মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

ঞ্চম খণ্ড

পূর্ণাঙ্গ

(তৃতীয় পর্ব)

॥ মনমথন প্রকাশন ॥
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

Anthology of one act Plays by Manmatha Ray

॥ মনমথন ॥

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

নবগ্রন্থ কুটির

৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

আনন্দ পাবলিশার্স

৯৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

এবং

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ জগদ্ধাত্রীপূজা, ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট ঃ বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ শ্রীমুদ্রণ

১নং খাসমহল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ ১৮৭২ ॥

আঠার-শ বাহাত্তর

প্রথম বাংলা সাধারণ নাট্যশালা

'ন্যাশানাল থিয়েটার'

প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠকদের স্মরণে প্রণাম

মন্মথ রায়

॥ ১৮৭২ ॥

—ঃ চরিত্রলিপি ঃ—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৫২)	ম্যানেজার (মল্লিকবাড়ির)
দীনবন্ধু মিত্র (৪২)	ফেকু সিং (দারওয়ান)
শিশিরকুমার ঘোষ (৩২)	প্রথম ভদ্রলোক
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২৪)	স্ত্রীবেশধারী পুরুষ
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (২২)	দ্বিতীয় ভদ্রলোক (নটবর দত্ত)
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নটবরের স্ত্রী (জয়া দাস)
অমৃতলাল বসু (১৯)	গোবিন্দ গাঙ্গুলী
নিমাইচরণ (সান্যাল বাড়ি)	রামহরি (গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ভৃত্য)
মহাকাল চৌধুরী	দীননাথ (গিরিশচন্দ্রের ভৃত্য)
মনোমোহন মিত্র (ইতিহাসের ছাত্র)	থিয়েটার দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ
কার্তিকচন্দ্র পাল (ড্রেসার)	ন্যাশানাল থিয়েটারের দর্শকবৃন্দ

দীনবন্ধু মিত্রের

॥ নীলদর্পণ ॥

১৮৭২/৭ই ডিসেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীতে

আংশিক ভূমিকালিপি

উডসাহেব (অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি)। রাইচরণ ও তোরাপ (মতিলাল সুর)

নবীনমাধব (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পদীময়রাণী ও সাধুচরণ (মহেন্দ্রলাল বসু)

গোপীনাথ দাওয়ান (শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। সূত্রধার ইত্যাদি।

॥ ১৮৭২ ॥

কলিকাতার রঙমহল থিয়েটারে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে
সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রথম অভিনয় রজনীতে রঙ্গসভা-র শিল্পীবৃন্দ

তুষার ভৌমিক	চন্দন রায়	ভোলা বসু
কমল মুখোপাধ্যায়	তাপস সাহা	অজিত মজুমদার
সুকোমল দাস	ধূর্জটীবন্দোপাধ্যায়	অচিন্ত্য মজুমদার
অবনীভূষণ দত্ত	প্রভাত দত্ত	দেবকিশোর বন্দ্যোঃ
অরিজিৎ সাহা	শংকর সরকার	সুদর্শন চক্রবর্তী
পান্না দত্ত	শিবানন্দ সাহা	বাচ্চু মুখোপাধ্যায়
শ্যামানন্দ দাসগুপ্ত	মলয় বিশ্বাস	হরেন কয়াল
নির্মল দাস	শৈলেন নস্কর	অজিত ভট্টাচার্য
প্রলয় রায় চৌধুরী	অলকনাথ	অমল দে
অতীন রায়চৌধুরী	শ্রীমতী ছবি তালুকদার	পালান নস্কর

নাট্য পরিচালনা ঃ তুষার ভৌমিক
সঙ্গীত পরিচালনা ঃ অচিন্ত্য মজুমদার

আলো ঃ রঞ্জিত মিত্র   মঞ্চ ঃ বাচ্চু মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রসঙ্গীত ঃ
ধনগোপাল গাঙ্গুলী, গোপাল দে, ফটিক দাস, গৌতম বসু ও
শৈলেন মণ্ডল।

প্রযোজনা ঃ **রঙ্গসভা**

সাধারণ সম্পাদক ঃ অচিন্ত্য মজুমদার
৩০৬, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-৪৭

॥ ১৮৭২ ॥
(আঠার-শ বাহাত্তর)

প্রথম দৃশ্য

[পটলডাঙা মল্লিক পরিবারে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা উপলক্ষে নাটকাভিনয়। অনুষ্ঠানে বাড়ির সিংহ দরজার সম্মুখে কৌতূহলী জনতাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে ফেকু সিং দারোয়ান।

প্লাকার্ড ঝুলিতেছে
পটলডাঙা মল্লিকবাড়ি বাসন্তী পূজায়
বিখ্যাত পটলডাঙা নাট্য সমিতির
থিয়েটার

বিদ্যাসুন্দর
WELCOME !

বাসন্তীপূজার বাদ্য শেষ হইতেই থিয়েটারের কনসার্ট শোনা গেল। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে দ্বারোয়ান তাঁহাদের হস্তস্থিত নিমন্ত্রণপত্র দৃষ্টে ভিতরে যাইবার অনুমতি দিতেছে। মল্লিকবাড়ির ম্যানেজারের প্রবেশ]

ম্যানেজার ॥ ফেকু সিং ?

ফেকু সিং ॥ ফরমাইয়ে হুজুর !

ম্যানেজার ॥ আর লোক ঢুকতে দিও না। থিয়েটারের আসরে তিল ধরণে কা জায়গা নেহি হ্যায়।

ফেকু সিং ॥ ওতো হ্যাম জানতা হ্যায়, লেকিন এই আদমি লোক ঠাকুর দেখনে মাঙ্গতা।

ম্যানেজার ॥ না না ও চালাকি চলবে না, ঠাকুর দেখবার নাম করে ভেতরে ঢুকে থিয়েটারের আসরে ভিড় জমাচ্ছে। বড় বাবুর ক্রোধ হয়েছে। তুমি এখন আর কাউকেই ঢুকতে দেবে না।

ফেকু সিং ॥ চিঠি দেখানে ভি ঘুসনে দেগা নেহি ম্যানেজার সাব ?

ম্যানেজার ॥ জরুর। আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে যাঁরা আসবেন তাদের সাত খুন মাপ। তাঁদের ঢুকতে দেবে। হয়াদ রাখ। [প্রস্থান]

ফেকু সিং ॥ [অপেক্ষমান লোকজনকে] হুকুম শুন লিয়া, আভি সব ভাগো।

১ম লোক ॥ ভাগতে বলছ কেন দারওয়ান সাহেব ? আমাদের এখানেই একটু দাঁড়িয়ে থাকতে দাও। বিদ্যাসুন্দর থিয়েটার হচ্ছে, কি সুন্দর কনসার্ট বাজছে।

২য় লোক ॥ আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই শুনবো এখন।

১ম লোক ॥ হাঁ দারওয়ানজী, বিদ্যাসুন্দরের দুখানা গান শুনতে পেলেই জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। আমরা বরং এই মাটিতেই বসে পড়ি।

৩য় লোক ॥ কিন্তু দরওয়ানজি, মায়ের কাছে যে আমার একটা মানত ছিল। মানতটা আমি দিয়ে আসছি, কি বল ?

ফেকু সিং ॥ নেহি নেহি, তোমরা মৎলব হাম সামাজলিয়া। তোমারা মানত তো থিয়েটার দেখ কর মজা লুটনা। [সকলে হাসিয়া উঠিল]

ফেকু সিং ॥ ভাগো সব, হিয়া পর হল্লা মাত করো।

[এমন সময় এক স্বামী-স্ত্রী ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসিয়া পত্র দেখাইলেন]

ফেকু সিং ॥ এক চিটঠি দো আদমী !

ভদ্রলোক ॥ নিমন্ত্রণ চিঠিতে রয়েছে সস্ত্রীক, ইনি আমার ইস্ত্রী।

ফেকু সিং ॥ আচ্ছা আচ্ছা, যাইয়ে—

[সস্ত্রীক ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকিলেন। দারওয়ানের কেমন সন্দেহ হইল]

১ম লোক ॥ এ কেমন স্ত্রীরে বাবা, মাথায় একেবারে সমান সমান !

[দারওয়ান ঐ সস্ত্রীক ভদ্রলোকটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল, হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল]

ফেকু সিং ॥ ঠারো।

[দারওয়ান ভিতরে গিয়া সস্ত্রীক ভদ্রলোককে বাহিরে টানিয়া লইয়া আসিল। দেখা গেল, ভদ্রলোকের সত্রীটির অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে সত্রীটি স্ত্রী নয়, তরুণ গুম্ফ শোভিত একটি যুবক। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

ভদ্রলোক ॥ শোন বাবা দরওয়ানজী। আমাদের নিমতলা থিয়েটার পার্টির খুব বড় এক্টর ইনি। বিদ্যাসুন্দর থিয়েটারটা কোনদিন দেখেনি। আমাকে খুব ধরে বসল। কি আর করব, তাই স্ত্রীকে না এনে একেই স্ত্রী সাজিয়ে—

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ফেকু সিং ॥ ভদ্দর আদমী হোকে এইসা ঠকবাজি ! পুলিশ বোলায় গা ?

[পুলিশ-এর কথা শোনামাত্র স্ত্রীবেশ ধারী যুবকটি 'ওরে বাবা' বলিয়া পলায়ন করিল।]

ভদ্রলোক ॥ আরে আরে—আমাকে মজিয়ে তুই-ই পালালি। খুব দেখালি যা হোক। তোকে আমি ছাড়ছি না, যাবি কোথায় ?

১ম লোক ॥ নিমতলা।

[ভদ্রলোকটিরও পলায়ন]

২য় লোক ॥ নাও, এও এক বিদ্যাসুন্দর নাটক হয়ে গেল।

৩য় লোক ॥ আর কতক্ষণ কনসার্ট বাজবে বাবা !

১ম লোক ॥ বাজুক না। বেশ বাজাচ্ছে।

২য় লোক ॥ পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা, আপত্তি কেন ?

[সস্ত্রীক আর একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁর হাতেও নিমন্ত্রণ পত্র। ভদ্রলোকের চালচলন দেখিয়া মনে হয় ইঁহার দাপট আছে। ইনি দারওয়ানকে নিমন্ত্রণ পত্র দেখাইলে—দারওয়ান নিমন্ত্রণ পত্রটি হাতে লইয়া ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।]

১ম লোক ॥ এইরে। এবার বাজিয়ে নিচ্ছে।

ভদ্রলোক ॥ পা থেকে মাথা কি দেখছো ?

ফেকু সিং ॥ ঘোমটা উতারণে পড়েগা।

ভদ্রলোক ॥ ঘোমটা উতারণে পড়েগা ! কাহে ?

ফেকু সিং ॥ হাম ইসকা বদন দেখে গা।

[সকলে হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোক সংগে সংগে দারওয়ানকে চপেটাঘাত করিলেন। সংগে সংগে দারওয়ানও তার হাতের লাঠি দিয়া ভদ্রলোককে পিটাইতে লাগিল।]

স্ত্রী ॥ (আর্তকণ্ঠে) ওরে কি সর্বনাশ হল। আমার স্বামীকে খুন করে ফেললে যে।

[স্ত্রী স্বামীকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। দারোয়ান স্বামীকে গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিল।]

ভদ্রলোক ॥ আমি দেখে নেব—আমি দেখে নেব। নিমন্ত্রণ করে থিয়েটার দেখতে ডেকে এনে, শেষে এই অপমান—এই গলা ধাক্কা !

১ম লোক ॥ মশাই, বড়লোকের বাড়ির কাণ্ডকারখানাই এমনি।

ফেকু সিং ॥ নিকালো সব—নিকালো।

২য় লোক ॥ দেশে এমন কোন লোক নেই, যে আমাদের সর্বসাধারণের দেখার জন্য একটা থিয়েটার করে দেয় !

ভদ্রলোক ॥ আমি দেখছি আমি দেখছি।

৩য় লোক ॥ আর দেখেছেন !

১ম লোক ॥ এই যা দেখেছেন, তারই ঠেলা সামলান এখন।

[সকলে উচ্চহাস্য করিল]

২য় লোক ॥ থিয়েটার কি শুধু বড়লোকরাই দেখবে ?

৩য় লোক ॥ একটা পাব্লিক থিয়েটার হয় না কেন ? আমরা টিকিট কিনেই দেখতাম।

১ম লোক ॥ অ দারোয়ান জী, আমরা টিকিট কিনেই ঢুকবো—উপরি কিছু কামিয়ে নাও না।

ফেকু ॥ ভাগো সব, জলদি, ভাগো, আভি ভাগো। থিয়েটার সুরু হো গিয়া, গোলমাল মাত করো—গোলমাল মাত করো—গোলমাল মাত করো। গোলমাল করনে সে হাম ইয়ে ডাণ্ডা মারেগা।

[লাঠি উত্তোলন করিয়া দারোয়ান সকলকে তাড়াইয়া দিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাইকোর্টের কর্মচারী গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়িতে শ্যামবাজার নাট্যসমাজের নাটক মহলার আসর (রিহার্সাল রুম)। সন্ধ্যা। বেশকারক (ড্রেসার) দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটক হইতে একটি অংশ বিড় বিড় করিয়া অভিনয় করিতেছিল। গৃহস্বামী গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

গোবিন্দ ॥ কি হে কার্তিক একা একাই এ্যাক্টো করছো, দলবল কই ?

কার্তিক ॥ তা এই সব এসে পড়লেন বলে—

গোবিন্দ ॥ আমার যে আর তর সইছে না।

কার্তিক ॥ কেন বলুন তো ?

গোবিন্দ ॥ তোমাদের শ্যামবাজার নাট্যসমাজ আমার এই ঘরে তোমাদের 'লীলাবতী' নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। হাইকোর্টে জজ সাহেবের পেশকারি করি তো, কথাটা একেবারে জজ সাহেবের কানে পেঁাচেছে।

কার্তিক ॥ তাই নাকি স্যার ?

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ গো। জজ সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে বললেন—ওহে গোবিন্দবাবু, এই দেখ, সংবাদপত্রে তোমাদের "লীলাবতী" নাটকের কথা খুব লিখেছে। এই দেখ—কাগজটা আমায় দিলেন, এই যে—(দেখাইলেন)··তখন আমার কি গর্ব হল—বল তো ?

কার্তিক ॥ বটেই তো, তা কি লিখেছে ?

গোবিন্দ ॥ এখন নয়—এখন নয়। দলবল আসুক তোমাদের জন্য এক হাঁড়ি মিষ্ট কিনে আনি, তারপর সে সব হবে। [প্রস্থান]

[প্রথম দৃশ্যের ২য় ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ভদ্রলোক ॥ এটাই কি হাইকোর্টের কর্মচারী গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ি ?

কার্তিক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ

ভদ্রলোক ॥ এখানে কি বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার-এর আপিস ?

কার্তিক ॥ বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নাম বদলে এখন শ্যামবাজার নাট্যসমাজ হয়েছে। এটা সেই শ্যামবাজার নাট্যসমাজ।

ভদ্রলোক ॥ নামে কিছু যায় আসে না। নাম ধুয়ে তো আর জল খাইনে। আসল কথা হচ্ছে, এ দলে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ, নগেন্দ্র ব্যানার্জী, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর এঁরা সব আছেন কিনা ? এঁরা দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'সধবার একাদশী' আর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' করেছেন কিনা ? আর এখন 'লীলাবতী' নাটক করে—দেশটা একবারে জ্বালিয়ে দিয়েছেন কি না ?

কার্তিক ॥ লঙ্কাকাণ্ড কিছু হয়েছে কিনা জানিনা। তবে হ্যাঁ মশাই, এঁরা তাঁরাই। আপনি—?

ভদ্রলোক ॥ আমি মশাই শ্রীযুক্ত বাবু নটবর দত্ত। আপনি ?

কার্তিক ॥ আজ্ঞে, আমি শ্রীযুক্ত বাবু কার্তিক চন্দ্র পাল।

নটবর ॥ মহাশয়ের এখন কি করা হয় ?

কার্তিক ॥ থিয়েটার করি।

নটবর ॥ ও আপনিও থিয়েটার করেন ? তবে তো আপনি নমস্য ব্যক্তি। নমস্কার-নমস্কার।

কার্তিক ॥ নমস্কার।

নটবর ॥ কি পার্ট করেন মশাই ?

কার্তিক ॥ যখন যা দরকার হয়, করি। সবাইকে সাজিয়ে দিই—মানে—তৈরী করে দিই—অভিনয়ের উপযোগী করে সবাইকে তৈরী করে দিই।

নটবর ॥ ওরে বাবা ! তবে আপনাকেই বলি—হ্যাঁ বলেই ফেলি।

কার্তিক ॥ বলুন না, কি বলবেন।

নটবর ॥ ভেবেছিলাম, ঐ গিরিশ ঘোষকে বলবো। একটু সম্পর্ক আছে কিনা—একটুই বা বলি কেন, বেশ ভাল সম্পর্কই আছে। আমার মাসতুতো শালার পিসতুতো বোনের মামাতো দেওর। আমাকে অবিশ্যি চেনেন না, কিন্তু বললে কি আর চিনবেন না ? কিন্তু বলি কখন ? খবর-টবর নিয়ে যখন সেখানে যাই, গিয়ে শুনি নেই। এখানে এসেও তো দেখছি নেই। আমি মশাই হয়রান হয়ে গেছি। জুতোর শুকতলা খয়ে গেল। তা মশায় আপনি যখন সবাইকে তৈরি টৈরি করেন, আপনিও তো কিছু কম নন। আপনাকেই বলি, আপনিই শুনুন।

কার্তিক ॥ কিন্তু এখন তো আমার আর সময় নেই। রিহার্সালের সব যোগাড় যন্ত্র করতে হবে। একজন এ্যাক্টর আবার অসুখ করে বসে আছেন। তাঁর বদলে লোক খুঁজে বের করতে হবে। যত সব ঝামেলা। আমার সময় হবে না স্যার। আপনি বরং আর একদিন আসবেন।

নটবর ॥ বেশ, কিছু শুনতে হবে না। (পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া) খবরের কাগজে আপনি শুধু এই জায়গাটুকু পড়ুন। (কাগজটি কার্তিকের হাতে দিলেন)।

কার্তিক ॥ (কাগজের ঐ অংশটুক্ পাঠ) "পটলডাঙ্গা মল্লিক পরিবারে বাসন্তী পুজোর সময়ে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্বেও অনেকটি ভদ্রলোককে দারয়ানের গলা ধাক্কা খাইতে হইল।"

নটবর ॥ মশাই—মশাই ! ঐ অনেকটির মধ্যে আমিও একটি। একটিই বা বলি কেন ? দুইটি। (সখেদে) বলতে বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়—আমার

স্ত্রীও সংগে ছিলেন। সে যে কি অপমান।

কার্তিক ॥ ধনীগৃহের সখের থিয়েটারে এমনি সব অত্যাচার অনাচার হয় বলেই আমরা মধ্যবিত্ত নাটুকে লোকেরা নিজেদের থিয়েটার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। অর্ধেন্দুবাবু, গিরীশবাবু নগেন্দ্রবাবু এ'দের সকলেরই এখন ঐ এক চেষ্টা, এক চিন্তা, এক ধ্যান। ও'দের সংগে কথা বললেই তা বুঝবেন এবং এটা জেনে রাখুন "দুঃখ নিশি পোহাইতে আর বিলম্ব নাই।" আমি তা ভাবছি না, ভাবছি—

নটবর ॥ কি ভাবছেন?

কার্তিক ॥ ভাবছি, আপনি কি একজন এ্যাক্টর? মনের কথা কি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করলেন? একেবারে চোখে জল এসে গেল আপনার?

নটবর ॥ (খুশি হইয়া সহাস্যে) এসেছিল নাকি? তবে শুনুন মশাই, আমার স্ত্রীও বলেন, আমি নাকি পারবো। গিরিশবাবুর সঙ্গে তো সম্পর্ক রয়েই গেছে--হবে না কেন।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিরিশবাবু তো আপনার মাসতুতো শালার মামাতো বোনের পিসতুতো দেওর।

নটবর ॥ না, না, না মশাই ভুল করলেন। পিসতুতো বোনের মামাতো দেওর। না কি আমিই ভুল করলাম! বেশ, আপনি যা বললেন তাই। তা আপনাদের এখানেও তো একজন এ্যাক্টরের অসুখ হয়েছে। তাঁর জায়গায় তো একজন লোকের দরকার। নিন না আমাকে!

কার্তিক ॥ কোন নাটকে আপনি পার্ট টার্ট করেছেন?

নটবর ॥ না মশাই। তবে দেখিয়ে দিলে, আপনি যখন বলছেন, আর স্ত্রীও যখন বলেন, নিশ্চয়ই আমি পারবো।

কার্তিক। হ্যাঁ। লীলাবতী নাটকে শ্রীনাথের পার্ট করে শিবনাথ চাটুজ্যে। হঠাৎ অসুখে পড়েছে। ঐ পার্টটা কয়েকদিন চালিয়ে দেবার জন্যে কাউকে খুঁজে বের করবার ভার আমার উপরেই পড়েছে। মশাই-এর চেহারাটা ঠিক আছে, এখন বচনগুলো বেরুলেই হলো।

নটবর ॥ বেরুবে মশাই, বেরুবে। গিন্নী তো বলেন, আমার নাকি বচনই সার। আর ইস্ত্রী মানেই শ্রী। আমি ইস্ত্রীর যখন নাথ তখন তো শ্রীনাথ হয়েই এসেছি।

কার্তিক। বাঃ! কথার খই ফুটছে দেখছি। তাহলে পার্টটা ধরছি। আমি যা যা বলবো, আপনি যথাযথ ঠিক তাই-ই বলবেন।

নটবর ॥ হ্যাঁ, তাই-ই বলবো--সে আমি জানি। বলতে গেলে আপনাদের গিরিশ ঘোষ তো আমাদেরই ঘরের লোক।

কার্তিক ॥ (বইয়ের পাতা উল্টাইয়া) বলুন, তবে তোমার পিসির ছেলে-

দের ডাকো।

নটবর ॥ বলুন, তবে তোমার পিসির ছেলেদের ডাকো।

কার্তিক ॥ না না বলুন নয়। শুধু বলুন, তবে তোমার পিসির ছেলেদের ডাকো।

নটবর ॥ না না বলুন নয়। শুধু বলুন, তবে তোমার পিসির ছেলেদের ডাকো।

কার্তিক ॥ ‘ই সেরেছে!

নটবর ॥ এই সেরেছে!

কার্তিক ॥ না মশাই, আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনি যান।

নটবর ॥ না মশাই, আপনাকে দিয়ে হবে না আপনি যান।

[গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ভৃত্য রামহরির প্রবেশ।]

কার্তিক ॥ (নটবরকে) আপনি বেরিয়ে যান।

নটবর ॥ (কার্তিককে) আপনি বেরিয়ে যান।

কার্তিক ॥ (নটবরকে) আমি না তুমি।

নটবর ॥ আমি না তুমি।

কার্তিক ॥ আঃ, কি পাগলামো হচ্ছে? বেরিয়ে যান বলছি।

নটবর ॥ আঃ, কি পাগলামো হচ্ছে বেরিয়ে যান বলছি।

কার্তিক ॥ ওরে রামহরি, দেখছিস কি? বদ্ধ পাগল, বের করে দে দেখি।

নটবর ॥ ওরে রামহরি, দেখছিস কি? বদ্ধ পাগল, বের করে দে দেখি।

রামহরি ॥ তাই বলুন কত্তা। ভাবগতিক দেখেই আমি বুঝেছি। (নটবরকে) চলুন মশাই। ভাল চান তো চলুন, নইলে গলাধক্কা খাবেন।

নটবর ॥ এখানেও গলাধাক্কা! এখানেও গলাধাক্কা বেশ। বল মা তারা তবে আর দাঁড়াব কোথা! [প্রস্থান]

রামহরি ॥ কি হয়েছিল কার্তিকবাবু? লোকটা কে?

কার্তিক ॥ একটা পাগল। মানে থিয়েটার-পাগল লোক।

রামহরি ॥ তা আপনারা সবাই তাই। কর্তামা বলেন যে। আড়াল থেকে সব দেখেন আর শোনেন তো। বলেন তো আমাকে, রামহরি, ওঘরে বেশি ঢুকবি নে, অত ঘন ঘন তামাক দিতে যাবি নে। পাগলের ছোঁয়াচ বড় মন্দ ছোঁয়াচ। তোদের কর্তাবাবুকে দিয়েই বোঝ। রোজ বাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি মেঠাই মোণ্ডা আসছে। পাগলে এনে পাগলদেরই বিলোচ্ছে।

কার্তিক ॥ কথাটা তোমার কর্তা মা কিছু মিথ্যে বলেন নি। পাগল না হলে থিয়েটার হয় না—কোন বড় কাজই হয়না জানবে রামহরি।

রামহরি ॥ পাগল—সবাই পাগল। তা আমাদেরটি কোথায় গেলেন?

আফিস থেকে এসেই তো নিচে নেমে এলেন। এখানে নেই, তবে গেলেন কোথায় !

কার্তিক ॥ এসেছিলেন। এক হাঁড়ি মেঠাই-মোণ্ডা আনতে চলে গেলেন। (বাহিরে কথাবার্তা শুনিয়া) ঐ যে এখানকার বাবুরা আসছেন। অনেকক্ষণ তামাক হয়নি। যাও যাও রামহরি সবার জন্যে তামাক সেজে আন।

রামহরি ॥ তা যাচ্ছি। তামাকের আগুন আর জ্বালাতে হবে না—ভেতরে আগুন জ্বলেই আছে। কর্তাবাবু এলে, তাঁরে এখন আর উপরে যেতে দেবেন না। আর যদি যান, তবে ঐ এক হাঁড়ি মেঠাই যেন পুরোপুরিই ওপরে নিয়ে যান।

[দীনবন্ধু মিত্রকে লইয়া অর্ধেন্দু মুস্তাফী, গিরিশ ঘোষ এবং নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

নগেন্দ্র ॥ (রামহরিকে) রামহরি, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। গন্‌গনে আগুনে বেশ ভাল করে তামাক সেজে আন দেখি।

রামহরি ॥ গন্‌গনে আগুন ?

নগেন্দ্র ॥ হ্যাঁ গন্‌-গনে আগুন।

রামহরি ॥ ও আর বলতে হবে না, ও অন্দরে জ্বালাই রয়েছে।

[প্রস্থান। নগেনবাবুরা সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এক নগেন্দ্রছাড়া আর সকলেই কিন্তু একটু চিন্তান্বিত এবং গম্ভীর।]

নগেন্দ্র ॥ ব্যাস্‌। অনেক এলোমেলো চিন্তা ভাবনা হয়েছে—এইবার আমাদের কথাবার্তাগুলো পাকাপাকি করে ফেলা যাক। কি, সব গম্ভীর হয়ে বসে যে ! কি অর্ধেন্দু—কি গিরিশ, দীনবন্ধুবাবুকে কত কষ্টে ধরে এনেছি, তোমাদের সংগে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ করেছি। আমার প্রস্তাব "লীলাবতীর" পর ওঁরা "নীলদর্পণ" বই ধরা। এখন তোমরা কথাবার্তা বলো।

গিরিশ ॥ না না এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।

অর্ধেন্দু ॥ আন্‌ডাউটেড্‌লী। দেয়ার ক্যান্‌ট বি এনি টু ওপিনিয়ন এ্যাবাউট ইট। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় মুদ্রিত নীলদর্পণের প্রথম সংস্করণের বইটা আমার আছে। এই বারো বৎসর বইটা পড়ছি। যতবার পড়ি গা শিউরে ওঠে। কি বই-ই লিখেছেন স্যার !

দীনবন্ধু ॥ নীলদর্পণ ! বইটার কথা মনে পড়লেই আমার অতীত-টা সামনে ভেসে ওঠে। নীল চাষের অঞ্চলেই তখন আমার কর্মক্ষেত্র, সেখানে কি নৃশংস অত্যাচারই না নীলকর সাহেবরা চাষী প্রজাদের ওপর অনবরত চালিয়ে গেছে, আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। প্রতিকারের কোন ক্ষমতা ছিল না, দেখেছি আর নীরবে কেঁদেছি। ভেবে দেখলাম, এই অত্যাচার, এই দুঃখ কষ্টের কাহিনী আমি লিখব—দেশে-বিদেশে জানাবো। ভেবে দেখলাম, এই কাহিনীই হবে সত্যিকারের নাটক—জীবন থেকে নেওয়া, জীবন দিয়ে লেখা।

গিরিশ ॥ অতি সত্য কথা। নীলদর্পণেই আপনার অভিজ্ঞতার আর সহানুভূতির পূর্ণ সংযোগ হয়েছিল। তাই নীলদর্পণ আপনার লেখা সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। তবু যদি অভয় দেন, তবে বলি!

দীনবন্ধু ॥ বল বল।

গিরিশ ॥ আপনার নাটকে চাষী চরিত্রগুলি গ্রাম্যভাষায় স্বাভাবিকভাবে এঁকেছেন বলে যেমন উজ্বল হয়ে উঠেছে, মধ্যবিত্ত ভদ্র চরিত্রগুলি সংস্কৃত বহুল শুদ্ধভাষায় কথাবার্তা বলায় তেমন উজ্বল না হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে।

দীনবন্ধু ॥ তুমি ঠিকই ধরেছো গিরিশ। তোমার বিচার-বুদ্ধি দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আমার মুখের উপর এইরূপ মন্তব্য আর কেউ কখনও করেনি।

গিরিশ ॥ কিন্তু জানবেন আমি আপনার ভক্ত। আর এও জানবেন আপনি আমাদের নাট্যগুরু।

দীনবন্ধু ॥ তুমি নাটক লেখ গিরিশ। তোমার জয় অনিবার্য।

[ভৃত্য রামহরি আসিয়া দীনবন্ধুকে তামাক দিল]

অর্ধেন্দু ॥ গিরিশ যা বলছে বলুক, নীলদর্পণ আমাদের ন্যাশনাল নাটক। রেভারেণ্ড লং বৃটিশ স্বার্থ বিরোধী এই নাটক প্রচার করে কারাবদ্ধ হয়েছিলেন। এর ইংরাজী অনুবাদ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়েছিলেন—

দীনবন্ধু ॥ শুধু কি তাই! শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন নির্বাহের উপায় ছিল সুপ্রীম কোর্টের যে চাকরী—তাও ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাতে তাঁর কি দুরবস্থা হল ভেবে দেখ।

নগেন্দ্র ॥ স্যারেরও তো অতবড় সরকারী চাকরি—বেঁচে গেছেন শুধু বইটাতে গ্রন্থকার হিসাবে আপনার নাম ছিল না বলে!

দীনবন্ধু ॥ কথাটা মিথ্যে নয় গিরিশ। তবে, কে লিখেছে ওরা শেষে জেনেছিল। কিন্তু ধরতে গিয়ে আইনের নাগাল পেল না।

অর্ধেন্দু ॥ আইনেই হোক আর বে-আইনের হোক আমরা কিন্তু নাগাল পেয়েছি। আর তা যখন পেয়েছি আমাদের স্বপ্নের ন্যাশনাল থিয়েটার খুলছি ন্যাশনাল নাটক "নীলদর্পণ" দিয়ে।

গিরিশ ॥ (অর্ধেন্দুকে) ন্যাশনাল থিয়েটার সম্বন্ধে আমার অন্যমত তাতে থাকলেও একথা অবশ্যই বলব—ধনীগৃহে যেসব থিয়েটার হয়ে থাকে সর্ব সাধারণের প্রবেশ অধিকার নেই। ওসব থিয়েটার বড় লোকদের খামখেয়ালীর আসর হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা মর্মান্তিক সত্য—এবং এটা অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ স্যার। মল্লিক বাড়িতে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত

হয়ে থিয়েটার দেখতে গিয়ে গলা ধাক্কা খেয়ে আজ এখানে কাঁদতে কাঁদতে আপনার কাছে এসে ছিলেন প্রতিকারের জন্য।

নগেন্দ্র ॥ হ্যাঁ জানি, সংবাদপত্রে এ কাহিনী প্রকাশ হয়েছে।

অর্ধেন্দু ॥ কাজেই দি ওন্‌লি রেমিডি ইজ এ পাবলিক থিয়েটার। আর, আমরা সেই পাবলিক থিয়েটারই করছি।

নগেন্দ্র ॥ আমরা টিকিট বিক্রি করে প্লে করবো। সর্বসাধারণের দেখার অধিকার থাকবে, কারও খামখেয়ালে চলবে না। নাম হবে ন্যাশানাল থিয়েটার। জাতির দর্পণ।

গিরিশ ॥ ন্যাশানাল থিয়েটার নামটাতেই আমার আপত্তি। থিয়েটারের জন্য একখানা ভাল বাড়ি না করে টিকিট বেচবার ব্যবস্থা করলে কিছুই হবে না। আগে ভাল স্টেজ করো—তারপর টিকিট বিক্রী করো। নইলে, লোকে টিকিট কিনবে কেন?

অর্ধেন্দু ॥ রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে। ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

নগেন্দ্র ॥ হ্যাঁ আমরা ছোট বাড়িতেই আরম্ভ করি। ছোটখাটো স্টেজ করি। প্রথমেই বড় বাড়ি বড় স্টেজ কোথায় পাব? আমাদের অত টাকা কোথায়?

গিরিশ ॥ (দীনবন্ধুকে) শুনেছেন স্যার অথচ নাম দেওয়া হবে 'ন্যাশানাল থিয়েটার'। টিকিট কিনে সব দেখেশুনে দর্শক আমাদের বলবে ঠগ আর জোচ্চোর। আমি এতে নেই।

গোবিন্দ ॥ এই যে মশাইরা সব এসে গেছেন। (দীনবন্ধুকে দেখিয়া) কি সৌভাগ্য! খোদ দীনবন্ধু মিত্র, আপনিও স্যার এসে গেছেন! শুনুন স্যার। আপনার 'লীলাবতী' নাটক আর এঁদের অভিনয় দেখে জনৈক দর্শক কি লিখে-ছেন শুনুন—

(পাঠ)—এডুকেশন গেজেট, ২৪শে মে, ১৮৭২। আমার বোধহয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোক ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন, এবং দেশের অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।

নগেন্দ্র ॥ তার মানেই একটা ন্যাশানাল থিয়েটার চাইছে।

অর্ধেন্দু ॥ সবাই চাইছে, সবদিক ভেবে চিন্তেই চাইছে।

গোবিন্দ ॥ (দীনবন্ধুকে) আপনি কি বলেন স্যার?

দীনবন্ধু ॥ হওয়া উচিত। নইলে ধনীদের এ খামখেয়ালী বন্ধ হবে না। আর তাছাড়া ধনীদের থিয়েটারী নাটকে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা, জাতির স্বধীনতার সাধনা আর সংকল্প প্রতিফলিত হবে না। সেই জন্যই, আমিও চাই একটি ন্যাশানাল থিয়েটার হোক।

গিরিশ ॥ মধ্যবিত্তের জন্য থিয়েটার হোক, টিকিট বিক্রী করে প্লে হোক ভাল কথা—কিন্তু সেটাকে ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিতে আপত্তি।

দীনবন্ধু ॥ কেন গিরিশ ?

গিরিশ ॥ ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাশানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম ব্যতীত সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত।'

নগেন ॥ অমত কেন ?

গিরিশ ॥ 'কারণ একেই তো এখন বাঙালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি।'

অর্ধেন্দু ॥ Let the dogs bark, the caravan will pass.

গিরিশ ॥ 'ন্যাশানাল থিয়েটার নামে (আমাদের) অনেকেই বুঝিবে যে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশানাল থিয়েটার করিতেছে ইহা বিসদৃশ।' এ যেন—ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

নগেন্দ্র ॥ দেখ গিরিশ, কে কি বলবে—কে কি ভাববে, এ সব চিন্তা করলে কোন বড় কাজই করা যায় না। তুমি নিজেদের এত ছোট মনে করছ কেন আমি কিন্তু বুঝছি না।

অর্ধেন্দু ॥ আমিও না।

গিরিশ ॥ আমি যা বুঝেছি, আমি বললাম। তোমরা যা বুঝবে করবে। তবে জেন ন্যাশানাল কথাটার একটা মর্যাদা আছে, অন্ততঃ আমার কাছে।… আচ্ছা চলি, আমার মাথাটা বডড ধরেছে।

নগেন্দ্র ॥ যেতে চাইছো যাও ; কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার আমরা করবই।

গিরিশ ॥ করো। কিন্তু জেন, আমি তাতে নেই।

[গিরিশ প্রস্থানোদ্যত]

অর্ধেন্দু ॥ শোন—শোন।

গিরিশ ॥ না—না।

[দীনবন্ধুর পদধূলি লইয়া প্রস্থান]

দীনবন্ধু ॥ গিরিশ চলে যাওয়া মানে তোমাদের স্তম্ভটাই ভেঙ্গে যাওয়া।

অর্ধেন্দু ॥ অস্বীকার করা চলে না।

নগেন্দ্র ॥ কিন্তু স্তম্ভটাই সব নয়, ভিতটাই আসল। আমরা থিয়েটার খুলবোই।

অর্ধেন্দু ॥ (দীনবন্ধুকে) আপনি স্যার আমাদের আশীর্বাদ করুন।

দীনবন্ধু ॥ জয়োস্তু। তোমাদের এই ন্যাশানাল থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণ হোক।

অর্ধেন্দু ॥ আপনার নীলদর্পণই হবে জাতীয়তার পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

দীনবন্ধু ॥ আবার বলছি জয়োস্তু।

গোবিন্দ ॥ তাহলে ন্যাশানাল থিয়েটার হচ্ছে ?

নগেন্দ্র ॥ হ্যাঁ হচ্ছে।

গোবিন্দ ॥ আপনাদের মিষ্টি মুখ করাতে বাগবাজার থেকে এক হাঁড়ি সন্দেশ কিনে নিজে বয়ে এনেছি—এই যে। কিন্তু, স্যারের মুখে ঐ জাতীয়তার কথা শুনে একটা বিজাতীয় ভয় মনে পড়ে গেল।

[গোবিন্দের ইংগিতে পূর্বেই রামহরি ইঁহাদের জন্য কয়েকটি প্লেট হাতে হাতে দাঁড়াইয়াছিল। এবার গোবিন্দের ইঙ্গিতে প্লেটগুলি সকলের সামনে দিয়া মিষ্টি দিল। গোবিন্দ নিজে খাইলেন না।]

গোবিন্দ ॥ নিন্ নিন্ চটপট খেয়ে নিন্ স্যার।

দীনবন্ধু ॥ খাইতে খাইতে মিষ্টিটা তো বেশ ভালো। গোবিন্দবাবু, আপনি খাচ্ছেন না যে।

গোবিন্দ ॥ আমার খাওয়া মাথায় উঠেছে স্যার।

নগেন্দ্র ॥ সে কি মশাই !

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ ভাই, আমার বাড়িতে ন্যাশানাল থিয়েটার -এর রিহার্স্যাল হলে সরকারী চাকরী কি আর আমার থাকবে ?

দীনবন্ধু ॥ ও !

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ। চারিদিকে সরকারের স্পাই রয়েছে যে।

অর্ধেন্দু ॥ সে স্পাই তবে আপনি নিজে। (দীনবন্ধুকে) জানেন স্যার এই ঘরে আপনার লীলাবতীর রিহার্স্যাল চলছিল। রিহার্স্যাল দেখে খুব খুসি হয়ে এই গাঙ্গুলী মশাই বলে উঠলেন—হাইকোর্ট থেকে ফেরার সুময় চপ-কাটলেট এনে আমাদের খাওয়াবেন।

গোবিন্দ ॥ খাওয়াই নি ?

অর্ধেন্দু ॥ খাইয়েছিলেন কিন্তু নিজে খেলেন না।

দীনবন্ধু ॥ কেন, কেন ?

নগেন্দ্র ॥ ও হো, মনে পড়েছে—লর্ড মেয়ো-র শোকে।

অর্ধেন্দু ॥ লর্ড মেয়ো র বড় কুটুম যে, খাবেন কি করে ?

গোবিন্দ ॥ দেখুন তো স্যার, ঠাট্টারওতো একটা সীমা আছে। আপিসে খবর এল বড় লাট লর্ড মেয়োকে আন্দামান দ্বীপে কে খুন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আপিস আদালত দোকানপাঠ সব বন্ধ হয়ে গেল। সরস্বতী পুজোর অমন ধুমধাম তাও সব বন্ধ হয়ে যেতে দেখলাম। অতবড় একটা লোক ওভাবে মারা গেলেন, আমার মুখে সেদিন আর কিছু উঠল না।

অর্ধেন্দু ॥ তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, ওঁর ভাগটা আমিই মেরে দিলাম !

নগেন্দ্র ॥ আরে মশাই আমার তো আর লর্ড মেয়োর জ্ঞাতি কুটুম্ব নই যে, অশৌচ পালন করব ! এ দেশের কত শত সিপাই বিদ্রোহে মারা গেল, শহীদ হলো। চা খাওয়াটাই বন্ধ রেখেছিল এ দেশে কোন সাহেব ?

দীনবন্ধু ॥ আচ্ছা আমি তবে উঠছি।

নগেন্দ্র ॥ হ্যাঁ স্যার চলুন, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছি।

গোবিন্দ ॥ আসুন স্যার—আসুন। গিরিশের প্রস্থানে মনটা পীড়িত হল, নইলে আপনাকে এখন ছাড়তাম না স্যার।

[দীনবন্ধুকে লইয়া নগেন্দ্র ও গোবিন্দ বাহির হইয়া গেল।]

অর্ধেন্দু ॥ কার্তিক।

কার্তিক ॥ বলুন স্যার।

অর্ধেন্দু ॥ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি। এখানে আমার খোঁজে আমার বাবা এসেছিলেন কি আজ ?

কার্তিক ॥ কথাটা আমিও আপনাকে বলবার সুয়োগ খুঁজছিলাম ! তিনি এসেছিলেন এবং আপনাকে না পেয়ে আমাকে বলে গেছেন, যেমন করেই হোক আপনি যেন পঞ্চাশটি টাকা হাতে নিয়ে আজ বাড়ি ফেরেন। নইলে, সাংঘাতিক কি পারিবারিক বিপদ ঘটবে।

অর্ধেন্দু ॥ তুমি কোন কাবুলিওয়ালার সন্ধান রাখো, যারা চড়া সুদে টাকা ধার দেয় ?

কার্তিক ॥ অমন কাজটি করবেন না স্যার। আমিও তো এক কাবুলি-ওয়ালার খাতক। যেখানে সেখানে তাগিদ, লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারি না স্যার, আর আপনি তো মাননীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মামাতো ভাই—

অর্ধেন্দু ॥ আরে সে তো একদিন ছিলাম। কিন্তু 'কিছু কিছু বুঝি, নাটকে ঐ রাজবাটীর এক কর্তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে অভিনয় করাই হল আমার কাল। আমার কৃতকর্মের ফলে রাজবাড়ি থেকে শুধু আমিই বিতাড়িত হয়নি, আমার পিতা মাতাও।

কার্তিক ॥ তাহলে আর 'কিছু কিছু' নয় অনেক কিছুই বুঝেছেন স্যার।

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ তা বুঝেছি, আজকের বড়লোকেরা কি চিজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাট্যাভিনয় যে কতবড় হাতিয়ার সেটা বুঝতেও আর বাকী নেই। সেই থেকেই এই নাট্যাভিনয়-ই হয়েছে আমার ব্রত। কিন্তু দুঃখ এই, পরিবারকে উপবাসী রেখে তো আর থিয়েটার করা চলে না। বন্ধু-বান্ধব দশজন আমাকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করে বলেই এখনও টিঁকে

আছি। কিন্তু তারাই বা আর কত করবে? তারাও তো সাবাই দিন আনে দিন খায়। নাটক নিয়ে আমরা যারা মাথা ঘামাই, সবারি প্রায় এই এক অবস্থা। এক গিরিশই যা একটু দাঁড়িয়েছে। সে বলেছিল আজ কিছু দেবে—তা তো দেখলেই, ঝগড়া করে চলে গেল।

[নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ]

নগেন ॥ দীনবন্ধু বাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম। বলছিলেন, খুব দুর্বল বোধ করছেন। একে তো ভগ্নস্বাস্থ্য, তার ওপর আবার সরকারের সংগে চলেছে মনোমালিন্য। এতকালের পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টালের চাকরি থেকে সরিয়ে, ঠেলে দিয়েছে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে। আঘাতটা খুব লেগেছে—তার উপর আজ গিরিশবাবু যে আমাদের দল ছেড়ে চলে গেলেন—এতেও বেশ আঘাত পেয়েছেন। গিরিশকে বাদ দিয়ে উনি নীলদর্পণের কথা ভাবতেও পারছেন না।

অর্ধেন্দু ॥ উনি কি চান যে, আমরা গিয়ে গিরিশবাবুর হাতে পায়ে ধরি?

নগেন ॥ না দীনবন্ধুবাবু এমন কোন কথা বলেন নি, তবে গিরিশবাবু ফিরে আসুন এটা উনি চান।

অর্ধেন্দু ॥ তা আমরাও চাই। আর সেজন্য ধরাধরি আমরা তো কিছু কম করিনি।

নগেন ॥ আসল কথা কি জান, লীলাবতীতে হঠাৎ খুব নাম করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। নীলদর্পণে এইবার তুমি দেখিয়ে দাও তুমিও কিছু কম নও অর্ধেন্দু।

অর্ধেন্দু ॥ য়্যাঁ?

নগেন ॥ হ্যাঁ।

অর্ধেন্দু ॥ বিপদ হয়েছে পেটের ধান্ধায় ঘুরতে হয়—যতটা সময় দিতে হয় তা এর জন্য দিতে পারছি না! বাড়িতে বাবার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। পঞ্চাশটা টাকা আজই তাঁর হাতে দেব বলে এসেছি—কিন্তু কোথায় আমি।

নগেন ॥ আমাদেরও অনেকেরই সেই অবস্থা। কিন্তু এখন দেখছি তোমার অবস্থাই চরম। আচ্ছা দেখছি, গোবিন্দ বাবুকে বলে কিছু টাকার যোগাড় হয় কিনা।

অর্ধেন্দু ॥ না—খবরদার না। লর্ড মেয়োর ঐ বড় কুটুম্বটির এই বাড়ি থেকে আমাদের রিহার্স্যাল ঘর আমরা সরিয়ে নিচ্ছি ভুবন নিয়োগীর বাড়িতে। যার জাতীয়তা বোধ নেই তার বাড়িতে জাতীয় নাট্যশালার রির্হ্যাসালও চলতে পারে না। তুমি ভাই ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়ে ব্যবস্থাটা পাকা করে এস। আর কার্তিক সেই কাবুলিওয়ালাকে ধরে আনতে পারো কিনা দেখতো। বেশী নয় পঞ্চাশটি টাকা—পঞ্চাশটি টাকা পেলেই এ যাত্রা বেঁচে যাই।

নগেন্দ্র ॥ না না কাবুলীওয়ালা থাক। নতুন ষ্টেজ গড়তে শ দুই টাক চাঁদা তুলে ধর্মদাস সুরের কাছে গচ্ছিত রেখেছি। তা থেকে বরং তোমাকে পঞ্চাশ টাকা এনে দিচ্ছি—

অর্ধেন্দু ॥ খবরদার না, ও টাকা জানবে আমাদের মাতৃরক্ত। ধর্মদাসকে আমি সেই কথাই বলেছি।

নগেন্দ ॥ আচ্ছা তুমি এখানে বোস। এস তো কার্তিক, ভুবন নিয়োগীর বাড়িটা ঘুরে আসি।

[কার্তিককে লইয়া নগেন্দ্রের প্রস্থান। অর্ধেন্দু নীলদর্পণ বইটি খুলিয়া একটি অংশ পাঠ করিতে লাগিল।]

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন ॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী ॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার ॥
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা ॥
কোথা পিতা কোথা মাতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার ॥

[গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ। অর্ধেন্দু তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দাবেগে চিৎকার করিয়া উঠিল।]

অর্ধেন্দু ॥ গিরিশ! তুমি তবে আমাদের কাছে ফিরে এলে?

গিরিশ ॥ তোমাদের কাছে নয়, তোমার কাছে। রাগের মাথায় তখন বেরিয়ে গেলাম—তোমার পঞ্চাশটা টাকা এনেও দিয়ে যেতে ভুলে গেলাম। পথে গিয়ে মনে হতেই তাই আবার ফিরে এলাম। টাকাটা নাও।

অর্ধেন্দু ॥ দলে ফিরে এলে তবে নেব, নইলে নেব না দাদা।

গিরিশ ॥ বটে!

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ দাদা। টাকার আমার খুবই ঠ্যাকা, তবুও না।

গিরিশ ॥ মহাজনের কাছে টাকা ধার নিতে পার—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতে পার—তারা বুঝি সবাই তোমার দলের—না?

অর্ধেন্দু ॥ সে কথা আলাদা।

গিরিশ ॥ শোন অর্ধেন্দু, এক হপ্তা মদ না খেয়ে আমি তোমার জন্য টাকাটা বাঁচিয়েছি। এমন করে আমাকে ফেরৎ দিস না অর্ধেন্দু।

অর্ধেন্দু ॥ দেব—দেব—একশো বার দেব। আমার চেয়ে—আমার চেয়ে আমাদের ন্যাশানাল থিয়েটার অনেক বড়। তা যখন তুমি পায়ে ঠেলতে পেরেছ, তখন আমিও তোমাকে দূরে ঠেলবো।

গিরিশ ॥ বটে!

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ।

গিরিশ ॥ বেশ।

[গিরিশের প্রস্থান। অর্ধেন্দু একটা আর্তনাদ করিল।]

অর্ধেন্দু ॥ এ আমি কি করলাম!

●

তৃতীয় দৃশ্য

[বাগবাজার বোসপাড়ার গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাসভবনে বসিবার ঘর। সময় সন্ধ্যা। অমৃতলাল বসু ঘরের মধ্যে একা বসিয়া 'নীলদর্পণ' হইতে সৈরন্ধ্রীর পার্ট পড়িতেছেন।]

অমৃত ॥ (পার্ট পাঠ) 'প্রাণনাথ! অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—'

[অমৃত মুখস্থ করিবার জন্য নারীকণ্ঠে বারবার আবৃত্তি করিল। এমন সময় গিরিশ-চন্দ্রের ভৃত্য দীননাথ সরবতের গ্লাস হাতে প্রবেশ করিল।]

দীননাথ ॥ প্রাণনাথ না, আজ্ঞে আমি দীননাথ। কর্তা আমারে দীনু কন—আপনিও তাই কবেন, প্রাণনাথ কইবেন না।

অমৃত ॥ য়্যাঁ?

দীননাথ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দীননাথ, প্রাণনাথ আমারে কয় আমার ইস্তিরি—স্বামী নাম মুখে নেয় না তো।

অমৃত ॥ ও, তাই বুঝি?

দীননাথ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ভালই লাগে। আপনিই দেখলাম, তারই মত গলা কইর‍্যা প্রাণনাথ প্রাণনাথ কইত্যাছেন। আমি তো চমকে উঠলাম, গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠল।

অমৃত ॥ না না দীননাথ, আমি তোমার তিনি নই—আমি অমৃতলাল বসু, জলজ্যান্ত পুরুষ। তবে কিনা নীলদর্পণ নাটকে মেয়েছেলে সৈরিন্ধ্রীর পার্ট করব—সেই পার্ট-ই মুখস্থ করছি। তা গিরিশবাবুর নামতে আর কত দেরী?

দীননাথ ॥ এই সরবতটা আপনাদের দিতে কইলেন। উনি চান করত্যাছেন, আসি যাবেন—এখনি আসি যাবেন। আঃ, কি কথাই আজ শোনালেন—প্রাণনাথ। আচ্ছা চলি। কতকাল পর শোনলাম 'প্রাণনাথ'—আমি কইতাম 'প্রাণেশ্বরী'। আজ কোথায় সে—কোথায় আমি!

[শূন্য সরবতের গ্লাসটি লইয়া দীননাথের প্রস্থান। অমৃতলাল একটু হাসিয়া আবার পার্ট পড়িতে লাগিল।]

অমৃত ॥ (পার্ট পাঠ) প্রাণনাথ ! অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ—

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ এই যে মশাই নমস্কার। গিরিশবাবু অপিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন ?

অমৃত ॥ চাকর বলে গেল ফিরেছেন। আপনি ?

নটবর ॥ আজ্ঞে আমি শ্রীযুক্তবাবু নটবর দত্ত - ওঁর জ্ঞাতি কুটুম্ব। আপনি ?

অমৃত ॥ আমি ডাক্তার অমৃতলাল বসু।

নটবর ॥ হতেই হবে। ঘোষমশাই যা মদ্যপান করেন—নিশ্চয়ই লিভারের অসুখ বাধিয়েছেন।

অমৃত ॥ না না, সে সব কিছু না —

নটবর ॥ তবে আপনি ডাক্তার এসেছেন কেন ?

অমৃত ॥ আমি থিয়েটার করি।

নটবর ॥ তাই নাকি ! আমার স্ত্রীও যে থিয়েটার করতে চায় মশাই।

অমৃত ॥ কি বললেন, আপনার স্ত্রী না আপনি ?

নটবর ॥ না মশাই, থিয়েটারের নেশা আমার চুকে গেছে। নেশাটা এখন আমার স্ত্রীর ঘাড়ে চেপেছে।

অমৃত ॥ বলেন কি মশাই আপনি ! ভদ্রঘরের স্ত্রী থিয়েটার করবে ? বিদ্যাসাগর মশাই আর সব সমাজপতিরা চাবকে দেবেন না ?

নটবর ॥ না না—তবে আমি খুলেই বলি। আমার স্ত্রী মানে—আমার রক্ষিতা স্ত্রী—রামবাগানে আলাদা বাড়িতে রেখেছি। মেয়েটা থিয়েটারের জন্য পাগল—এর জন্য কত যে গলাধাক্কা খেতে হচ্ছে, তাও মানছে না। আজ গিরিশ বাবুকে বলে কয়ে রাজী করাতে না পারলে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবেনা। আবার সেই গলাধাক্কা। বুঝুন আমার বিপদটা।

অমৃত ॥ কিন্তু গিরিশবাবু তো থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন।

নটবর ॥ সেটা আমিও দু'একজনের কাছে শুনেছি। কিন্তু কথাটা কি সত্যি ?

অমৃত ॥ এই ভর সন্ধ্যেতে তিন সত্যি করে বল্‌ছি—সত্যি।

নটবর ॥ তবে আর এ ব্যাটাকে তেলাই কেন—ও থিয়েটারটা এখন কে চালাচ্ছেন বলুন দেখি ?

অমৃত ॥ গিরিশবাবুর বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি গিরিশবাবুকেই ব্যাটা বল ?

[নটবরকে গলাধাক্কা]

নটবর ॥ যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। দেখছি থিয়েটার মানেই গলাধাক্কা।

[নটবরের প্রস্থান]

অমৃত ॥ (পুনরায় পার্টে মনোনিবেশ) প্রাণনাথ! অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করে বেড়াইতেছ যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরত বারিধারা বর্ষণ হইতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষন্ন হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিঃরপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ, আমি সেইজন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলি দিতে পারিনে?

[গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ]

গিরিশ ॥ 'Things at the worst will cease or else climb upward to what they were before.'

[অমৃতলাল পদধূলি লইতে গেলে গিরিশ বাধা দিলেন]

অমৃত যে। না না, ওসব থাক। তুমি না বাঁকিপুরে ছিলে—ডাক্তারী পড়ছিলে?

অমৃত ॥ কলকাতার বাইরে থাকতে মন বসে না—বিশেষ করে এখানকার থিয়েটারের সংশ্রবে আসার পর থেকে। আর ডাক্তারীর কথা বলছেন? মেডিকেল কলেজে শুধু আনাগোনাই করেছি। ওতে সত্যিকার চিকিৎসা করা চলে না।

গিরিশ ॥ সে কি হে? শাস্ত্রেই বলেছে 'শত মারিং ভবেৎ বৈদ্য, সহস্র মারিং চিকিৎসক।' তোমার হাতে কটা মরেছে?

অমৃত ॥ (হাসিয়া) একটাও না। কাজেই ও লাইনে আমার কিছু হবে না।

গিরিশ ॥ তা বেশ তো। লীলাবতী নাটকে যোগজীবনের ভূমিকায় তুমি তো রিহার্সালে ভালই করেছিলে। কিন্তু ঠিক প্লের আগে কাশী পালিয়ে গেলে শুনলাম। 'A rolling stone gathers no moss' থিয়েটার করতে চাও লেগে থাক। প্লে করবে আবার? চেহারাটা ভালই আছে—উচ্চারণ আর কণ্ঠস্বর ভাল দেখেছি—তুমি পারবে।

অমৃত ॥ তা যদি বলেন, সে লীলাবতী নাটকের রিহার্সালে যোগজীবনের ভূমিকায় আপনার কাছেই আমার যা কিছু শিক্ষা। অবশ্য অর্ধেন্দুও আমাকে খুব সাহায্য করতো। আজও যে আপনার কাছে এসেছি, সেও আপনার কাছে শিখতেই এসেছি।

গিরিশ ॥ না না, এখন তো তোমাকে নিয়ে বসতে পারব না অমৃত। এই দেখ তোমার নাম মুখে আনতেই আমার পিপাসা বেড়ে গেল। অর্ধেন্দুর

নামে সাতদিন খাইনি—এখন সুদে আসলে খাচ্ছি। কিন্তু আজ এখনও যে অমৃত পানে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি, কেন জান ?

অমৃত ॥ কেন স্যার ?

গিরিশ ॥ সেও আর এক অমৃত, অমৃতবাজার পত্রিকা। তার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় খবর পাঠিয়েছেন, সন্ধ্যায় আমি যেন বাড়ি থাকি —জরুরী কি কথা আছে। তিনি চলে গেলে তবেই তা আমার অমৃত পানের ছুটি—চিন্তা ভাবনার অবসর—

'Wine is the fountain of thought, and
The more we drink the more we think.'

অমৃত ॥ আচ্ছা, তবে আমি আসছি—

গিরিশ ॥ না না, শিশিরবাবু এলে তুমি যেও। অবশ্য আসবার সময়ও হয়ে গেছে। তা কি পার্ট শিখবে বলে এসেছ তুমি ?

অমৃত ॥ নীলদর্পণ নাটকে সৈরিন্ধ্রীর পার্ট।

গিরিশ ॥ ও !

অমৃত ॥ হ্যাঁ, অর্ধেন্দু ভীষণভাবে ধরেছে আমাকে। বলছে "অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য চালিয়ে দে।"

গিরিশ ॥ হুঁ।

অমৃত ॥ আমি বললাম মাসখানেকের ছুটিতে এসেছি, আমি কি করে সৈরিন্ধ্রী সাজি ? তা শুনছেন না, বলছে—'৭ই ডিসেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটারটা খোলা হয়ে যাক তারপর দেখা যাবে।'

গিরিশ ॥ ন্যাশানাল থিয়েটার ! ন্যাশানাল থিয়েটার ! তুমি আমার কাছে এসেছ কেন ? তুমি কি জাননা—

অমৃত ॥ জানি, সবই জানি স্যার। ন্যাশানাল থিয়েটার নিয়েই আপনার সংগে ওদের মনান্তর হয়েছে, আপনি দল ছেড়ে দিয়েছেন।

গিরিশ ॥ তবে ?

অমৃত ॥ অর্ধেন্দু আমাকে শেখাতে সময় পাচ্ছে না। উপায় না দেখে মান বাঁচাতে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনার উপদেশেই আমি নাটক লিখতে পেরেছি। মনে পড়ছে না ? আপনিই তো আমার প্রথম ফার্সটা দেখে দিয়েছিলেন। আপনিও কিন্তু আমার গুরু।

গিরিশ ॥ তোমাকে নিয়ে যে আমি কি করব, ভেবে পাচ্ছি না। ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে তাড়িয়ে দিই, আবার ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কি করব আমি জানি না, আমি বেঁচে গেলাম—ঐ শিশিরবাবু আসছেন।

অমৃত ॥ আমি যাচ্ছি—আমি কি আবার আসব ?

গিরিশ ॥ বুঝে শুনে এস। কপালে তোমার কি জুটবে আমি জানি না।

[অমৃতলালের প্রস্থানকালেই শিশিরকুমার ঘোষের প্রবেশ]

শিশির ॥ এই যে গিরিশ, আমার একটু দেরী হয়ে গেল। খবরের কাগজ চালানো—সে যে কি ঝকমারি, জান তো ?

গিরিশ ॥ যাক, তবু যে এসেছেন এই আমার ভাগ্য।

শিশির ॥ একটু বক্তৃতার মত শোনাবে কিন্তু কথাটা সত্যি—দেশ আর জাতির স্বার্থেই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি।

গিরিশ ॥ সে কি মশাই ! দেশ আর জাতির স্বার্থে এসেছেন এই অধমের কাছে ? আপনি কি জানেন না ? দীনবন্ধুবাবু নিজেই বলেন তাঁর সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ চরিত্রটি আমারই ছবি।

শিশির ॥ কথা রাখ। বেশীক্ষণ কথা কইবার সময়ও নেই আমার, এখুনি গিয়ে আমাকে আবার এডিটোরিয়াল লিখতে হবে। শোন গিরিশ—

গিরিশ ॥ বলুন।

শিশির ॥ তোমাকে বাদ দিয়ে ন্যাশানাল থিয়েটার ঠিক ন্যাশানাল হচ্ছে না।

গিরিশ ॥ আমাকে নিয়েও ওদের ন্যাশানাল থিয়েটার ন্যাশানাল হবে না। সব কিছু শ্রেষ্ঠত্বের সমাবেশ হলে তবেই গড়ে উঠবে ন্যাশানাল থিয়েটার।

শিশির ॥ আরে, সেই জন্যই তো শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তোমাকে চাই।

গিরিশ ॥ আর কতবার আমি বলব স্যার, ন্যাশানাল কথাটার মর্যাদা রাখতে হবে তো ? কারো বাড়ির উঠোন মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে, ভাঙাচোরা একটা ষ্টেজ গড়ে তালিমারা সিন-এ ন্যাশানাল থিয়েটার হয়না। টিকিট কিনে এসব দেখে লোকে মুখে থুথু দেবে।

শিশির ॥ দেখ গিরিশ, ওসব কথা রাখ। ন্যাশানাল কথাটাই আমরা চাই। আজকের দিনে ঐ কথাটাই হবে জাতীয় প্রেরণা। বৃটিশ রাজশক্তির সংগে লড়াই করতে হলে এই পড়ে থাকা ম'রে যাওয়া জাতটাকে আবার জাগাতে হবে। আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদী কাগজের মারফতে সেই চেষ্টাই করছি—আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও সেই চেষ্টাই করছেন। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা যেন ভেসে যাচ্ছে, জনসাধারণের মনে ছাপ মারতে পারছে না। আমি দেখেছি তোমাদের থিয়েটার সেটা পারে। ঐ নীলদর্পণ সেটা খুব ভাল করে পারবে। প্রজাদের ওপর অত্যাচার, চাষীদের ওপর নির্যাতন—জনসাধারণের উপর নিপীড়ন, দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

গিরিশ ॥ ধরবো।

শিশির ॥ ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া মহৎ সব চরিত্র, স্বাধীনতাকামী সাহসী বীর চরিত্র, সমাজ জীবন থেকে নেওয়া স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী সব চরিত্র, এই সব নিয়ে নাটক লিখতে হবে, অভিনয় করতে হবে, মুমূর্ষু এই জাতিকে রামমোহন রায়-এর আদর্শে পরিচালিত করতে হবে, থিয়েটারের মাধ্যমে। 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'—

গিরিশ ॥ আমি স্বীকার করছি—আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি শপথ নিচ্ছি আমি তাই করবো।

[শিশির গিরিশকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

গিরিশ ॥ কিন্তু—

শিশির ॥ কিন্তু—

গিরিশ ॥ কিন্তু ঐ ন্যাশানাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে নয়, আমি নিজে একটা যাত্রার দল খুলবো।

শিশির ॥ হুঁ। আচ্ছা আমি চল্লাম। এই ন্যাশানাল থিয়েটারে যোগ দিলে আমি খুবই খুশী হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা যখন হবার নয়, যে প্রতিশ্রুতিটুকু আমি তোমার কাছে পেলাম তার দামও কম নয় গিরিশ।

[দুইজনে ঘরের বাইরে যাইতেছিলেন হঠাৎ শিশিরকুমার দাঁড়াইয়া গেলেন।]

তুমি বলতে চাও আমাদের ন্যাশানাল থিয়েটার ডুববে ?

গিরিশ ॥ ডুববে।

শিশির ॥ ও! আচ্ছা, দেখছি।

[শিশিরকুমার গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিলেন। গিরিশও মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া সহসা ছুটিয়া ভিতরে গিয়া মদের বোতল ও গ্লাস লইয়া আসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন।]

গিরিশ ॥

"The thirsty earth soaks up the rain,
A d drinks and gapes for drink again"

[খাতা ও পেন্সিল হস্তে তরুণ যুবক মনোমোহনে প্রবেশ]

গিরিশ ॥ এই যে, মনোমোহন যে, তোমার বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লেখা কতদূর এগোলো ?

মনো ॥ আপনাদের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আপনি খুব উৎসাহের সংগে বলেছিলেন, দেখে দেবেন—

গিরিশ ॥ সে উৎসাহ আর নেই। বোস।

মনো ॥ আর বসে কি হবে ? আপনাকে যেমন ব্যস্ত দেখছি আজ আর হবে না।

গিরিশ ॥ আরে বোস, বোস। মদ খেলে আমার কি হয় জানো মনোমোহন ?

"The mind and spirit remain
Invincible and vigour soon returns."

মনো ॥ দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"তে নিমচাঁদের পার্ট বলছেন—

গিরিশ ॥ পার্ট তো ঐ একটাই করেছি হে—নিমচাঁদের পার্ট। অমন

পার্ট আর পাব না। নেশা আর পেশা এক হয়ে গিয়েছিল বলেই না আমার অমন জয়জয়াকার হলো।

মনো ॥ সত্যিই বলেছেন, সেই থেকে আপনার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

গিরিশ ॥ কিন্তু ওতে বাগড়া দিতে এসেছিল তোমাদের নগেনবাবু।

মনো ॥ কোন নগেন বাবু?

গিরিশ ॥ আরে শ্যামবাজার নাট্যসমাজের কর্তাব্যক্তি! ঢাল নেই তরোয়াল নেই, যিনি এখন ন্যাশানাল থিয়েটারের নিধিরাম সর্দার! দেখেছো তো 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ আগাগোড়া দুর্দান্ত মাতাল। সেই পার্ট করতে গেলে রাত্তিরবেলায় ষ্টেজে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় আর বুকে সর্দি বসে যাবে যে! আমি নগেনকে বললুম, আসল দাও—ও নকল চলবে না। নগেনবাবু বলেন—থিয়েটারে মদ্যপান নিষেধ। আমি বললুম, প্লে করতে গিয়ে তো নিমুনিয়া বাধিয়ে প্রাণ হারাতে পারবো না! এই রইলো আপনাদের পার্ট। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আসলের ব্যবস্থাই হয়ে গেল। আর তাই না, নেশা আর পেশা এক হয়ে অমন সোনা ফলল হে! দেখেছ-তো?

[মদ্যপান করিতে লাগিলেন]

মনো ॥ দেখেছি। কি সংঘাতিক মদই না খেতে পারেন আপনি!

গিরিশ ॥ Yes, I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. কিন্তু জানবে, জ্ঞান আমার টনটনে থাকে। মদ খাই বটে কিন্তু মাতাল হই না, মদ আমায় খেতে পারে না। এখন কি ছাইপাঁশ লিখছো বল। প্রথম বাংলা নাট্যশালার জন্ম হয় কবে বলো দেখি?

মনো ॥ ১৭৭৫ সালে এই কলকাতায় ২৫ নম্বর ডুমাতলায়।

গিরিশ ॥ ঠিক। ডুমাতলাটা কোনখানে বল দেখি?

মনো ॥ জানিনে স্যার।

গিরিশ ॥ এখন যেখানে এজরা স্ট্রিট। ওখানেই হয়ে ছিল Bengali Theatre. অভিনেতা ও অভিনেত্রীও ছিল বাঙালী। কিন্তু থিয়েটারের গঠন কর্তা ছিলেন—

মনো ॥ জানি। ভারত প্রেমিক রাশিয়ান, নাম গেরাসিম লেবেডেফ। গোলকনাথ দাসকে দিয়ে 'দি ডিজগাইজ' নামক একখানা ইংরাজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়ে অভিনয় হল।

গিরিশ ॥ কিন্তু টিক্‌লো না। কলকাতার ইংরেজদের অত্যাচারে লেবেডেফ বিলেতে চলে যেতেই সেটা উঠে গেল। এদের ন্যাশানাল থিয়েটারও টিকবে না।

মনো ॥ ন্যাশানাল থিয়েটার তো এখনও মাতৃগর্ভে। আগে থেকে একথা বলছেন কেন?

গিরিশ ॥ বল্‌বো না? সবাই হুজুগে মেতে ভুলপথে চলছে যে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালে বাঙালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা "হিন্দু থিয়েটার" অত খরচ পত্তর করে করলেন বটে, কিন্তু কোন বাংলা নাটকের অভিনয় না করায় বাঙালীর নাড়ির সংগে যোগ রইল না, উঠে গেল।

মনো ॥ তা বটে। কাগজ-পত্রে পাচ্ছি এর কিছুকাল পরে কিন্তু শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়িতে একটি নাট্যশালা খুলে লাখ লাখ টাকা খরচ করে বছরে চারপাঁচটি বাংলা নাটকের অভিনয় করতে লাগলেন। স্ত্রী চরিত্রে বাঙালী মেয়েরাই নামতো। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙালীর চেষ্টায় বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ওখানে।

গিরিশ ॥ আরে সেও তো উঠে গেল। উঠবে না? বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হল। প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্তনের সংগে সংগে দর্শকদেরও স্থান পরিবর্তন করে দেখতে যেতে হত। বাগানের সিন দেখতে বাগানে যাও—ঘরের সিন দেখতে ঘরে ফিরে এস। পাগলামি নয়? বরং বলতে পার, একটা বুদ্ধিমন্ত প্রচেষ্টা প্রথম হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। দাঁড়াও, গলাটা ভিজিয়ে নি।

মনো ॥ পেয়েছি স্যার, সেটাও পেয়েছি। ১৮৫৭ সালে নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' অভিনয় হল।

গিরিশ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার একটা গান ছোটবেলায় আমাদের মুখে মুখে ফিরতো—"অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?" (গাহিতে ব্যর্থ হইয়া) তা ঐ গানটাই শুধু টিকে আছে, আর কিছু টেকেনি। ঐ সময়েই টেকেনি—কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে "বেণীসংহার" আর "বিক্রমোর্বশী", টিকবে কি! নামগুলো উচ্চারণ করতেই দাঁত ভেংগে যেত যে! তারপর পাইকপাড়া রাজাদের "বেলগাছিয়া নাট্যশালা"য় "রত্নাবলী"—জাঁকজমক খুব হল কিন্তু আসর জমল না। ভাল নাটকের অভাব দেখে মাইকেল মধুসূদন বললেন,—"আচ্ছা, আমি নাটক লিখব।" ভদ্রলোকের যেমন মদের নেশা তেমনি লেখার নেশা। সত্যিই তাঁর হাত থেকে বেরুল খানকয়েক ভাল নাটক—

মনো ॥ হ্যাঁ পাচ্ছি, প্রথমে শর্মিষ্ঠা, তারপর একে একে—"একেই কি বলে সভ্যতা" আর "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"। কিন্তু রুচির অমিল হওয়াতে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা"য় প্রহসন দুটির অভিনয় হয়নি। কিন্তু শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি—১৮৬১ সালে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' পরে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর মাতা!

গিরিশ ॥ বেশ মানিয়েছিল তাঁকে। শোন—শোন—এই নাট্যশালাতেই ১৮৬৭ সালে যখন অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক', তাতে গাছপালায় জ্যান্ত জোনাকি আঠা দিয়ে এঁটে একটা বনের দৃশ্য করা হয়েছিল।

রাতের বেলা আঠা আঁটা জোনাকিগুলো জ্বলতো। আর সে কি হৈ হৈ এতে আর কিছু না হোক কিছু দরিদ্র লোক জ্যান্ত জোনাকি ধরে দিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছে। (মনোমোহন হাসিয়া ওঠায়) হাসছো? হাসো। কিন্তু জেনো—He laughs best who laughs last. আমিও হাসব। এই ১৮৭২ সালেই হাসব, যেদিন ন্যাশানাল থিয়েটার ফেল করবে। আমি এখন একটু শোব। ইয়েস। টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন।

মনো ॥ আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি। নমস্কার। [প্রস্থান]

[গিরিশ ওখানেই গড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় মনোমোহন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল]

মনো ॥ স্যার শুনছেন? আপনার কাছে কে আসছেন, জানেন? আপনাকে বাদ দিয়ে যাঁরা ন্যাশানাল থিয়েটার করছেন, তাঁদের শিরোমণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।

[কথাটা শুনিয়াই গিরিশের নেশা যেন কাটিয়া গেল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মদের একটা গ্লাস মনোমোহনের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। অল্পের জন্য উহা মনোমোহনের গায়ে লাগিল না। মনোমোহন ভয়ে পলাইয়া গেল। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফির প্রবেশ। উভয়ে যেন উভয়কে নীরবে চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিলেন। মুহূর্ত পরেই উভয়ের ওষ্ঠে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। অর্ধেন্দু ধীরে ধীরে গিরিশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গিরিশ কর্তৃক বিতাড়িত মনোমোহন কিন্তু গিরিশ ও অর্ধেন্দুর এই পুনর্মিলন দৃশ্য দেখিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেও পা টিপিয়া টিপিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্ধেন্দু হঠাৎ গিরিশকে আলিঙ্গন করিল।]

অর্ধেন্দু ॥ "বাবা ললিত, আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি, কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি—তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভালবাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবন ধারণ কচ্ছেন—আজ আমার মহা আনন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততোক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্ছে না—"

মনো ॥ লীলাবতী নাটকের লাস্ট সিন! হরবিলাসরূপী অর্ধেন্দু ললিতরূপী গিরিশকে—এক্সজ্যাক্টলি যা বলেছিল। আজ অবশ্য লীলাবতী মানে—আপনার ন্যাশানাল থিয়েটার। কি বলেন অর্ধেন্দুবাবু?

গিরিশ ॥ (চটিয়া গিয়া) Get out I say. Get out or I shall kill you.

[মনোমোহনের পলায়ন]

বোসো অর্ধেন্দু, ব্যাপার কি? চল্‌বে নাকি এক পেগ?

অর্ধেন্দু ॥ না দাদা, রিহার্সাল দিতে যাচ্ছি। অনেকদিন দেখা হয়নি, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

গিরিশ ॥ তা যদি বলো কাল রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

অর্ধেন্দু ॥ তাই নাকি ! তবে হয়তো তুমি আমার কথা ভাবো।

গিরিশ ॥ তা তুমিও তো আমার কথা ভাবছো। নইলে এলে কেন ?

অর্ধেন্দু ॥ সেদিন আমাদের সংগে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়িতে যখন গিয়েছিলে—তখন শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছিলে। রোজই ভাবি সেটা একেবারে সেরে গেছে কিনা খবর নেব।

গিরিশ ॥ এইজন্য এসেছ ! ভাল, ভাল। মাথাই নেই তার আবার মাথা ব্যাথা ! হ্যাঁ হে, তোমার কুকুরটার কি অসুখ করেছিল বলেছিলে, কেমন আছে ? আর এইজন্যই বোধ করি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

অর্ধেন্দু ॥ তাই-ই হবে। তা সেটা আর নেই—আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

গিরিশ ॥ (সক্রোধে) অর্ধেন্দু তুমি আমাকে অপমান করতে এসেছ !

অর্ধেন্দু ॥ কি বলছো দাদা ! কি করে আমার সে সাহস হতে পারে ?

[গিরিশ মুহূর্তকাল অর্ধেন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে মনোবেদনায় বলিতে লাগিলেন]

গিরিশ ॥

Canst thou not minister
to a mind diseas'd
Pluck from the memory
a rooted sorrow
Raze out the written
troubles of the brain ;

অর্ধেন্দু ॥ দাদা—

গিরিশ ॥ বলো—

অর্ধেন্দু ॥ চলো—

গিরিশ ॥ না। আমার যা বলবার ছিল আমি সেদিনই তা স্পষ্ট করে বলে এসেছি। লক্ষ্য রেখে ছিলাম তারপর তোমরা কি করছো। দেখলাম জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনটি মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় নিয়ে সেখানে একটা ভাঙাচোরা ষ্টেজ খাড়া করে ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়ে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা করছো। আমি মনে করি দর্শকদের সংগে হবে এটা প্রতারণা।

অর্ধেন্দু ॥ প্রতারণা !

গিরিশ ॥ হ্যাঁ প্রতারণা। ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিচ্ছো বলেই এটা হবে প্রতারণা। ন্যাশানাল কথাটার কিছু মান মর্যাদা আছে অর্ধেন্দু ! ওটা

নিয়ে অমন ছিনিমিনি খেলা আমি পাপ মনে করি অর্ধেন্দু। থিয়েটার যখন ন্যাশানাল হবে, তখন তার বাড়ি হতে হবে শ্রেষ্ঠ, তার মঞ্চ হবে শ্রেষ্ঠ তার শিল্পীরা হবে শ্রেষ্ঠ তার নাটকেও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ থাকবে। জাতীয় নাট্যশালা জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দর্পণ, জাতির প্রদীপ্ত মশাল; জাতিকে শুধু প্রতিফলিত করবে না, জাতিকে ও করবে। তা যেদিন পারবে, সেদিন আমাকে ডাকতে হবে না। আমি ছুটে যাব তোমাদের কাছে। আর তা যদি না পারো, তবে গুডবাই—জন্মের মত বিদায়।

অর্ধেন্দু ॥ আমি মেনে নিলাম দাদা। তোমাকেই যাতে ছুটে যেতে হয় আমাদের কাছে—আমাদের ঐ ন্যাশানাল থিয়েটারে, তোমার ভক্ত আমরা সেই তপস্যাই করছি। (হঠাৎ নতজানু হইয়া) আশীর্বাদ চাই।

[গিরিশ অর্ধেন্দুর মাথায় হাত রাখিলেন পরে তাঁহাকে তুলিলেন]

গিরিশ ॥ বটে! বেশ, জয়োস্তু। একটা যাত্রার দল খুলবো ভাবছিলাম। কে হারে কে যেতে সেটা না দেখা পর্যন্ত ওটা বন্ধ রাখছি। (বোতল হইতে মদ্য পানান্তে)

"If consequence do but approve my dream
My boat sails freely, both wind and streem."

অর্ধেন্দু ॥ "If consequence do but approve my dream
My boat sails freely both wind and stream."

Good bye.

[অর্ধেন্দু বিদায় গ্রহণ করিলেন। গিরিশ তাঁহার মদ্যপানে আবার মন দিলেন। হঠাৎ সেই কক্ষে একটি ভীতা, ত্রস্তা তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাব। সে ছুটিয়া গিয়া গিরিশচন্দ্রের সামনে দাঁড়াইল।]

তরুণী ॥ যাক পেয়েছি। আপনিই তো গিরিশবাবু? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই লীলাবতীতে ললিত সেজেছিলেন। আপনি আমাকে বাঁচান—একটা লোক আমাকে তাড়া করেছে—আমাকে ধরে নিয়ে যাবে—আমাকে কয়েদ করে রাখবে—বাধা দিলে হয়তো মেরেই ফেলবে—আপনার পায়ে পড়ছি আপনি আমাকে বাঁচান!

গিরিশ ॥ খুব নাটকীয় ব্যাপার দেখছি। সরো—(তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া) কে তুমি?

তরুণী ॥ বাইরে আমি যাই-ই হই না কেন, এখন এখানে আমি একটা

আত্মা—শুদ্ধ, নিষ্পাপ আত্মা—যে আত্মা ঘৃণা করে অশুচি—যে আত্মা কামনা করে মুক্তি—প্রার্থনা করে আলোক—

গিরিশ ॥ মাথায় ছিট আছে নাকি! থামো, বন্ধ করো তোমার প্রলাপ। সহজভাবে যদি কথা বলতে পারো তবে বলো—নইলে বেরিয়ে যাও। দেখছ না আমি মদ্যপান করছি। এ সময় এই রাতের বেলায় আমার ঘরে তুমি একা এক তরুণী—কলংকের ভয় নেই তোমার নারী?

তরুণী ॥ কিন্তু, জানবেন, জীবনের ভয় আরও বেশি।

গিরিশ ॥ জীবনের ভয় বেশি হতে পারে। কিন্তু মেয়েদের কলংকের ভয় আরও বড় জেনো। মানে মানে তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। নইলে, লোক ডাকতে হবে আমাকে—কেলেঙ্কারি হবে—

তরুণী ॥ (সাতঙ্কে) না-না—না, যে লোকটা আমাকে তাড়া করেছে—সে আমার পিছু পিছু হয়তো এরই মধ্যে এখানে এসে পড়েছে। দয়া করে কিছুটা সময় আমায় আশ্রয় দিন। আমাকে ধরতেই সে এখানে আসছে, আমার সন্ধান না পেলেই সে চলে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি সে চলে গেলেই আমি চলে যাব। গিরিশবাবু শুনুন, একটা বন্দী আত্মা মুক্ত জীবনের আনন্দ আর আলো খুঁজছে। আপনি না শিল্পী?

[নেপথ্যে কে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিতে আসিতেছে]

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ॥ কোথায়—কোথায় পালালো—পালিয়ে যাবে কোথায়?

] তরুণী আতংকে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া গিরিশের প্রতি তার মৌন অনুনয় জানাইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে আত্মগোপন করিল। গিরিশচন্দ্র নির্বিকার ভাবে মদ্যপান শুরু করিলেন। বাহিরের লোকটি ভিতরে আসিলে দেখা গেল সে নটবর দত্ত।]

নটবর ॥ এই যে মশাই! আরে আপনিই তো গিরিশবাবু?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ। তা আমার এখানে কি মনে করে! আপনিই কি ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিলেন? কে আপনি?

নটবর ॥ আরে মশাই, আমি শ্রীযুক্ত বাবু নটবর দত্ত। আমাকে চিনলেন না? হাটখোলার নটবর দত্ত, রামবাগানের সেরা কাপ্তেন।

গিরিশ ॥ সে আপনি যেখানকার যেই হোন—বেরিয়ে যান বলছি, নেশার সময় গোলমাল করবেন না।

নটবর ॥ বেরিয়ে যাব কি মশাই! আমার ইস্ত্রিকে এখানে ফেলে রেখে আমি যাব বেরিয়ে! আপনি আছেন বেশ! কোথায় সে শালী চটপট্ বলুন। আজ আমি তাকে খুন—খুন করব।

গিরিশ ॥ কে তোমার শালী—কোন চুলোয় সে গেছে—সে তুমিই জানো তুমিই দ্যাখো। আমাকে বিরক্ত করো না—বিরক্ত করলে ফল তার ভাল হবে না। বেরুবে—না গলাধাক্কা খাবে?

নটবর ॥ আবার গলাধাক্কা! 'থেটার' মানেই দেখছি গলা ধাক্কা! কিন্তু আমিও এবার ছেড়ে কথা কইব না—ও আর গলা ধাক্কা টাক্কা নয়, আমি এবার গলা কাটব—খুন করব। ভাল চাও তো বল—সে শালী কোথায়? তোমার চাকর দেখেছে শালী এই এই ঘরে ঢুকেছে। সরো, আমি ও ঘরটা দেখব।

গিরিশ ॥ না।

নটবর ॥ (হঠাৎ ছোরা বাহির করিয়া) এই ছোরাটা দেখছ?

গিরিশ ॥ দেখেছি বলেই—ও ঘরে যেত দেব না।

নটবর ॥ পার তো আটকাও।

গিরিশ ॥ (রুদ্রমূর্তিতে) আমাকে খুন করে তবে ও ঘরে যেতে পারবে—তার আগে নয়।

[নটবর থমকিয়া দাঁড়াইল—পাশের ঘরে লুক্কায়িত তরুণীটি হাসিমুখে গিরিশের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।]

তরুণী ॥ (নটবরকে) তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, দত্ত মশাই, আমার কথামত কাজ করেছ। এই তো পারো, বেশ অভিনয় করেছ। (হাসিমুখে নটবরের কাছে গিয়া এবার গিরিশচন্দ্রর প্রতি) আর আমার অভিনয়টা আপনি দেখলেন? ভালই অভিনয় করি, কি বলেন? নইলে জীবন পণ করে আমাকে বাঁচাতে যান!

গিরিশ ॥ য়্যাঁ! ও! হ্যাঁ, বটেই তো। তা বলতে পারো তুমি।

তরুণী ॥ আপনারা থিয়েটার করেন, মেয়েদের পার্ট দেন না কেন? ব্যাটাছেলেরা যখন মেয়ে সাজে, ফাঁক একটা থেকেই যায়। গরমিলটা পুরুষের চোখে ধরা না পড়লেও মেয়েদের চোখে ধরা পড়েই, মেয়েরা মনে মনে হাসে।

গিরিশ ॥ জানি। আমরাও হাসি। কিন্তু সমাজপতিরা মানেন না।

তরুণী ॥ কলকাতায় থিয়েটারের গোড়ার যুগে মেয়েরাই মেয়েদের পার্ট করেছে। নবীন বসুর বাড়িতে আমারই দিদিমা বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা সেজেছে।

নটবর ॥ আর বুঝলেন মশাই—সেই বিদ্যাধরী দিদিমার রক্ত আমার এই অবিদ্যার দেহে টগবগ করে ফুটছে, আর আমি কিনা হরদম সেদ্ধ হচ্ছি। মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন ইনি। আনতেই হল এখানে আজ।

তরুণী ॥ আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এখানে এসে কার কাছে দত্ত মশাই শুনলেন, আপনি নাকি আপনার থিয়েটারের দল ছেড়ে দিয়েছেন। শুনেই গাড়ি হাঁকিয়ে আমি চলে গেলাম আমার রামবাগানের ঘরে। ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম আমার জীবনের যা কিছু সঞ্চয় এই গয়নার বাক্স। এই নিন, নতুন থিয়েটার খুলুন আর তাতে মেয়েদের নিন। পাঁক থেকে আমাদের টেনে তুলুন। আমাদের অন্ধকার জীবনে আলো এনে দিন। বেশ্যা কি

মানুষ হতে পারে না? আমরা পারব। মানুষকে আমরা তার মহত্বে—তার নীচতায় এমন করে সবার সামনে তুলে ধরব যাতে—সমাজের চোখ খুলবে। আমরা পারব। কি, চুপ ক'রে রইলেন যে! আমরা ব্যাভিচারিণী, তাই? কিন্তু -কিন্তু (গিরিশের চোখে চোখ রাখিয়া) মঞ্চে ব্যাভিচারী পুরুষ যদি স্থান পায়—আমরা কেন পাব না, এ আপনাদের কেমন বিচার?

গিরিশ॥ (মাথা নিচু করিয়া কি ভাবিয়া) যদি দিন পাই, তোমার একথা আমি ভুলব না। তোমার নাম?

তরুণী॥ জয়া।

[তরুণী গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করিল]

গিরিশ॥ জয়া! সার্থক হোক্ তোমার নাম। সমাজপতি! সমাজপতি! সমাজপতি! সমাজপতিরা একদিন বলতেন—সতীদাহ খুব একটা ধর্মের ব্যাপার, রামমোহন রায়ের বিদ্রোহে সেই অধর্মটা উঠে গেছে। সমাজপতিরা বলতেন—কুলীনের কুলরক্ষা করতে বহু বিবাহ একটা ধর্মের ব্যাপার, শিক্ষিত নব্য বাঙালীর বিদ্রোহে আজ সে অধর্ম নিন্দার বিষয় হয়েছে। সমাজপতিরা বলতেন—বিধবা বিবাহ অধর্ম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহে বিধবা বিবাহ আইনত সিদ্ধ হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী—স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখছে। আজকের এ নূতন আলোকে আমাদের মঞ্চও আলোকিত হতে বাধ্য। সেই দিনের অপেক্ষায় ঐ গয়নার বাক্স তোমার কাছেই থাক—এখন ওটার দরকার নেই জয়া।

জয়া॥ কিন্তু—

গিরিশ॥ না না, আসল মূলধন তুমি দিয়েছে। তোমাদের ঘুম ভেঙেছে—তোমাদের চৈতন্য হয়েছে! পঙ্কের মধ্যে থেকেও পদ্ম হয়ে ফুটে উঠতে চাইছ। এই জাগরণ ব্যর্থ হবে না। জেন, তোমরা—আমরা এক সঙ্গেই থিয়েটার করছি অদূরে ভবিষ্যতে—আমরা সবাই পদ্ম হয়ে ফুটে উঠব—এই থিয়েটারই হবে আমাদের জীবনপদ্ম। আচ্ছা এসো, আমি এখন বড় তৃষ্ণার্ত।

নটবর॥ সে আর বলতে। আমিও কিছু কম নই।

[গিরিশকে একটা নমস্কার করিয়া জয়াকে হঠাৎ টানিয়া লইয়া নটবর চলিয়া গেল। গিরিশ মদ্যপানে উদ্যত এমন সময় মনোমোহনের পুনঃ প্রবেশ। গিরিশ তাহাকে দেখিয়া বিরক্তই হইলেন।]

গিরিশ॥ আবার কেন?

মনো॥ ন্যাশানাল থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল বেরিয়েছে স্যার।

গিরিশ॥ চুলোয় যাক তোমার ন্যাশানাল থিয়েটার। Get out I say. (মনোমোহন যাইতেছিল) দাঁড়াও, কি লিখেছে ঐ হ্যাণ্ডবিলে?

মনো॥ (পাঠ)—"কলিকাতা ন্যাশানল থিয়েট্রিকেল সোসাইটি। সর্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার

তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে রঙ্গ ভূমির ও বঙ্গ ভাষার অঙ্গ পুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান্ হইয়াছি। সে দিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে। টিকিটের মূল্য প্রথম শ্রেণী ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক। শ্রীধর্মদাস শূর স্টেজ ম্যানেজার।"

গিরিশ ॥ মনোমোহন, ভাই তুমি আমার একটা কাজ করবে?

মনো ॥ আপনার কোন কাজ করতে পারলে আমি ধন্য হবো স্যার।

গিরিশ ॥ কিন্তু কেউ যেন জান্তে না পারে।

মনো ॥ কেউ জানবে না স্যার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কেউ জানবে না।

গিরিশ ॥ চুপি চুপি ঐ দিনের একটা টিকিট কিনে এনে তুমি আমায় দেবে।

মনো ॥ নিশ্চয় দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানবে না।

গিরিশ ॥ দীনুর কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে যাও।

মনো ॥ যাচ্ছি (যাইতে উদ্যত)—

গিরিশ ॥ না না দাঁড়াও। ফার্স্ট ক্লাশে বসলে সবাই আমাকে দেখবে। তুমি বরং সেকেণ্ড ক্লাশের একেবারে শেষ লাইনের একটা টিকিট—

মনো ॥ (হাসিয়া) সে স্যার আপনি যেখানেই বসবেন, কারও চোখ এড়াতে পারবেন না—তবে হ্যাঁ, যদি মুটে-মজুরের ছদ্মবেশে যান—

গিরিশ ॥ তাই যাব-তাই যাব, আমি দেখবো—আমি সব দেখবো। যাও—

[মনোমোহন চলিয়া গেল]

গিরিশ ॥ (হঠাৎ যেন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল) না না এ আমি কি করছি! গিরিশচন্দ্র ঘোষ তুমি এত নীচে নেমে গেছ! (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) মনোমোহন মনোমোহন যেও না, শুনে যাও—

[মনোমোহন ফিরিয়া আসিল]

তুমি কি বেকুব মনোমোহন! অর্ধেন্দু-রা প্লে করবে আমি তাই টিকিট কিনে দেখবো! (হঠাৎ উচ্চহাস্যে) তুমি বড্ড ছেলেমানুষ। আমি দেখব বললেই ওরা আমায় মাথায় করে নিয়ে যাবে না?

মনো ॥ কিন্তু আপনি টিকিটের কথা বললেন যে—

গিরিশ ॥ অনেকদিন অভিনয় করিনি, একটু অভিনয় করলুম। (হঠাৎ মনোমোহনের হাত দুইখানি ধরিয়া) কিন্তু এটাও তুমি কাউকে বলতে পারবে না, গোপন রাখবে। কথা দাও—

মনো ॥ কথা দিচ্ছি দাদা।

গিরিশ ॥ আচ্ছা বাড়ি যাও।

মনো ॥ যাচ্ছি, কিন্তু আমার আনন্দ কি জানেন?

গিরিশ ॥ কি ?

মনো ॥ আমি আপনার সবচেয়ে মর্মান্তিক এক অভিনয় দেখলাম আজ। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—একথা দ্বিতীয় লোক জানবে না। [মনোমোহনের প্রস্থান]

গিরিশ ॥ হায় হায়, এ আমার কি দুর্বলতা—এ আমার কি দুর্বলতা! (মদ্যপান) ডিক্সনারীতে আছে 'ন্যাশনাল' মানে 'Belonging to or Pertaining to a nation'—মানে, জাতিগত, জাতীয়। তবে আমার কি দোষ ঈশ্বর! না-না, তোমাকে বলতে হবে, বলতেই হবে—না বললে তোমাকে আমি ছাড়ছি না, অর্ধেন্দু!

●

চতুর্থ দৃশ্য

[১৮৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের মঞ্চ।

[থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ও নিমন্ত্রিত বান্ধবগণ প্রেক্ষাগৃহে সমাসীন। যবনিকার সম্মুখে গায়কের প্রবেশ]

লোকসংগীত

(রাগিনী, আড়ানা বাহার—তাল, তিওট)

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন ॥
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছ সকল তো হে কি আর আছে এখন ॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলেয় হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালি দিল বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।

[বিদ্যাভূণী-কৃত]

[গান শেষে গায়কের প্রস্থান ও সূত্রধারের প্রবেশ এবং সমবেত দর্শকদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জ্ঞাপন]

সূত্রধার ॥ আমাদের এই ন্যাশানাল থিয়েটারের মাননীয় পৃষ্ঠপোষক এবং নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতগণ। আগামী কাল ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর

শনিবার সুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র রচিত বঙ্গদেশ আলোড়নকারী সমাজ জীবনের বাস্তব আলেখ্য 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা আমরা বাঙ্গালীর প্রথম জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন করিব। (প্রেক্ষাগৃহে করতালি) বাঙ্গালীর নীল-ই সারা পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তৎপর উহার কর্মচারী ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা এই লাভজনক ব্যবসা চালাইতে গিয়া কৃষককুলকে ছলে বলে কৌশলে দাদন ও অন্যান্য চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করিতেছিলেন। ব্যবসাটি প্রচুর লাভজনক হইলেও নীলচাষীরা উহার ছিটেফোঁটাও পাইত না। অসহায় প্রজাগণ অনাহারে থাকিয়া সকল নির্যাতন সহিয়া নীলের চাষ করিতে বাধ্য হইতে—কোন প্রতিকার ছিল না। প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া বিদেশী বণিকরা রাজার হালে দিন কাটাইত। হতভাগ্য প্রজাদের ধন-প্রাণ-মান ইজ্জত সব কিছু এই বিদেশী বণিকরা গ্রাস করিত। ঠিক এই সময় নীলদর্পণ রচিত ও পঠিত হইয়া এই হতভাগ্যদের প্রতি দেশে-বিদেশে সহানুভূতি ও সমবেদনা সৃষ্ট হয়। বাংলার আবাল বৃদ্ধবণিতা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে। প্রচন্ড জাতীয় বিক্ষোভের ফলে নীলকরের অত্যাচার রহিত হইতে বাধ্য হয়। জাতীয় সমস্যার নাটকের অভিনয় দারাই আমাদের জাতীয় নাট্যশালা আগামী কল্য আত্মপ্রকাশ করিবে। প্রজাদের বিশেষ, ধনী গৃহস্থ গোলক বসু এবং দরিদ্র কৃষক সাধুচরণের পরিবারের সহিত দুর্বৃত্ত নীলকরদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া নীলকর সাহেবদের ক্রমাগত অত্যাচার এবং ষড়যন্ত্রের ফলে দুটি পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল—পঞ্চমাঙ্ক এই নাটকের মর্মান্তিক কাহিনী। আজ আমাদের এই নাটকের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের ড্রেস রিহার্স্যাল হইবেক। দর্শকদের মূল্যবান মতামত ও সমালোচনা পাইলে আমরা নিজেদের সংশোধন করিয়া লইব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। নমস্কার।

[প্রেক্ষাগৃহে করতালি]

নীলদর্পণ। প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। বেগুনবেড়ের কুঠি, বড় বাংলোর বারেন্দা। আই. আই. উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ। [সূত্রধারের প্রস্থান। ধবনিকা উত্তোলন]

গোপী ॥ হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোনদিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোনদিন বা একটাও বাজে।

উড ॥ তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা

এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী ॥ ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুঠির কতক গুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড ॥ আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখোনি, আমি বজ্জাত-দের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি। জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ্ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমাকে কিছু বলনি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্কা হায় নেই বাবা।—তোম্কো জুতি মার্কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী ॥ ধর্মাবতার, যদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওটের মতই কর্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কার্য করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড ॥ নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্য়ে চায়—ওস্কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্কা হিসাব দোরস্ত কর্কে রাখ—বাঞ্চৎ মাম্লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী ॥ ধর্মাবতার, ঐ একজন কুঠীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয় উকীল মোক্তারদিগের এমন শলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীন-বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই। তাতে বেটা উত্তর দিল "গরিব প্রজাগণের রক্ষার্থে দীক্ষিত হইয়াছি নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব!" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড ॥ তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্সে কাম হোগা নেই।

গোপী ॥ হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জবালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড ॥ আমি কথা চাই না আমি কাজ চাই।

[সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ]

এ বজ্জাতের হস্তে দাঁড় পড়িয়াছে কেন ?

গোপী ॥ ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু ॥ ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিয়াছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পূরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হয় ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি—৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি !

গোপী ॥ সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করে রাখ।

সাধু ॥ দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী ॥ সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শোনায় না, গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড ॥ বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন ॥ বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী ॥ ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্মাবতার ! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড ॥ গভরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন ॥ বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড ॥ (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী ॥ ধর্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু ॥ (স্বগত) হা ভগবান্ ! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল ! (প্রকাশ্যে)

হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুঠির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদি ও ৯ বিঘা আমার চাষ দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো ?

উড ॥ শালা বড় হারামজাদা. দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হবে হামাকে, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্ কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)।

সাধু ॥ হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই ॥ (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন ॥ কই শালা, ফৌজদারী করলি নে ! (কান মলন)

রাই ॥ (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো ! মাগো !

উড ॥ ব্লাডি নিগার, মারো বাণ্ডৎকো (শামচাঁদাঘাত)

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

রাই ॥ বড়বাবু, মলাম গো ! জল খাবো গো ! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন ॥ ধর্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুনবে কে ? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড ॥ তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে ?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল ; আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু ॥ হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি ? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্কা দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করে দিব।

উড ॥ আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান, (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন ॥ (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিবেন। আহা! উহার বাড়িতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে. সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড ॥ চুপরাও, শালা. বাঞ্চৎ, পাজি. গোরুখোর। এ আর অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুঠির লোক ধরো মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান. নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন ॥ (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী। তুমি দ্বিধা হও. আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী ॥ নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীন ॥ সাধু পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান]

উড ॥ গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও। [উডের প্রস্থান]

গোপী ॥ চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।

ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই ॥ [সকলের প্রস্থান]

[যবনিকা]

●

পঞ্চম দৃশ্য

সূত্রধার ॥ নীলদর্পণ। তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক! রোগ সাহেবের কামরা। রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

[সূত্রধারের প্রস্থান]

ক্ষেত্র ॥ ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না মুই পরাণ দিতি পারবো,

ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে ?

পদী ॥ তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায় ; এ কথা কেউ জানতে পারবে না—এই রাত্রেই আমি সংগে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র ॥ ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেব্‌তা তো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চকি তো ধুলো দিতি পারবো না ! আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বল্‌বে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্‌, আর অজানাই হোক্‌, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ ॥ পদ্দ, খাটের উপরে আন্‌ না।

পদী ॥ আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ ॥ আমার কাছে বলা শুয়োরের পায়ে মুক্তো ছড়ান, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুঠি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়েমানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে হাঁসিতে খানা খাই—আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালবাসি, কুঠির কর্মে ও কর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে। তোর গায়ে জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী ॥ ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস্‌, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র ॥ পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ি দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা। মোর মা এত বেল্‌ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ি রেখে আয়, তোর পায়ে পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ ॥ কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র ॥ মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ি গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী ॥ (স্বগত) আমার ধর্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশ্যে) তা, মা, আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ি যাক্ তখন আর একদিন আস্‌বে।

রোগ ॥ তুমি তবে আমার সংগে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সংগে বাড়ি পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্‌নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাঠিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাঠিয়াল এ কার্যে কখনও দিয়াছি ? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী ॥ তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র ॥ ময়রা পিসি যাস্‌নে ময়রা পিসি যাস্‌নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান]

ক্ষেত্র ॥ মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতি লেগিচি, মোর ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ ॥ ডিয়ার, ডিয়াব (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র ॥ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সংগে দিয়ে মোরে বাড়ি পেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ ॥ তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র ॥ মোর ছেলে মরে যাবে. দোহাই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে— মুই পোয়াতি।

রোগ ॥ তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র ॥ ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

[রোগের হস্তে নখ বিদারণ]

রোগ ॥ ইন্‌ফরন্যাল বিচ্ ! [বেত্র গ্রহণ করিয়া] এইবার তোমার ছেনালি ভংগ হইবে।

ক্ষেত্র ॥ মোরে অ্যাকেবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ি যোড়া মরা মরো, মোর গায়ে যদি আবার

হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাই ভাতারির ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতে পারি নে।

রোগ ॥ চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

[পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র ॥ কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)।

[জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ]

নবীন ॥ (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার !

তোরাপ ॥ সামিন্দ দেঁড়য়ে যেন কাটের পুতুল -- গোড়ার -বাক্যি হরে গিয়েচে বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বি তো জোরার বাড় যাবি (গাল টিপে ধর্যে) পাঁচ দিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচদিন খাবালি একদিন খা (কানমলন)।

নবীন ॥ ভয় কি ভাল কর্যে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্যে লইয়া পালাই —আমি বুনোপাড়া ছাড়ুয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমুয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না, তুই তারপর আমাদের বাড়ি যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ ॥ মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোস্তার সামিন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেংগে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তারপর নাত কর্যে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সামিন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল কর্যে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন--তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড কর্যে জুতার গুতো মারিস্ নে ?

[হাঁটুর গুঁতো]

নবীন ॥ তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দয় বলো আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম।

[ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান]

তোরাপ ॥ এমন বস্‌গারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বলো মেন্‌য়ে জন্‌য়ে কাজ মেরে নে, জোর জোরাবতী কদিন চলে, পেল্‌য়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সর্মিন্দি নেয়েত ফেরার হলি ঝে কুঠি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে ট্যাকাগুনো চুক্‌য়ে দে আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না,—চষা চাই—ছোট সাহেব, স্যাল'ম, মুই আসি।

[চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন]

রাগ ॥ বাই জোভ ! বিটেন্‌ টু জেলি।

[প্রেক্ষাগৃহে উচ্চ করতালি]

[মঞ্চে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সূত্রধার, শিশিরকুমার ঘোষ এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রবেশ। ঈশ্বরচন্দ্রের পা খালি, একহাতে একপাটি চটি জুতা। তিনি সোজা রোগ সাহেবের কাছে গিয়া বলিলেন]

ঈশ্বরচন্দ্র ॥ বৎস রোগ আমি তোমার অত্যাচার দর্শনে আত্ম বিস্মৃত হইয়া তোমাকে আমার একপাটি চটি ছুঁড়িয়া মারিয়াছি—

অবিনাশ ॥ সংগে সংগে আমি তাহা বিদ্যাসাগরের সাগরতুল্য আশীর্বাদ স্বরূপ পকেটে পুরিয়াছি।

[অবিনাশ চটিটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের পদতলে রাখিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র দুই পায়ে চটি পরিহিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ উচ্চ করতালিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।]

ঈশ্বরচন্দ্র ॥ (অবিনাশকে) বৎস ! আশা করি তুমি সত্য সত্যই অত খারাপ লোক নও, কি বল ?

অবিনাশ ॥ (বিব্রত হইয়া) আমি—আমি—

সূত্রধার ॥ না না ও হচ্ছে আমাদের অবিনাশ—অবিনাশ চন্দ্র কর। খুবই ভাল ছেলে বিদ্যাসাগর মশায়। আর এ তো অভিনয়।

ঈশ্বরচন্দ্র ॥ কিন্তু দেখ এই সব দুষ্টু লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে শেষে দুর্বৃত্ত হয়ে প'রো না (ক্ষেত্রমণির প্রতি) তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, কি বলো মা ?

ক্ষেত্রমণি ॥ না বাবা, ভয়ের কি আছে। আমি দেখেছিলাম আপনি ওখানে বসে রয়েছেন। আপনি যেখানে রয়েছেন সেখানে ভয় কি ? আর তা ছাড়া, সত্যিই তো আর আমি মেয়ে নই। আমি ব্যাটা ছেলে, মেয়ে সেজেছি।

[সকলের হাস্য]

ঈশ্বরচন্দ্র ॥ এই দেখ আমি কি ভুলই না করি! আমি না তোমাদের বলেছিলাম, খবরদার, মেয়েছেলে নিয়ে তোমরা অভিনয় কোর না। মাইকেলের মত অবশ্য ছিল অন্যরূপ। বলে, বেটাছেলে মেয়েছেলে সাজলে সেটা নাকি বিসদৃশ—অস্বাভাবিক। কিন্তু কই, তা তো হল না। অভিনয় দেখতে দেখতে কেউ বুঝতেই পারে নি যে, এখানে ছেলেরাই মেয়ে সেজেছে। তবে আর ঘরের লক্ষ্মীদের নিয়ে টানাটানি কেন? না না, এই বেশ। (সকলের প্রতি) কি বল হে?

নগেন্দ্র ॥ আজ্ঞে আপনার কথাই আমরা রেখেছি।

ঈশ্বরচন্দ্র ॥ বেশ, বেশ। আচ্ছা চলি। জয়োস্তু।

সূত্রধার ॥ সর্বজনমান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা আগামীকল্য ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় নাট্যশালা ন্যাশানাল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করিব।

[পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে হর্ষধ্বনি। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রে কনসার্ট বাদনের পর সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ করতালি মুখরিত হইল। তৎপর মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, নাটকের সমুদয় কুশীলবগণ দর্শকগণকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিতেছে। সূত্রধার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—]

সূত্রধার ॥ আমাদের জাতীয় নাট্যশালা ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম রজনীর মাননীয় দর্শকগণ, সমাপ্ত মিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং। ভবদীয় অনুগ্রহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের এই সর্বপ্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল—আজ ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার। আমরা সর্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

[প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় উচ্চ করতালি। ইতিমধ্যে মঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন নিমাই সান্যাল এবং তাঁহার এক বৃদ্ধ আত্মীয় মহাকাল চৌধুরী এবং শিশিরকুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র এবং আরও দুই একজন ভদ্রলোক]

সূত্রধার ॥ আমাদের আশীর্বাদ করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন স্বর্গত মধুসূদন সান্যাল-এর সুযোগ্য বংশধর শ্রীনিমাই সান্যাল। আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

[প্রেক্ষাগৃহে করতালি]

মহাকাল ॥ আমি এই সান্যাল মহাশয়ের লক্ষ্ণৌবাসী একজন আত্মীয়। ব্যবসা সূত্রে বহুকাল পর মহানগরী কলিকাতায় আগমন করে আজ এখানে যে নাট্যলীলা দর্শন করলাম তাতে এখনও আমার মস্তক, কি যেন কথাটা—ঘূর্ণায়মান। ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের বন্ধু নবীনকৃষ্ণের বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর" নাট্যলীলায় 'বিদ্যা' সেজেছিল 'রাধামণি'। তার রূপে গুণে আর অভিনয়ে আমি, কি যেন কথাটা—উন্মাদ হয়েছিলাম, যেমনটি হয়েছি ৩৭ বৎসর পর পুনরায় কলিকাতায় আজ এই 'ক্ষেত্রমণি' কন্যাটিকে দর্শন করে।

আমি ওকে—বুঝলে, গো, তোমাকে একটি ভারী সোনার মেডেল দেব ঘোষণা করছি। আমি কালই অবশ্য লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছি, কিন্তু চৌদ্দ দিন পর তোমাকে ঐ মেডেলটি দিতেই আসবো এখানে। বুঝলে ক্ষেত্রমণি ?

শিশির ॥ কথাগুলো বড় ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে! কেমন অশোভন শোনাচ্ছে।

নিমাই সান্যাল ॥ বিপদ হয়েছে, আমার এই লক্ষপতি আত্মীয়টি একটি বিয়ে পাগলা বুড়ো। এঁর কোন পত্নীই জীবিত থাকেন না। এরি মধ্যে বারোটির বারোটা বেজে গেছে। এবারে এসেছেন ত্রয়োদশীর খোঁজে!

মহাকাল ॥ না না ক্ষেত্রমণি তুমি কি যেন কথাটা—ভীত হয়ো না।

বেলবাবু ॥ ভীত হব কি মশাই! আমি ক্ষেত্রমণি নই।

[বলিয়া মেয়েলি পরচুল খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ]

বেলবাবু ॥ আমি বেলবাবু—কাপ্তেন বেল।

মহাকাল ॥ পুরুষ! মদ্দা! তাও আবার কাপ্তেন, ওরে বাবা! তবে বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা সাজতো রাধামণি—আমি কি যেন কথাটা—প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ দেখে গেছি।

বেলবাবু ॥ সে মশায় সেকালে—

মহাকাল ॥ ও তাই নাকি—তাই নাকি। আচ্ছা যাচ্ছি।

বেলবাবু ॥ কিন্তু মেডেলটা ?

মহাকাল ॥ সে আমি পাঠিয়ে দেবো।

শিশির ॥ শুনুন মশাই, চৌদ্দ দিন বাদেই তো আসছেন, সেই সংগে লক্ষ্ণৌ থেকে একদল দেশী বাদ্যকর যদি দয়া করে নিয়ে আসেন, তবে এই থিয়েটারের মহৎ উপকার হয়। অনেকেই সমালোচনা করছিলেন, 'ন্যাশানাল থিয়েটারে ইংরেজী বাদ্য বাজান হচ্ছে কেন ?' আমিও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে এই অভিনয়ে ঐ একটি ত্রুটি পরিলক্ষণ করছি।

মহাকাল ॥ এ ত্রুটি আমি সারিয়ে দেবো। কিন্তু মশাই, মেয়েছেলের পার্টে ব্যাটা ছেলে সাজানো এ মশাই, কি যেন কথাটা—সাংঘাতিক, হাঁ, সাংঘাতিক ত্রুটি—ওটা সারিয়ে রাখবেন।

[প্রস্থান ও সকলের হাস্য]

দীনবন্ধু ॥ বিয়ে পাগলা বুড়ো। ঠিক এমনি একটি চরিত্র দর্শন করে ঐ নামে আমিও একটি নাটক রচনা করেছি। নাটকটির নামও দিয়েছি "বিয়ে পাগল বুড়ো"।

নগেন্দ্র ॥ আপনার সেই নাটকটিও আমরা অভিনয় করব ঠিক করে রেখেছি। আগামী শনিবার আমরা অভিনয় করছি আপনার "জামাই বারিক"।

আপনার নাটকের জন্যই আমরা বেঁচে আছি—বেঁচে থাকবো। আপনিই মূলতঃ আজকের এই ন্যাশানাল থিয়েটারের পরম স্রষ্টা।

দীনবন্ধু ॥ না না, তোমরা অভিনেতারাই আমার স্রষ্টা। নাটক সুঅভিনীত হলেই নাট্যকার—নাট্যকার। তোমাদের পারদর্শিতা দেখে আমি ধন্য হয়েছি। নীলদর্পণ আমার জীবনধন ছিল, তাকে তোমরা আজ জাতীয় সম্পদ করে তুললে। আমার 'সধবার একাদশী' নাটকে গিরিশ এমন অভিনয় করলে যে, ও নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রটা যেন তাকে দেখেই লেখা। তার সংগে বিচ্ছেদ হওয়ায় আমি বড় মনোকষ্টে আছি। আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। আমার বড় সাধ গিরিশের সংগে তোমাদের পুনর্মিলন দেখে যাই। আমার এই শেষ কামনা জানিয়ে তাকে এখানে আজ নিয়ে আসতে লোক পাঠিয়েছিলাম —তা সে নাকি আজ দু'দিন বাড়ীতেই নেই।

অর্ধেন্দু ॥ গিরিশবাবু এ দুদিন কোথায় আছেন সে আমি জানি। কাল গেছে আমাদের ড্রেস রিহার্সাল, আজ হল আমাদের ন্যাশানাল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন। এ দু'দিন তাঁর একটি মাত্রই চিন্তা ভাবনা—আমরা হারলাম কি জিতলাম—আমরা উঠলাম কি পড়লাম। এরই উত্তর পাবার জন্য, আমি গিরিশবাবুর শিল্পীসত্বা আমাদের এই থিয়েটারের আশে-পাশে পড়ে রয়েছে। অভিনয় দেখে দর্শকরা ঘরে ফিরছেন, আর তিনি যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন দর্শকরা কে কি বলে যাচ্ছেন। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি তিনি আমাদের কাছে আসছেন, কারণ তিনি দর্শকদের মুখে শুনেছেন আমাদের এই অভাবনীয় সাফল্য।

শিশির ॥ তোমাদের এই অভাবনীয় সাফল্যের কথা শুনলে সে আর এখানে আসবে না অর্ধেন্দু। বরং লজ্জায় পালিয়ে যাবে, নতুবা হিংসাবশে আবার নতুন করে একটা থিয়েটার খুলে বসবে।

নগেন্দ্র ॥ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তশিশিরকুমার ঘোষের এই অনুমানই যথার্থ।

অর্ধেন্দু ॥ না, যথার্থ নয়। অন্য কেউ হলে শ্রদ্ধেয় শিশিরবাবুর কথা আমি মানতাম কিন্তু গিরিশবাবুকে আমি জানি বলেই বলবো, তাঁর মত সত্যকার শিল্পী আমাদের এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না হয়ে আনন্দিত মনে আমাদের অভিনন্দন জানাতেই আসবেন একদিন।

দীনবন্ধু ॥ এই ভরসা রেখেই আজ আমি বিদায় নিচ্ছি।

[কোলাহল শোনা গেল 'গিরিশবাবু এসেছেন গিরিশবাবু'। সুরাপানে জড়িত কণ্ঠে গিরিশবাবু বলিতেছেন 'চোপরও' চোপরও'। কোলাহল স্তব্ধ হইল। মত্তাবস্থায় গিরিশের মঞ্চে প্রবেশ]

দীনবন্ধু ॥ গিরিশ!

[দীনবন্ধু মিত্রকে দেখিয়া গিরিশের নেশা খানিকটা কাটিয়া গেল।]

গিরিশ ॥ নাট্যগুরু! আপনি! বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় নাট্যবন্ধুরূপে জন্ম নিয়েছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি না হলে যখন নাট্যাভিনয় সাধ্য ছিল না, তখন আমরা সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে আপনার সমাজ চিত্র 'সধবার একাদশী' অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছি। মহাশয়ের সামাজিক নাটকগুলি যদি না থাকতো এই সকল নির্ধন যুবকরা আজ ন্যাশানাল থিয়েটার করতে সাহস করত না—এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলে নমস্কার করি। কর-কর তোমরা সকলে নমস্কার কর—

[দীনবন্ধু মিত্রকে সকলে নমস্কার করিলেন]

দীনবন্ধু ॥ (সাশ্রুনেত্রে) জয়োস্তু—জয়োস্তু—জয়োস্তু।

গিরিশ ॥ এই নাট্যগুরুর সামনে তোমাদের সবাইকে একটা কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি।

জনৈক দর্শক ॥ গিরিশবাবু. আপনি মশাই দল ছাড়লেন কেন ?

২য় দর্শক ॥ এ বই-এ আপনি সাজলে না জানি আরও কত ভালো হোত।

গিরিশ ॥ চোপ্ রাও—চোপ্ রাও। আমি শালা এ বই-এ সাজলে (দীনবন্ধুর প্রতি চোখ পড়াতে) মাফ করো গুরু, আমাতে আর আমি নেই। আমার শ'কার-ব'কার তোমরা ধরো না, তোমাদের পায়ে পড়ছি, ধরো না। তবে যাবার আগে একটা কথা খুব গোপনে বলে যাচ্ছি, সেই যে লোকটা—যাকে তোমরা গিরিশ ঘোষ বলো গো—যাকে এই আমাদের গুরু—ইনিও বলে থাকেন এক্টর নাম্বার ওয়ান—সেই গিরিশ ঘোষ আজ তোমাদের সবার সামনে বলে যাচ্ছে—এই থিয়েটার গেটের সামনের ফুটপাথে গোপনে দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকদের মুখে স্বকর্ণে শুনেছে—ন্যাশানাল থিয়েটারে আজ এই যে নীলদর্পণ হলো—এর জবাব নেই—জুড়ি নেই। বুঝেছ অর্ধেন্দু—তোমরা জিতেছ, তোমরা জিতেছ, তোমরা জিতেছ—আমি হেরেছি, আমি হেরেছি. আমি হেরেছি। তিন সত্যি। বাস্ হলো তো, এইবার আমি চলি, পথ ছাড়ো—আমার পথ ছাড়ো—আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—

দীনবন্ধু ॥ কোথায় যাচ্ছ গিরিশ ? দাঁড়াও—

শিশির ॥ গিরিশবাবু, আপনার পা টলছে। চলুন, আমি আপনাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

গিরিশ ॥ কোন শালা এখন বাড়ি যাবে ? আজ শনিবার ৺মা কালীর কাছে আমার মানত রয়েছে না ? সর, আমি ৺মাকে পুজো দিতে যাব।

শিশির ॥ কিন্তু আপনি যখন হেরে গেছেন বলছেন, তখন আবার পুজো দেবেন কেন ? মানত পূর্ণ হলে তবে তো পুজো। চলুন চলুন, আমার গাড়ি রয়েছে, আমি আপনাকে পেঁৗছে দিচ্ছি।

গিরিশ ॥ শাট আপ ষ্টুপিড—য়্যা—না না—মদের খেয়ালে আপনাকে যা বল্‌বার নয়, আমি আপনাকে তাই বলেছি। আপনার পায়ে মাফ চাইছি। মাফ চেয়ে নিয়েই বলছি, আপনি জানেন না—আপনি মশাই জানেন না—আমি শালা বলে ছিলাম, ন্যাশানাল থিয়েটার করতে হলে সব কিছু শ্রেষ্ঠ চাই। তা যদি পারো তবে আমি আছি, নইলে গুড বাই—গুড বাই। ও শালারা বলেছিল, আমাদের যা আছে তাই দিয়েই ন্যাশানাল থিয়েটার খুলবো। ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল। তবে এটাও বলে ছিলাম, যদি তোমরা জিততে পারো, তবেই আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। আর যদি হারো, তবে এইসব ছোটলোকদের মুখ আর আমি দেখব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বল্‌ শালারা তাই কিনা ?

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ। তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য, আমরা যাতে জিততে পারি—সেই জন্য, সেই তপস্যাই করেছি, আর তবেই না আমরা জিতেছি।

নগেন্দ্র ॥ আর তবেই না মশাই আপনি এসেছেন।

গিরিশ ॥ হ্যাঁ এসেছি। মা কালীর পায়ে সেই মানতই করে ছিলাম যে। তোরা হারলে, তোদের মুখ দেখা আর তো আমার হতো না-রে! জন্মে হ'তো না। আমার ভয় ছিল ন্যাশানাল থিয়েটার নাম শুনে বাঙ্গালী দর্শক অনেক কিছু চাইবে—যা এক শুধু বড় লোকেরাই দিতে পারে। তা—আমার ভুল ভেঙ্গেছে। এ পরাজয়ে আমার আনন্দ হচ্ছে এই দেখে যে, বাঙ্গালী চায় ভাল নাটক—ভাল অভিনয়। যেটা সারবস্তু সেইটেই চায়—কি গো তাই তো ?

[প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনি উঠিল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাল নাটক—ভাল অভিনয়—দিন মশাই আমাদের দিন'।]

গিরিশ ॥ হ্যাঁ দেব। যত শিগ্‌গির পারি, এই ন্যাশানাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে তাই হবে আমার সাধনা। ন্যাশানাল থিয়েটার হবে জাতির দর্পণ—জাতির মশাল—আর ঘৃণিত এই নট-নটীদের জীবন পদ্ম—

[দীনবন্ধু মিত্র গিরিশ এবং অর্ধেন্দুর হাত নিজের হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিলেন]

দীনবন্ধু ॥ তোমাদের এই মণিকাঞ্চন সংযোগে ন্যাশানাল থিয়েটারের আদর্শ জয়যুক্ত হোক—মৃত্যুপথযাত্রী এই নাট্যকারের অন্তিম এই আশীর্ব্বাদ।

[গিরিশ ও অর্ধেন্দু দীনবন্ধুকে প্রণাম করিল। দীনবন্ধু উভয়ের মাথায় হাত রাখিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ জয়োস্তু! জয়োস্তু! জয়োস্তু!

[গিরিশ ও অর্ধেন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। নীরব আবেগে উভয়ে উভয়ের মুখপানে কণকাল তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। প্রেক্ষাগৃহে উচ্চ করতালি।]

॥ যবনিকা ॥

মীরকাশিম

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

৭ম সংস্করণ

রচনাকাল
১৮ই নভেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর ১৯০৮
৩০, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট, ফ্ল্যাট, ৮
কলিকাতা

মীরকাশিম
বাঙলার অতীত-স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ !
দীপ নির্বাপিত
কিন্তু
স্মৃতি বর্তমান !!
স্মৃতির সেই বেদীমূলে
প্রণাম করি ।

মন্মথ রায়
২৪-১২-৩৮

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্নেহধন্য
মন্মথ রায়

২৪-১২-৩৮

মীরকাশিম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গের মন্ত্রণাগার

পর পর কয়েকটি গুলীর শব্দের মধ্যে পটোত্তোলন। একজন গুপ্তচর ভূপাতিত—তাহার শেষ আর্তনাদ—মৃত্যু।

নজাফ খাঁ ॥ বেইমান! বেইমান!

মীরকাশিম, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতির প্রবেশ।

মীরকাশিম ॥ নজাফ খাঁ!

নজাফ খাঁ ॥ বেইমান—গুপ্তচর—

মীরকাশিম ॥ বাংলায় বেইমানের অভাব নেই নজাফ খাঁ—তা হ'লে অনেককেই হত্যা ক'রতে হয়—তোমাদের নবাবও বাদ যায় না—কিন্তু চক্রীদের চক্রান্তের ভয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে এসেও নিস্তার নেই, এখানেও গুপ্তচর!

নজাফ খাঁ ॥ তকী খাঁর প্রেরিত চর-মুখে সংবাদ পাই—সপ্তাহ আগে চিৎপুর দেওয়ানখানায় মনি বেগমের আহ্বানে এক বৈঠক বসে।

মীরকাশিম ॥ আমাদের সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য তো বৈঠকের আহ্বান।

নজাফ খাঁ ॥ বৈঠকে ক'লকাতার কাউন্সিলের সদস্যগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম ॥ তাতেও বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই—গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস ব্যতীত আর সকলেই আমার ওপর বিরূপ; কেননা আমার জন্য তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে না!

নজাফ খাঁ ॥ অনেক রাজা মহারাজা জমিদারও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম ॥ থাকবেনই তো। মীরকাশিম নবাব হওয়ায় তাঁরা ব্যক্তিগত সুযোগ পাবেন ভেবেছিলেন—কিন্তু বেইমান মীরকাশিম যে নবাবী গ্রহণ ক'রে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে সে ধারণা তাঁরা করতে পারেন নি।

নজাফ খাঁ ॥ মনি-বেগমের প্ররোচনায় সকলে মীরজাফরকে গদী দেওয়ার

ষড়যন্ত্র ক'রছেন ।—এখন সমস্ত নির্ভর ক'রছে অমিয়ট আর হে সাহেবের দৌত্যের ওপর—

মীরকাশিম ॥ জীবনে সে-ভুল একবার করেছি—এবার প্রাণ দিয়েও সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো, তাদের কথায় প্রজার স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কোনো সন্ধি ক'রবো না ।

নজাফ খাঁ ॥ বৈঠক বসবার পূর্বেই অমিয়ট আর হে সাহেব ক'লকাতা থেকে চ'লে আসেন —তাঁদের কিছু গুপ্ত উপদেশ দেওয়ার জন্য এই বেইমানকে তারা গুপ্তচর পাঠিয়েছে । আমাদের চর বরাবর এর সঙ্গে থাকায় মুঙ্গের পেঁছে ও সাহেবদের কুঠিতে যেতে সাহসী হয়নি ।

মীরকাশিম ॥ হুঁ । এ-ই যে সেই গুপ্তচর— তার প্রমাণ ?

নজাফ খাঁ ॥ আছে ।

জগৎশেঠ ॥ রক্তে যে সব ভেসে গেল ! উঃ ! কী বীভৎস ! (মৃতদেহের প্রতি রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) নিয়ে যা—নিয়ে যা—নবাবের চোখের সামনে থেকে এ দৃশ্য সরিয়ে নে—

মীরকাশিম ॥ একটু পরে শেঠজী ।

জগৎশেঠ ॥ (মৃতদেহ যেন আর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না) কিন্তু আপনার চোখের ওপর এই বীভৎস দৃশ্য !

রাজবল্লভ ॥ দরবারে এই প্রকার হত্যা—

নজাফ খাঁ ॥ হত্যা ব'লবেন না রাজা —বলুন শাস্তি ·

রাজবল্লভ ॥ বিনা বিচারে—

নজাফ খাঁ ॥ নির্দোষীকে হত্যা ক'রে থাকি—নবাব আমায় শাস্তি দেবেন ।

মীরকাশিম ॥ প্রমাণ নজাফ খাঁ ।

(গুপ্তচরের জুতার মধ্য হইতে একটা লাল-পাঞ্জা বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিল) ।

মীরকাশিম ॥ (লাল পাঞ্জা পরীক্ষা করিয়া) কোম্পানীর লাল-পাঞ্জা — কোম্পানীর শিলমোহর—সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন !—সিরাজের সময় এই লাল-পাঞ্জার কথা প্রথম শুনি—কিন্তু তখন দেখিনি —প্রথম কবে দেখি জানেন শেঠজী ?

জগৎশেঠ ॥ না জনাব ।

মীরকাশিম ॥ তিন বৎসর পূর্বে—ক'লকাতায়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে !

গুর্‌গিন খাঁ ॥ হামি দেখিলাম হুজ ।

মীরকাশিম ॥ মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি ক'রতে স্বীকার হ'লাম । শপথ হ'ল । তখন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এই লাল-পাঞ্জা দেখিয়ে ব'ললেন—যার হাতে এই লাল-পাঞ্জা পাবেন —জানবেন সে কোম্পানীর বিশ্বস্ততম লোক—

বিশ্বস্ততম বন্ধু—প্রয়োজন হ'লে তাকে দিয়ে সংবাদ পাঠাব—এবং সংবাদ সংগ্রহ ক'রব।

গুর্‌গিন খাঁ ॥ তাজ্জব! তাজ্জব!

মীরকাশিম ॥ রাজা রায়দুর্লভের হাতে ঐ লাল-পাঞ্জা দেখেছিলাম, খোজা পিদ্রুসের হাতে ঐ লাল পাঞ্জা দেখেছি, শেঠজী আপনার হাতে—

জগৎশেঠ ॥ না জনাব! এ সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি। শেঠেরা চিরদিনই বাংলার মসনদের ক্রীতদাস—

মীরকাশিম ॥ ঠিক—ঠিক শেঠজী বরং ব'লতে পারেন ঐ পাঞ্জা একদিন আপনি আমার হাতে দেখেছিলেন—না?—কিন্তু ভুলে যাবেন না—তখন ঐ পাঞ্জাই ছিল আমার নবাবী পাবার সোপান—ঐ পাঞ্জা দেখেই, কর্ণেল কলার্ডকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ দখল ক'রতে সাহায্য করেছিলাম—ঠিক তার দু'ঘণ্টা পরেই—

জগৎশেঠ ॥ আপনাকে নবাবী শীল-মোহর হাতে নিতে হ'ল।

মীরকাশিম ॥ কাজেই লাল পাঞ্জা হাতে নিয়ে আর কাজ ক'রতে পারলুম কই। দুটো অত বড় জিনিস এক হাতে এক সঙ্গে ধরে না শেঠজী। হয় লাল-পাঞ্জা নাও—নতুবা নাও নবাবী শীল-মোহর। আপনাদের অনেকেরই হয় তো ইচ্ছা ছিল ঐ লাল-পাঞ্জা হাতে নিয়ে আমি নবাবী করি—না শেঠজী?

জগৎশেঠ ॥ তা আর হ'ল কই জনাব!

মীরকাশিম ॥ হয়।

জগৎশেঠ ॥ হয়?

মীরকাশিম ॥ হয়। নবাবী নয় গোলামী!

গুর্‌গিন খাঁ ॥ [illegible]!

মীরকাশিম ॥ নজাফ খাঁ. মৃতদেহ নিয়ে যেতে বল—কুত্তা দিয়ে খাওয়াবার আজ্ঞা দাও।

মৃতদেহ অপসৃত হইল। নজাফ খাঁ চলিয়া গেল।

সিরাজকে মনে ক'রতাম হঠকারী, দাম্ভিক, উদ্ধত। মনে ক'রতাম, দেশে শান্তি সংস্থাপনের সে-ই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে, বেইমানি ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে—আমরা তাকে হত্যা ক'রলাম।

রাজবল্লভ ॥ আমরা!

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ, আমরা; নতুবা কে? কার সাধ্য ছিল সেই সিংহ-শিশুর কেশও স্পর্শ করে! পলাশীর যুদ্ধ! সে কি যুদ্ধ? এক দিকে অগণিত নবাব সৈন্য, উপযুক্ত সেনানায়ক, অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র—আর একদিকে বিচলিত বিকম্পিত মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সৈন্য—

গুর্‌গিন খাঁ ॥ একটা ফুঁ দিলে কোম্পানীকে কোম্পানীই উড়িয়া যাইত।

মীরকাশিম ॥ সাহসের অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্রের অভাব ছিল না, কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল দেশাত্মবোধের—অভাব ছিল মনুষ্যত্বের। বুদ্ধিরও অভাব ছিল না—কিন্তু সে ছিল স্বার্থবুদ্ধি।

গুর্‌গিন খাঁ ॥ ভারী বুদ্ধিমান জাত আছে এই বাঙ্গালী।

মীরকাশিম ॥ ক্ষমতার প্রলোভনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সিরাজকে বন্দী কর'লাম—বেগমের মণিমুক্তা লুঠ ক'রলাম মানুষ হ'য়ে পশুর ও অধম আচরণ ক'রতে দ্বিধা ক'রলাম না।

জগৎশেঠ ॥ এখন সে অনুশোচনা ক'রে আর লাভ কি জনাব। যা হবার হ'য়েছে—এখন আবার আমরা যাতে শান্তিতে বাস ক'রতে পারি জনাব—আপনি সেই ব্যবস্থা করুন ; এই আমাদের সকলের মিলিত অনুরোধ।

মীরকাশিম ॥ মীরজাফর নবাব হ'লেন। ভাবলাম সকলে শান্তিতে বাস ক'রব, দেশে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না। প্রজা সুখে থাকবে—আমার সোনার বাংলা আবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু যে সুদিন গেল—বাংলার সে সুদিন আর ফিরে এলো না। কোম্পানীর লোকদের শুধু বোনাস দিতেই মুর্শিদাবাদ রাজকোষ শূন্য হ'য়ে গেল। কোম্পানীর দেনা শোধ হ'ল না—ফলে নবাবকে হ'তে হ'ল কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল! মীরজাফরের রাজত্বে হ'ল বাদশাই ফার্মানে বিনা শুল্কে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য করবার অধিকারের ব্যভিচার! দেখলাম প্রজা যায়, দেশ যায়, বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হয়—তখন এই বেইমান যে বেইমান, সেও আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না।

গুর্‌গিন খাঁ ॥ হামাডের নবাবের প্রজার উপর যে ডরড আছে। টাহা সকলেই জানে।

মীরকাশিম ॥ রাজা রায়দুর্লভ আর ধনকুবের জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় বাংলার মসনদ কিনলাম—নবাব মীরজাফরের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রলাম—বাংলার তিন তিনটে পরগণা—বর্ধমান, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের রাজস্ব ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলাম—দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের খরচা দিলাম পাঁচ লক্ষ তঙ্কা—তবু কোম্পানীর অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। নাগপাশের এমন বাঁধনে আজ আমরা জড়িয়ে আছি যে এ থেকে আর মুক্তি নেই।

গুর্‌গিন খাঁ ॥ এবার বাঁধন কাটিয়ে ফেলুন—কোম্পানীকে ডেখিয়ে ডিন হাপনি নবাব—কোম্পানীর চালাকি নবাবের সহিট্ চলিবে না।

মীরকাশিম ॥ পাটনায় এলিস আমার শাসন মানে না—কোম্পানীর সেপাই নবাব-সৈন্যের অপমান করে—কোম্পানীর অন্যায় কাজে বাধা দিলে তারা ধ'রে নিয়ে কয়েদ করে—পীড়ন করে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস

সাহেব সেদিন মুঙ্গেরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর প্রজার ওপর অত্যাচার হবেনা—দেশে শান্তি হবে। কিন্তু আবার কোম্পানী দূত পাঠিয়েছেন অমিয়ট আর হে সাহেবকে—কি মতলবে তা তাঁরাই জানেন!

গুরগিন খাঁ ॥ উহাডের মটলব ভাল নয়—তাহা হইলে কাল নবাবের নাচের মজলিসের নিমন্ত্রণ প্রট্যাখ্যান করিট না।

রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুর্লভ ॥ অমিয়ট আর হে সাহেব নবাবের দর্শনপ্রাথী।

গুরগিন খাঁ ॥ টাহারা ডরবারে হাসিটেছেন—ভাল করিটেছেন—কিণ্টু টাহাদের সাবটান করিয়া ডিলে ভাল হইট. নবাবের হুকুম না মানিলে এবার হামি টাহাডের উচিট্ শিক্ষা দিব।

রায়দুর্লভ ॥ গোলযোগ! গোলযোগ! চারিদিকে গোলযোগ! দু'দিন শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম—হ'ল না! দেখে শুনে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ছেড়ে ছুড়ে কাশী চ'লে যাই।

জগৎশেঠ ॥ কেন? কি হ'ল!

রায়দুর্লভ ॥ আর বলেন কেন শেঠজী। এখানে গুরগিন খাঁ ব'লছে 'দেখেঙ্গা' ওখানে অমিয়ট সাহেব ব'লছেন 'দেখেঙ্গা'। 'শোনেঙ্গা' কেউ ব'লছে না। আমাদের হ'য়েছে—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!" জনাব, আমি আর শেঠজী—আমাদের চেয়ে আপনার বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। বয়েস হ'য়েছে। আর কি আমাদের হৈ হৈ রৈ রৈ শোভা পায়। আপনি এখন আরাম করুন—আয়েস করুন—আমাদের বয়েস হ'য়েছে আমরা একটু পরকালের চিন্তা করি। না না জনাব, 'না' বলবেন না—অমিয়ট আর হে সাহেব আসছে—তারা যা চায় তা নিক্ না—নবাবী তো আর চাইছে না। গোলমাল মিটে যাক্—এ কাঠ-খোট্টা দেশ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ চলুন—মুর্শিদাবাদ যে কাঁদছে!

মীরকাশিম ॥ মুর্শিদাবাদ! রাজা রায়দুর্লভ, শ্রেষ্ঠী মহাতাপচাঁদ, বিচক্ষণ রাজবল্লভ, শুনে আশ্বস্ত হ'লাম—মুর্শিদাবাদের জন্য আপনাদের প্রাণ আজ কাঁদছে! কিন্তু মুর্শিদাবাদকে শ্মশান ক'রে সেই তমসাবৃত নগরীর পথে পথে সিরাজের শবদেহ নিয়ে আপনারা প্রেতের যে তাণ্ডব ক'রেছিলেন তাও আমি দেখেছি। রাজা রায়-দুর্লভ! জগৎশেঠ! শুধু নিজেদের স্বার্থ চিন্তাই ক'রেছেন—দেশের কথা একবারও ভাবছেন না। আপনারা কি এখনও লক্ষ্য ক'রছেন না, কোম্পানী এখন শুধু বাণিজ্যও ক'রতে চায়না, বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যেও কোম্পানী আর খুশি নয়, এখন তাদের লক্ষ্য বাংলার মসনদ? শোষণ সম্পূর্ণ—এবার তারা চায় শাসন! রায়দুর্লভ!

জগৎশেঠ! ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে আমরা অন্ধ হ'য়ে এতদিন তা বুঝতে পারিনি,—আজ বুঝতে পেরেও কি তার প্রতিকার ক'রব না? শেষে—শেষে আমাদেরই হাতে উঠবে পরাধীনতার প্রথম শৃঙ্খল! আমাদেরই জীবনে প্রথম ডুববে—আমাদের এতকালের স্বাধীনতার সূর্য্য! জগৎশেঠ! রায়দুর্লভ! ভেবে দেখুন—একটিবার ভেবে দেখুন, জাতির ইতিহাসে, দেশের ইতিহাসে কী প্রতিমূর্তিতে আমাদের বিচরণ ক'রতে হবে চিরকাল! সে ইতিহাস পাঠ ক'রে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের কী আখ্যায় অভিহিত ক'রবে, কী অভিশাপ দেবে—একটিবার ভেবে দেখুন—একটিবার ভেবে দেখুন!

জগৎশেঠ ॥ আমরা কি করতে পারি জনাব?

মীরকাশিম ॥ আপনি ধনকুবের, বাংলার ঐশ্বর্য্য আপনারই ঘরে বাঁধা, অর্থে কী না হয়? আপনি কী না ক'রতে পারেন!

জগৎশেঠ ॥ নবাব সরকারে এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা আমার পাওনা। কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

মীরকাশিম ॥ হুঁ। বাংলা আপনার জন্মভূমি নয়, দেশ নয়। আপনাদের দেশ মাড়োয়ার, না?

জগৎশেঠ ॥ সে তো কোনো কথা নয়, এ হচ্ছে ব্যবসার কথা—লেনদেনের কথা কারবারের কথা।

মীরকাশিম ॥ রাজা রায়দুর্লভ! আপনি তো বাঙালী!

রায়দুর্লভ ॥ একশ'বার! লক্ষবার! সোনার বাংলা আমার জন্মভূমি। আজ যদি বয়েস থাকতো—দেখতেন, আমি কখনও পিছ-পা হ'তাম না। কিন্তু বয়েস হ'য়ে পড়েছে ভেবেছিলাম কালীঘাটে গঙ্গাতীরে

মীরকাশিম ॥ ও! ক'লকাতায় বলুন!

রায়দুর্লভ ॥ হ্যাঁ, কালীঘাটকে এখন ক'লকাতাই ব'লছে। ঐ পীঠস্থানে ব'সে এ বয়সে হিন্দুর যা করণীয়—একভাল তো আর সে সব—

মীরকাশিম ॥ ও! এতকাল বুঝি মনেই ছিল না যে আপনি হিন্দু!

রায়দুর্লভ ॥ তা কতকটা তাই বটে!

মীরকাশিম ॥ আমিয়ট আর হে সাহেব আপনাকে ব'লে দিয়েছে আপনি হিন্দু, না? তবে আপনার মনে প'ড়ে গেল আপনি হিন্দু, কি বলেন?

নজাফ খাঁর পুনঃ প্রবেশ

নজাফ খাঁ ॥ জনাব! গুরুতর সংবাদ!

মীরকাশিম ॥—এখানে ততোধিক।

নজাফ খাঁ ॥ সে কি জনাব?

মীরকাশিম ॥ (জগৎশেঠকে দেখাইয়া) ওঁর হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে, উনি বাংলায় জন্ম নেননি, এখানে শুধু একটা লেনদেনের কারবার রেখেছেন।

(রায়দুর্লভকে দেখাইয়া) অমিয়ট সাহেব ব'লেছেন উনি হিন্দু এবং হে সাহেব ওঁর কানে কানে এ-কথাও বোধ হয় ব'লে দিয়েছেন আমি মুসলমান ! এতকাল এ-সব আমরা ভুলে ব'সেছিলাম হঠাৎ আজ এ-সব বেরিয়ে প'ড়ল। বেইমানি করবার সময় এ-সব কথা কারো মনে পড়েনি—মনে প'ড়ল কখন জানো? যখন দেশের জন্য এদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রলাম—তখন। শুনুন, সাহায্য ক'রতে না চান ক'রবেন না, শুধু একটা প্রার্থনা—আর বেইমানি ক'রবেন না। অন্ধকার রাত্রে হতাশ হ'য়ে যখন আকাশের পানে চাই, কেবলি শুনি সিরাজের অন্তিম হাহাকার—'বেইমানি ! বেইমানি !'

নজাফ খাঁ ॥ জনাব !

মীরকাশিম ॥ কি ?

নজাফ খাঁ ॥ তকী খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছেন—ক'লকাতা থেকে কোম্পানীর ত্রিশখানা নৌকা বাণিজ্যের নিশান উড়িয়ে মুঙ্গেরে এসে পেঁছেছে। বাণিজ্যের ছলে ঐ সব নৌকা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হ'য়ে এলিসের সাহায্যে পাটনা যাচ্ছে। খানাতল্লাসী করবার জন্য তকী খাঁ ফৌজ নিয়ে বহর আটক ক'রেছেন।

মীরকাশিম ॥ কে আছিস ! ইংরাজ দূত অমিয়ট আর হে ! (দৌবারিক যাইতেছিল তাহাকে নিষেধ করিয়া) না, নজাফ খাঁ, তুমি নিজে যাও। নিয়ে এস। কিন্তু নৌকো আটকের সংবাদ গোপন রেখো।

নজাফ খাঁর প্রস্থান

রায়দুর্লভ ॥ এ সংবাদ কি আর এতক্ষণ গোপন আছে ?

মীরকাশিম ॥ না থাকাই সম্ভব। রায়দুর্লভ ! আপনার সেই লাল-পাঞ্জাটার নম্বর কত ছিল মনে আছে ?

রায়দুর্লভ ॥ কোম্পানীর পাঞ্জা ! তোবা ! তোবা ! সে আমি কবে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি।

মীরকাশিম ॥ আমি যে লাল-পাঞ্জাটা পেয়েছিলাম তার নম্বর ছিল, মনে পড়ছে না, আপনার মনে পড়েছে জগৎশেঠ ?

জগৎশেঠ ॥ না জনাব !

মীরকাশিম ॥ এই—একশ'র মধ্যেই ছিল। এটার নম্বর দেখলাম ত্রিশ-হাজার কত। এই তিন বছরেই এই ! ক'লকাতায় কি লাল-পাঞ্জারও একটা ফ্যাক্টরী ব'সেছে জগৎশেঠ ?

রায়দুর্লভ ॥ অদ্ভুত জাত এই ইংরেজ।

মীরকাশিম ॥ ওদের কি দোষ ? দোষ আমাদের। ওদের জাতীয়তা আছে, দেশাত্মবোধ আছে, বৃহত্তর জীবনের কল্পনা আছে আমাদের আজ তা নেই। ক্ষমতা প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য চাওয়াটা পাপ নয়, হারানো পাপ ! আমরা সেই পাপ ক'রেছি এবং করছি ! কিন্তু আর কতকাল ? কতকাল ?

নজাফ খাঁ সহ অমিয়ট আর হে সাহেবের প্রবেশ।

অমিয়ট ॥
হে ॥ } বণ্ডেগি জনাব!

জগৎশেঠ ॥ (সাহেবদের কাছে আসিয়া) বন্দেগি—বন্দেগি সাহেব!

অমিয়ট ॥ এই যে! শেঠজী! হাঁ, হাপনার কঠাও বলিব। জনাব! হাপনি জগটশেঠডের মুর্শিডাবাড হইটে ঢরিয়া হানিয়েছেন! উহারা মানী লোক—ঢনী লোক, গোটা বাংলাটা কিনিয়া লইটে পারেন। এই কাজটা কি হাপনার উচিট হইয়াছে।

গুরগিন খাঁ ॥ উচিট হয় নাই কহিবেন না। বলিবেন শেঠজীকে এখানে ঢরিয়া রাখাটে হাপনার বহুট্ ডরড হইটেছে।

মীরকাশিম ॥ ওঁরা আমার প্রজা। রাজ-কার্য্যের জন্য আমি ওঁদের মুঙ্গেরে এনেছি—এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা তোমাদের অনধিকার চর্চা! (কিছুক্ষণ পরে) আমার এই প্রজার জন্য তোমাদের যে দরদ দেখছি সাহেব, আমার কোটি কোটি প্রজার জন্য তো সে দরদ দেখিনা! প্রতি পরগণায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি কুঠিতে, তোমাদের কোম্পানীর গোমস্তারা নুন, চাল, চিনি, তামাক, আফিং—আর কত ব'লব—জোর জবরদস্তিতে কিনছে—বিক্রী ক'রছে। অত্যাচার ক'রে পীড়ন ক'রছে, প্রহার ক'রে প্রজাদের কাছ থেকে এক টাকার মাল পাঁচ টাকায় বিক্রী ক'রছে, চার টাকার মাল এক টাকায় কিনছে। আমার প্রজাদের জন্য তখন তো মহাশয়দের দরদ দেখি না।

হে ॥ ডরড যদি না ডেখিয়া থাকেন, জানিয়া রাখিবেন পীড়ন হয় নাই। পীড়ন ডেখিলে হামারা কখনও সহিটে পারি না।

অমিয়ট ॥ পীড়ন! অট্যাচার। হামরা করিব! হামরা ইহা কখনো স্বীকার করিব না।

মীরকাশিম ॥ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব—তোমাদের গভর্ণর নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অমিয়ট ॥ উহারা হাপনার নুন খাইয়াছেন—গুণ গাহিটেছেন।

নজাফ খাঁ ॥ বটে! নুন খাইয়াছেন। বাংলার নুন তোমরা কে না খাইতেছ সাহেব?

গুরগিন খাঁ ॥ বাংলার নুন বহুট মিঠা হাছে।

অমিয়ট ॥ টর্ক করিবার সময় হামাদের নাই। হামাদের এখান কলিকাটা যাইটে হইবে। হাপনার টিন ডাবী, হামাদের এগার ডাবী, বহুট্ বাট্ চিট্ হইল কোন ফল প্রসব করিল না।

হে ॥ বিয়োগ না করিলে কোন ফল প্রসব করিবে না। হামাদের এগার ডাবী আপনার টিন ডাবী। বিয়োগ করিলে হাপনার ডাবী রহিল না, হামাদের

আট ডাবী রহিয়াই গেল।

মীরকাশিম ॥ আমার দাবী তোমরা মানবে না সাহেব ?

অমিয়ট ॥ মানবার মটো ডাবী উহা নহে। হামাদের ডাবী হাপনি মানবেন কিনা শেষ কঠা বলিয়া দিন !

মীরকাশিম ॥ এ তোমাদের নতুন দাবী। নিত্য নতুন দাবী আমি মানতে পারি না। ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব এই সেদিন এসে চুক্তি ক'রে গেলেন শতকরা নয় টাকা হারে দেশী-বাণিজ্যে সকলে শুল্ক প্রদান ক'রবে, আর দস্তক আমার কর্মচারী আর কোম্পানীর কর্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হবে না—তোমরা সে চুক্তি না মেনে—অবাধ বাণিজ্য ক'রছ। বাদশাহী ফার্মানেরও ব্যাভিচার ক'রছ।

অমিয়ট ॥ সে সব কঠা হামরা বিবেচনা করিব—হাগে হাপনি হাপনার প্রজার কাছে মাশুল আডায় করুন।

মীরকাশিম ॥ তোমরা মাশুল দেবেনা—আর মাশুল দিয়ে মরবে আমারই প্রজা ? কেন সাহেব ? তোমরা মাশুল না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি ঘোষণা ক'রেছি আমার রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাভিচারে পৃথিবীর কোনো দেশে যা হয় না—হয়নি- লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার ক'রেও আমি তাই করেছি—বাংলা থেকে ব্যাণিজ্যের শুল্কই তুলে দিয়েছি ! ভর বাণিজ্য।

হে ॥ হাপনি নিজের ক্ষতি করিয়া হামাদের ক্ষটি করিটেছেন।

গুর্গিন খাঁ ॥ নবাবের যাহা খুশী টাহা করিটে পারেন। হাপনারা বলিবার কে ?

অমিয়ট ॥ মনে রাখিবেন হামরাই হাপনাকে নবাবী ডিয়াছি।

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ নবাবীই ক'রছি—গোলামী ক'রব না সাহেব !

হে ॥ কিন্তু বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হইলে বাট্য হইয়া হামাদের হাপনার বিরুদ্ধাচরণ করিটে হইবে।

মীরকাশিম ॥ জানি। সাহেব ! তোমাদের স্বার্থের হানি হ'লে আমার নবাবী কেড়ে নিয়ে এই শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা শোষণের পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রতে, বাংলার মসনদে আবার বসাবে ক্লাইভের সেই গর্দভকে। কিম্বা ব'সবে তোমরা নিজে। সে আয়োজনও যে হচ্ছে, সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি মসনদে আছি বাংলার দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ ক'রতে আর তোমরা পারবে না—সাবধান।

হে ॥ ডেখিটেছি হাপনি যুদ্ধই চান—হাপনি যুদ্ধই চান, হামরা কিণ্টু শাণ্টিই চাহিয়াছিলাম।

মীরকাশিম ॥ শান্তিই চান ! বটে ! সেই জন্যই বুঝি—নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ ॥ জনাব !

মীরকাশিম ॥ তকী খাঁর খবর নাও—

নজাফ খাঁর প্রস্থান

অমিয়ট ॥ ডেখিটেছি হামরা আসিয়া ভালো করি নাই। বেশ। সেলাম। হামরা চলিয়া যাইতেছি!

মীরকাশিম ॥ দাঁড়াও। যেতে পার—একজন। আর একজনকে এখানে জামিন থাকতে হবে।

অমিয়ট ॥ জামিন! কিসের হাবার জামিন।

মীরকাশিম ॥ তোমাদের ত্রিশখানা নৌকা ক'লকাতা থেকে পাটনা যাচ্ছে।

হে ॥ ত্রিশখানা কেন, টিনশখানাও যায়। বাণিজ্য করে।

মীরকাশিম ॥ কিন্তু আমার সংবাদ, এসব নৌকায় গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে—পাটনায় এলিসের কাছে।

অমিয়ট ॥ হাপনার যাহা খুশি বলিটে পারেন।

মীরকাশিম ॥ নৌকা আটক করা হ'য়েছে। খানাতল্লাস হচ্ছে। খানাতল্লাসের ফল না জানা পর্য্যন্ত তোমাদের একজনকে জামিন থাকতে হবে।

অমিয়ট ॥ বেশ। হে ঠাকিবে। হামারা কলিকাটা কাউন্সিলে রিপোর্ট করিটেছি। কিন্টু ইহার ফল ভাল হইল না।

গুর্‌গিন খাঁ ॥ শোনো—টোমার কোম্পানীকে বলিয়া ডিটে পারে, যে কেহ হামাডের একটা আঘাট করিবে, হামরা টাহার খুলিটে দুইটি হাঘাট হানিব। যাহারা হামাডের শক্টি পরীক্ষা করিটে ইচ্ছুক টাহারা চেস্টা করিটে পারে।

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ ॥ জনাব।

মীরকাশিম ॥ সংবাদ—তকী খাঁর সংবাদ!

নজাফ খাঁ ॥ নৌকা বোঝাই গুলী গোলা বন্দুক!

মীরকাশিম ॥ বাজেয়াপ্ত কর। কি সাহেব! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমারই রাজ্য-রক্ষা করার লিখিত-চুক্তি ক'রে শেষে আমারই রাজ্যে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! এই রাজদ্রোহ! তোমাদের পেনালকোডে এই রাজদ্রোহের কি শাস্তি সাহেব?—

আরাব খাঁর প্রবেশ

আরাব খাঁ ॥ জনাব! পাটনায় সর্বনাশ! দুর্বৃত্ত এলিস—

মীরকাশিম ॥ দুর্বৃত্ত এলিস? পাটনা আক্রমণ করেছে—

আরাব খাঁ ॥ অতর্কিতভাবে আক্রমণ ক'রে দুর্গ দখল করেছে। নিরীহ নর নারীকে নির্বিচারে হত্যা ক'রেছে। অবাধ হত্যায়, লুঠতরাজে, অগ্নিদাহে—পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দন-রোল উঠেছে।

মীরকাশিম ॥ শুধু পাটনায় নয়, আরাব, শুধু পাটনায় নয়—বাংলা-বিহার উড়িষ্যার প্রতি শান্তিকামী নিরস্ত্র নিরীহ নর-নারীর বুক ফাটা কান্নার

রোল আকাশে ধ্বনি তুলে আজ খোদাতালার কাছে বেদনার আরজি পেশ ক'রে প্রতিকার প্রার্থনা ক'রছেঃ কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর—অত্যাচার অবসানের এই পুণ্যজেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন করবার জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়-মুঙ্গেরে বাংলা-বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর; সমগ্র ইংরাজ ব্যবসায়ীকে বন্দী ক'রে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের কুঠি

য়্যাডামস্ ॥ হার হাটিক বিলম্ব করিব না। হামরা সমষ্ট সডস্যগণ এক সাঠ হইয়া হাপনার পাক্কা বণ্ডবষ্ট করিয়া ডিবে।

মীরজাফর ॥ কিন্তু মুঙ্গেরে যে সন্ধি-পত্র হয়েছে তার কি হবে?

য়্যাডামস্ ॥ আমিয়ট আর হে সাহেব টাহার বণ্ডবষ্ট করিবে।

কার্ণাক ॥ মীরকাশিমের সঙ্গে যাহাটে যুদ্ধ বাঢে হামরা টাহার সমষ্ট বণ্ডবষ্ট করিয়াছে। বেগম সাহেবা এ বিষয়ে হামাদের সব প্রকার সাহায্য করিটেছেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী Lady হাছেন। হাপনি শুধু টাহার সল্লা লইয়া কার্য্য করিবেন।

মীরজাফর ॥ বেগম—এখনো বুঝে দেখ—

মণিবেগম ॥ কি প্রলাপ ব'কছ। সিংহাসনের জন্য না হোক, অন্ততঃ বেইমানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবার তোমায় বাংলার তক্তে ব'স্‌তে হবে।

মীরজাফর ॥ বেইমান! বেইমান! বাংলায় কে বেইমান নয় বেগম? বাংলার সবাই বেইমান। আজ রায়দুর্লভ চায় আবার আমি নবাব হই, কিন্তু রায়দুর্লভই কি বেইমানি ক'রে মীরকাশিমকে কোম্পানীর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়নি? জগৎশেঠ আজ আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত—কিন্তু কোম্পানীর দেনা দিতে না পেরে আমি কি জগৎশেঠের কাছে অর্থ-ভিক্ষা ক'রিনি? আজ রাজা রাজবল্লভ আবার আমাকে সাহায্য ক'রতে চায়; কেননা কাশিম আলি কোম্পানীর সাহায্যে তাকে বাণিজ্য করবার সুযোগ দিচ্ছে না—তার স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত হচ্ছে। নবাবী নিয়ে আমাকে তো আবার কোম্পানীর গোলাম হ'য়েই থাকতে হবে?

মণিবেগম ॥ তোমায় কিছু ক'রতে হবে না, আমি কি করি, তাই দেখ।

নবাবের বেগম হয়ে আজ আমি ইংরেজ দরবারে এসেছি—ভিক্ষে ক'রে নবাবী ফিরিয়ে নেবার জন্য। আমার ইজ্জত নেই, মান নেই, মর্য্যাদা নেই—আবার তোমায় সিংহাসনে দেখ্‌ব, একমাত্র এই আমার বাসনা। সাহেবদের কথা দাও —ওঁরা যা ব'লবেন তাইতেই তুমি সম্মত।

মীরজাফর ॥ সিরাজের বিরুদ্ধে সন্ধির সময় এ'রা যে কথা ব'লেছিলেন আমি সেই কথাতেই সম্মত ছিলাম। কিন্তু কর আদায় হ'ল না—কোম্পানীর তঙ্কা দিতে পারলাম না, এই অপরাধে আমার পদচ্যুতি হ'ল। মীরকাশিম কোম্পানীর তঙ্কা কড়া-গণ্ডায় শোধ ক'রেছে। এখন কোম্পানীর কি ক'রে আবার তার কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আমায় দেবে বল?

মণিবেগম ॥ প্রজার মুখ চেয়ে মীরকাশিম কোম্পানীর কাজে বাধা দিচ্ছে

মীরজাফর ॥ কাজেই প্রজারা তার পক্ষে।

মণিবেগম ॥ কিন্তু প্রজারা তো যুদ্ধ ক'রবে না। যারা যুদ্ধ করবে অর্থ দিয়ে তাদের হাত ক'রতে হবে। মীরকাশিম মনে ক'রছে বিদেশী সেনানায়কদের সাহায্যে সে কোম্পানীর উচ্ছেদ ক'রবে, কিন্তু এ কথা ভাবছে না যে বিদেশী সেনানায়কেরা অর্থের লোভে তার সেনানায়ক।

মীরজাফর ॥ মীরকাশিমও তো কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করতে পারে।

মণিবেগম ॥ সে সন্ধি হবে না—আমি তার ব্যবস্থা ক'রেছি। মীরকাশিম কোম্পানীর দেনা শোধ করবার জন্য দেশের রাজা, জমিদার, হিন্দু মুসলমান সকলের কাছ থেকে সমান অত্যাচার ক'রে কর আদায় ক'রেছে। তারা কেউই তার উপর সন্তুষ্ট নয়। তবু যারা মীরকাশিমের পক্ষে আছে, তাদের মীরকাশিমের শত্রু করবার জন্য—আমার চর—তাদের অর্থের প্রলোভন দেখাচ্ছে। গুর্‌গিন খাঁ, সমরু, মার্কার সকলে মীরকাশিমের বিপক্ষে হবে। তুমি অমত ক'রো না—মীরকাশিমকে শাস্তি দিতে যা কিছু প্রয়োজন আমি তা ক'রবই।

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ Here is an Oracle! We must obey her!

মণিবেগম ॥ সাহেব, আমার একটা কথা রাখবে?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ By all means। কি করিটে হবে বলিয়া ডিন্‌—

মণিবেগম ॥ খোজা পিদ্রুস্‌কে কয়েদ ক'রে তোমরা ভুল করেছ সাহেব।

কার্ণাক ॥ সেটা হামাদের দুষমন। সে কাশিম আলির হাডমী আছে। টার ভাই গুর্‌গিন খাঁ নবাবের General আছে।

মণিবেগম ॥ সাহেব, এতদিন বাংলায় থেকেও দেখ্‌ছি বাংলার হালচাল বুঝতে পারলে না! বাংলায় কে কার পক্ষ? যখন যেখানে যার সুবিধে সে সেদিকে যাচ্ছে। সবাই সুবিধে খুঁজছে। যখন কাশিম আলিকে নবাব ক'রেছিলে খোজা পিদ্রুস্‌ দেখল নবাবের পক্ষে সায় দেওয়াই সুবিধে, সেই পক্ষেই সে গেল। আবার একটা গোলমাল বাধলেই সে আমাদের পক্ষে আসবে।

য়্যাডামস্‌ ॥ ও হামাদের কী কাজে লাগিবে ?

মণিবেগম ॥ গুরগিন খাঁ ওর ভাই। সে কথা ভুলে যাও কেন সাহেব? ওকে হাত করে আমরা গুরগিনকে হাত ক'রব। সমস্ত আর্মানী সৈন্য হাত ক'রব।

মীরজাফর ॥ তা বোধ হয় হ'তে পারে।

কার্ণাক ॥ Yes, Yes, Blood is thicker than water.

য়্যাডামস্‌। উট্টম কঠা! Governor হাসিবার পূর্বে পিদ্রুস্‌কে হাপনার কাছে হাজির করিয়া দিটেছে—আপনি টাহাকে কাম বাট্‌লাইয়া দিন। Major Carnac, will you kindly—

কার্ণাক ॥ Most gladly.— প্রস্থান

মীরজাফর ॥ তোমরা তো সাহেব আমাকে মসনদ দিতে চাইছ, তোমাদের ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যে বেঁকে ব'স্‌বে।

মণিবেগম ॥ আ—সে ওঁরা বুঝবেন। তুমি ভাবছ কেন?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ বেগম সাহেবা ঠিক বাট বলিয়াছেন। হামরা majority হাছে—I mean, ডলে ভারী হাছে। গভর্ণরকে outvote করিব। কেন করিব জানেন? মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে খাটির করিল—হামাদের রস্তা ডেখাইল। হাপনি হামাদের পেট ভরাইবেন—হাপনার ভি পেট ভরিবে—

মণিবেগম ॥ এই সোজা কথাটা তুমি কেন বুঝছ না আমি বুঝতে পারছি না।

পিদ্রুস্‌ সহ কার্ণাকের প্রবেশ

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ খোজা পিদ্রুস্‌ টোমার ফাঁসী।

পিদ্রুস্‌ ॥ ফাঁসী হইবে—Father Abraham! হামি কি ডোষ করিলো—What these Christians are! হামার কোন ডোষ নাই, ফাঁসী কেন হইবে? What have I done?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ টুমি নবাব মীরকাশিমের হাদমী হাছে—spy হাছে, A dog of a spy!

পিদ্রুস্‌ ॥ টুমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট হামাকে মীরকাশিমের কাজ করিতে বোলিল হামি মীরকাশিমের কাম করিলো। উহাটে হামার কি ডোষ হইল? Tell me that। ডোষ হইলে Vansittart কো পহিলে ঝুলাও—পিছে হামাকে ঝুলাও; হামরা এক সাথে ঝুলিবে। কুছ্‌ ডুখ্‌ঃ নাই।

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ হামরা নবাব মীরকাশিমের বডলে মীরজাফর খাঁকে নবাব করিল—

ম ৬৫

পিদ্রূস্ ॥ Very good—বহুট আচ্ছা—হামিভি মীরকাশিমকে ছোড়িয়ে নবাব মীরজাফরের কাম করিবে। sure.

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Right you are! মণিবেগমের অনুরোঢে হামরা টোমাকে pardon করিটে পারে—

পিদ্রূস্ ॥ মণিবেগম জিন্ডাবাড!

মণিবেগম ॥ খোজা পিদ্রূস্! গুরগিন খাঁ তোমার ভাই?—

পিদ্রূস্ ॥ ভাইভি আছে—ভাই না ভি আছে।

মণিবেগম ॥ ভাই! আবার ভাই না! মানে?

পিদ্রূস্ ॥ হামাকে যখন খাতির করিবে—টখন ভাই হাছে, by all means; যখন করিবে না—টখন ডুষমন হাছে— sure enough.

মণিবেগম ॥ এখন কি আছে?

পিদ্রূস্ ॥ এখন কি হাছে এখন হামি কি করিয়া বলিবে? ঘড়ি ঘড়ি টুমাদের মেজাজ বড্‌লাইয়া যায় উহারভি, হামারভি। We are always changing, aren't we? হামরা সব রোজগার করিটে হাসিয়াছে, my friends.

মণিবেগম ॥ তুমি আমাদের পক্ষে আছ?

পিদ্রূস্ ॥ হালবাট্ হাছে। যে হামাকে পুষিবে—হামি টাহার পোষ কুট্টা হাছে।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ মীরকাশিমভি পুষিটেছে—

পিদ্রূস্ ॥ ডাল ভাট ডিয়া পুষিটেছে। বেগম সাহেবা হামাকে ঘিউ ভাট ডিয়া পুষিবেন!

মণিবেগম ॥ নিশ্চয়। পিদ্রূস্ গুরগিনকে হাত ক'রতে হবে।

পিদ্রূস্ ॥ টাকা ছোড়িলে হাট হইবে, টাকা না ছোড়িলে বেহাট হইবে। হামার Father বলিয়া গিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ কি বলিয়াছে?

পিদ্রূস্ ॥ মরিবার সময় old man কিছু রাখিয়া যাইটে পারিল না—কেবল এই বুদ্ধিটা উইল করিয়া দিল ঃ পিদ্রূস্! গুরগিন! বেগর রুপেয়া কাহারও সাঠ বাট্ কহিবি না!....হামরা কি করিবে।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ ডেখ এ কামটা পাকা করিয়া করিটে পারিলে হামি গভর্ণরকে বলিয়া টোমাকে খালাস করিয়া ডিবে।

মণিবেগম ॥ আর আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

পিদ্রূস্ ॥ ঠিক হইল। যেই ডিন পিদ্রূস্ টাকা পাইবে ওই ডিন পিদ্রূস্ কাজে লাগিয়া যাইবে, Your faithful servant from that day onward. বিস্‌ওয়াসি বৃট্য হইবে।

য়্যাডামস্ ॥ All right—you wait outside—টোম বাহার ঠারো।—বাগো মট্।

পিদ্রুস্ ॥ টাকা না লইয়া বাগিবে সে বান্ডা হামি না আছে। প্রস্থান

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস প্রবেশ করিল

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Good morning, Ex-Nawab. শুনিল হাপনি কারবালা যাইটে চাহিয়াছেন। সে খুব ভালো কঠা হাছে। বুড়া হইয়াছেন, এখন ঢর্ম-কর্ম না করিলে উদ্ধার হইবে কিরূপে?

মীরজাফর ॥ হ্যাঁ, সাহেব তাই কর—আমায় কারবালায় পাঠিয়ে দাও। লক্ষ লক্ষ টাকা এই হাতে তোমাদের দিয়েছি। তোমরা যথেচ্ছা খেয়েছ, পরেছ, কুড়িয়ে দেশে নিয়ে গেছ—বেইমানের তুলনা দিতে মীরজাফরের নাম ছাড়া অন্য কেউ জানেনা—সেই আমি—আমার মাসিক ভাতা—আজ দু'হাজার টাকা!

ভ্যান্সিটার্ট। টা হামারা কি করিব—হাপনি হামাদের ডেনা শোঢ করিতে পারিলেন না—হাপনাকে সুবেডারী হইটে সরাইটে হইল। হাপনার ভাটা হাপনারই জামাটা বণ্ডবণ্ট করিয়া ডিয়াছেন। এখন হামরা নবাব মীরকাশিম আলির মট না লইয়া হাপনার ভাটা বাড়াইটে পারে না।

মীরজাফর ॥ কাশিম আলি, কাশিম আলি—বড় বিশ্বাস ক'রে তাকে আমার প্রতিনিধি ক'রেছিলুম—তার প্রতিদানে আমাকে নবাবী থেকে বরখাস্ত করে সে আজ নবাব—আর আমি তার অনুগ্রহপ্রার্থী—বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!

মণিবেগম ॥ সাহেব, তোমরা কি এখনো মনে কর কাশিম আলি তোমাদের বন্ধু? তাকে দিয়ে তোমরা তোমাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়ে নেবে? সে তোমাদের দেনা শোধ ক'রেছে—কেন তা জান?

ভ্যান্সিটার্ট ॥ কোম্পানীর টাকা কোম্পানী পাইয়াছে আউর কিছু জানিবার কাম হামাদের নাই। হামরা বাণিজ্য করিটে হাসিয়াছে—বাণিজ্য করিটে পারিলেই হামরা খুশি ঠাকিবে।

মণিবেগম ॥ মীরকাশিমের রাজত্বে আর সে আশা ক'রোনা সাহেব। বাণিজ্যের সুযোগ তো পাবেই না—এ দেশে বাস ক'রতে পার কিনা তাও সন্দেহ।

য়্যাডামস্ ॥ Right—বেগম ঠিক বাট্ বলিটেছেন। হামরাই উহাকে নবাবী ডিয়াছে, এখন ও হামাডের ডুষমন হইয়াছে—

ভ্যান্সিটার্ট ॥ We should have adhered to the Treaty of Monghyr.

য়্যাডামস্ ॥ হাপনি উহাকে সাঁন্ধ বলিটে চান—What do you mean? হামাডের বাণিজ্যের কট ক্ষটি হইল।

কার্ণাক ॥ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অঢিকার কোম্পানীর নোকরদের আছে। That has been decided by the majority in the counsil.

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ Ex-Nawab হাপনি ডুঃখ করিবেন না। অমিয়ট হার হে সাহেবকে দূট করিয়া হামরা মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছি। টাহারা ফিরিয়া আসিলেই ঐ ডুষমনকে এক ডফে হামরা ডেখিয়া লইব। হামরা বাণিজ্য করিটে এ দেশে হাসিয়াছে—বাণিজ্যের ক্ষটি হামরা সহিটে পারেনা।

মণিবেগম ॥ আর কি দেখবে সাহেব। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে ব'লে সব গোরা আদমিদের মীরকাশিম তার সেনানায়ক গোলন্দাজ ক'রেছে। মুর্শিদাবাদে তোমাদের চোখের ওপর না থেকে মুঙ্গেরে বসে সল্লাপরামর্শ কর্‌ছে। যাতে আর বেইমানি ক'রতে না পারে—তাই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, সকলকে মুঙ্গেরে আটক রেখেছে। এখনও তোমাদের গভর্ণর মনে করেন, মীরকাশিমের রাজত্বে কোম্পানী সুখে বাণিজ্য ক'রবেন ?

কার্ণকি ॥ Begam describes our position very clearly.

য়্যাডাম্‌স্‌। ডেখিটেছি ঘটী জাতি হইয়াও ডেশের হালচাল হাপনি ভাল বুঝিয়াছেন। অমিয়ট হার হে সাহেব মারফট্‌ হামরা যে প্রস্টাব পাঠাইয়াছি টাহাটে সম্মট না হইলে হামরা নবাবকে আক্রমণ করিব।

ভ্যান্সিটার্ট ॥ But that will not be fair,

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ Why please ?

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Because নবাবের অটিকারে হামরা হস্টক্ষেপ না করিলে হামাদের সাঠে ঝগড়া করিবার কোন মটলব মীরকাশিমের নাই।

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ But he has done it.

কার্ণক ॥ He had no business to abolish the duty on inland-trade.

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ টাহার প্রজাডের কেন কোম্পানীর সমান করিয়া বাণিজ্যের সুযোগ ডিল। কোন এক্টিয়ার নাই।

নন্দকুমার ॥ এইবার আপনি কিছু বলুন !

মীরজাফর ॥ গভর্ণর সাহেব কি ব'লছেন ?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ গভর্ণর সাহেব বলিটে চান ডেশ হইটে বাণিজ্যের শুল্কটা একেবারে টুলিয়া ডিল—কালা গোরা সব এক করিয়া ডিল—টঠাপি নবাব মীরকাশিম—হামাদের ডুষমন নয়।

মীরজাফর ॥ বরাত সাহেব, আমাদের বরাত। কোম্পানীর জন্যে এত ক'রেও আজ আমি রাজ্যচ্যুত—আর কোম্পানীর সঙ্গে দুষমনি ক'রেও মীরকাশিম আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার !

হেষ্টিংস ॥ The Nawab is surely within his rights to abolish trade-duty in his own territory,

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Can you produce a single instance of his molesting us in a single article of commerce ?

মণিবেগম ॥ সাহেব নিশ্চয়ই কাশিম আলির পক্ষে ওকালতি ক'রছেন ?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ সলপিটার সম্বন্ধে এলিস সাহেব যে complain করিয়াছে, উহার কি হইল ?

ভ্যান্সিটার্ট ॥ But those are aggravated complaints.

মণিবেগম ॥ গভর্ণর সাহেব কাশিম আলির জন্য এ ওকালতি কেন ক'রছেন, আপনারা না জানলেও আমরা জানি—

কার্ণাক ॥ হামরাও কিঞ্চিট জানি। অমিয়ট উহা নোট করিয়া রাখিয়াছে।

হেষ্টিংস ॥ What do you mean ?

কার্ণাক ॥ I mean what I say It is believed—

হেষ্টিংস ॥ Believed what ?

কার্ণাক ॥ That Mr. Vansittart got seven lakhs by his visit to Monghyr.

ভ্যান্সিটার্ট ॥ What !

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ And that's a good fee for any d—d—advocate.

হেষ্টিংস ॥ Withdraw, otherwise—

য়্যাডাম্‌স্‌ এবং কার্ণাক ॥ Rather we would repeat.

নন্দকুমার ॥ এদের দেশেও হিন্দু মুসলমান আছে !

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Order ! Order ! we are looking very small before the Lady. Don't you see they are smiling in their sleeves ?

মণিবেগম ॥ যে-বাণিজ্যের সুখ-সুবিধের জন্য আজ এই মারামারি—

হেষ্টিংস ॥ মারামারি বলিবেন না—বলুন heated discussion—টীব্র হালোচনা।

মণিবেগম ॥ হাঁ হাঁ—আলোচনা আলোচনাই বটে। তা এত সুখ-সুবিধে চাইলে কি আমরাই দিতে পারতাম না ?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ Of course ! হাপনি ঠিক বলিয়াছেন, মীরজাফর খাঁ বরাবর হামাদের সাঠে দোস্তি রাখিয়া কাম করিটেছে।

কার্ণাক। টঠাপি Governor টাহাকে মসনড হইটে হাটাইয়া ডিলেন।

একজন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাহী ॥ হে সাহেব !

সকলে ॥ Mr. Hay !

কয়েকজন ॥ And Mr. Amiyatt ?

হের-প্রবেশ

হে ॥ Amiyatt m u r d e r e d ! Patna factory demolished—

সকলে ॥ War ! War !

হে ॥ জার্মান স্মরু—হামাদের এলিস হার পাটনায় যাহারা সব হাছে—সকলকে হাটক করিয়াছে।

সকলে ॥ War ! War ! Let us march at once—

ভ্যান্সিটার্ট ॥ But Ellis and hundreds of our people are at Nawab's mercy.

হেষ্টিংস ॥ Mind you, নবাব সংবাড পাইলে সকলকে কোটল করিবে। কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিবে না। Will that be desirable ?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ টঠাপি হামি লোক ভয় পাইবে না। মীরকাশিমকে মসনদ হইটে সরাইটে হইবে।

ভ্যান্সিটার্ট ॥ All right ! We dethrone Mircosim from the masnad of Murshidabad and nominate—

সকলে ॥ Our old ally and friend—

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর !

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Very well, মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর ! এটকাল হামি নবাব মীরকাশিমের কোন ডোষ দেখিটে পাই নাই কিন্টু জানিবেন যে ইংরেজের রক্ট-পাট করিবে, সে ডুনিয়ার ডুষমন, সেরা শয়টান। হামি এটকাল টাহার বন্ধু ছিলাম। কিন্টু সে যখন হামার স্বজাটিকে মারিয়াছে - সে হামার জাটির ডুষমন—হামার ডুষমন—হামরা হাজ হইটে টাহাকে নবাবী হইটে বরখাষ্ট করিলো।

সকলে ॥ Hear ! Hear !

ভ্যান্সিটার্ট ॥ এখন হামরা হামাদের সর্টের খসড়া ডিটেছি—মীরজাফর খাঁ রাজী হইয়া সহি করিলেই হামরা আবার উহাকে নবাব বলিয়া সেলামকরিব।

মণিবেগম ॥ নতুন করে খসড়া আবার কি দেবে সাহেব ? উনি তোমাদের সর্ব সর্ত্তে রাজী ছিলেন—এখনও থাকবেন।

মীরজাফর ॥ তোমাদের অনুগ্রহের ওপরেই যখন সব নির্ভর, তখন নবাব হলেও আমাকে তোমাদেরই গোলাম ব'লে জানবে সাহেব। বিনা দোষে এই গোলামের নবাবী কেড়ে নিয়েছিলে—

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ হাবার ডিটেছি—

কার্ণাক ॥ হাবার যাহাটে কাড়িটে না হয় হাপনি সেই ভাবে কার্য্য করিবেন, টাহা হাপনি হইলে যটকাল বাঁচিয়া ঠাকিবেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ঠাকিবেন।

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ হাসুন—নবাব হইয়া এবার যুদ্ধের বণ্ডবষ্ট করুন—টঙ্কার বণ্ডবষ্ট করুন।

কার্ণাক ॥ নবাবী করিবেন—টঙ্কার বণ্ডবষ্ট করিবেন না ?

মীরজাফর ॥ বেগম ॥

মণিবেগম ॥ আমি দেব। যত তঙ্কা লাগে আমি দেব। ছিলাম নর্ত্তকী। দয়া ক'রে মীরজাফর আমায় বেগম ক'রেছিলেন। সকলে আমায় বেগম ব'লেছে—বলেনি শুধু একজন। জানো সাহেব সে কে ?

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ মীরকাশিম ?

মণিবেগম ॥ মীরকাশিম নয়—মীরকাশিমের বেগম। মীরকাশিম আমার সঙ্গে বেইমানি ক'রেছে—আর তার বেগম ক'রেছে প্রকাশ্যে আমার অপমান। আমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রেও যদি তোমাদের যুদ্ধের খরচা জোগাতে হয় তাই জোগাব—কিন্তু বন্দী মীরকাশিমকে আমি উপহার চাই—আর সেই সঙ্গে চাই তার বেগম।

সাহেবগণ ॥ Right O! Now Governor!

ভ্যান্সিটার্ট ॥ Let Adams take charge of the Army and capture Murshidabad. On no account should Mircosim be allowed to sit again on the throne of Bengal—অমিয়টকে হত্যা করিয়াছে, এলিস সাহেব আর সব সাহেব-লোকডের কয়েড করিয়াছে,—শয়টান মীরকাশিমকে এমন সাজা ডিব সারা বাংলা ডেশটা কাঁপিয়া উঠিবে।

য়্যাডাম্‌স প্রভৃতি ॥ Hear! Hear!

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগার

জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, পিদ্রুস্‌, নজাফ খাঁ ইত্যাদি সকলে দুই তিন দলে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

রাজবল্লভ ॥ তা হ'লে কাটোয়া গিরিয়া দুই জায়গায়ই নবাব ঘায়েল হয়েছেন—

জগৎশেঠ ॥ ভগবান মুখ রেখেছেন—ভাগ্যে আমরা সব নবাবের চোখের উপর আছি, নইলে আমরাই বদনামের ভাগী হতাম!

রায়দুর্লভ ॥ বলা যায় না, আমরা সব ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, বদনাম দিলেই হ'ল।

পিদ্রুস্‌ ॥ হামার সবই সমান—নবাব বলেন, হামি ডুষমন হাছে—কোম্পানী ভি বলে হামি ডুষমন হাছে—টাই হামাকে এট ডিন আটক করিয়া

রাখিয়াছিল। পুরানা নবাব মীরজাফর ভি বলে হামি ডুষমন হাছে—লেকেন, হাঁ মণিবেগম বলে, হামি কাজের লোক হাছে। মেহেরবানি করিয়া হামাকে ছোড়াইয়া ডিয়াছে।

রাজবল্লভ ॥ তাহ'লে মণিবেগমের সঙ্গে—খোজাসাহেবের দেখা শোনা হচ্ছে।

পিদ্রুস্ ॥ তা কাম করিটে হইলে ডেখা করিটেই হইবে। হামাকে মণি-বেগমের কাছে ভি যাইটে হয়—ভাইয়ের কাছে ভি হাসিটে হয়। হামি কাজের লোক হাছে—কাজ করিয়া টো খাইটে হইবে। আবার Father-এর একটা উইল ভি হাছে। ভাইয়ের সহিত উহার হালোচনা ভি হাছে।

গুরগিন খাঁর প্রবেশ

গুরগিন খাঁ ॥ Look here পিদ্রুস্ হামি পসন্দ করিনা—টুমি একডফে এ টরফ এক ডফে ও-টরফ যানা-আনা কর। তোমার সে মটলব হইলে হামাকে ছুট্টি কর ভাই। Don't come to me any more ; হামার কাছে হাসিও না। এখন হামি নবাবের General হাছে, যে হাডমী ডু-টরফ আনা-যানা করে—হামি টাহার সাঠে বাট্ করিতে পারে না। No, Never.

পিদ্রুস্ ॥ নবাবের General হাছে—ওটো ঠিক হাছে, লেকেন হামি ভি টো ভাই হাছে—you can't deny that, can you ? ভাই কেমন হাছে, কেমন রোজগার করিটেছে, নবাব কেমন বিসওয়াস্ করে, Father এর উইলটার কি হইবে—এ সব খবর ভি ভাইকে করিটে হয়।

গুরগিন খাঁ ॥ No you needn't—টোমার কিছু করিটে হোবে না। হামাদের মন বহুট্ খারাপ হাছে—বার বার হামাডের defeat হইটেছে—ইহার একটা বণ্ডবষ্ট না করিলে হামার মেজাজ ঠিক হইটে পারিটেছে না।

পিদ্রুস্ ॥ আচ্ছা ভাই তুমি ঠাক, হামি যাইতেছে। লেকেন ভাই তোমার ডুষমন নয়—এটা ইয়াড রাখো।

আরাব খাঁর প্রবেশ ; তাহার হাতে লাল ইস্তাহার

আরাব খাঁ ॥ দেখেছেন শেঠজি—

জগৎশেঠ, আরাব খাঁ, নিবিষ্টচিত্তে ইস্তাহার দেখিতে লাগিল।

গুরগিন খাঁ ॥ কি খাঁ-সাহেব, হাপনারা এক সাঠ হইয়া কি পড়িটেছেন ?

আরাব খাঁ ॥ কোম্পানীর ইস্তাহার—

গুরগিন খাঁ ॥ কি ইষ্টাহার ?—

আরাব খাঁ ॥ (পাঠ) 'নবাব মীরমহম্মদ কাশিম আলি খাঁ ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করায় এবং করিতে থাকায়—'

নজাফ খাঁ ॥ মিথ্যা কথা। একেবারে মিথ্যা। পাটনা ফ্যাক্টরীর এলিস

প্রকাশ্য শত্রুতা সুরু করে—পাটনা দখল করে—নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করে—

রায়দুর্লভ ॥ ও প্রতিবাদ এখানে না ক'রে কোম্পানীর কাছে গিয়ে করুন —(আরাব খাঁকে) পড়ুন খাঁ সাহেব। সব শুনে রাখা ভাল।

আরাব খাঁ ॥ (পাঠ) 'আমরা ইংরাজ' 'জাতির এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেছি এবং মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে বাংলা-বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব স্বীকার করিয়া ঘোষণা করিতেছি—'

মীরকাশিম প্রবেশমুখেই ঐ ঘোষণা শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেহ-রক্ষীর হাত হইতে তরবারি লইয়া বলিলেন—

মীরকাশিম ॥ বটে! তোমরা—তোমরাই মীরজাফরকে—

গুরগিন খাঁ। নবাব বাহাডুরের ভুল হইয়াছে। উহা ইহারা ঘোষণা করিটেছে না—কোম্পানী করিটেছে। উহা কোম্পানীর ইস্টাহার—

নজাফ খাঁ ॥ কিন্তু কে বিলি ক'রছে?

আরাব খাঁ ॥ জানা যাচ্ছে না অথচ খুব বিলি হচ্ছে।

মীরকাশিম। হুঁ. 'জানা যাচ্ছে না—অথচ খুব বিলি হচ্ছে।' হুঁ! মীরজাফর নবাব ঘোষিত হ'লেন। তারপর মীরকাশিমের কি হ ল?

আরাব খাঁ। জনাব কি আমাকে এই অশিষ্ট ইস্তাহার জনাবের সম্মুখেই পাঠের জন্য আদেশ ক'রছেন?

মীরকাশিম ॥ মীরকাশিমের কি হবে জান্‌ব না! ইস্তাহারে কী লিখেছে পড়।

আরাব খাঁ ॥ (পাঠ) 'আমরা এতদ্বারা আমাদের অধীনস্থ সকল প্রকারের লোকদের নিকট এই দাবী করি এবং অন্যান্য কর্মচারী ও দেশবাসীর নিকট এই নিমন্ত্রণ পাঠাই যে, তাহারা যেন'··উঃ জনাব! আর আমি পড়তে পারছি না।

মীরকাশিম ॥ পড়্‌তেই পা'রছ না! কেন? আমার মানহানি হবে? তার কি কিছু বাকী আছে আরাব খাঁ? তুমি পড়, আমি শুনি—

আরাব খাঁ ॥ (পাঠ) 'উক্ত কাশিম আলি খাঁর দুষ্ট বুদ্ধি সমূহ পরাভূত করিয়া উক্ত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে সুবেদারিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিবেন······'

মীরকাশিম ॥ এই নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে এসেছে। তা তোমরা কী ক'রবে ঠিক ক'রলে? নিমন্ত্রণ এসেছে—

গুরগিন খাঁ ॥ হামি এই ইষ্টাহার Bonfire করিবে। উহারা মুঙ্গেরের

ডিকে আসিটেছে—উডয়নালায় হামি উহাডের ডেখিয়া লইবে। ডেখিবেন নবাব।

নাজাফ খাঁ ॥ থামো সাহেব, আর বড়াই ক'রো না। কাটোয়া গিরিয়ায় তোমাদের বীরত্বের যে নিদর্শন দেখিয়েছ—তাতে আর 'কোম্পানীকে দেখে নেবে' এ-কথা তোমার মুখে খাটে না। উদয়নালায় যা হবে তা জানি।

গুরগিন খাঁ ॥ মানহানি সুচক কঠা কহিবেন না। I demand... টোমার মনে কি আছে খুলিয়া বল—

নজাফ খাঁ ॥ হ্যাঁ, ব'লব। তোমরা নবাবের বেতন ভোগী সৈনিক বৈ তো আর কিছু নও। চাকরী বজায় রাখ্‌তে হবে তাই তোমরা যুদ্ধ ক'রছ! এ যুদ্ধ তোমাদের জীবন-মরণ সমস্যা নয়। তা যদি হ'ত, তবে গিরিয়ায় কাটোয়ায় এ লাঞ্ছনা আমাদের হ'ত না। সুতীতে ইংরাজ হেরে গিয়েছিল, তাদের দুর্দশা দেখে তোমার দুইশত গোরা-গোলন্দাজের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজরা তাদের যেই ডেকে বলল—আমরাও গোরা, তোমরাও গোরা, আমরা ইয়োরোপের ভাই—অমনি তোমার দুইশ গোলন্দাজ তাদের পক্ষে গিয়ে যোগ দিল। তোমরা যুদ্ধ ক'রছ দেশের জন্যে নয়—তোমরা যুদ্ধ ক'রছ "তঙ্কার" জন্য। আমি মিথ্যা ব'লছি গুর্গিন খাঁ?

গুর্গিন খাঁ ॥ টাহারা rebels—বিড্রোহী। হামার দেশের লোক বলিয়া টাহাদের হামি ছাড়িব না—ধরা পড়িলে টাহারা হামার হাটে কুট্টার মটো মরিবে। I will shoot them like dogs; কিন্তু বাংগালী হইয়া যাহারা বাংগলার সর্বনাশ করিল—ডেশী-লোক হইয়া যাহারা ডেশকে ডুবাইল—যাহারা স্বডেশের স্বাটীনটা বিদেশীর হাটে টুলিয়া দিল—টাহাদের কি সাজা হইবে বলিবে কি?—কাটোয়ায় টকী খাঁ যুদ্ধে জিটিয়া যাইটেছে—ইংরাজ পলাইটেছে—এমন সময়ে নবাবের ফৌজডার সৈয়ড মহম্মদ খাঁ বেইমানি করিয়া সৈন্যডের হটাইয়া লইল। টকী খাঁ হারিয়া গেল—মারা গেল! গিরিয়ায় ইংরেজ পলাইটে লাগিল—শের আলি টাহাদের ডাকিয়া আনিয়া জিটাইয়া দিল! কোনো ডেশে এমন কেহ ডেখে নাই। ইহাডের কী সাজা হইবে হামি ভাবিয়া পাইনা। টুমি বলিয়া ডিবে কি?

মীরকাশিম ॥ কি শাস্তি হবে শুনবে গুরগিন খাঁ? আমি ব'লতে পারছি না—এক জীবনে শেষ হবে না—এ শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে যুগে যুগে—বংশ পরম্পরায়। যাক্‌, সে কথা। গুরগিন খাঁ, উদয়নালায় আমাদের শেষ চেষ্টা—আমি নিজে যাব।

গুর্গিন খাঁ ॥ হাপনি যাবেন সেটা আনন্ডের কঠা। কিন্তু নবাব, হাপনার মূল্যবান জীবন—একটা গুলীর উপর ছাড়িয়ে দেওয়া উচিট হইবে কি? কাটোয়ায় হার হইল—গিরিয়ায় হার হইল—টবু নবাব হাছেন বলিয়া হামরা খাড়া হাছি—টাকা মিলিটেছে, লোকজন মিলিটেছে—কাজ যেমন চলিটেছিল। টেমনি চলিটেছে।

রায়দুর্লভ ॥ গুরগিন খাঁ ঠিক ব'লেছেন, নবাবের মূল্যবান জীবন বিপন্ন করা কোন কাজের কথা নয়।

রাজবল্লভ ॥ আমারও ঐ কথা।

জগৎশেঠ। না জনাব, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা সমীচীন হবে না।

মীরকাশিম ॥ কিন্তু তকী খাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যু—

গুরগিন খাঁ ॥ টকী মরিয়াছে—হামি খাড়া আছি। হামি মরিলে সমরু খাড়া হইবে। লড়াই হাছে—হার-জিত হাছে—নবাব খাড়া ঠাকিলে সবই খাড়া রহিল। নবাব গেলে সবই গেল!

মীরকাশিম ॥ বেশ! গুরগিন, আমি যাব না—উদয়নালার সম্পূর্ণ ভার তোমাকেই দিলাম। উদয়নালাতেই আমার ভাগ্য-নির্ণয় হবে। জগৎশেঠ. মহাতাপচাঁদ, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ আপনারা যেমন নবাবের জীবন মূল্যবান মনে করেন—আপনাদের নবাবও আপনাদের জীবন সেইরূপ মূল্যবান মনে করেন। উদয়নালার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা সপরিবারে দুর্গমধ্যেই অবস্থান ক'রবেন—এই আমার অভিপ্রায়।

রাজবল্লভ ॥ নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য।

মীরকাশিম ॥ বেশ আপনারা যান—নিরাপদে থাকবার জন্য দুর্গে আসবার ব্যবস্থা করুন।

পরম উদ্বেগের সঙ্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও
রায়দুর্লভের প্রস্থান

মীরকাশিম ॥ গুরগিন, তুমি সামান্য অবস্থায় জীবন যাপন ক'রতে—

গুরগিন খাঁ ॥ সে হামার মনে আছে, জনাব। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিটাম—

মীরকাশিম ॥ সেই অবস্থা থেকে তোমায় আমি আমার সেনাপতিপদে তুলেচি—ধন, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—আমি তোমায় সব দিয়েছি—সব থেকে বড় কথা গুরগিন, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে—

গুরগিন খাঁ ॥ এ সব কঠা কহিয়া নবাব হামাকে লজ্জা ডিটেছেন--

মীরকাশিম ॥ বিশ্বাসঘাতকতা দেখে দেখে আমার মন অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে—আমাকে ক্ষমা করো। মনে রেখো, একটা দেশের একটা জাতির স্বাধীনতা—আজ তোমার উপর নির্ভর ক'রছে। দুর্ভেদ্য উদয়ানালার আমার সে সৈন্য-সমাবেশ হ'য়েছে, তাতে আমাকে পরাজিত ক'রতে পারে, এমন শক্তি ইংরেজের নেই—কারো নেই। উদয়নালা আমার জীবনের পরম সাধনা—চরম রচনা।

গুরগিন খাঁ ॥ হাম টার ভার লইলাম, জনাব। কি করি ডেখিয়া লইবেন। Good bye!

মীরকাশিম ॥ এসো ।

গুরগিন খাঁর প্রস্থান

মীরকাশিম ॥ আরাব আলি ! প্রতিপক্ষ যদি তোমাকে উৎকোচ দিতে চায়—কত উৎকোচ দিতে পারে ?

আরাব আলি ॥ জনাব ! জনাব !

মীরকাশিম ॥ খুব বেশী হ'লে এক লক্ষ। দু' লক্ষ ? আমি তোমায় সমস্ত মুঙ্গের অর্পণ ক'রছি—বিশ্বাসঘাতকতা ক'রো না। তাতেও যদি তৃপ্ত না হও—তুমি কি চাও, বল, অসঙ্কোচে বল কিন্তু বেইমানি—বেইমানি ক'রো না আরাব আলি ! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ—সিদ্ধির জন্য একটা স্বাধীন জাতিকে একটা স্বাধীন দেশকে বিদেশীর কাছে বিক্রয় করোনা। বল ক'রবে না ?

আরাব আলি ॥ দাসকে অনর্থক সন্দেহ ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন জনাব। মুঙ্গের দুর্গের জন্য নবাব নিশ্চিন্ত থাকুন !

মীরকাশিম ॥ তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর ইমান রাখবে।

আরাব আলি ॥ নিশ্চয় ! এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ করছি ইমান রাখ্‌ব।

মীরকাশিম ॥ নিশ্চিন্ত হ'লাম। যাও, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

আরাব আলির প্রস্থান

মীরকাশিম ॥ নজাফ ! দেশের—জাতির—আজ চরম মুহূর্ত। শপথ কর নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ ॥ না জনাব ! যদি আমি সত্যই বেইমান হই, শপথের মূল্য কি ? নবাব ! এ দেশ শুধু আপনার নয়, আমারও।

মীরকাশিম ॥ নজাফ ! নজাফ ! আর মাত্র একজনের কাছে এ কথা শুনেছিলাম—সে আজ নেই, দেশের জন্য প্রাণ বলি দিয়েছে।

নজাফ খাঁ ॥ তকী খাঁ ?

মীরকাশিম ॥ তকী খাঁ ! তকী খাঁ ! নজাফ ! বন্ধু ! তুমি কি ভার নেবে আজ ?

নজাফ খাঁ ॥ যুদ্ধের ভার নয় ; নবাবের যা সৈন্যবল অস্ত্রবল—নবাবের যেরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ—তাতে মীরজাফর এবং কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

মীরকাশিম ॥ কিন্তু তারাই জিতছে !

নজাফ খাঁ। কিন্তু তারাই জিতছে ! বিবেচনা ক'রে দেখুন, কেন জিতেছে ?

মীরকাশিম ॥ আমাদের বেইমানিতে।

নজাফ খাঁ ॥ আমাদেরই বেইমানিতে। আমি ভার নিলাম, জনাব—এই

সব বেইমানদের কুকুরের মতো গ্‌লী ক'রে মারবার। যদি সব বেইমানদের চিনতে পারতাম, মারতে পারতাম—য্‌দ্ধই হ'তো না ; আজ কোম্পানী এসে নতজান্‌ হ'য়ে নবাবকে কুর্ণিশ ক'রত !

মীরকাশিম ॥ সত্য—অতি সত্য। কিন্তু তাদের সব সময় চিনে উঠতে পারি কই ? তব্‌ যাদের পেরেছি—জগৎশেঠ—রায়দ্‌র্লভ—রামনারায়ণ—রাজবল্লভ। ম্‌ঙ্গেরে তাদের নজরবন্দী করে রেখেছি। সন্দেহ হচ্ছে—মীরজাফর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে—রাজদ্রোহীতা ক'রছে, কিন্তু—না—এখনো অকাট্য প্রমাণ পাইনি—আমি অবিচার ক'রবো না।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা ॥ অকাট্য প্রমাণ যার সম্বন্ধে পেয়েছেন, তার কী শাস্তি জনাব ?

মীরকাশিম ॥ বেগম !

নজাফ খাঁর প্রস্থান

ফতেমা ॥ নবাবের বেগম এ পরিচয়ে আমি দরবারে আসিনি। আজ আমার পরিচয়—আমি বাংলার এক প্‌রনারী, বাংলার এক প্রজা। নবাবদরবারে আমার অভিযোগ আছে।

মীরকাশিম ॥ অভিযোগ ! কার বির্‌দ্ধে ?

ফতেমা ॥ নবাবের আর এক প্রজা রাজদ্রোহ ক'রেছে। তার বিদ্রোহের ফলে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে, অগণ্য প্রজার ধন-প্রাণ বিপন্ন হ'য়েছে—প্রমাণ এই ইস্তাহার। রাজার বির্‌দ্ধে য্‌দ্ধ ঘোষণা করা বা য্‌দ্ধের সহায়তা করার শাস্তি প্রাণদণ্ড। অভিযোগ প্রমাণিত। নবাব, দণ্ড-ঘোষণা কর্‌ন।

মীরকাশিম ॥ ফতেমা।

ফতেমা ॥ বেগমের পিতা ব'লে, তিনি দেশের আইনের উর্ধে নন। নবাব তার দণ্ড-বিধান কর্‌ন।

মীরকাশিম ॥ আইনের ঊর্ধে তিনি নন—কিন্তু আজ তিনি নবাবের আয়ত্তের বাইরে।

ফতেমা ॥ আয়ত্তের বাইরে যারা, তাদের মস্তকের জন্য তো প্‌রস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে।

মীরকাশিম ॥ হঠাৎ তুমি এতটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠছ কেন ফতেমা ?

ফতেমা ॥ ইস্তাহারে কি লেখা আছে, নবাব তা অবগত আছেন ?

মীরকাশিম ॥ মীরকাশিমকে গদীচ্যুত ক'রে মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করা হ'য়েছে।

ফতেমা ॥ তা'হলে আপনার সভাসদরা আপনার প্রতি অসীম কর্‌ণায় সম্প্‌র্ণ ইস্তাহার আপনার সম্ম্‌খে পাঠ করেন নি।

মীরকাশিম ॥ তাই নাকি ! কী সেই অপঠিত অংশ ?

ফতেমা ॥ স্পর্ধা এই দুর্বৃত্তদের—নবাবের শিরের জন্য তারা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে!

মীরকাশিম ॥ বিদ্রোহীদের পক্ষে সবই সম্ভব।

ফতেমা ॥ নবাবের শিরের জন্য যদি পুরস্কার ঘোষণা হ'তে পারে, তবে নবাব কি বিদ্রোহীর শিরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা ক'রতে পারেন না?

মীরকাশিম ॥ তাতে তো এ যুদ্ধের অবসান হবে না ফতেমা! যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কিন্তু কোম্পানীকে সাহায্য ক'রছে একা তোমার পিতা মীরজাফর নয়—সাহায্য ক'রছে স্বার্থান্বেষী শত শত মীরজাফর! আজ যদি দেশের সমস্ত মীরজাফরকে উচ্ছেদ ক'রতে পারতাম! আমার শিরের কি মূল্য ধার্য হ'য়েছে?

ফতেমা ॥ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর নানাবিধ অনুগ্রহ—চাকরী—খেতাব!

মীরকাশিম ॥ লক্ষ টাকা! কে দেবেন? তোমার পিতা?

ফতেমা ॥ না, ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আমি জানি এ টাকা জোগাবে পিতার সেই নাচওয়ালী বাঁদী—

মীরকাশিম ॥ মণিবেগম। এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

ফতেমা ॥ চরমুখে পিতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে উপদেশ পাঠিয়েছেন—অজেয় ইংরেজের সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ না ক'রে আমরা যেন সুবা ছেড়ে পালিয়ে যাই—অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে!

মীরকাশিম ॥ কন্যার বৈধব্য-ভয় ভীত পিতার উপযুক্ত উপদেশ!

ফতেমা ॥ না। এ সেই নাচওয়ালীর বুদ্ধি। ভবিষ্যতে যাতে নাজামদ্দৌলা নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে ব'সতে পারে, তাই নবাবকে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার বাইরে পাঠানো একান্ত আবশ্যক!

মীরকাশিম ॥ মণিবেগম! নাচওয়ালী মণিবেগম! তুমি তাকে তো কখনো বেগম ব'লেই সম্বোধন কর নি—তাই তোমাকে তিনি দেখাবেন, তিনি শুধু নবাব-বেগম নন, নবাব মাতাও হবেন তিনি।

ফতেমা ॥ এক নাচওয়ালীর পুত্র বাংলার মসনদে ব'সবে—তা দেখবার পূর্বে যেন আমাদের মৃত্যু হয়।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী ॥ বেগম-সাহেবার সাক্ষাৎ প্রার্থী—এই তার পরিচয় চিহ্ন!

ফতেমা ॥ একি! এ যে··· তাকে এখানে নিয়ে আয়!

বাঁদীর প্রস্থান

এ যে পিতার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরি! কে এল?

মীরকাশিম ॥ হয়তো স্নেহ-কাতর পিতা কন্যাকে কোন গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন! তাহ'লে আমার কোমেরও একটা মন্ত্রগুপ্তি আছে! কম তো নও! মীরজাফরের কন্যা, মীরকাশিমের স্ত্রী একাধারে। প্রস্থানোদ্যত

ফতেমা ॥ যাবেন না জনাব।

মীরকাশিম ॥ না—না, পিতা পুত্রীর কথার মধ্যে আমি কেন? আমি শুধু দেখব—কে হারে কে জেতে!—মীরজাফরের কন্যা কিম্বা মীরকাশিমের বেগম! প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া বাঁদীসহ চরের প্রবেশ। চর কুর্ণিশ করিয়া পত্র বাহির করিল
বাঁদী সে পত্র লইয়া বেগমকে দিল

ফতেমা ॥ (বাঁদিকে) যাও। চলে যাও, এখানে এখন যেন কেউ না আসে।

বেগম পত্র পড়িতে সুরু করিতেই চর সেই অবসরে তাহার
ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল।

ফতেমা ॥ (পত্র পাঠান্তে চরের দিকে তাকাইয়া বিস্মিতস্বরে) নাজামদ্দৌলা!

নাজাম ॥ যাক্, বহিন তার ভাইকে চিনতে পেরেছে।

ফতেমা ॥ ভাই! না শত্রু!

নাজাম ॥ যুদ্ধ যখন একটা হচ্ছে—মিত্র যে নয়, সে তুমিও জানো আমিও জানি। কিন্তু রক্তের সম্বন্ধটা যাবে কোথায়?

ফতেমা ॥ তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা স্বীকার করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

নাজাম ॥ কিন্তু তোমার পিতা আমাকে পুত্র বলতে ঘৃণা বোধ করেন না!

ফতেমা ॥ আমি আমার পিতৃ-পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি। আমার জীবনের একমাত্র লজ্জা আমি মীরজাফরের কন্যা। আমার জীবনের একমাত্র অভিশাপ, আমি মীরজাফরের সন্তান। বাংলা দেশে এ পরিচয় আর দিয়োনা নাজামদ্দৌলা! দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে পলাশীর রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে যে সামান্য সৈনিক—অথবা বাংলার স্বাধীনতার পতাকা বহন করাতে লাঞ্ছিত হ'য়েছে যে কৃষক—আজ যদি আমি তাদের কারো কন্যা হ'তাম তবে সগর্বে—সগৌরবে গিয়ে দাঁড়াতাম ঐ মীরজাফরের সামনে—গিয়ে সুস্পষ্টকণ্ঠে তাকে ব'লতাম আমি বাংলার মেয়ে—তোমাকে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি! তার জন্য যদি কারারুদ্ধ হ'তাম—যদি নিহত হতাম—সে হ'ত আমার অধিকতর গর্ব—আমার অধিকতর গৌরব!

নাজাম ॥ তুমি তোমার পিতৃ পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ ক'রছ। কিন্তু সেই পরিচয়েই আজ আমার এখানে আসবার সার্থকতা!

ফতেমা ॥ তোমার এতদূর দুঃসাহস !

নাজাম ॥ তাতেই বুঝতে পার, কি গুরুতর প্রয়োজনে আমি এসেছি।

ফতেমা ॥ তোমাকে—তোমাকে বন্দী করা হবে।

নাজাম ॥ তাতে যুদ্ধটা আরও গুরুতর হবে। জানো তো এ যুদ্ধ আমারই জন্য ? চালাচ্ছেন আমার মা। বাবাকে মসনদে বসাতে নয় - তিনি এর আগেও ব'সেছেন—বসাতে আমাকে। এ জন্য মা অলঙ্কার বিক্রী ক'রে কোম্পানীর যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছেন ! কাজেই একমাত্র আমার বধেই তোমাদের জয়—বন্ধনে নয় !

ফতেমা ॥ তা হ'লে বধই করতে হবে !

নাজাম ॥ (উচ্চতরস্বরে) এই কে আছিস—একটা জল্লাদকে ডেকে দে !

ফতেমা ॥ তোমার মতলবটা কি ?

নাজাম ॥ ব'লতে অবসর পাচ্ছি কই।

ফতেমা ॥ বল—

নাজাম ॥ তাই বল। বসো।

দুজনে বসিলেন

এলাম বোনের বাড়ী। ভাবলাম, একটু আরাম ক'রব—আয়েস ক'রব—

ফতেমা ॥ নাজাম—

নাজাম ॥ তা ভাই ব'লেই স্বীকার কর না ; উপরন্তু গালাগাল আর গালাগাল। তা আমার বোন বলা আটকাচ্ছে কে ? ওরে কে আছিস—সরবৎ টরবৎ কিছু আন—

ফতেমা ॥ নাজামদ্দৌলা !

নাজাম ॥ নাঃ, বসা আর চলল না (কৃত্রিম কোপে) তুমি যা ভেবেছ তা হবে না।

ফতেমা ॥ তার মানে ?

নাজাম ॥ বাবা লিখেছেন, "ফতেমা ! কাশিম আলিকে নিয়ে বাংলার বাইরে পালিয়ে যাও।" তার উত্তরে তুমি লিখলে, "তুমিই বরং আমাদের এখানে পালিয়ে এস !" —ভেবেছ, বাবা পালিয়ে আসবেন তোমার কাছে !

ফতেমা ॥ তিনি লিখেছিলেন ব'লেই আমিও লিখেছিলাম। আমি তাঁকে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে বলেছিলাম !

নাজাম ॥ তার উত্তরে এবার তিনি কি লিখেছেন ?

ফতেমা ॥ সে লজ্জাকর জবাবটা তো তুমি জান !

নাজাম ॥ না, জানি না।

ফতেমা ॥ পত্র বহন ক'রে এনেছ তুমি,— তুমি জানো না !

নাজাম ॥ না। তুমি কি ভেবেছ, আমি এখানে পিতামাতার জ্ঞাতসারে এসেছি? তবে কি আমি আসতে পারতাম? দূতের হাত থেকে পথে এ পত্র কেড়ে নিয়ে তবে এসেছি!

ফতেমা ॥ তুমি মণিবেগমের পুত্র—সাধারণ কোন অভিসন্ধি নিয়ে যে তুমি আসোনি, তা খুবই বুঝি।

নাজাম ॥ এ কথা সত্য। পিতা তোমার এখানে পালিয়ে আসছেন—এই জবাবই বোধ হয় পেয়েছ?

ফতেমা ॥ তিনি আসবেন?—তা'হলে তাঁর নামই যে মিথ্যা হ'য়ে যায়! তাই তিনি স-দুঃখে লিখেছেন, "মা ফতেমা! কি করে যাই! শৃঙ্খলে আমার হাত পা আবদ্ধ!" আবদ্ধই বটে।

নাজাম ॥ শৃঙ্খ'ল আমার হাত পা আবদ্ধ'—বাবা লিখেছেন?

ফতেমা ॥ আশ্চর্য! মেয়ের সঙ্গেও চাল চেলেছেন!

নাজাম ॥ বহিন্। বহিন্! জীবনে বোধ হয় একটিবার বাবা সত্য কথা ব'লেছেন।

ফতেমা ॥ এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রতে বলছ!

নাজাম ॥ এই কথাই আমিও ব'লতে এসেছি বহিন্! এত বড় দাসত্ব আমি দেখিনি। সুবে বাংলার স্বাধীন নবাব আমরা দেখেছি—স্বাধীন দেশে আমরা জন্মেছি—স্বাধীনতা ভোগ ক'রেছি—শির উঁচু করে কথা বলেছি—কখনো মাথা হেঁট করিনি—আর আজ!

ফতেমা ॥ নাজাম!

নাজাম ॥ আজ কি জানো? প্রতি পদে প্রতি কথায় ভ্যান্‌সিটার্ট সাহেবের অনুমতি নিতে হচ্ছে—কোম্পানীর সাহেবদের কুর্ণিশ ক'রছি—তাঁরা দাবী করছেন, আমাদের মেটাতে হচ্ছে—তাঁদের রক্তচক্ষু দেখলেই আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছে, তাঁদের প্রসন্ন মুখ দেখলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কি ছিলাম, কি হয়েছি! পিতাকে বলি, কেন? মাতাকে বলি কেন? তাঁর শুধু বলেন, চুপ! চুপ! কিন্তু আমি জানি, কেন! স্বার্থসিদ্ধি। দেশের স্বর্থ বলি দিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি!

ফতেমা ॥ নাজাম! নাজাম! ভাই! তুমি বুঝেছ?

নাজাম ॥ বুঝেছি বহিন্! বুঝেছি ব'লেই এসেছি। প্রজার স্বার্থ কিছু নয়—জাতির স্বার্থ কিছু নয়—দেশের স্বাধীনতা কিছু নয়।—সব কিছু ঐ বাংলার মসনদ—সেই মসনদে এক দিন ব'সবে নাজামদ্দৌলা, তাই এ যুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি।—বিদেশী বণিকের পদলেহন ক'রে, অমন সিংহাসনে আমি বসতে চাই না। অমন মসনদে আমি পদাঘাত করি। স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও বহিন্—স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও··· রাজার হয়ে, দেশের হয়ে, আমায় ম'রতে দাও। আমায় বাঁচতে দাও!

অন্তরালে অবস্থান করে মীরকাশিম সবই দেখছিলেন।
তিনি এগিয়ে এলেন

মীরকাশিম। কে আছিস, ঐ বালককে বন্দী কর্।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিগণ আসিয়া নাজামদ্দৌলাকে বন্দী করিল।

ফতেমা ॥ স্বামী। স্বামী। ও আমার ভাই। ওকে তোমার পতাকা দাও—ওকে তোমার পতাকা দাও।

মীরকাশিম ॥ (কর্ণপাত না করিয়া) খুব গোপনে একে উদয়নালায় নিয়ে মুক্ত ক'রে দিবি।

নাজাম ॥ জনাব! জনাব!

মীরকাশিম ॥ আমার সঙ্গে সঙ্গে এ যদি ধ্বংস হয়—দেশ গেল। কিন্তু এ যদি বাঁচে—আশা হয়, এ দেশ আবার জাগবে—আবার জাগবে।… …

●

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইংরেজ শিবিরের বহির্ভাগ। অদূরে উদয়নালা দুর্গ দেখা যাইতেছে। ইংরেজ প্রহরী পাহারা দিতেছে। সন্ধ্যা।]

জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, মণিবেগম, নন্দকুমার

রায়দুর্লভ ॥ জনাবের জরুরী তলব আগেই পেয়েছিলাম। কিন্তু যে পাহারায় ছিলাম তাতে গঙ্গার পারে যে হাওয়া খাব সে উপায়ও ছিলনা।

মীরজাফর ॥ কি ক'রে এলেন?

জগৎশেঠ ॥ কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা-দুর্গ গোপনে তদারক ক'রতে বেরিয়েছেন খবর পেয়ে চরদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে তবে এখানে আস্‌তে পেরেছি।

রায়দুর্লভ ॥ কাশেম আলি খাঁর চর সর্বত্র।

নন্দকুমার ॥ হ্যাঁ সর্বত্র এবং তারা আছে বেশ। বেতনও খাচ্ছে উৎকোচও খাচ্ছে। প্রকৃত সংবাদ যে কে পাচ্ছে মা গঙ্গাই জানেন।

রায়দুর্লভ ॥ কেউ পাচ্ছে না সে জেনে রাখুন। কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা দুর্গেই এসেছেন—না, আমাদের পরীক্ষার জন্য ঐ সংবাদ রটিয়েছেন—তা-ও বলা যায় না।

জগৎশেঠ ॥ আমরা এখানে এসে খুবই দুঃসাহসের কাজ ক'রেছি। আমাদের বিলম্ব করা উচিত হচ্ছে না।

মণিবেগম ॥ আপনারাই হচ্ছেন বাংলার প্রকৃত কর্ণধার। আমার স্বামীকে আপনারাই মসনদে ব'সিয়ে ছিলেন—আপনারাই আবার টেনে তুলুন।

রায়দুর্লভ ॥ নামানো ওঠানো ব'লবেন না বেগমসাহেবা। আমাদের ক্ষমতা কতটুকু! কিছু নেই। আমরা শুধু অভিমান করতে পারি—খুব বেশি হ'লে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রতে পারি। তার বেশী কিছু করিনি।

জগৎশেঠ ॥ আমরা হচ্ছি, বাংলার মসনদের দাস। তবে সুখ সুবিধা সবাই খোঁজে সবাই দেখে—এই যা। দুঃখ এই - যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। সিরাজের পর জনাব সিংহাসনে ব'সলেন। কত আশা—কত ভরসা আমরা পেলাম। দেখি কিনা সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তঙ্কাশালা বসাবার অনুমতি পেল — আমার লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হ'তে লাগল। আমার এ দুঃখ-দুর্দশা দেখেই কিন্তু কাশেম আলি খাঁ তক্তে ব'সলেন। ও বাবা। তক্তে ব'সেই কোম্পানীর তঙ্কার বাট্টাটা পর্যন্ত তুলে' দিলেন। আবার এখন শুনছি বাংলায় বাঙালী আর কারো থাকা চ'লবে না মারোয়াড় থেকে বাংলায় এসে আমরা নাকি মহা দোষ ক'রেছি; কিন্তু বাংলায় নবাবদের নবাবীর যে টাকাটা এতকাল জুগিয়েছি জোগাচ্ছি—তা তো আর মেকি নয়।

মণিবেগম ॥ আপনার একটা কথাও অন্যায় নয়।

রায়দুর্লভ ॥ অন্যায় কথা আমরা বলিনা, সইতেও পারি না। কেমন অভ্যাসের দোষ। এই তো জনাব র'য়েছেন। সিরাজের অন্যায় দেখলাম ওঁকে এসে স্পষ্ট ব'ললাম, জনাব! আর তো সইতে পারি না। উঠুন, আপনাকে মসনদে বসতে হবে। যেমন ক'রেই হোক, বসালাম তো আমরা ওঁকে মসনদে। কিন্তু বসিয়ে কি হ'ল? ...নাঃ, স্পষ্ট কথা বলা আমার এক রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মণিবেগম ॥ না—না বলুন, মন খুলে কথাবার্তা হওয়াই ভালো।

রায়দুর্লভ ॥ মসনদে ব'সেই জনাবের প্রথম কার্জটিই হ'ল আমাদের ভুলে যাওয়া। তক্তে ওঠবার মইটাই দিলেন ফেলে। মুসলমান রাজ্যে হিন্দুরাও ছিল সেনাপতি; উচ্চ রাজ কার্যেও তাঁরা ছিলেন। একে একে তাঁদেরও সরানো হ'ল!

নন্দকুমার ॥ বুদ্ধিটা জনাব ক'লকাতায় পেয়েছিলেন, ওটা একটা উচ্চ রাজনীতি—Divide and Rule—' কিন্তু ঐ উচ্চ রাজনীতিতে সুবিধাটা হল কার—সেটাও দেখা দরকার!

জগৎশেঠ ॥ সুবিধা হ'ল তৃতীয় পক্ষের। ক'লকাতায় একটা টাঁকশালই ব'সে গেল।

রাজবল্লভ ॥ তৃতীয় ছাড়া চতুর্থ পক্ষের সুবিধাও যদি হয়, হোক্ না; আমাদের সুবিধাটুকু থাকলেই হ'ল। কিন্তু তাই বা হ'ল কই?

মণিবেগম ॥ কাশেম আলি খাঁর নবাবীতে সে সুখ সুবিধা কি আপনাদের কারো র'য়েছে ?

জগৎশেঠ ॥ বরং বলুন যেটুকু ছিল তাও গেছে। বাট্টা ব'লে একটা পদার্থ ছিল বাংলায় আজ তা নেই।

রাজবল্লভ ॥ সম্মান ইজ্জত কারো নেই !

রায়দুর্লভ ॥ আমরা আজ নজরবন্দী !

নন্দকুমার ॥ আপনাদের ধড়ে এখনো মাথাটা র'য়েছে দেখে আশ্চর্যই হচ্ছি।

মীরজাফর ॥ তাই যদি হয়—তবে আপনারা আমাকে এখনো কেন সাহায্য ক'রছেন না ! ইংরেজ কাশেম আলি খাঁকে গদীচ্যুত ক'রেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে—আমি নবাবী পেলাম—এ ঘোষণা-ও হ'য়েছে। এখনো আপনারা দোমনা কেন ?

জগৎশেঠ ॥ কেবল ভাবছি রাজদ্রোহ হচ্ছে না তো !

মণিবেগম ॥ আপনি এ কথা ব'লছেন শেঠজী। সিরাজের সময় রাজদ্রোহ করেন নি ? আমার স্বামীর রাজত্বে রাজদ্রোহ করেন নি !

জগৎশেঠ ॥ করেছিলাম ; কিন্তু সেটা অপরাধ হয়নি—কারণ, আমরাই জিতেছিলাম ! কিন্তু এবার সেরকম আশা পাচ্ছি না যে !

নন্দকুমার ॥ সাহেবরা বলে—A revolution is a crime when it fails but a virtue when it succeeds !

রায়দুর্লভ ॥ মানে ?

নন্দকুমার ॥ বুঝতেই পারছেন—হেরে গেলে মহাপাপ, জিতলে স্বর্গলাভ !

রাজবল্লভ ॥ যা ব'লেছেন।

মেজর য়্যাডাম্‌স্‌ অতিরিক্ত ইংরেজ প্রহরীসহ আসিয়া তাহাদিগকে
যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া এই বৈঠকে আসিলেন

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ হাপনাডের কটাবার্টা পাক্কা হইল টো ?

জগৎশেঠ ॥ কই আর হ'ল সাহেব ! একটা বিষয়ে সবাই একমত—

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ That Bengal is no place for Siraj or Mircosim, is that so ?

নন্দকুমার ॥ ঠিক ব'লেছ সাহেব। Bengal for Mirzafars and Mirzafars for Bengal !

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ ক'লকাটায় কয়েড ঠাকিয়া নণ্ডকুমার ইংরাজী বাট শিখিয়া লইল। হাপনাডের বাট্‌চিট্‌ জলডি সারিবেন। ঘটনা ঘটিবে। গুরুটর ঘটনা ঘটিটেছে। [প্রস্থান]

রায়দুর্লভ ॥ ঘটনা ঘটিবে ! কি ঘটনা ? আক্রমণ-টাক্রমণ নয় তো ?

মণিবেগম ॥ না না সে-সব কিছু নয়। ওসব হচ্ছে ঘরোয়া ব্যাপার।

মীরজাফর ॥ আমাদের আক্রমণ ভেতর থেকে। বাইরের লড়াই কোনো দিন করিনি—কাজেরও নয়।

জগৎশেঠ ॥ কিন্তু কাশেম আলি খাঁর যেরূপ আয়োজন দেখছি কি যে হবে বলা যাচ্ছে না। উদয়নালা দুর্গটি তো দেখ্ছেন? একমাস এখানে আছেন —ওখানে নাচ-গান স্ফূর্তি চ'লছে—আপনারা এখানে নাজেহাল হ'চ্ছেন।

রায় দুর্লভ ॥ আক্রমণটা যে ভেতর থেকে হবে কাশেম আলি খাঁ তা বুঝেছে। এবার তাই 'দেশ-প্রেম' 'আত্মোৎসর্গ' 'বাংলার দুঃখ' 'বাংলার স্বাধীনতা' এমনি সব ভালো-ভালো কথা আমদানী ক'রেছে। দেখা হ'লে কুশল প্রশ্ন নয়—প্রথম কথাই হচ্ছে—আর যা কর বেইমানি ক'রোনা!

মীরজাফর ॥ নিজে বেইমান কি না!

রাজবল্লভ ॥ আর ও-সব কথা নতুনই বা কি, সিরাজের ধার-করা বুলি!

জগৎশেঠ ॥ পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে—এ কথাটা কিন্তু নতুন!

নন্দকুমার ॥ বাংলায় অবাঙালীর স্থান নেই, তাড়িয়ে দাও সব অবাঙালী —এ কথাটিও নতুন।

মীরজাফর ॥ কিন্তু ও সব কথা শুন্ছে কে?

রায়দুর্লভ ॥ মোহনলাল মীরমদনের মতো গোটাকতক ছোকরা সব যুগেই থাকে—এখনও আছে—শুন্বে তারা।

রাজবল্লভ ॥ কিন্তু আমরা তো আর মরি নি। আমরা তো আছি। ওসব ধাপ্পায় ছেলে ভুলানো যায়—কিন্তু যারা দেশের কথা ভেবে ভেবে চুল পাকলো তারা তো ব্যাপারটা বুঝ্ছে! ভেবে দেখছি ইংরাজ ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মীরজাফর ॥ এটাই হচ্ছে কথা। আজ যা অবস্থা তাতে ইংরেজকে কেউ রুখতে পারবে না। আবেদন নিবেদন যা কিছু তাদেরই কাছে ক'রতে হবে। কারবালা যাবো ব'লে সব ঠিক ক'রলাম; সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে শুনি কাশেম আলি যুদ্ধ বাধিয়েছে। যুদ্ধ বাধিয়েছে ইংরাজের সঙ্গে। দেখ্লাম এই সুযোগ! ক'রলাম সন্ধি। সন্ধি—যা-ই হোক না কেন, গদীটা তো থাকছে। সন্ধিতে ক্ষতি হ'ল বিস্তর, হোক ক্ষতি! তবু আমরা ব'লতে পারব আমরা স্বাধীন।

নন্দকুমার ॥ নিশ্চয়। স্বাধীনতার জন্যে যে কোন ক্ষতি আমরা সইব। যে কোন ক্ষতি!

জগৎশেঠ ॥ সবই বুঝ্ছি।

রাজবল্লভ ॥ }
রায়দুর্লভ ॥ } হুঁ। কিন্তু—

মীরজাফর ॥ কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে একা ইংরেজ কি ক'রবে ?

জগৎশেঠ ॥ তা বেশ ; কারবার তো যাওয়ার মধ্যে—এখন এতে যদি কিছু হয়—

রাজবল্লভ ॥ চিরটাকাল রাজনীতি নিয়ে কাটালাম। একটা কিছু না ঘটলে চলেও না। কি বলেন রায়দুর্লভ ?

রায়দুর্লভ ॥ হ্যাঁ, নিষ্কর্মা হয়ে থাকা যায় না। এতে যদি আমাদের সকলের সুখ-সুবিধে হয়—দেশের একটা কাজ হবে বৈকি। তা হ'লে একটা লেখাপড়া হোক্—

মণিবেগম ॥ নিশ্চয়। অলংকার বেচে এই যুদ্ধের খরচ জোগাচ্ছি। জনাবের মুখ চেয়ে নয়। বাঁদী ছিলাম, বেগমও হয়ে ছিলাম, কাজেই বেগম হবার জন্যও নয়। নবাবী-তক্তে আমি আমার নাজামদ্দৌলার জন্য উত্তরাধিকার চাই। আপনারা স্বীকৃত ?

জগৎশেঠ ॥ অস্বীকৃত কেন হব ? এ তো আনন্দের কথা। বাংলায় মীরজাফরের বংশ যতকাল রাজত্ব করে - আমাদেরই মঙ্গল : তার ওপর সে বংশধর যদি আপনার পুত্র হয় তবে তো কথাই নেই।

নন্দকুমার ॥ কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে না তো ? উদয়নালার দিকে একবার চেয়ে দেখুন।

মণিবেগম ॥ আপনাদের যখন পাওয়া গেল উদয়নালার কথা ভাবি না ! শেঠজী যদি কাশেম আলিকে টাকা না জুগিয়ে আমাদের টাকা জোগান - রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ যদি কাসেম আলির হিন্দু সেনানায়কদের হাত করেন, আমি যদি গুরগিন খাঁকে-- আচ্ছা সে হবে এখন। তা হ'লে শপথ করুন—

মীরজাফর ॥ না-- না শপথের আবশ্যক নেই। সময়ের অপব্যয়। ওঁরাও আমাকে জানেন—আমিও ওঁদের জানি। কি বলেন ?

জগৎশেঠ ॥ (মৃদু হেসে) সে কথা ঠিক।

মীরজাফর ॥ শপথ নয়, লেখাপড়া নয়, আমাদের মধ্যে মুখের কথাই যথেষ্ট। তা হলে চলুন—সাহেবদের গিয়ে বলি। আপনারা কি এই রাত্রেই রওনা হবেন ?

রায়দুর্লভ ॥ হ্যাঁ জনাব ! বিলম্বে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

রাজবল্লভ ॥ কাজেরও ক্ষতি।

হঠাৎ ইংরেজ শিবিরের অভ্যন্তর হইতে সোরগোল উঠিল "স্পাই। "স্পাই !"
"গুপ্তচর গুপ্তচর !"—ক্রমাগত কয়েকটা গুলী-ছোড়ার শব্দ পাওয়া গেল।
বিষম চাঞ্চল্য। খোজা পিদ্রুস্ দৌড়াইয়া ইহাদের সম্মুখে আসিল।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরেজ-সেনানায়কগণ ছুটিয়া আসিলেন।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Hands up!

Hands up!

Othorwise!

খোজা পিদ্রুস্ হাত তুলিল

জগৎশেঠ ॥ সর্বনাশ!

মীরজাফর ॥ কে এ?

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Coaza Petruse।

রায়দুর্লভ ॥ গুরুগিন খাঁর ভাই। চল হে চল—

পিদ্রুস্ ॥ এই যে শেঠজীভি এখানে হাছে—সভা যখন ভাঙিবে হামাকে ভি সাঠে লইয়া চলিবে।

রায়দুর্লভ ॥ দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

পিদ্রুস্ ॥ বেগমসাহেবা! গুরুগিন খাঁ হাপনার চিঠির জবাব ডিয়াছেন—

মণিবেগম ॥ কই—

পিদ্রুস্ ॥ জবাব ডিয়াছেন হামার মুখে।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ গুরুগিন খাঁ খুব খেলা খেলিটেছে।

কার্ণাক ॥ Shilly-shallying always!

য়্যাডাম্‌স্ ॥ টুমি এখানে কি করিয়া আসিলে। কোন্ পঠে?

পিদ্রুস্ ॥ হামি গুরুগিন খাঁর ভাই হাছে—মণিবেগমের Spy হাছে—টুমাদের ভি ডোস্ট হাছে—হামার যাটায়াটের পঠ সব সময় খোলাসা হাছে।

মণিবেগম ॥ যাতায়াত তো অনেকদিন থেকেই ক'রছ—টাকাও খেয়েছ বিস্তর। কাজ তো কিছু দেখি না।

পিদ্রুস্ ॥ বড্ড কড়া হাদমি হাছে। হাজার টাকা নজর ডিলে একটা বাট্ কহিল।

মণিবেগম ॥ হাজার টাকা নজর লইয়া কি বাত কহিল?

পিদ্রুস্ ॥ লাখো রুপেয়া হানো!

মণিবেগম ॥ লাখো রুপেয়া আনো—লাখো রুপেয়ার জড়োয়া গয়নাই তো দিয়েছি।

পিদ্রুস্ ॥ গুরুগিন বোলে ও টাহার বিবির হইয়াছে—টাহার কি হইল?

মণিবেগম ॥ বেশ তো দুর্গ জয় হ'লেই দেবো।. এই শেঠজী জামিন থাকবেন। তা' হলেই তো হবে?

রায়দুর্লভ ॥ দুর্গা! দুর্গা!

জগৎশেঠ ॥ তা থাক্‌বো। দেখাই যাক্ না—গুরগিন খাঁ বেইমানি ক'রে কি করেন। কি বলেন রাজা রাজবল্লভ? পরীক্ষা—একটা পরীক্ষা ···আমরা তা হ'লে আসি।

পিদ্রুস্ ॥ হামি ভি ভাইকে পরখ করিয়া ডেখিটেছে—বুঝিলে শেঠজী ?

রাজবল্লভ ॥ নবাব উদয়নালার দুর্গে আছেন তো ?—

পিদ্রুস্ ॥ মুঙ্গেরে হাছেন বলুন।

জগৎশেঠ
রায়দুর্লভ
রাজবল্লভ } সর্বনাশ ! উদয়নালায় আসেন নি ?

পিদ্রুস্ ॥ হামি কাল ডুর্গের বাহিরে হাসিয়াছে। টাহার পরে কি হইয়াছে হামি জানে না।

জগৎশেঠ ॥ তবে যে শুনেছি কাল রাতে নবাব উদয়নালায় এসেছেন !

রাজবল্লভ ॥ সঠিক জেনে ফেরাই ভালো—

জগৎশেঠ ॥ বাল-বাচ্চা সব মুঙ্গেরে, না ফিরে উপায় কি ?

পিদ্রুস ॥ টাহ'লে শেঠজী হাপনি জামিন্ রহিল ?

জগৎশেঠ ॥ (মণিবেগম প্রভৃতির মুখের দিকে চাহিয়া) তা থাক্‌ছি।

পিদ্রুস্ ॥ লিখিয়া ডিন।

মীরজাফর ॥ ভিতরে চল। চল সাহেব।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ It is better to detain Petoruse here—পিদ্রুস্‌কে হাট্‌কাইয়া রাখিলে গুরগিন সিধা ঠাকিবে।

পিদ্রুস্ ॥ গুরগিনকে টোমরা জানে না। হামি টো হামি টাহার বিবিকে হাটক করিয়া টাহাকে ভয় ডরাইতে পারিবে না ! সে যাহা মন করিবে—টাহা করিবেই। টাহার মনটাই হামি বডলাইটেছে। এখন ডোনমনা হইয়াছে। ....বেগম সাহেব, হামার feet টা নগট ডিবেন। হার এক ডজন বিলাটী সরাব।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ গুরগিনখাঁ হামাডের কিরূপ সাহায্য করিটে পারে ? ডুর্গে টো হাউর সব বহুট্ General হাছে।

পিদ্রুস্ ॥ গুরগিন গোলন্ডাজ জেনারেল হাছে ! কামান সব out of order হইয়া মেরামট হইটে যাইটে পারে। গোলন্ডাজরা হাট গুটাইয়া বসিয়া ঠাকিটে পারে' কামানের মুখভি ঘুরিয়া যাইটে পারে।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ But what about access to the fort ? হামরা ডুর্গে যাইবার পঠ পাইটেছে না—! এক মা—স এখানে চুপ-চাপ বসিয়া হাছে। নজাফ খাঁ একটা গুপ্ট পঠে হাসিয়া হামাদের সাঠে গরিলা যুদ্ধ করিয়া পলাইয়া যায়—সে পঠটা কে বলিয়া ডিবে—

পিদ্রুস্ ॥ মনে হইলে সেটা হামি বলিয়া ডিবে—

জগৎশেঠ ॥ আমাদের ফিরতে হবে যে !

মীরজাফর। তাতো বটেই ! আসুন—আসুন।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Sentries ! Be on your guard !

সকলের শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান

গভীর রাত্রি—ইংরেজ-প্রহরী বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে

প্রথম ইং-প্রহরী ॥ (তাহার সঙ্গীকে) What's the time please ?

দ্বিতীয় ইং-প্রহরী ॥ 2 O'clock in the morning !

উভয়ে হাই তুলিল

প্রথম ॥ This bloody Ud a ynala shall be our grave ! Have yon a cigar ?

দ্বিতীয় ॥ As many as you like········ but you see, I am matchless !

প্রথম ॥ Say that to your Sweete, I have a match.

তাহারা সিগারেট ধরাইয়া খাইতেছিল—এমন সময় নজাফ খাঁ পরিচালিত একদল
নবাব-সৈনিক গুপ্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল ও হামা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল

প্রথম ॥ While we are rotting here, they are rioting over there —with wine and women !

দ্বিতীয় ॥ Let us hope, everything—theirs—shall be ours soon.

নজাফ খাঁ ইহাদের হঠাৎ গুলী করিল। ইহারা ভূপতিত হইল। নজাফ খাঁ
সসৈন্য ইংরাজ-শিবির লুট করিতে ছুটিল। চীৎকার গুলী ও আর্তনাদের
শব্দে আকাশ বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরেই নজাফ খাঁ
সসৈন্য শিবির হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া বাহিরে
আসিয়া রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।
পিদ্রুস্ কিন্তু আপাদমস্তক আবৃত হইয়া তাহাদের
অনুসরণ করিল। ইংরেজ সেনানায়কগণ
একে একে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Vanishid !

কার্নাক ॥ As if in the air !—

য়্যাডাম্‌স্ ॥ Thieves ! Plunderers' !

নন্দকুমার ছুটিয়া আসিল

নন্দকুমার ॥ নবাবের শিবির লুট ক'রেছে !

মীরজাফরের প্রবেশ

মীরজাফর ॥ উল্লুকরা আমার মুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে।

কার্ণাক ॥ হাবার ডিব—হাবার ডিব—চিল্‌হাইবেন না।

নন্দকুমার ॥ (মীরজাফরকে) বেগম সাহেবা··· আছেন তো ?

মীরজাফর ॥ না—না তিনি আছেন।

কার্ণাক ॥ বাঁচাইলেন। মুকুট গেলে মুটকু মিলবে—বেগম গেলে হার

মিলিবে না। Major Adams। এক মাস হইয়া গেল—হামারা কেবল হাঁ করিয়া উডয়নালা ডুর্গ ডেখিটেছি, হার ডেখিটেছি, কিছু করিয়া উঠিটে পারিটেছি না! This is quite unbearable।

য়্যাডাম্‌স্‌॥ পঠ পাইটেছি না। কোন পঠে যাইব। একঢারে রাজমহল হিলস্‌ হার ঢারে Ganges। সন্মুখে উডয়নালা; টাহার সেটু উহাডের। কোন পঠে যাইব!

অদূরে পাহাড়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া মণিবেগমের প্রবেশ

মণিবেগম॥ পথের ভাবনা ভেবো না সাহেব আর কিছুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। পথের সন্ধান এখনি মিলবে।

য়্যাডাম্‌স্‌॥ পঠের সন্ধান পাইলে রাট্রেই হামি attack করিব।

মীরজাফর॥ মণি! আমরা পথ পাবো এ তুমি কী বলছ?

মণিবেগম॥ এই ইংরাজকে একদিন পথের সন্ধান তুমি দিয়েছিলে পলাশীতে। আজ দেব আমি উদয়নালার। নজাফ খাঁর পিছে পিছে আমি লোক পাঠিয়েছি! সে পথ দেখে আসছে! পথ আমরা পাব!....আমরা....পাব! (পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখ—

সাহেবগণ॥ A figure! A man crawling।

সকলে সেই দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল। দেখা গেল আপাদমস্তক আচ্ছাদিত একটি মূর্তি ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

মণিবেগম॥ পথ আমরা পা—বো—পথ আমরা—পা—বো!

নন্দকুমার॥ এ ঘর-ভেদী বিভীষণের দেশ। পথের ভাবনা আমরা ভাবি না।

মূর্তি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্তিটি মুখাবরণ সরাইয়া ফেলিয়া হাত তুলিল

সকলে॥ (সবিস্ময়ে) পিদ্রুস্‌!

পিদ্রুস্‌॥ গুপ্ট-পঠের সন্ধান হামি পাইয়াছে—হন্ডকারে আ—লো—ক ডেখিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স্‌॥ Lead us on—Lead us on—

পিদ্রুস্‌॥ বেগম-সাহেবা হামার ফি?

মণিবেগম॥ আমার হাতের এই শেষ হীরক-বলয় নাও। উদয়নালা দখল ক'রিয়ে দিলে, পুরস্কার—আমার এই মুকুট!

পিদ্রুস্‌॥ হাপনি কিছু ভাবিবেন না—কিছু ভাবিবেন না বেগম সাহেবা। হামরা এ ডেশে টাকা করিটে হাসিয়াছে—টাকা পাইলে হাপনি যেমনটি বলিবেন—হামরা টেমনটি করিব। হামার নাম Coza Petrus আছে—পঠ হামি বাট্‌লাইবে. হামি উদয়নালা ডুর্গে যাইটেছে। টোপ্‌ ডাগিলে—জানিবে, লাইন ক্লিয়ার হাছে—Line clear!!

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়নালা দুর্গ

প্রমোদ-উন্মত্ত সেনানায়কগণ সম্মুখে নর্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে

সেতারের ঝিঞ্ঝিনি, নূপুরের কিঙ্কিনী
মঞ্জুল কিঙ্কিনী
ছন্দিত সুরে জাগি—
মোরা গীতি সঙ্গিনী।
নন্দিতা সঙ্গিনী
মরমের নাচ-ঘরে
প্রিয়তম খেলা করে
ভালবাসা বেচি-কিনি রঙে রঙে রঙ্গিনী
দেয়াশিনী রঙ্গিনী।

সৈয়দবান্দা ॥ হুং আচ্ছা—বাহোবা—বাহোবা—ওরে কেউ যা না—কোম্পানীর শিবিরে চ'লে যা—কয়েক বোতল বিলাতী সরাব চেয়ে আন—একবার সকলে মুখটা ব'দলে নি।

মুর্তাজা খাঁ ॥ দেবে কেন?

সৈয়দবান্দা ॥ তবে কর্জ ক'রে আনো—

মুর্জাতা খাঁ ॥ কর্জ! উঁহু, তা-ও দেবে না।

খানসামা ॥ পথ জানি না হুজুর—

সৈয়দবান্দা ॥ জাহান্নামের পথ—জানিস না উল্লুক?

খানসামা ॥ জানি হুজুর।

সৈয়দবান্দা ॥ সেই পথ—যা।

খানসামা ॥ যাচ্ছি হুজুর। [প্রস্থান]

মঁসিয়ে জেন্টিল ॥ ইংরেজ বলিয়া ঠাকে—Beg—Borrow—or Steal—ভিক্ষা মাগিবে—না পাইলে, কর্জ করিবে—কর্জ না পাইলে—চুরি করিবে।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল
নর্তকীগণের পুনরায় নৃত্যগীত

পিয়ালার সঙ্গীতে ঝরে রাঙা ঝরণা
মধু-তনু-অঞ্জলি বুক পেতে ধর না—
হৃদয়ের তাল গোনো
কানে কানে কথা শোনো
অধরের রীতি নীতি

চিনি সখা খুব চিনি—

অধরকে খুব চিনি।

উজীর খাঁ ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আমরা উদয়নালায় র'য়েছি—দুর্গে—না?

মুর্তাজা খাঁ ॥ হাসালে দেখ্‌ছি—মাত্রা কিছু বেশী হ'য়েছে—না?

উজীর খাঁ ॥ আমার যেন কেবলী মনে হচ্ছে—শ্বশুরবাড়ী এসেছি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

উজীর খাঁ ॥ গুলিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা ছিল—উদয়নালা আসবার হুকুম হ'ল। কোথায় যে এলাম ঠিক বুঝতে পারছি না—দূর ছাই—

গুর্‌গিন খাঁর প্রবেশ

গুর্‌গিন খাঁ ॥ ঠিক আছে—হাজ ভাল করিয়া ফুর্টি চালাও—কোম্পানী এটদিন বসিয়া আছে কিছু করিটে পারিল না—কাল হামরা কোম্পানীকে আক্রমণ করিব। কাল হইটে লড়াই সুরু হইবে হাজ ফুর্টিটা শেষ করিয়া ডাও। (ম'সিয়ে জেন্‌টিলের প্রতি) We have to attack to-morrow.

ম'সিয়ে জেন্‌টিল ॥ I know the orders. হামাদের পিদ্রুস্ টোমার খুঁজিটেছিল—ইংরেজের খবর হানিয়াছে।

গুর্‌গিন খাঁ। ভাই হইয়া হামার শত্রু হইয়াছে—উহার কথা হামায় বলিবে না।

সৈয়দবান্দা। গুর্‌গিন খাঁ বেশ লোক—কাজের সময় কাজ—না থাকে স্ফূর্তি কর—সরাব খাও—কোন মানা নেই। নাজাফ খাঁ বলেন সব সময় তৈরী থাক—লড়াইয়ে এলে স্ফূর্তি নেই—সরাব নেই। আমরা দো-টানায় ভাসছি। যাক, যতক্ষণ গুর্‌গিন খাঁর প্রভুত্ব আছে—সরাব খাও—স্ফূর্তি কর—কুছ্‌পরোয়া নেই। এই, দে উল্লুক।

সকলের মদ্যপান

মুর্তাজা খাঁ ॥ নাম নজাফ "খাঁ"—বল্‌বেন সরাব খেও না—তবে নাম নিয়েছেন কেন "খাঁ"। আজ থেকে আমরা ওকে বলব শুধু "নজা—ফ"।

অন্যান্য সেনানায়কগণ ॥ নজা—ফ! নজা—ফ।

ম'সিয়ে জেন্‌টিল ॥ Nazaf Khan believes in gurella warfare.

গুর্‌গিন খাঁ ॥ The sly fox that he is! হামি ওসব বুঝে না—হামি বুঝে—যে একটি হাঘাট হানিবে—হামি টাহার খুলিটে ডুইটি হাঘাট হানিব। যাহারা হামাদের শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করিটে ইচ্ছুক—চেষ্টা করিয়া দেখিটে পারে। হামি বুঝে বণ্ডুক কামান! হামার কামানের ভয়ে ইংরেজ এক মাস ভয়ে 'ঠ' হইয়া বসিয়া হাছে। কাল attack করিলে উহারা জাহাজ ভাসাইবে।

গুর্‌গিন খাঁ ও মসিয়ে জেন্‌টিলের অন্যদিকে গমন

মর্তাজা খাঁ ॥ এক মাস ব'সে আছি ইংরেজ একটা গুলী ছুড়ল না।

উজীর খাঁ ॥ আমার বন্দুকটার মরচে পড়ে গেছে—উঠছে না।

সৈয়দবান্দা ॥ সাহেবদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে—ওদের কয়েকটা বাইজী পাঠিয়ে দিলে হ'ত।

নেপথ্যে সোরগোল উঠিল

সকলে ॥ ব্যাপার কি—ব্যাপার কি?—

খানসামা ॥ নাজাফ খাঁ ইংরেজ শিবির লুঠ ক'রে ফিরলেন।

সকলে ॥ বেঁচে থাক নজাফ খাঁ—নজাফ খাঁ জিন্দাবাদ!!

সৈয়দবান্দা ॥ সরাব এনেছে—সরাব! বিলাতী সরাব?

মর্তাজা খাঁ ॥ নজাফ খাঁ আনবে সরাব?

সৈয়দবান্দা ॥ কিন্তু নজাফ খাঁর সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও কি নজাফ খাঁ! তারা কি ক'রল!

মর্তাজা খাঁ ॥ নজাফ খাঁ বরবাদ!!

খোজা পিদ্রুসের প্রবেশ

পিদ্রুস্ ॥ লেকেন, খোজা পিদ্রুস জিন্ডাবাড!! কি চিজ্ হামডানী করিয়াছে একবার ডেখিয়ে নিন—

মর্তাজা খাঁ ॥ চিজ্ তো আমাদের এখানেও আছে। সরাব আছে?—সরাব?

পিদ্রুস্ ॥ সরাভ ভি হাছে—জেনানা ভি হাছে, টোমার ডিশী নাচওয়ালী এবার ছুট্টি কর। বিলাটী সরাবের সাঠে বিলাটী নাচওয়ালীর নাচ বহুট্ হাচ্ছা লাগিবে—

আর্মেনিয়ান-নর্তকী নাচ আরম্ভ করিল

ইহার মধ্যে গুরগিন খাঁ আসিল; সে একদিকে বসিতেই পিদ্রুস্ একটা বোতল ও গ্লাস লইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল

পিদ্রুস্ ॥ Hallo brother!

গুরগিন খাঁ ॥ No, nonsence—p'ease! War to-morrow!

পিদ্রুস্ ॥ (গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে) Right you are; but war with whom?

গুরগিন খাঁ ॥ The English, of course!

পিদ্রুস্ ॥ Not with English wine, I suppose?

গুরগিন খাঁ ॥ (হাসিয়া) Certainly not.

মদ নিয়া খাইতে লাগিল

পিদ্রুস্ এত টাকা খাইয়া টুমি ডোনোমনো কেন করিটেছ?

গুরগিন খাঁ ॥ টাকা ডিটেছে—খাইটেছি। কোম্পানীর টাকার জোর কমাইটেছি- ইহার নাম গুরগিন খাঁর লড়াই।

পিদ্রুস্ ॥ (মদ দিয়া) আউর লাখ টাকা ভি ডিটে চায়।

গুরগিন খাঁ ॥ ডেও।

পিদ্রুস্ ॥ কামের পর ডিবে।

গুরগিন খাঁ ॥ কামভি পরে হইবে।

পিদ্রুস্ ॥ জগট্ শেঠ জামিন হাছে—ডেখিয়া লও—

জগৎশেঠের জামিন-নামাটা দিল

গুরগিন খাঁ ॥ এটা হামি রাখিয়া ডিলাম (পকেটে রাখিয়া) কাজে লাগিবে। ইংরেজের মডটা ভারী কড়া হাছে।

পিদ্রুস ॥ ইংরেজের সাটে কি লড়াই করিবে ?—ইংরেজের এক বোটল মডেই কাট্ হইলে।

গুরগিন খাঁ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ডেও।

মদ গ্রহণ ও পান

পিদ্রুস্ ॥ এটড়ুর হাগু হইয়া টুমি পিছাইয়া যাইবে—ধর্ম ভি হাছে, ঈশ্বর ভি হাছে।

গুরগিন খা ॥ ডেখো ভাই, নবাবের নিমক খাইটেছি।

পিদ্রুস্ ॥ কোম্পানীর মড খাইটেছ। কোনটী ডামী হাছে ?

গুরগিন খাঁ ॥ ডেখো ভাই। নবাব ভারী বিশ্ওয়াস কোরে।

পিদ্রুস্ ॥ বিশ্ওয়াস করে টো উদ্ধার হইয়া গেলে। এটকাল যে নবাবের নকরি করিলে, টলব ছাড়া আর কি মিলিল ? আর এখন ডেখ—মণিবেগম কেমন মণি ছড়াইটেছে—গুরগিন বলিয়া মণিবেগম অজ্ঞান হাছে!

গুরগিন খাঁ ॥ (মদ্যপান করিয়া) মণিবেগম হামাকে বহুট খাটির করে। মুর্শিডাবাডেও যখন নাচনেওয়ালি ছিল, উহাকে জানিটাম। হাজি ভি মনে রাখিয়াছে ?

পিদ্রুস্ ॥ টবে হাসল বাট্টা টুমি কি বুঝিলে ? (মদ্যপান) হীরার এই হাংটিটা পর—মণিবেগম টোমাকে ডিয়াছে! (আংটিটা গুরগিনের হাতে পরাইয়া দিল) ডেখ, কেমন মানাইয়াছে—কেমন ঝক্-মক্ ঝক্-মক্ করিটেছে!

গুরগিন খাঁ ॥ মণিবেগম ডিয়াছে ?—কি বলিয়াছে ?

পিদ্রুস্ ॥ কোম্পানী ডুর্গে ঢুকিরে, টুমি গোলন্ডাজ-সৈন্য হাটে রাখিবে—লড়াই করিবে না!

গুরগিন খাঁ ॥ ডেখো ভাই, মন করিলে হামি এখনো নবাবটাকে খাড়া রাখিটে পারে।

পিদ্রুস্ ॥ মণিবেগমের হাংটে হাটে পরিয়া আর টাহা পারে না !

গুরগিন খাঁ ॥ মণিবেগমকে হামি জানিটাম—নাচনেওয়ালি ছিল, বেগম হইয়া গেল—

পিদ্রুস্ ॥ গজ মাপিয়া কাপড় বেচিটে গুরগিন খাঁ হইয়া গেলে ! ও বেগম হইয়াছে—টুমিও নবাব হইতে পার। হ্যাঁ, মণিবেগম বলিয়াছে—হ্যাঁ, আমি ভি বলটেছে !

গুরগিন খাঁ ॥ নবাবটা হামার মুখের দিকে চাহিয়া হাছে।

পিদ্রুস্ ॥ ঐ এক কঠা টুমি জানো !

গুরগিন খাঁ ॥ ডেশটা ডুবিয়া যাইবে।

পিদ্রুস্ ॥ টাহাটে হামাডের কি হাহে ? হামরা আর্মেনিয়ান হাছে। বাঙালী হইয়া যডি বাংলা না রাখিটে পারে, হামরা রাখিয়া ডিব। এ কেমন কঠা হাছে ?

গুরগিন খাঁ ॥ হামার মাঠাটা গুলাইয়া যাইটেছে—ইংরেজের মড ভারী কড়া হাছে।

মদ্যপান করিতে লাগিল। পিদ্রুস্ আর্মেনী-নাচওয়ালীদের ইঙ্গিতে ডাকিল। নাচিতে নাচিতে তাহারা আগাইয়া আসিল। সেনানায়কগণ তাহাদের পিছু পিছু টলিতে টলিতে আসিতে লাগিল
উজীর খাঁর প্রবেশ।

উজীর খাঁ ॥ শ্বশুরবাড়ি না হ'য়ে যায় না ! সবই মিলে যাচ্ছে—কেবল মিলছে না শ্বশুর—শাশুড়ী আর—

সকলে। আর ?

উজীর খাঁ ॥ আমার গফুরের মা।

সকলে হাসিয়া উঠিল

গুরগিন খাঁ ॥ মনে হইলে হামি কি না পারে—সব পারে !

পিদ্রুস্ একটি আর্মানী-নর্তকীকে ইঙ্গিত করিল। পান-পাত্র তাহার হাতে দিল। নর্তকী সে পান-পাত্র গুরগিনের সামনে ধরিল

গুরগিন খাঁ ॥ (সেই নর্তকীকে) এই জানো ? রাজাকে আমি উজী—র করিটে পারে—উজীরকে ফকির করিটে পারে—ফকিরকে রা—জা করিটে পারে।

পিদ্রুস্ ॥ নিজে রাজা হইটে পার না····

গুরগিন খাঁ ॥ পারি সোভি পারি।—(মদ্যপান ; হঠাৎ পিদ্রুসের প্রতি বজ্রকণ্ঠে) এই উল্লুক। টুই মডে নিমক ডিয়াচিস্ ? নবাবের নি—মক।—

পিদ্রুস্ ॥ হার এক ডফে টানিলেই নামিয়া যাইবে।

গুরগিন খাঁ ॥ (পিদ্রুসের চোখে চোখে চাহিয়া মদ্য-পাত্র হাতে নিল। হঠাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিল)

পিদ্রুস্ ॥ নামিয়া গিয়াছে ?

গুরগিন খাঁ ॥ গিয়াছে। আ। নবাবের নিমক নামিয়া গেল, নবাবের নিমক নামিয়া গেল।

অভিভূতের মত বসিয়া পড়িল

পিদ্রুস্ ॥ (উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া) কি রকম ফুর্টি টোমরা করিটেছ—কেহ জানিটেছে না। কোম্পানীর লোকেরা ভাবিটেছে, টোমরা নাকে টেল ডিয়া ঘুমাইটেহে ! Shame ! একটা টোপ ডাগিয়া ডাও—উহারা জানিয়া লউক, টোমরা সরাব খাইটেছ।—বিবিরা নাচিটেছে ! হামার ভাই হার হামি গলাগলি ধরিয়া বসিয়া হাছে। বিশ্ওয়াস না হয় দেখিয়া যাক।

গুরগিন বাদে সকলে। তোপ দাগো ! তোপ দাগো !

গুরগিন খাঁ ॥ No ! No ! That must be a signal—They will come ! টাহারা এখনি চালিয়া আসিবে !

পিদ্রুস্ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—হামার ভাই খোয়াব ডেখিটেছে ! টোপ ডাগো ! টোপ ডাগো ! নাচো—গাও—ফুর্টি চালাও। টোপ ডাগিবার ব্যবস্থা করিটে হামি নিজে যাইটেছে। [প্রস্থান]

গুরগিন খাঁ ॥ Wait ! Rather wait ! পিদ্রুস্ ! পিদ্রুস্ !

কিন্তু একটি আর্মানী নর্তকী নাচিবার ছলে
তাহার পথরোধ করিল।

গুরগিন খাঁ ॥ Hopeless ! Hopeless !

নেপথ্যে তোপধ্বনি।—নৃত্যগীত থামিয়া গেল
গুরগিন খাঁ ছুটিয়া যাইতেছিল—আর্মানী নর্তকী তাহাকে
ধরিয়া বসাইল ও ঘন ঘন তাহাকে
মদ জোগাইতে লাগিল

গেল ! সব গেল। টোমরা সবাই মিলিয়া হামাকে ডুষমন করিলে ! কর ! (মদ্যপান)

ছুটিয়া নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ ॥ তোপধ্বনি ! কে এ তোপধ্বনি ক'রল !—কেনএই তোপ ধ্বনি !····

নেপথ্যে ইংরেজের তোপধ্বনি। চীৎকার !—গোলমাল !—
"কোম্পানীর ফৌজ !"
"কোম্পানীর ফৌজ !"
"কোম্পানীর ফৌজ !"

নজাফ খাঁ ॥ কোম্পানীর ফৌজ! গুরগিন খাঁ। গুরগিন খাঁ! কোম্পানীর ফৌজ আক্রমণ ক'রেছে। কিন্তু পথ দেখালে কে? পথ দেখালে কে! কে সে বেইমান! (গুরগিনকে ধাক্কা দিয়া) গুরগিন! গুরগিন!

গুরগিন খাঁ ॥ টুমি কে হাছে? মণিবেগম! হামি ঠিক হাছে···হামি ঠিক হাছে··টুমি হামাকে হাৎটি দিয়াছে··হারো লাখ টাকা ডেবে।

জামিন-নামাখানা বাহির করিল

নজাফ খাঁ ॥ (জামিন-নামা কাড়িয়া লইয়া দেখিয়াই) লাখ টাকায় তুমি আমাদের সাতকোটি হিন্দু-মুসলমানের সোনার বাঙলার স্বাধীনতা বিক্রী ক'রেছ! বেইমান! বিশ্বাসঘাতক—(গুলী করিল) নবাব, নবাব, উদয়নালা হ'ল আমাদের দ্বিতীয় পলাশী—

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল; চতুর্দিক হইতে বিউগল ও
গুলীর আওয়াজ আরম্ভ হইল

গুরগিন খাঁ ॥ বিশ্বাসঘাটক! বেইমান! না—না—হামি বেইমান হোবে না! বিশ্বাসঘাটক হোবে না, নবাব হামার মুখের ডিকে চাহিয়া হাছে—ডেশটা ডুবিয়া যাইবে। না—না—না! বেইমান হামি হোবে না।

ইংরেজ সৈন্যকে দেওয়াল টপকাইয়া ঢুকিয়া পড়িতে দেখিয়া

Fall in! Fire! Fire! Fire!

ইংরেজ সৈন্যকে গুলী করিতে লাগিল

য়্যাডাম্‌স্‌ ॥ Fire!

ইংরেজ সৈন্য গুরগিন খাঁকে গুলী করিয়া অন্যত্র ছুটিল

গুরগিন খাঁ ॥ নবাব! নবাব! হামি বেইমান ছিলাম না—এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ! এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ! হামি কি করিবে! হামি কি করিবে! (মৃত্যু)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গ-প্রাসাদ

ফতেমা বেগম

গান

মন কাঁদিয়ে কেবল কাঁদে রক্তমাখা লাল-পলাশী
সেই সিরাজের লাল-পলাশী,
অন্ধকারে আজও সেথায় মৃত্যু-রাখাল বাজায় বাঁশী,
বাজায় ভাঙা-হাড়ের বাঁশী।
প্রভাত-আলোয় ছদ্মবেশে রাত্রি সেথায় নিত্য এসে
তন্দ্রা-তানে ছন্দ তোলে শুনছে যত কবর-বাসী
জ্যান্ত যত কবর-বাসী।
সোনার পুরে উড়ছে ধুলো,
জ্বলছে ধু ধু শ্মশান চুলো,
কঙ্কালে কে জীবন দেবে
অশ্রুজলে দুলিয়ে হাসি—
দৃপ্ত প্রাণের মুক্ত হাসি ॥

মীরকাশিমের প্রবেশ

মীরকাশিম ॥ বেগম! বেগম! আজ আনন্দের দিন! উৎসবের দিন! আজ তোমার কণ্ঠে এ করুণ সঙ্গীত কেন?

ফতেমা ॥ এ গান আমি গাইতে চাইনি জনাব! অথচ এই গানই—কেন জানি না—আমার কণ্ঠে আসছে!

মীরকাশিম ॥ আমি জানি—আমি জানি—কেন আসে এই গান। কিন্তু এ গান আজ আমরা গাইব না। আজ গাইতে হবে আনন্দের গান—উৎসবের গান।

নেপথ্যে জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ফতেমা ॥ জয়-বাদ্য বাজছে! উদয়নালায় তবে আমাদের জয় হয়েছে! প্রভু! স্বামী! ঈশ্বর!

মীরকাশিম ॥ জয়ের সংবাদে নয় প্রিয়া! জয়ের আশাতে, আমারই আদেশে বাজছে জয়-বাদ্য!

ফতেমা ॥ আশা ।…

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ আশা ! মানুষের পক্ষে যা সম্ভব উদয়নালায় আমি তা ক'রেছি। দুর্ভেদ্য দুর্গ—অগণিত সৈন্য—অপর্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র—পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় সৈন্য !

ফতেমা ॥ পলাশীতেও তাই ছিল জনাব !

মীরকাশিম ॥ ঠিক ব'লেছ ফতেমা, পলাশীতেও তাই ছিল। সিরাজের পরাজয় ছিল অসম্ভব—জয় ছিল অনিবার্য—অথচ পরাজয়ই হ'ল !—আমাদের বেইমানিতে অসম্ভবও হ'ল সম্ভব। আজও যদি পরাজয় হয়—একমাত্র বেই-মানিতেই হবে !

ফতেমা ॥ কিন্তু দেশের কি আজও শিক্ষা হয়নি ? পলাশীর পরাজয়ের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর কেটে গেছে—সে পরাজয়ের অর্থ দেশবাসী আজো কি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেনি ? বিদেশী বণিকদের হাতে মানদণ্ডের বদলে আজ রাজদণ্ড চ'লে যেতে ব'সেছে—যাদের আজ বিচার হওয়ার কথা তারাই আজ আমাদের বিচার ক'রতে ব'সেছে—এর অর্থ কি, দেশবাসী আজো কি তা বুঝতে পারছে না ?

মীরকাশিম ॥ না, পারছে না। তা যদি ক'রত তবে আবার তারা আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহায্য ক'রছে কেন ?

ফতেমা ॥ তারা কি জানে না, কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ শুধু দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য।

মীরকাশিম ॥ তারা জেনেও কিছু জানে না—বুঝেও কিছু বোঝে না, তারা জানে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ;—দেশের বাণিজ্য যাক—শিল্প যাক—তাদের নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষা হ'লেই তারা সুখী ; তারা দেশ বোঝে না—দেশ চায় না ! বেইমান স্বার্থপর !

ফতেমা ॥ এই বেইমানদের কি শেষ নেই ! এদের কি ধ্বংস নেই ?

মীরকাশিম ॥ সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমার এই উৎসব। আজ প্রভাতে নবাব-সৈন্য ইংরেজকে আক্রমণ ক'রবে আদেশ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে জয়-বার্তা প্রতীক্ষা ক'রছি। শুধু তাই নয় · জয়োৎসবের ব্যবস্থা পর্যন্ত ক'রেছি। বেইমানরা মুখে আমার জয়-ধ্বনিও ক'রছে—কিন্তু অন্তরালে আমার পরাজয়ের আয়োজনও ক'রছে ! আজ তাদেরই জন্য আমার এই উৎসব ! কাল প্রাসাদে আমি আত্মগোপন ক'রে থেকে রটনা ক'রে দিয়েছিলামঃ আমি উদয়নালা দুর্গ পরিদর্শন ক'রতে গিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ জগৎশেঠ, ঐ রায়দুর্লভ, ঐ রাজবল্লভ—নিশ্চিন্তমনে ইংরেজ শিবিরে গিয়ে উপস্থিত ! আজ প্রত্যূষে অতি গোপনে তারা মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন ক'রেছে। তাদের প্রত্যেককে আমি নিমন্ত্রণ ক'রেছি আমার এই উৎসবে ! আজ যদি উদয়নালায় আমাদের পরাজয় হয়—

তা'হলে এইখানেই বাংলার এই সেরা বেইমানদের—ধ্বংস ক'রে—আমরা আলিঙ্গন ক'রব মৃত্যু··· হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু ! . .

ফতেমা ॥ মৃত্যুতে তো প্রায়শ্চিত্ত হবে না, প্রিয়তম ! 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' তোমার প্রতিজ্ঞা। আমাদেরই পাপে যদি স্বাধীনতা যায়—আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে পরাধীনতা দূর করবার সাধনা- মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেই হবে আমাদের সাধনা—সেই হবে আমাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'।—যদি পার সে-সাধনা গ্রহণ করবার পূর্বে নির্মূল কর বেইমানদের—নির্মূল কর বাংলার মীরজাফরদের—

মীরকাশিম ॥ ঐ তারা আসছে—তুমি অন্তরালে অবস্থান কর ; স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়—পরাধীনতা দূরে করবার সাধনা নিয়েই যাব ভারতের গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে—কিন্তু স্বাধীন দেশের চেয়ে পরাধীন দেশে যারা হবে ভীষণতর দুষমন—স্বাধীনতার এই সমাধিতে সেই বেইমানদের ধ্বংস ক'রে তবে আমরা যাব। [ফতেমার প্রস্থান]

উৎসব-বাদ্য বাজিয়া উঠিল—জগৎশেঠ প্রভৃতি আমীর ওমরাহগণ প্রবেশ করিলেন। মীরকাশিম হর্ষোৎফুল্ল আননে তাঁহাদের সহিত অভিনন্দন-বিনিময় করিলেন

রায়দুর্লভ ॥ জনাব ! হঠাৎ এই উৎসব ?

মীরকাশিম ॥ বলুন তো কেন ?

জগৎশেঠ ॥ নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ'য়েছে। উদয়নালায় ইংরেজদের আমরা বোধ হয় সবংশে নিধন ক'রেছি।

রাজবল্লভ ॥ মীরজাফরকে বধ করা হ'য়েছে তো ?

মীরকাশিম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—আপনি কি বলেন, মীর্জাইরাজ খাঁ ?

মীর্জাইরাজ খাঁ ॥ যদি তাকে বধ করা না হয়ে থাকে, ঐ আদেশটি আমায় দিন, জনাব। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে উদয়নালায় তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, জনাব আমায় সে সুযোগ দেন নি—আমার জীবনে যে কি জ্বালা, তা কি ব'লব, জনাব !

মীরকাশিম ॥ শান্ত হন—শান্ত হন। আপনি কি বলেন সৈয়দমহম্মদ খাঁ ?

সৈয়দমহম্মদ খাঁ ॥ উদয়নালায় আমাদের জয় না হ'য়ে যায় কোথায়। তকী খাঁ জীবিত থাকলে, অবশ্য, আমার সন্দেহ ছিল। ঐ কাটোয়াতেই আমি ইংরেজ নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতাম, পারলাম না শুধু তকী খাঁর—হঠকারিকতায়। যত বলি সব ইংরেজ আসুক, এক সঙ্গে মারব—শুনল না ? যাক্—দু' একটা ইংরেজ বেঁচেছে, না সবংশে ?

রায়দুর্লভ ॥ মীরজাফরের কী হ'য়েছে ? বধ করা হ'য়েছে তো ? শত্রুর শেষে রাখতে নেই—শত্রুর শেষ রাখতে নেই !

মীরকাশিম ॥ উদয়নালায় ইংরেজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস—মণিবেগম বন্দিনী —মীরজাফর বধ…

নবাবের প্রতি কথায় জগৎশেঠের মুখ চোখের পরিবর্তিত ভাব
দেখিয়া নবাব কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন।

(ক্ষণেক থামিয়া ইহাদের অনুচ্চারিত আর্তনাদ উপভোগ করিবার পরে বলিলেন) এই শুভ সংবাদ—পাবো এই আশায়—আজ এই উৎসব।… উৎসব ! উৎসব !

জগৎশেঠের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

সকলে। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

মীরকাশিম ॥ আজ প্রভাতে যুদ্ধ সুরু হ'য়েছে। এখনো জয়বার্তা আসছে না কেন শেঠজী ?

জগৎশেঠ ॥ না এলেও এল ব'লে।

রায়দুর্লভ ॥ ধ'রে নিন্—এসেছে।

রাজবল্লভ ॥ তা নয় তো কি !

সৈয়দমহম্মদ ॥ তকী খাঁ যদি বেঁচে থাকতো আমার সন্দেহ ছিল।

মীর্জাইরাজ খাঁ ॥ যদি বধ না হ'য়ে থাকে, তাকে গুলি করবার ভারটা আমায় দিন জনাব।

মীরকাশিম ॥ আমার মনে হচ্ছে, কী কাজ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে। সন্ধি ক'রলে কেমন হয় ?—

সকলে ॥ তা—তা—

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল

মীরকাশিম ॥ (জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ও রাজবল্লভকে) আপনারা নৌকা-যোগে উদয়নালায় ইংরেজ-শিবিরে—

তিনজনেই চমকাইয়া উঠিলেন

একবার যাবেন ?

ইঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন

জগৎশেঠ ॥ না জনাব। কোন আবশ্যক নেই।

রায়দুর্লভ ॥ ইংরেজ-শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার অপমানের চেয়ে, আমাদের—আর যে-কোন শাস্তি দিতে চান, দিন।

রাজবল্লভ ॥ সেখানে মীরজাফর র'য়েছে। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে, যে-হাসি হাসবে তা সইতে পারব না জনাব।

মীর্জাইরাজ খাঁ ॥ দেশটাকে ডোবাতে পারব না জনাব।

জগৎশেঠ ॥ এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। গুর্গিন খাঁ রয়েছে—মঁসিয়ে জেন্টিল—ইংরেজ যাবে কোথায় ?

মীরকাশিম ॥ বেশ! তবে সকলে স্ব স্বস্থানে উপবেশন করুন, উৎসব আরম্ভ হোক।

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি আরম্ভ হইল
সমরুর প্রবেশ

সমরু ॥ নবাব—জরুরি খবর হাছে—

মীরকাশিম ॥ কি সংবাদ সমরু ?

সমরু ॥ হামি যটবার কহিতেছে ডুষমনডের শেষ করিয়া ডি—নবাব কান ডিটেছেন না—এবার টাহাডের কান্ড দেখুন।

জগৎশেঠ প্রভৃতি চমকাইয়া উঠিলেন। তাহাদের পরম উদ্বেগ।

মীরকাশিম ॥ তুমি কাদের কথা ব'লছ সমরু!

সমরু ॥ মুঙ্গেরের ইংরেজ-লোক।

মীরকাশিম ॥ তারা তো নজরবন্দী র'য়েছে।

সমরু ॥ চাকর খান সামাডের ডিয়া গোলা-গুলী-বণ্ডুক জোগাড় করিটেছে—ঘুষ দিয়া প্রহরীডের হাট করিয়াছে—

মীরকাশিম ॥ হুঁ! এখানেও উৎকোচ! উদয়নালার সংবাদ কিছু পেয়েছ সমরু ?

সমরু ॥ না জনাব!

মীরকাশিম ॥ তা হ'লে—আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা ক'রতে হবে। এখানকার সব প্রস্তুত ?

সমরু ॥ সবই টৈয়ার জনাব।

মীরকাশিম ॥ তুমি আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক। [সমরুর প্রস্থান]

নবাব রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইলেন
রাজা রাজবল্লভ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

রাজবল্লভ। মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি।

মীরকাশিম ॥ রাজা-সাহেব, দেশপ্রেম সবে আপনার বুকে সাড়া দিয়েছে। তাই ঐ বুকে আজ দ্রুত স্পন্দন, দুরু দুরু কম্পন।

জগৎশেঠ ॥ উদয়নালার খবর এখনো আসেনি জনাব ?

মীরকাশিম ॥ উদয়নালার খবরের অপেক্ষাই করছি শেঠজী। কি খবর আসবে বলুন তো ?

জগৎশেঠ ॥ আপনার বিজয়-বার্তা ?

মীরকাশিম ॥ তা হ'লে আজ সারারাত এই গঙ্গার বুকে চ'লবে আমাদের নৌ-বিহার।

রায়দুর্লভ ॥ কি প্রবল স্রোত এখানকার গঙ্গায়!

মীরকাশিম ॥ গা যখন ভাসিয়েই দিয়েছি, তখন স্রোতে আর ভয় কি রাজা-সাহেব।

রাজবল্লভ ॥ বুরুজের নীচে ···গঙ্গা গর্ভে প্রকাণ্ড একটা ঘূর্ণি—

মীরকাশিম ॥ রাজা রাজবল্লভ। বুরুজে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণি দেখে শিউরে উঠলেন। আর আমি কতবার দেখেছি আরোহী-সমেত কত নৌকা ঐ ঘূর্ণির বেইমানিতে পড়ে অতলে তলিয়ে গেছে।···উদয়নালায় যদি পরাজয় হয়—

রাজবল্লভ ॥ তা হ'লে কি জনাব?

মীরকাশিম ॥ বলুন তো রাজা রাজবল্লভ, বলুন শেঠজি, বলুন তো রাজা রায়দুল্লভ, উদয়নালায় পরাজয় হ'লে আমরা কি ক'রবো। (সকলে চুপ করিয়া রহিল) কেউ ব'লতে পারছেন না! উদয়নালায় পরাজয় হ'লেও আমরা নৌ-বিহার ক'রবো—

জগৎশেঠ ॥ কিন্তু বুরুজের নীচেকার গঙ্গার ওই ঘূর্ণি—?

মীরকাশিম ॥ উৎসবে যখন মন মেতে উঠবে তখন গঙ্গার জলের ঐ ঘূর্ণির ভয়ে কে তীরে ব'সে থাকবে! উৎসব! উৎসব! আবার সুরু হোক—নাচের উৎসব, গানের উৎসব ···

নেপথ্যে আসন্ন ধ্বংসের আগমনী বাদ্য যেন বাজিতে লাগিল।

রাজবল্লভ ॥ জনাব! জনাব!

মীরকাশিম তাহার কাছে আগাইয়া গেলেন।

মীরকাশিম ॥ একি! রাজা রাজবল্লভ! আপনার কপালে ঘাম কেন?

রাজবল্লভ ॥ ওই বাজনা বন্ধ ক'রতে আদেশ দিন, জনাব। আমি উৎসব সইতে পারছি না।

রায়দুর্লভ ॥ জনাব, উদয়নালার সংবাদের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে র'য়েছি। উৎসব আমাদের ভালো লাগছে না—উৎসব বন্ধ করুন জনাব—

মীরকাশিম ॥ আপনারা বলছেন কি রাজা? উদয়নালার বিজয়বার্তা আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাই তো আমার মন আজ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। আপনারা মিছে চঞ্চল হবেন না। উৎসব! উৎসব! হাঃ হাঃ হাঃ আজ নিশ্চিন্ত উৎসব ··

অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

রায়দুর্লভ ॥ (মীরকাশিমকে দেখাইয়া) মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি!

রাজবল্লভ ॥ আমার ভয় হচ্ছে রায়দুর্লভ। ওর ওই হাসি, ওর ওই পরিহাস—আমার ভাল লাগছে না; মনে হচ্ছে, ওর মনের কোণে যেন রয়েছে কোন গূঢ় অভিসন্ধি।

জগৎশেঠ ॥ রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ, দীর্ঘকাল আমরা এক সঙ্গে

রয়েছি, বন্ধুত্ব আমাদের আজও অটুট! যদি বিপদ কিছু হয়, আমাকে ত্যাগ ক'রবেন না—

মীর্জাইরাজ ॥ ঐ আবার আসছে এই দিকে!

মীরকাশিম ॥ হাঁ, আপনাদের জিজ্ঞাসা করি—আপনারা বলুন তো! বলুন তো, উদয়নালায় যদি আমাদের পরাজয় হয়, তা'হলে আমরা কি করব!

সকলে মহাবিপদে পড়িলেন। মীরকাশিম তাহাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিলেন।

ব'লতে পারছেন না? ব'লতে পারছেন না? তা হ'লেও আমরা উৎসব করব।

জগৎশেঠ ॥ তা হলেও আমরা উৎসব ক'রব?

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ শেঠজী! গঙ্গায় নৌ-বিহার। ওই দূরে চেয়ে দেখুন—ঐ দূরে, একখানা কালো মেঘ! ঐ মেঘ বড় হ'য়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে; ঐ মেঘের রূপ দেখে গঙ্গা ফুলে ফুলে দুলে উঠবে, সেই রূপ দেখে মেঘ গ'লে যাবে, জল হবে, ঝড় হবে। সেই জলে ঝড়ে, ফুলে ওঠা গঙ্গার বুকে, আঁধারে, নিকষ কালো আঁধারে, আজ হবে—নৌ-বিহার! জীবনের পরম উৎসব—! চরম উৎসব! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

সকলে ॥ জনাব! ! জনাব!

নজাফ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

নজাফ খাঁ ॥ জনাব! সর্বনাশ হ'য়েছে! আমাদের শেষ প্রয়াসও—

মীরকাশিম আড়ষ্ট হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কহিলেন—

মীরকাশিম ॥ শেষ প্রয়াসও ব্যর্থ হ'য়েছে?

নজাফ খাঁ ॥ গুর্‌গিন খাঁ বেইমানি ক'রে উদয়নালা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছে।

মীরকাশিম ॥ গুর্‌গিন! অবশেষে গুর্‌গিন!—

নজাফ খাঁ ॥ লক্ষ টাকার বিনিময়ে!

মীরকাশিম ॥ মাত্র লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

নজাফ খাঁ ॥ এই শেঠজীই তার জামিন!

মীরকাশিম ॥ শেঠজী…

জামিন-নামা দেখাইল

রাজা রাজবল্লভ }
রায়দুর্লভ } জনাব, আমরা এর কিছুই জানি না…

মীরকাশিম ॥ না, না, আপনারা কিছুই জানেন না····ঐ····ঐ মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, ঐ শুনুন তার ডমরু-ধ্বনি, প্রস্তুত হোন আপনারা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হোন, অন্ধকারে গঙ্গার বুকে নৌ-বিহার! প্রস্তুত হোন····সমরু··· সমরু হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিদ্যুৎ, ডমরু, প্রলয়বাদ্য, নবাবের অট্টহাস্য। সদলবলে সমরু আসিয়া বেইমানদের বধ করিল। নবাবের অট্টহাস্যের মধ্যে যবনিকা পড়িল।

●

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ

সুবিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীর নিম্নস্থ প্রাঙ্গন

ফতেমা বেগম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ

ফতেমা ॥ পেলে?

নজাফ খাঁ ॥ না মা!

ফতেমা ॥ এখানেও নেই—

নজাফ খাঁ ॥ তা'হলে গেলেন কোথায়!

ফতেমা ॥ বাদশার সঙ্গে কিছুতেই দেখা ক'রতে না দেওয়ায় আজ এখানে যখন বাদশা নামাজ পড়তে আসবেন তখন পথে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমায় বলেছিলেন।

নজাফ খাঁ ॥ আমায়ও তা বলেছিলেন। আমি তখনি নিষেধ ক'রেছিলাম।

ফতেমা ॥ আমিও নিষেধ করেছিলাম। চারদিকে শত্রু! চারদিকে কোম্পানীর গুপ্তচর!

নাজাফ খাঁ ঃ 'ধরিয়ে দিলে লক্ষ টাকা—' কোম্পানীর সেই ইস্তাহার দেখ্‌লাম এখানেও বিলি হ'য়েছে।

ফতেমা ॥ আমাদের দিল্লীতে আসা একেবারেই উচিত হয়নি।

নজাফ খাঁ ॥ বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন, আমার এখন মনে হ'চ্ছে বাদশাই ওঁকে ধরিয়ে দেবেন।

ফতেমা ॥ বলে, বাদশা ওঁর দোস্ত—

নজাফ খাঁ! চুপ! মনে হ'চ্ছে কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে। আমরা ওদিকটা দেখে আসি— [ফতেমা সহ প্রস্থান]

উজীর মাজাদউদ্দৌল্যা ও কর্ণেল কামিংসের চর আতাউল্যা খাঁর প্রবেশ। তাহারা একধারে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন

আতাউল্যা ॥ আর কতক্ষণ এখানে বিলম্ব হবে জনাব ?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ নামাজের পরই যাব।

আতাউল্যা ॥ কিন্তু আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে। কর্ণেল কামিংস চ'টে যাবেন। আপনার উত্তর নিয়ে আমার আজই সন্ধ্যায় ফিরবার কথা।

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ এত ব্যস্ত কেন ?

আতাউল্যা ॥ উদয়নালা যুদ্ধের পর আজ কত বৎসর পার হ'য়ে গেল—আজো ইংরেজ মীরকাশিমকে ধ'রতে পারল না—মুঙ্গেরে পাঠনায় ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারল না, ইংরেজের চ'ক্ষে ধুলো দিয়ে মীরকাশিম বাঙলা ছেড়ে পালিয়ে গেল—অথচ কেউ তা জানল না—বিলেতের সাহেবরা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠেছেন।

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ ক্ষেপে উঠেই বা ক'রছেন কি! আমি চিঠি দিয়েছিলাম ব'লেই না আজ তাঁরা জানতে পেরেছেন মীরকাশিম এখানে!

আতাউল্যা ॥ সে তো বটেই। আপনার মত লোক দেশে আছে বলেই না ইংরেজদের ভরসা। তাঁরা আপনারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে রয়েছেন।

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ আমার উপর নির্ভর ক'রে র'য়েছেন ব'লবেন না। তাঁরা বাদশার ওপর নির্ভর করেছেন বলুন। তাঁর কাছে পর পর দু'খানা আর্জি পেশ ক'রেছেন।

আতাউল্যা ॥ মীরকাশিম বাদশার প্রাপ্য সুবে-বাংলার রাজস্ব নিয়ে পালিয়েছে, বাদশা তাকে ধরুন—অপহৃত রাজস্ব উদ্ধার করুন।—

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ বাদশা কি বলেন জানেন ?

আতাউল্যা ॥ কি ?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ বাদশা বলেন তিনি যখন পাটনায় অর্থহীন হ'য়ে পড়েছিলেন, তখন মীরকাশিম তাঁকে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। জীবনে তার ঋণ প্রতিশোধ ক'রতে পারবেন না—

আতাউল্যা ॥ কোম্পানী বলে, বাদশা যদি কোন প্রকারে মীরকাশিমকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেন ইংরেজ জাতি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকবে।

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ এর উত্তরে বাদশার কি উত্তর—শুনবেন ?

আতাউল্যা ॥ কি জনাব ?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ মীরকাশিম বাদশার স্বজাতি—স্বধর্মী। বিদেশী বিধর্মীর হাতে তাকে ধরিয়ে দেবেন এমন নরাধম—বাদশা নন্।

আতাউল্যা ॥ কিন্তু এতে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে না কি ?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ উদয়নালায় হেরে গিয়ে মীরকাশিম যখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্যার আশ্রয়ে ছিল—ইংরেজরা ঠিক এইরূপ আর্জিই সুজাউদ্দৌল্যার কাছেও পেশ করেছিল। কিন্তু সুজাউদ্দৌল্যা কি ক'রল।

আতাউল্যা ॥ মীরকাশিমের ধনরত্ন লুট করে নিয়ে মীরকাশিমকে তাড়িয়ে দিল।

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ কিন্তু ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেন নি তো? এর কারণ আর কিছু নয়, মীরকাশিম সুজাউদ্দৌল্যার স্বধর্ম্মী। মীরকাশিম যদি একবার কোনমেতে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারে—বাদশা তাকে আশ্রয় দেবেন—ইংরেজের হাতে সমর্পণ ক'রবেন না—ইংরেজের হাতে শত্রুতার ভয়েও না!

আতাউল্যা ॥ তা হ'লে উপায়? আপনি জানিয়েছেন মীরকাশিম দিল্লীতেই রয়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ হ্যাঁ। দিল্লীতেই সে এসেছে। এসেই বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়—কিন্তু আমি তাকে সাক্ষাৎ ক'রতে দিই নি—বাদশাকে জানতেও দিই নি যে সে এসেছে।

আতাউল্যা ॥ আপনি নায়েব উজীর ব'লেই এটুকু সম্ভব হয়েছে। দয়া করে এইবার তাকে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ কাজটা যত সোজা মনে করছেন, তা নয়।

আতাউল্যা ॥ আমরা সংবাদ পেয়েছি ওর সঙ্গে যে তিন হাজার লোক কয়েকমাস আগেও ছিল, এখন তা নেই—সবাই ক্রমে ক্রমে খসে পড়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ তারা, ওর যা ছিল সব লুটে পালিয়েছে! এখন সঙ্গে আছে শুধু বেগম, আর আছে দু'চারজন বিশ্বস্ত অনুচর।

আতাউল্যা ॥ তবে ওকে ধ'রতে আর অসুবিধা কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ যদি বাদশা জানেন, কারো রক্ষা থাকবে না।

আতাউল্যা ॥ যাতে বাদশা না জানেন এই ভাবে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ মজুরি পোষাবে না।

আতাউল্যা ॥ কেন! কেন! লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণাই আছে। তদুপরি, ইংরেজের খেতাব—মোটা বেতনে চাকরী—যা চান পাবেন—

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ ওটা অগ্রিম চাই এবং গোপনে।

আতাউল্যা ॥ বেশ, তাই হবে। একবার মীরকাশিমকে দেখে যেতে পাই না?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ সেইজন্যই আপনাকে এখানে এনেছি।

আতাউল্যা ॥ মীরকাশিম তবে এখানে—

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ শয়তান কি কম? দরবারে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে দিইনি বলে আমায় শাসিয়েছে জুম্মাবারে বাদশা যখন নামাজ পড়তে

আসবেন সেই সুযোগে সে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রবে। প্রতি জুম্মাবারে আসছে।

আতাউল্যা ॥ সর্বনাশ! এখন উপায়?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ উপায়--আমি করে রেখেছি।

আতাউল্যা ॥ কোথায় সে?

মাজাদউদ্দৌল্যা ॥ হয় তো আশে পাশেই আছে। আসুন দেখ্‌ছি।

উভয়ের প্রস্থান। এক ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী গান গাহিতে গাহিতে আসিল--

চল্ বেদুইন, অচল পথে
পীতমকে তোর চাস্‌রে যদি।
রাজপথে যে কেবল ধুলো,
এই জনতায় নেই দরদী।

মীরকাশিমের প্রবেশ। পরিধানে ছিন্ন মলিন পোষাক।
ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নীর গান চলিতে লাগিল—

খুঁজবে কারা মরীচিকা—
মরুর বুকে জুঁই-কলিকা!
কে নিতে চায় ফকিরী ভাই,
কে নিবি বল্ রাজার গদী?
ওগো মালিক! তোমার দেশে
আস্‌মানে সাত-সাগর মেশে,
সেই সাগরে কূল হারিয়ে
অকূলে খোঁজে জীবন-নদী।

গানের শেষে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী মীরকাশিমের নিকট ভিক্ষা চাহিল।

মীরকাশিম ॥ নেই, কিছু নেই। একদিন মুঠো ভ'রে মোহর তুলতাম, মুঠো ভ'রে ছড়িয়ে দিতাম। আজ নেই কিছু নেই।

মস্‌জিদের দিকে ফিরিলেন

ভিক্ষুক ॥ পাগল।

মীরকাশিম ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ--পাগল। ঠিক বলেছ—পাগল। নইলে কি শুনতে পাই সিরাজের আর্তনাদ, লুৎফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার। তোমরা কি তা শুনতে পাও? তোমরা কি দেখতে পাও এক ফোঁটা রক্ত বড় হয়ে সারা দেশ লাল ক'রে দিচ্ছে? পাও দেখতে?

ভিক্ষুকপত্নী ॥ (ভিক্ষুককে) চল্ চল্ পালিয়ে যাই—

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালাও ! পালাও ! বাংলা থেকে পাটনায়, পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে অযোধ্যায়—অযোধ্যা থেকে দিল্লীতে পালিয়ে এলাম। আস্তে আস্তে দেখলাম, যে পারছে সে-ই পালাচ্ছে। মাটিতে স্থির হয়ে বুক ফুলিয়ে কেউ রুখে দাঁড়াচ্ছে না—কেউ না। সারা দেশে কেউ না ! ! পালাও—পালাও……

কথা শেষ হইবার আগেই ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী চলিয়া গেল।
মীরকাশিম কথা শেষ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—

একা ! আবার একা !

ধীরে ধীরে গিয়া আবার মস্‌জিদের সোপানে বসিলেন। ধীরে ধীরে ফতেমা আর নজাফ খাঁ প্রবেশ করিল।

নজাফ ॥ ওই দেখুন মা !

ফতেমা ॥ নজাফ ! এ-ও আমাকে দেখতে হোলো ! অনাহারে শীর্ণ দেহখানি জীর্ণ শালে জড়িয়ে নির্জনে নির্বান্ধব বসে রয়েছেন বাংলার প্রজাপালক নবাব কাশেম আলি !

নজাফ ॥ দেখা পেয়েছে, এই কি যথেষ্ট নয় মা ?

ফতেমা ॥ হ্যাঁ নজাফ, তা ই আমার ভাগ্য। নজাফ !

নজাফ ॥ মা !

ফতেমা ॥ আমি এগিয়ে যাব ওঁর কাছে ?

নজাফ ॥ যাও মা—

ফতেমা ॥ পেছনে চুপটি করে বসে ওঁর ব্যথা-ভরা বুকে হাত বুলিয়ে দেবো নজাফ ?

নজাফ ॥ দাও মা—

ম্লান হাসি হাসিয়া ফতেমা অগ্রসর হইল।

কিন্তু মা, মনে রেখ………

ফতেমা ফিরিয়া আসিল।

ফতেমা ॥ কি নজাফ ?

নজাফ ॥ মনে রেখো চারিদিকে শত্রু। বেশীক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়। যত শীগ্‌গির পার ওঁকে নিয়ে চলে এস।

ফতেমা ॥ নজাফ !

নজাফ ॥ বল মা—

ফতেমা ॥ আমার যেতে সাহস হচ্ছে না ; আমি যাব না। আমি…ফিরে যাই—

নজাফ ॥ সে কি মা।

ফতেমা ॥ তুমি জাননা নজাফ, মীরজাফরের কন্যা ব'লে নবাব আমাকে ঘৃণা করেন। আমাকে দেখলেই হয়তো উত্তেজিত হয়ে চলে যাবেন। তাই আমি বলি, নজাফ, আমি চলে যাই। তুমি ওঁকে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যাও। তারপর····· তারপর যদি সুদিন আসে, তাহলে····

মীরকাশিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন।

নজাফ ॥ নবাব এই দিকেই আসছেন—

ফতেমা ॥ আমি যাই নজাফ!

একটু অগ্রসর হইল।

মীরকাশিম ॥ যেয়োনা····

ফতেমা দাঁড়াইল।

যেয়োনা তোমরা ·· আর আমি একা থাকতে পারি না····

তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাও আবার সেই গান—

"ওগো মালিক। তোমার দেশে
আসমানে সাত-সাগর মেশে।
সেই সাগরে কূল হারিয়ে
অকূল খোঁজে জীবন-নদী"

গাও।

ফতেমার দিকে ফিরিলেন।

গাও বহিন!

ফতেমা ॥ জনাব, জাঁহাপনা, আমি যে আপনার বাঁদী!

মীরকাশিম ॥ কে। মীরজাফরের কন্যা? এখানেও এসেছ পিতার আদেশে ধরিয়ে দিতে!

ফতেমা ॥ মীরজাফরের কন্যা আমি নই জাঁহাপনা। নবাব কাশেম আলির বাঁদী ফতেমা!

মীরকাশিম ॥ কাশেম আলির বাঁদী।

নজাফ ॥ জাঁহাপনা। চারিদিকে শত্রু। আপনাকে যে ধরিয়ে দিবে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

মীরকাশিম ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো মীরজাফরের কন্যা দিল্লী পর্যন্ত ছুটে এসেছে লাখো টাকার লোভে—আসবে না। তার বাপ টাকার লোভে বাংলাকে বিক্রী করেছিল।

ফতেমা ॥ না জাঁহাপনা, মীরজাফরের কন্যা তার বাপের কাছে ফিরে যাবে

না। সে থাকবে তার স্বামীর কাছে। লতা যেমন ক'রে গাছকে জড়িয়ে থাকে, ছায়া যেমন ক'রে কায়ার পেছনে পেছনে ফে'রে, তেমন ক'রে আমি সকল দুঃখে, সকল দুর্দিনে আপনার সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে থাকব, মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে আপনার কাছ থেকে পৃথক ক'রে নিতে পারবে না।

মীরকাশিম ॥ তবে তাই হোক! মৃত্যুই হোক মীরজাফরের কন্যার স্বামী-ভক্তির—পুরস্কার।....

গলা টিপিয়া ধরিলেন।

নজাফ ॥ জনাব! জাঁহাপনা!

ছাড়াইয়া নিল।

ফত্তেমা ॥ হায় খোদা!

বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মীরকাশিম ॥ চোখের জলে আমি ভুলছি না। লুৎফাও কেঁদেছিল, গোটা বাংলা আজ ডুক্‌রে কাঁদছে। আল্লার নামে, যে-সকল পরলোকগত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন তাঁদের নামে, দেশের জনসাধারণকে আমা.দর পতাকাতলে সমবেত হবার জন্যে, বিদেশী বণিক-দের হাত থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আহবান করেছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু করবার জন্যে জনে জনে ডেকে বলেছি, শত্রু যত-দিন না বাঙলা ছেড়ে যায়, তর্তাদন আমরা হিন্দু মসলমান সকলে মিলে রুখে দাঁড়াব—এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করব—শুধু এই চরমসংকটে কেবল তোমরা বেইমানি করোনা—কে তার মূল্য দিল? কে তাঁর মূল্য দেবে? সিরাজ নিয়ত আমার কানে কানে ব'লছে—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর—আকাশে বাতাসে ধ্বনি তোল 'ভারত ছাড়ো—ভারত ছাড়ো।"

মাজাদউদ্দৌল্যা ও প্রহরিগণের প্রবেশ।

মাজাদ ॥ এখানে এত গোলমাল কিসের?

মীরকাশিম ॥ এই যে উজীর। দয়া কর, ভাই, দয়া কর—আমায় একটি-বার বাদশার সম্মুখে হাজির কর—

মাজাদ ॥ দেখছি শক্ত পাগল—সরাও, সরাও, বাদশা আসবার সময় হয়েছে।

প্রহরিগণ মীরকাশিমকে ধরিতে গেল।

মীরকাশিম ॥ কি—আমি পাগল। বাংলা বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব মীরকাশিম পাগল! আর সে কথা ব'লছে কিনা বেতনভোগী এক ভৃত্য!

নজাফ ॥ জনাব! জনাব! আপনি স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হচ্ছেন; আসুন, আমার সঙ্গে আসুন—

মীরকাশিম ॥ (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) তুমিও নজাফ খাঁ, শেষে তুমিও আমায় পালাতে ব'লছ ?

মাজাদউদ্দৌল্যার চরের প্রবেশ।

চর ॥ (মাজাদদ্দৌল্যাকে) জনাব বাদশা আস্‌ছেন। বাদ্‌শা আসছেন।

মাজাদ ॥ কি সর্বনাশ ! বন্দী কর, বন্দী কর, এ পাগ্‌লাকে বন্দী কর, এখান থেকে নিয়ে যাও, বাদশা যাতে দেখতে না পান।

প্রহরী অগ্রসর হইল।

মীরকাশিম ॥ কার সাধ্য আমায় বন্দী করে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতিকে বন্দী ক'রবে কে? কার আদেশ? (রুখিয়া উপরের ধাপে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন) বাদশা! বাদশা!

রক্ষীরা তাঁহাকে ধরিল।

মাজাদ ॥ বন্দী কর। বন্দী কর—পাগ্‌লাটাকে বন্দী কর—

মীরকাশিম ॥ ছাড়, আমায় ছাড়। বিশ্বাস কর আমি পাগল নই, আমি পাগল নই। সুদূরে বাংলা থেকে আমি পত্র বহন করে এনেছি।·· আলিবর্দীর পত্র, সিরাজের পত্র, গোপনীয় পত্র—রক্তের হরফে লেখা পত্র···আমি বাদ্‌শার কাছে পেশ ক'রব····

প্রহরীগণ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল।

ফতেমা ॥ হায় খোদা!··· প্রভু—স্বামী—

মীরকাশিম কপালে হাত দিয়ে টের পাইলেন রক্ত পড়িতেছে।

মীরকাশিম ॥ রক্তে লাল হয়ে গেছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে—পলাশীর প্রাঙ্গণ যে রক্তে রাঙা হয়েছে—সে-রক্ত—সারা বাংলা লাল হ'য়ে গেল—সেই রক্তের বন্যা ধেয়ে আস্‌ছে সারা ভারত লাল হ'য়ে যাবে, সারা ভারত লালে লাল হ'য়ে গেল,—লালে লাল হ'য়ে গেল—লালে লাল হ'য়ে গেল— (মৃত্যু)

—যবনিকা—

ম হা প্রে ম

বীরের
রক্তস্রোত ও
মাতার অশ্রুধারা-অভিষিক্ত
দিবারাত্রির তপস্যা ধন্য হয়েছে
জাতির পরাধীনতার অবসানে ;
অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনগণের
এই সিদ্ধি অক্ষয় অক্ষুণ্ণ থাক
এই ব্যগ্র কামনাতেই
এই নাটকের জন্ম।

একটি
অখ্যাত অজ্ঞাত
গ্রামের অতি সাধারণ
মানুষগুলিই এই নাটকের চরিত্র-
কোন নেতা নয়,
কোন সেনাপতি
নয়।

মহাপ্রেম

ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের
অখ্যাত অজ্ঞাত অগণিত শহীদের
পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে
শ্রদ্ধার্ঘ্য।

মহাপ্রেম

প্রথম অঙ্ক

* প্রথম দৃশ্য *

সকাল।

[সীমান্তে অরণ্য-অঞ্চলের একটি গ্রাম। দীননাথ দাসের বাড়ি, সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার আসর। একাংশে মূল-বাড়ির অংশ দেখা যাইতেছে। পশ্চাতপটে চৌহদ্দির প্রাচীর। তাহার দরজা দৃশ্যমান। আলপনা দিতে ব্যস্ত রহিয়াছে পড়শী বালিকা নলিনী। পঞ্চায়েত-প্রধান মহেন্দ্র, তাঁহার বন্ধু শিবনাথ, শীতল, হলধর, ত্রিলোচন সহ চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

মহেন্দ্র ॥ কৈ, সব কোথায় ? আমরা যে এসে গেলাম।

নলিনী ॥ এই রে এসে গেছে। এসে গেছে। বসুন আপনারা, আমি গিয়ে বলছি।

[ছুটিয়া ভেতরে চলিয়া গেল।]

শিবনাথ ॥ নাঃ, ঘর বাড়ি সাজিয়েছে।

শীতল ॥ সাজাতেই হবে, সাজাতেই হবে। জন্ম মৃত্যু আর বিয়ে, এতেও যদি একটু হৈ হৈ না হয় তবে আর কিসে হবে।

হলধর ॥ হলো তো ! শুভদিনে ঐ মৃত্যু টৃত্যুর কথা কেন বাপু ?

ত্রিলোচন ॥ আরে আজ তো শুধু পাত্রের আশীর্বাদ। বিয়ে তো নয় ?

[অন্দর হইতে দীননাথের হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ।]

দীননাথ ॥ এসো ভাই এসো—বসো ভাই বসো।

[অতিথিদের বসাইতে লাগিলেন।]

শিবনাথ ॥ এসে দেখি তুমিই নেই দীনুভায়া ! ভাবলাম তারিখ-টারিখ ভুল টুল হয়নি তো ?

দীননাথ ॥ কিসের তারিখ ?

শিবনাথ ॥ পাত্র আশীর্বাদের তারিখ।

হলধর ॥ তা পাত্রই বা কৈ ? কানাইকেও তো দেখছি না।

দীননাথ ॥ আর বলো কেন, ঐ ছন্নছাড়া ছেলে নিয়েই না আমার যত বিপদ।

মহেন্দ্র ॥ কি আবার বিপদ ?

দীননাথ ॥ কি আর বলবো, পাত্র আশীর্বাদ করতে এসেছো, পাত্রেরই দেখা নেই।

অন্যান্য সকলে ॥ সে কি ? কি বলছো ? তার মানে ?

দীননাথ ॥ কাল রাতে পই পই করে বলে রেখেছি দেখ কানাই, আজ সকালে তোকে আশীর্বাদ করতে আসবে মহেন্দ্র ভায়া। সকালবেলাটা বাড়ি থাকবি। তা কাকস্য পরিবেদনা ! সকালে উঠেই দেখি বাড়ি নেই, একেবারে উধাও !

শীতল ॥ ঐ যে শাস্ত্রে আছে না, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই। এ দেখছি হয়েছে তাই।

মহেন্দ্র ॥ কিন্তু তা বল্লে তো আর চলবে না, কোথায় গেল ছেলেটা !

দীননাথ ॥ সেটা এক তোমার ছেলেই বলতে পারে মহেন ভায়া। দু'জনে যে হরিহর আত্মা।

মহেন্দ্র ॥ আমারো তো বিপদ। বোনের বিয়ে দিতে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে আমার ইন্দুবাবু। কিন্তু বাড়ি থাকছে কখন !

শিবনাথ ॥ ঐ মিলিটারী ছেলেকে আর বাবু বলোনা হে। আমাদের সেই ইন্দির, মিলিটারী পোষাক পরে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, ভড়কে যাই বাবা।

মহেন্দ্র ॥ আরে সে যদি বলো, ভড়কে যাই আমিও। রাতদিন কেবল টৈ-টৈ করে ঘুরে বেড়াবে। কোথায় যাচ্ছে, কি ক'রছে জিজ্ঞেস ক'রতেই ভরসা পাই না। কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো ? পাত্রই যদি না থাকে আশী-র্বাদ করবো কাকে।

[রাজেন দত্তের ভাগিনেয় মাণিকের প্রবেশ।]

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, [দীননাথকে] মামাবাবু আপনি তো বললেন কানাই-কে খুঁজে দেখো, ধরে আনো। খুঁজে দেখলাম, গরু খোঁজা খুঁজলাম।

দীননাথ ॥ পেলে বাবা মাণিক ! পেলে ?

মাণিক ॥ হেঃ, হেঃ, পেলে আপনি বলেছিলেন ধরে আনতে, বেঁধে আন-তাম না আমি ?

মহেন্দ্র ॥ আমাদের ইন্দ্রনাথকে দেখেছো ?

মাণিক ॥ দেখিনি ? সবাইকে খুঁজে দেখছি। নেই, সব হাওয়া। এ গাঁয়ে কোন ছেলে নেই আজ। আশীর্বাদ করতে একটা পাত্র পাবেন না আজ। ছেলে রয়েছি এক আমি। আর যত গোপাল সব চলে গেছে নাকি শিবতলার মাঠে।

অনেকেই ॥ সেখানে কি করছে ?

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, কি আবার করবে ! মাঠে গেছে যখন, গরু চরাচ্ছে, গরু চরাচ্ছে। মামাবাবু শুনে বললেন—নাহে মাণিক, খোঁজ নিয়ে দেখো, ওরা কুচকাওয়াজ করছে।

অনেকে ॥ কুচকাওয়াজ ? সে আবার কি ?

দীননাথ ॥ আমিও তাই শুনছি। [মহেন্দ্রকে] তোমার মিলিটারী ছেলে গাঁয়ের ছেলেদের নাকি লড়াই করা শেখাচ্ছে।

ত্রিলোচন ॥ লড়াই না হাতি। মারামারি শেখাচ্ছে।

অনেকে ॥ কেন ?

মাণিক ॥ পিটবে, পিটবে। বুড়োদের ধরে পিটবে।

হলধর ॥ মাণিক কিন্তু কথাটা ঠিকই বলেছে। অকর্মার ঢেঁকি তো সব—ঐ কাজটাই সবচেয়ে সোজা।

শীতল ॥ শাস্ত্রে আছে "নাই কাজ তো খই ভাজ"।

মহেন্দ্র ॥ রাখো তোমার শাস্ত্র। এখন কি করা যায় বলো দেখি ? বেজেছে বলো তো ?

শীতল ॥ [পকেট ঘড়ি দেখিয়া] এই যা। মাহেন্দ্রক্ষণটা যায় যে এর পরেই বারবেলা। শাস্ত্রে বলে—

মহেন্দ্র ॥ রাখো তোমার শাস্ত্র। এখন আশীর্বাদ করি কাকে ?

মাণিক ॥ মামাকে ডেকে আনি।

হলধর ॥ তোমার মামাকে—রাজেন দত্তকে আশীর্বাদ করবে ?

মাণিক ॥ না, না, এই ভাগনেকে। মামা আমাকে বলেছিলো, এত টাকা-কড়ি তো একা সামলাতে পারবি নে, ঐ মহেন্দ্রর মেয়ে ময়নাটাকে দেব তোর বৌ করে।

শিবনাথ ॥ চুপ কর। ক্যাবলামির একটা সীমা আছে।

মহেন্দ্র ॥ ওর ওটা ক্যাবলামি হতে পারে, রাজেন্দ্র কথাটা আমাকে বলে-ছিলো ঠিকই।

শিবনাথ ॥ এ্যাঁ ! বলেছিল !

হলধর ॥ বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাহস আছে এ গাঁয়ে এক ঐ রাজেন দত্তেরই।

মহেন্দ্র ॥ রাখ তোমার রাজেন দত্ত। আজ রাতে বিয়ে, সকালবেলা পাত্র আশীর্বাদ করতে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। এর ফল কি ভালো হবে ?

মাণিক ॥ নাঃ। তাইতো বলছিলাম মামা—

ত্রিলোচন ॥ দেখ মাণকে ! তুই গাঁশুদ্ধু লোককে মামা বলিস কেনরে হতচ্ছাড়া ?

মাণিক ॥ আমার মামাবাবু যে শিখিয়ে দিয়েছেন মামা। গাঁশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই, গাঁ শুদ্ধু লোক আমার মামা।

[অনেকে হাসিয়া উঠিল, অনেকে রাগিল।]

মহেন্দ্র ॥ শোন ভাই দীননাথ, আশীর্বাদ না করেই চলে যেতে হবে আমাকে। কি হবে আমি জানিনা।

[দীননাথের স্ত্রী সারদা দরজার আড়াল হইতে কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। সামনে আসিলেন।]

সারদা ॥ আপনি ভাববেন না। মনে মনে অশীর্বাদ করে যান আপনি আমার ছেলেকে, তাতেই হবে। মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় কোন অমঙ্গলই ঘটবে না।

মহেন্দ্র ॥ বেশ, তাই হোক, তাই হোক। তাই করছি।

শীতল ॥ শাস্ত্রেও আছে—মনসাচিন্তয়েৎকর্ম্ম, বচসা না প্রকাশয়েৎ। [ঘড়ি দেখিয়া] এইমাত্র—মাহেন্দ্রক্ষণটাও এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

মহেন্দ্র ॥ তাহলে, এইবার—

সারদা ॥ এবার আসুন আপনারা, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।

শীতল ॥ বটেই তো, বটেই তো, শাস্ত্রেই আছে মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ।

মাণিক ॥ না। আমি খাব না।

শীতল ॥ কেন রে? তোর মন খারাপ হয়ে গেল?

মাণিক ॥ না আমি উপোস করে থাকবো তোমারা দেখো, ও কানাইকে পাওয়া যাবে না।

[অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন এবং সকলে অন্দরে চলিয়া গেলেন। নিকট ছুটিয়া আসিল নলিনী।]

নলিনী ॥ ছিঃ মাণিকদা, পাগলামি করোনা—চল, মিষ্টিমুখ করবে চলো।

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, মিষ্টিমুখ আমার হয়ে গেছে। মিষ্টিমুখ দেখলেই মিষ্টিমুখ। দেখ, আমার সে কথাটার জবাব দিলিনি তো?

নলিনী ॥ কোন কথাটা মাণিকদা?

মাণিক ॥ সেই যে চুপি চুপি তোকে বলতে বলেছিলাম তোরা মেয়েরা কি কি ভালবাসিস? মানে—কি দেখে কোন বর বিয়ে করতে চাস?

নলিনি ॥ ধ্যেৎ। [নলিনী অন্দরে ছুটিল।]

মাণিক ॥ কেউ বলবে না। কিন্তু জানে সবাই। গাঁ শুদ্ধু লোক মতলব করেছে, ময়না পাখী উড়ে যাক্, আমাকে ধরতে দেবে না।

[অন্দর হইতে পূর্বদৃষ্ট কন্যাপক্ষগণ জলপানান্তে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের সহিত দীননাথও রহিয়াছেন। নলিনী আসিয়া পান দিল।]

মহেন্দ্র ॥ (দীননাথকে) তা হলে ঐ কথাই রইল। গোধূলি লগ্নেই বিয়ে হবে, কারণ পরের লগ্নটা তো অনেক রাত্রে।

শীতল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোধূলি লগ্নেই—শাস্ত্রে আছে।

হলধর ॥ দেখ শীতল, সব সময় অত শাস্ত্র তুললে আমি কিন্তু অস্ত্র ধরবো এবার।

শিবনাথ ॥ আঃ, তোমরা লাগালে কি! চলো, ওদিকেও তো মহেন্দ্র ভায়াকে গোছগাছ করতে হবে। ভোটে এবার পঞ্চায়েত হয়েছে, সব কিছু তো সেইমত হওয়া চাই।

[সকলে চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্রও যাইতে উদ্যত এমন সময় মাণিক ডাকিল।]

মাণিক ॥ ও পঞ্চায়েত মামা! [মহেন্দ্র ফিরিলে] পিঁড়িতে কোন বর বসবে সেতো ঠিক হলো না।

[নলিনী হাসিয়া উঠিল।]

দীননাথ ॥ কি বিপদ!

মাণিক ॥ নয় তো কি! সেটা ঠিক না হলে যে আমি খেতে পারছি না।

মহেন্দ্র ॥ না বাবা, উপোষ করে থাকা কিছু নয়, তুমি বরং খেয়েই নাও।

[মাণিক ও কানাইের প্রবেশ।]

নলিনী ॥ আসুন মাণিকদা। ঐ যে, কানাইদা এসে গেছে।

মহেন্দ্র ॥ যাক্ বাঁচা গেল।

[রামু চৌকিদারের প্রবেশ। সঙ্গে কানাই।]

মাণিক ॥ [কানাইকে দেখিয়া] ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, লজ্জাও করে না, ছুটে এসেছে হ্যাংলার মত বিয়ে করতে। করো। কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি কেউ টিকবে না। মামার কাছে শুনেছি, যম আসছে—যম আসছে।

[মাণিক গজরাতে গজরাতে চলিয়া গেল। নলিনী হাসি চাপিয়া গেল অন্দরে।]

কানাই ॥ বাবা, তোমরা তো ইন্দিরদার কথা বিশ্বাস করনা। এইবার রামুদার কাছে থানা থেকে কী চিঠি এসেছে শোনো। ভাগ্যিস পড়তে না পেরে আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে এসেছিল।

দীননাথ ॥ কী চিঠি এসেছে?

কানাই ॥ থানার দারোগা লিখছে, 'এতদ্দ্বারা প্রত্যেক চৌকিদারকে জানানো হইতেছে তাহারা যেন এখন হইতে তাহাদের এলাকার প্রতিটি বিদেশীর আনাগোনা লক্ষ্য রাখে—সন্দেহ জনক বুঝলে গ্রামের পঞ্চায়েতকে উহা জানাইয়া থানায় অবিলম্বে রিপোর্ট করে।' তাহলেই বোঝো, কিছু একটা ঘটছে। ভাগ্যিস্ ইন্দিরদা বোনের বিয়ে দিতে এসেছিল। তাই আমরা কতকটা তৈরী হতে পারছি।

দীনেশ ॥ [রাগিয়া] ছাই তৈরী হয়েছে। সম্নেহে দেখছিস কে এসেছেন? আগে প্রণাম কর।

[কানাই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেন্‌শন্‌ হইয়া মহেন্দ্রকে করজোড়ে নমস্কার করিল।]

মহেন্দ্র ॥ [হাসিয়া] না, তা তৈরী হয়েছে। বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো।

দীননাথ ॥ আরে ব্যাটাচ্ছেলে লড়াই হচ্ছে না। বিয়ে হচ্ছে তোর। আজ রাতে। ওঁরই মেয়ে ময়নার সঙ্গে। উনি হবেন তোর শ্বশুর। শ্বশুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতে হয়, পায়ের ধুলো মাথায় নিতে হয়। দু'দিন কুচকাওয়াজ করে এসব বে-মালুম ভুলে গেলি ?

কানাই ॥ ও—

[মহেন্দ্রকে পায়ে হাত দিয়া সে প্রণাম করিল। মহেন্দ্র তাহার হাতে একটি আংটি পরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সারদা ও নলিনী। নলিনী শাঁখ বাজাইল। সারদা উলু দিলেন।]

রামু ॥ তা এ দেখছি আমি বেশ ভাল সময়ই এসে পড়েছি কর্তামশাইরা।

সারদা ॥ [রামুকে] তা এসে যখন পড়েছ পেটপুরে চাটি খেয়ে যাও বাবা।

[সারদার অন্দরে প্রস্থান।]

রামু ॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি। [মহেন্দ্রকে] তা' নতুন ভোটে তুমিই তো আমাদের পঞ্চায়েৎ হয়েছ কত্তা। দারোগার হুকুমমত কথাটা আগে তোমাকেই জানিয়ে তবে যাচ্ছি।

মহেন্দ্র ॥ কী জানাবে ?

রামু ॥ রাতের সব ঘটনা।

মহেন্দ্র ॥ সে কী রে! রাতের সব ঘটনা ? কী সব ঘটনা ?

রামু ॥ পাহাড়ের ওপারের দু'একটা বিদেশী লোককে এ ক'দিন রাতে চোরের মত ঘোরাফেরা করতে দেখেছি এ গাঁয়ে।

দীননাথ ॥ কোথায় ?

মহেন্দ্র ॥ কোন্‌ বাড়িতে ?

রামু ॥ এই তো কত্তা ঠেকালেন। বড়ঘরের সব কেচ্ছা,—বললে যে আমার মাথা কাটা যাবে কত্তা ; বলবো, চুপি চুপি, পঞ্চায়েত, তোমাকে।

মহেন্দ্র ॥ বটেই তো। আচ্ছা সে শুনবো এখন। তুমি এখানে খেয়ে, আমার ওখানে চলে এসো। বেয়াই, তবে আসি। [মহেন্দ্রের প্রস্থান।]

দীননাথ ॥ আয় রামু। [দীননাথেরও অন্দরে গমন।]

কানাই ॥ দাঁড়াও রামুদা! এই নাও তোমার চিঠি। পঞ্চায়েতকে তো তুমি কাণে কাণেই সব রিপোর্ট করবে। সে না-হয় বুঝলাম। কিন্তু দারোগার কাছে রিপোর্ট করবে কী করে রামুদা ? লিখে পাঠাতে হবে যে!

রামু ॥ ও হ্যাঁ। দারোগাবাবুর কাছেও তো রিপোর্ট করতে হবে আবার।

কানাই ॥ তা নয়তো কী? আর তা না করলে তোমার চাকরী নিয়েই টানাটানি হবে রামুদা।

রামু ॥ এই দেখ। ফ্যাসাদ দেখ। সরকারী চাকরী মানেই—ঝকমারি।

কানাই ॥ রিপোর্ট করতে হবে তোমাকে আজই—এখুনি। ডাকবাক্স খুলে নেবার সময়ও তো এসে গেল।

রামু ॥ কিন্তু সে রিপোর্ট লিখছে কে? আমি তো ক'অক্ষর গো-মাংস।

কানাই ॥ তোমার চিঠি-পত্তর তো সব আমিই লিখেদি। এস, চুপি চুপি রাতের ঘটনা আমাকে বলো, এটাও আমি লিখে দিচ্ছি। সময়মত রিপোর্টটা দারোগার হাতে পড়লে তোমার কি সুখ্যাত হবে বল দেখি রামুদা? চাই কী—হয়ে যাবে প্রমোশান।

রামু ॥ যা বলেছো। কিন্তু দোহাই তোমার। রিপোর্টটা যে আমিই সদরে পাঠালাম, সেটা যেন ফাঁস করে দিওনা তুমি। তবে কিন্তু আমার মাথা নিয়ে টানাটানি—

কানাই ॥ আরে রাম রাম। সে আমি জানিনা! আমার কাণে কাণে বলে ফেলো—এখান আমি রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি তোমায়।

[কাণে কাণে রামু বলিল বটে, কিন্তু দুটি নাম শোনা গেল, একটি "রাজেন দত্ত", আর একটি "হরিদাসী"। ইন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

ইন্দ্র ॥ কানাই!

কানাই ॥ ইন্দিরদা! হঠাৎ?

ইন্দ্র ॥ বাবা নাকি এখানে এসেছেন, কোথায় তিনি?

[ইতিমধ্যে অন্দর হইতে দীননাথের প্রবেশ।]

দীননাথ ॥ কই রামু, এলি না? কি ইন্দির! ব্যাপার কি? আজ ময়নার বিয়ে, আর তোমার পাত্তা নেই।

ইন্দ্র ॥ বিয়ের কথা এখন আপনারা ভুলে যান। সাইকেলে চড়ে আজ যা স্বচক্ষে দেখে এলাম, তারপর আর বিয়েটিয়ে চলে না।

দীননাথ ॥ [চটিয়া] তুমি বলছো বিয়ে হবে না—তোমার বাবা বলছে আজই বিয়ে হবে। আয় রামু—এস কানাই—

[দীননাথের প্রস্থান। রামু তাঁহাকে অনুসরণ করিল।]

কানাই ॥ [ইন্দ্রকে] ইন্দ্রদা। খবর আছে।

ইন্দ্র ॥ কি?

[কানাই কাণে কাণে ইন্দ্রকে কি বলিল]

ইন্দ্র ॥ [চমকাইয়া] কি? রাজেন দত্ত! হরিদাসী! বিদেশী পাহাড়ী!

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

[হরিদাসী বৈষ্ণবীর ঘর। দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক ছবি। হরিদাসী বিধবা, পূর্ণযৌবনা ; বৈকালী প্রসাধনে রত। সম্মুখে ভৃত্য চরণদাস।]

হরিদাসী ॥ হ্যাঁরে চরণ! তুই কি বাজার দরটর আজকাল জানিস্?

চরণ ॥ কেন জানবো না দিদিমণি? রোজ তোমার বাজার করছি, বাজার-দর জানবো না?

হরিদাসী ॥ সে বাজার দর বলছি নারে মুখপোড়া। সোনা-দানার দরটর জানিস্?

চরণ ॥ সোনা-দানার দর? ওরে বাবা! সে আমি কী জানি? সে সব জানো তুমি।

হরিদাসী ॥ আমি কি জানবো রে? বিধবা মানুষ, আমি কি সোনাদানা পরি?

চরণ ॥ রাতে বেলায় তো পর। এখনই তো পরবে। দিনে না হয় আলো চল আর হবিষ্যি।

হরিদাসী ॥ বাজে কথা রাখ। যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দে। আজকাল সোনার দরটা কত? মধু স্যাকরার কাছ থেকে জেনে আয় দেখি।

চরণ ॥ এই দেখো। আবার আমাকেও ওর কাছে পাঠাচ্ছো! পথে-ঘাটে দেখা হলেই ও জিজ্ঞেস করে তোমার বাজারদর কত যাচ্ছে? তাহলে তোমার দরটা বলে দাও।

হরিদাসী ॥ দরে আট্‌কাবে না। আসতে বলবি ওকে আজ।

চরণ ॥ তাতো বলবোই, আর আসবেও। কিন্তু দরটা জান্‌তে চাইবে যে।

হরিদাসী ॥ বলিস 'ফাউ'।

চরণ ॥ ফাউ?

হরিদাসী ॥ ফাউ।

[চরণ মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। হরিদাসী দর্পণে মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতে লাগিল। চরণ আবার হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।]

চরণ ॥ দিদিমণি আছো কোথায়? মিলিটারি!

হরিদাসী ॥ মিলিটারি? সেকী রে?

চরণ ॥ আরে ঐ যে—ঐ যে—

[ভয়ে তাহার মুখে আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। দরজায় করাঘাত।]

হরিদাসী ॥ আরে বলনা মুখপোড়া কেমন মিলিটারি? গোরা না পাহাড়ী, না দেশী?

চরণ ॥ (তোৎলাইয়া) দে—দে—শী।

হরিদাসী ॥ সন্ধ্যেবেলায় কেন?

চরণ ॥ এ বাবা মিলিটারি! দিন-রাত জ্ঞান নেই।

[দরজায় পুনরায় করাঘাত। হরিদাসী ত্রস্তপদে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং দেখিতে পাইল মিলিটারি বেশে ইন্দ্রনাথ।]

হরিদাসী ॥ (সবিস্ময়ে) তুমি?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ হরিদাসী, আমি।

হরিদাসী ॥ এ সা, এসো। (চরণকে) হাঁ করে দেখছিস্ কি? আমার ছোটবেলার খেলার সাথী—ইন্দিরদা। চেয়ারটা টেনে দে। বোসো ইন্দিরদা।

[ইন্দ্রনাথ নিজেই চেয়ারটি টানিয়া লইয়া বসিল।]

হরিদাসী ॥ আমার এখানে একটু চা খাবে ইন্দিরদা?

ইন্দ্র ॥ না। তোর এই হাবাগঙ্গারামকে বাইরে যেতে বল হরিদাসী।

চরণ ॥ বাঁচালে সায়েব। এই এক্ষুণি।

[চরণ বাহিরে চলিয়া গেল। ইন্দ্র নিজেই উঠিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল।]

হরিদাসী ॥ তুমি বোনের বিয়েতে ছুটি নিয়ে গাঁয়ে এসেছ। আমি খবর পেয়েছি ইন্দিরদা। আজই তো ময়নার বিয়ে। কিন্তু তুমি বিয়ে ফেলে এখানে!

ইন্দ্র ॥ বিয়ের কথা থাক। তোর সঙ্গে আজ আমার বোঝা পড়া আছে।

হরিদাসী ॥ বুঝতে কিছু কি এখনও বাকী আছে?

ইন্দ্র ॥ না। তুই বিধবা হয়েছিস্ সে আমি জান্তাম। স্বভাবটাও জানা ছিল, কিন্তু তোর যে এত অধঃপতন হয়েছে সে কী আমিও ভাবতে পেরেছিলাম!

হরিদাসী ॥ মিলিটারির লোক হলেই বুঝি লড়াই করতে হয়? যেখানে-সেখানে, যখন-তখন—যার তার সঙ্গে—না?

ইন্দ্র ॥ তুই আমার কথার আগে জবাব দে। কেন তোর ঘরে বাইরের লোক আসে রাতে?

হরিদাসী ॥ বা—রে! নইলে আমার চলবে কি করে? আমার স্বামীর অবস্থা তো তোমরা সবাই জানতে। এক রকম ভিক্ষে করেই চালিয়ে গেছে সে।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। যাক্ তোর সঙ্গে নীতিকথা আলোচনা করতে আমি আসিনি। দেহ বেচে খাচ্ছিস খা। তার ফল ভোগ করবি তুই। কিন্তু—

হরিদাসী ॥ কিন্তু—বল. থামলে কেন ?

ইন্দ্র ॥ কিন্তু তুই দেশকে বেচবি এ আমি সইবো না হরিদাসী। এর ফল ভোগ একা তুই করবি না, ফল ভোগ করবে গোটা দেশ।

হরিদাসী ॥ দেশ-টেশ আমি বুঝিনা, আমি বুঝি পেট।

[ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক চড় কষাইয়া দিল। চকিতে সরিয়া গিয়া দলিতা ফণীর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল হরিদাসী।]

হরিদাসী ॥ খেলার বউ ছিলাম আমি তোমার খেলাটা খেলাই রয়ে গেল কেন ? উত্তর দাও।

[ইন্দ্র কোন উত্তর দিল না। রাগে কাঁপিতে লাগিল।]

আমি যখন অসহায় বিধবা হলাম, গোটা গাঁয়ে এমন একজন লোক বেরুলো না যে আমাকে মোটা ভাত-কাপড় রোজগার করবার একটা ভালো পথ দেখিয়ে দেয়। কেন বেরুলো না এমন একজন লোক ? জবাব দাও।

[ইন্দ্র পূর্ববৎ নিরুত্তর রহিল।]

গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই আমার দুর্দশা দেখে যেন ভারী মজা পেলো। এ দেহটার উপর লোভ ছিল বহু লোকের। কেউ তাদের রুখলো না। কেন রুখলো না ?

[ইন্দ্র তথাপি নিরুত্তর। চিন্তামগ্ন।]

আজ যখন আমার ঘরের সব দেয়াল ভেঙ্গে গেছে, যখন আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে, তখন এসেছ তুমি আমাকে শাসন করতে। যে চড় তুমি আমাকে মেরেছ, এ চড় আমি খাইনি, খেয়েছে তুমি।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। ছোটবেলায় তুই এমন অনেক চড় খেয়েছিস্ আমার হাতে, আর আমিও খেয়েছি তোর হাতে। অতীতটাকে বাদ দিয়ে নতুন করে কিছু বোঝাপড়া হোক্। তুই নার্স হবি ?

হরিদাসী ॥ নার্স ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, নার্স। রেডক্রশের চাকরী। খুব ভাল মাইনে। ভাল কোয়ার্টার। আর কাজ হ'ল গিয়ে রোগীর সেবাশুশ্রূষা। চমৎকার জীবন।

হরিদাসী ॥ কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার জীবন ছিল ইন্দিরদা।

ইন্দ্র ॥ কি ?

হরিদাসী ॥ তোমার বউ হয়ে তোমার সঙ্গে ঘর করা।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। কিন্তু তা যখন হয়নি, আর তা' হবে না।

হরিদাসী ॥ তোমার হাতে গড়া পুতুলটাকে এমন করে ভেঙে দিলে

ইন্দ্র ॥ তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু হরিদাসী, একটা কথা জেনে রাখবি, জীবনটা অনেক বড়। এত- বড় যে, একদিকে ভেঙ্গে পড়লেও আর একদিক দিয়ে তা আবার গড়ে ওঠে।

হরিদাসী ॥ [আব্দারের সুরে] আমি বুঝিনা, আমি বুঝিনা তোমার ওসব হেঁয়ালি।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। ভালো কথা তো তুমি বুঝবে না। আর তা' যখন বুঝবে না, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন। আমি জানতে চাই হরিদাসী, একটা বিদেশী পাহাড়ী কাল তোর ঘরে এসেছিল। পায়ে ছিল ভারী বুট জুতো। না—না—অস্বীকার করিস্‌না। তোর ঘরের দুয়োরের শিশির-ভেজা মাটিতে সেই বুটের ছাপ পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা গেছে আরও এক জোড়া চটি জুতোর ছাপ। চটি জুতো পায়ে এই মহাপ্রভুটি কে?

হরিদাসী ॥ কেন বলবো আমি?

ইন্দ্র ॥ কেন বলবি না?

হরিদাসী ॥ এসব আমার ব্যবসার কথা, কেন আমি ফাঁস করবো?

ইন্দ্র ॥ শোন্‌ আমার সময় নেই। দেশের আজ বড় বিপদ। ওপারের বিদেশী শত্রু আমাদের এপাড়ে হানা দিয়েছে। আমরা কেউ প্রস্তুত নই। হানাদাররা আজই রাতে হয়ত এসে এ গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। আমরা যথা-সম্ভব তৈরী হচ্ছি তাদের রুখ্‌তে। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার আমাদের ঘরশত্রু কে কে? তাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হতে হবে সবার আগে।

হরিদাসী ॥ ঘরশত্তুর? কে আমি কি ক'রে বলবো?

ইন্দ্র ॥ বিদেশী শত্রুর সঙ্গে গোপনে যে আলাপ আলোচনা চালায় সেই হ'ল ঘরশত্রু। সেই আলাপ আলোচনা হয়েছে তোরই এই ঘরে। কাল রাতে বিদেশী পাহাড়ীটার সঙ্গে দেশী দুষমনটা ছিল কে? আমি জানতে চাই হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ সে সব কথা আর আমার মুখ থেকে বেরুবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না। তাদের কাছে দিব্যি করতে হয়েছে আমাকে, তাই আমি সোনা পেয়েছি। দেখবে? এই দেখ।

>] ছুটিয়া গিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া প্রায় পাঁচ ভরি সোনার একটি মোড়ক খুলিয়া দেখাইল।]

ইন্দ্র ॥ তুই বলবি না?

হরিদাসী ॥ না।

ইন্দ্র ॥ কি সব পরামর্শ হয়েছিল, তাও বলবি না?

হরিদাসী ॥ না।

ইন্দ্র ॥ দেশের দাবী, তোকে ব'লতে হবে।

হরিদাসী ॥ দিব্যি গেলেছি আমি। আমি বলবো না।

ইন্দ্র ॥ তুই কি ভীষণ পাপ করছিস্, তুই জানিস্ না হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ সেটা আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি। কারণ তুমি নিজে এসেছো। [থামিল।] তোমার কাছেও দিব্যি করছি, এমন পাপ আমি আর করবো না। [থামিল।] আর যে পাপ করেছি, তারও প্রায়শ্চিত্ত করছি আমি। এই সোনাটা আমি দেশের কাজে দিচ্ছি—তোমার হাতে।

ইন্দ্র ॥ [অভিভূত হইয়া] তোকে আমি শ্রদ্ধা করি হরিদাসী। [সোনাটি হাতে লইয়া] কর, এবার আমাকে একটা প্রণাম কর।

[হরিদাসী প্রণাম করিল।]

ইন্দ্র ॥ টাকার বড় দরকার ছিল। নাঃ, সত্যিই তুই এখনো আমায় ভালোবাসিস্।

হরিদাসী ॥ কত টাকা চাই তোমার ?

ইন্দ্র ॥ অ—নে—ক।

হরিদাসী ॥ তবে বোসো। আমি বাৎলে দিচ্ছি পথ।

[ইন্দ্রকে হাত ধরিয়া বসাইল।]

* তৃতীয় দৃশ্য *

[পঞ্চায়েতপ্রধান মহেন্দ্রের বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণ। দক্ষিণে, বামে দু'টি ঘর—মধ্যস্থলে অন্দরে যাইবার দরজা। বাঁ দিকের ঘরটি ঠাকুর ঘর। দক্ষিণেরটি বৈঠকখানা। প্রাঙ্গণের দুই পাশে বাহিরে যাতায়াতের পথ। মহেন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নার বিবাহ-বাসর রচিত হইয়াছে এই প্রাঙ্গণে। কিশোর নামক একটি ছেলে অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়ন করিতেছে, জল ও তামাক দিয়া। তাহার বুকে ও পিঠে যে দুইটি পোষ্টার বাঁধা রহিয়াছে তাহাতে লেখা (১) "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।" (২) "বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই—কর কর সবে সাজ।" বিবাহবাসরে উপস্থিত লোকের সংখ্যা খুবই কম—বড় জোর পাঁচ, ছ'জন। মেয়েদের সংখ্যাও দু'তিন জনের বেশী নয়। বর-কনে পিঁড়িতে বসিয়া আছে। পুরোহিত মন্ত্র-পাঠ করিতেছে। একটি ডে-লাইট লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে প্রাঙ্গণটি আলোকিত। মেয়েরা শঙ্খ উলুধ্বনি করিল।]

শীতল ॥ না, না পঞ্চায়েত, আর দেরী নয়। শুভস্য শীঘ্রম্। একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে শত্রুপল্টন—বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে। আমরা আর স্থির হয়ে বসতে পারছি না।

মহেন্দ্র ॥ [কন্যা সম্প্রদান-কর্তার আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে] ও' হলে বরকর্তা, অনুমতি দিন। আমি এইবার কন্যা সম্প্রদান করি।

বরকর্তা দীননাথ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রং। [অন্যান্য সকলকে] কি বলেন।

শিবনাথ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বাবা বিদেশী শত্রু। বিয়েও বুঝবে না, শ্রাদ্ধও বুঝবে না, কখন হুড়মুড় করে গাঁয়ে ঢুকে দক্ষযজ্ঞ করে দেবে।

হলধর ॥ আমি তো বলেছিলাম, শিয়রে যখন সমন, বিয়ে-টিয়ে আজ থাক। তা পঞ্চায়েত, তুমি শুনলে না। শুনলেই না যখন—চটপট দু'হাত এক করে দাও। শিবনাথ ঠিকই বলেছে এ বাবা বিদেশী শত্রু। এতটুকু দয়া-মায়া পাবে না।

ত্রিলোচন ॥ নাঃ, দুয়ারে শত্রু আর এখানে কিনা বিয়ে। তোমাদের যতসব!

মহেন্দ্র ॥ আমি কি আর সাধে এতো বড়ো বিপদের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি? আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করা ছিলো—তোমাদেরও সবাইকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছিলাম—আজ বিয়ে না হলে মেয়েটার যে জাত যায়।

শীতল ॥ আরে বাবা কথা রাখো। শাস্ত্রমত সম্প্রদানটা সারো।

পুরোহিত ॥ ফাল্‌গুন মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশ্যাম তিথৌঃ (ইত্যাদি)।

> [হঠাৎ গ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে চমকিত হইল। পাত্রী ময়নামতীও বরণডালা হইতে শঙ্খ তুলিয়া লইয়া তিনবার বাজাইল। পাত্র কানাই পিঁড়ি হইতে চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া মালকোছা মারিয়া একটি লাঠি লইয়া 'বন্দেমাতরম্‌-বন্দেমাতরম্‌' আওয়াজ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। কিশোরও।]

জয়মতী ॥ একি হ'ল! [মহেন্দ্রকে] ওগো, একি হ'ল!

মহেন্দ্র ॥ না—না, এসব কি?

দীননাথ ॥ [চীৎকার করিয়া] কানাই—কানাই—!

হলধর ॥ আর কানাই! ঘরে ঘরে যখন শাঁখ বাজছে, বিদেশী শত্রু হয়তো গ্রামেই ঢুকে পড়েছে। ওরা সব ভলান্টিয়ার। রুখতে গেলো।

রাজেন্দ্র ॥ পাত্র গেল। পাত্রীর ভাই তো আগেই গেছে। এখন পাত্রী না যায়।

ত্রিলোচন ॥ আমাদেরও যেতে হয়।

মহেন্দ্র ॥ [দাঁড়াইয়া করজোড়ে] না, না। তোমরা একটু দাঁড়াও—শোনো।

ত্রিলোচন ॥ দাঁড়াবো কি পঞ্চায়েত। তোমারি মিলিটারী-ছেলে ইন্দ্র বাবাজীর হুকুমটা শোনো। বিকেলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে—বোনের

বিয়েতে আমি থাকতে পারবো না। যা করতে হয় আপনারা করবেন। আমি যাচ্ছি পাহারা দিতে জঙ্গলে। শাল গাছে চড়ে দূরবীন নিয়ে দেখবো ওই বিদেশী দুষমণদের আনা-গোনা। ওরা আসছে দেখলেই শাঁখ বাজাবো আমি। সেই শাঁখ শুনে, ঘরে ঘরে যেন বেজে ওঠে শাঁখ—আর লাঠি-সোটা নিয়ে যেন তৈরী হয় সবাই!

হলধর ॥ সেই শাঁখই তো বাজছে—

শিবনাথ ॥ এখন শিঙে ফুঁকতে না হয়।

কয়েকজন ॥ ·· না না আর থাকা চলে না।··· এখন যেতেই হয় ·

শীতল ॥ শাস্ত্রেও আছে যঃ পলায়তি স জীবতি। আমরা চলি।

জয়মতী ॥ হায় ভগবান! এ কী সর্বনাশ!

মহেন্দ্র ॥ আমার এই বিপদে তোমরা একটা গতি করবে না?

রাজেন্দ্র ॥ গতি কি আর হতো না? হতো। এই তো আমার মাণিক বাবাজী এখানে রয়েছে।

মাণিক ॥ হ্যাঁ মামা।

রাজেন্দ্র ॥ ওর সঙ্গে এ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আমিই নিজে করেছিলাম। কিন্তু তখন তো রাজী হওনি। ভোটে পঞ্চায়েত হয়ে তখন তোমার মাথা গরম। ধরাকে দেখছো সরা। তাই না হেসে বললে, রাজেন, তোমার ভাগ্নে বড্ডো কালো, একেবারে কালিকেষ্ট। তারপরেই তো জোগাড় হলো দীননাথ ভায়ার ওই কার্তিকটি। একেবারে মাকাল ফল।

[সঙ্গে সঙ্গে জয়মতী ও মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল।]

মহেন্দ্র ॥ আমাকে ক্ষমা করো রাজেন। আমার ঘাট হয়েছে।

জয়মতী ॥ জাতকুল বাঁচাও ঠাকুরপো। করজোড়ে তোমার কাছে মাণিককে ভিক্ষা চাইছি।

দীননাথ ॥ বিয়ের পিঁড়ি থেকে আমার ছেলে পালিয়ে গেলো। বিদেশী শত্রুকে রুখতে গেলো। দোষ দিতে পারি না তাকে। আমার ছেলে বাঁচবে কি মরবে কে জানে! তুমি রাজী হও—রাজী হও ভাই রাজেন। নইলে লগ্ন বয়ে যায়, মেয়েটার কপাল পোড়ে, পঞ্চায়েতের জাত যায়।

মাণিক ॥ সত্যি মামা। বড়ো বিপদ এদের।

রাজেন্দ্র ॥ বিপদ যখন, তখন যা না,—উদ্ধার কর। কিন্তু শিগ্‌গীর। ঐ শাঁখ শুনে ভয়ে বুক কাঁপছে। আমার আবার অতগুলো ধানের গোলা। অতগুলো পাটেরগুদাম। দেশী শত্রুই চোখ লাগায়—বিদেশী শত্রুর তো চোখে পড়বে সবার আগে।

[মাণিক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কানাইয়ের পরিত্যক্ত চাদরটি গায়ে দিয়া যে মুহূর্তে পিঁড়িতে বসিয়াছে, মহেন্দ্র কন্যা সম্প্রদানের জন্য উদ্যত হইয়াছে, পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে—সেই মুহূর্তেই একটি এরোপ্লেনের শব্দ ভাসিয়া আসিল।]

হলধর ॥ এই যাঃ! এরোপ্লন।

ত্রিলোচন ॥ সর্বনাশ! বোমা ফেলবে।

মাণিক ॥ শালা আর সময় পেল না!

ময়না ॥ (পিঁড়ি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও। দাদা তাই বলে গেছে।

শীতল ॥ পালাও—পালাও—যঃ পলায়তি স জীবতি।

[ময়না ছুটিয়া গিয়া ডে লাইট লণ্ঠনটি নিভাইয়া দিলো। ভয়চকিত হইয়া সকলে অন্যান্য প্রদীপগুলি নিভাইয়া দিতে লাগিল। এরোপ্লেনের শব্দ ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। বিবাহ-বাসর নীরব, নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার হইল।]

॥ সময়ক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

[অতঃপর যখন আর এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল না, তখন ময়নামতী একটি লণ্ঠন জ্বালিল এবং একটি বাঁশের সহিত উহা ঝুলাইয়া দিলো। সেই স্বল্পালোকে দেখা গেল প্রাঙ্গণে ময়নামতী ছাড়া আর কেহ নাই। ময়নামতী আকাশের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, হয়তো বা এরোপ্লেন দেখা যায় কি না দেখিতে, কিম্বা উর্ধ্বে থাকেন যে ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে। মুখ যখন নামাইল, সেই লণ্ঠনের স্বল্পালোকে ও দেখা গেল, তাহা অশ্রুস্নাত। এবার অন্দর হইতে ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মা জয়মতী।]

জয়মতী ॥ ময়না!

ময়না ॥ বলো।

জয়মতী ॥ যা হবার তা' হয়ে গেলো। কপালে যা ছিলো, তাই হলো। এতো রাতে একা এখানে আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়।

ময়না ॥ দাদারা না ফেরা পর্যন্ত আমি ঘরে যেতে পারবো না মা। তুমি যাও, বাবার কাছে যাও। কেমন আছেন বাবা?

জয়মতী ॥ বুক ধড়ফড় বড্ডো বেড়ে গেছে। তোকে ডাকছেন।

ময়না ॥ আমাকে দেখলেই বাবার বুক ধড়ফড়ানি আরো বেড়ে যাবে মা।

জয়মতী ॥ তবে থাক। কিন্তু একা তোর ভয় করবে না তো?

ময়না ॥ [হাসিয়া] আমার আবার ভয়। ভয়ই আমাকে দেখে ভয় পাবে মা।

[জয়মতী প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ থামিয়া।]

জয়মতী ॥ কিন্তু কিছু খাবি না তুই? সারাদিন উপোস করে রয়েছিস যে।

ময়না ॥ দু' দুটো বর খেয়েছি। আর আমাকে খেতে বলো না মা।

জয়মতী ॥ একশো লোকের খাবার নষ্ট হয়ে গেলো।

ময়না ॥ খাবার লোকের অভাব কি মা। কাল বিলিয়ে দিও।

জয়মতী ॥ সে, কাল পর্যন্ত যদি সব টিকে থাকি তবে তো?

[অন্দরে প্রস্থান। ময়নামতী একে একে তাহার ফুলসাজগুলি খুলিয়া ফেলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কাগজের মালা দিয়া বিবাহ-সভা সজ্জিত করা হইয়াছিল। ময়নামতী এবার সেগুলি ছিঁড়িতে লাগিল। বিবাহের মঙ্গল ঘটটি হাতে লইয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিবে এমন সময় ছুটিয়া আসিল সেখানে কানাই।]

কানাই ॥ ময়না! মঙ্গলঘট ছুঁড়ে ফেলছিলে যে?

ময়না ॥ অমঙ্গল ঘট, তাই।

কানাই ॥ পথে আসতে আসতে শুনলাম আমার জায়গায় আর এক বর জুটেছে তোমার।

ময়না ॥ বর নয়, বর্বর।

কানাই ॥ বর্বর! বাঃ তা কোথায় সে?

ময়না ॥ জানি না। মাথার উপর এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনেই সব উধাও। শেয়ালের গর্তটর্তগুলো খুঁজে দেখতে পারো।

কানাই ॥ দু'হাত তবে এক হয়নি?

ময়না ॥ ওসব কথা থাক। দাদার খবর কি? হানাদাররা কোথায়? লড়াই বেধেছে নাকি? দুর্ঘটনা ঘটেনি তো কিছু?

কানাই ॥ না। লড়াই এখনো কিছু হয়নি। শত্রু-সৈন্য চোখে পড়েছে মাত্র। আমরা ওদের আসবার পথঘাটগুলো আটকাচ্ছি। ট্রেঞ্চ খুঁড়ছি।

ময়না ॥ সেটা আবার কি?

কানাই ॥ মানে খাদ কাটা হচ্ছে। ওসব তুমি বুঝবে না।

ময়না ॥ তা, তুমি এখানে কেন? এখানে তো আগেই তুমি খাদ কেটে গেছো।

কানাই ॥ এসব রাগের কথা,—কাজের কথা নয়। আরে, বিয়ে কি ফুরিয়ে যাচ্ছে?

ময়না ॥ না তা যায়নি। শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে কতক্ষণ? তোমরা যে পুরুষ মানুষ।

কানাই ॥ হ্যাঁ, পুরুষ। কিন্তু সামনের পিঁড়িতে একটি মেয়েমানুষ

চাই। তবেই না বিয়ে। তা, শত্রুকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রাণভরে আজ একটিবার। সময় বুঝে ওই এরোপ্লেনটি তোমার মাথার উপরে আনবার জন্য।

[ময়নার মুখে হাসি ফুটিল]

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শত্রু যে কখনো কখনো মিত্র হয়, এ আমি জানতাম না ময়না। এবার এই বাক্সটি রাখো দেখি। ফার্ষ্ট-এডের বাক্স।

ময়না ॥ জানি, জানি। দাদা এর কাজ আমাকে শিখিয়েছে।

কানাই ॥ শিখিয়েছেন বলেই আমাদের ব্যায়াম সমিতির ঘর থেকে আনিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি আমাদের নার্স। আমরা কেউ আহত হলে আমাদের এনে ফেলা হবে তোমারই কাছে।

ময়না ॥ [বাক্সটি লইয়া] দাদাকে বোলো, এই কাজটাই আমি চাইছিলাম।

কানাই ॥ আমি চলি। এক গ্লাস জল দিতে পারো ?

ময়না ॥ এক্ষুণি।

[বাক্সটি লইয়া ময়না ছুটিয়া ভিতরে গেল। কানাই এই ফাঁকে মঙ্গল ঘটটি তুলিয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিল এবং তাহার পরিত্যক্ত চাদরটি গায়ে দিয়া বরের পিঁড়িটিতে বসিয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল। ময়না এক গ্লাস জল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া মুখে আঁচল দিয়া হাসি আটকাইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল জয়মতী। তাহার হাতে এক থালা খাবার।]

জয়মতী ॥ কই রে ? কোথায় ?

ময়না ॥ কেন, ওই তো ?

[কথা শোনামাত্রই চমকাইয়া উঠিল কানাই। পিঁড়ি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিল জয়মতীর সামনে।]

জয়মতী ॥ [হাসিমুখে] না বাবা। তোমাকে ওই পিঁড়িতেই বসতে হবে। এটুকু খেতে হবে যে।

কানাই ॥ তা, না বলবো না মাসিমা। ইন্দ্রদা, শুধু ইন্দ্রদা কেন, সবাই দুপুরে পেট ভরে খেয়েছে। সারাদিন উপোস রয়েছি শুধু আমি। কিন্তু আর কথা নয়। সব চটপট সারতে হবে।

[ছুটিয়া গিয়া আবার পিঁড়িতে বসিল। জয়মতী তাহার খাবারের থালা এবং ময়নামতী জলের গ্লাস সামনে রাখিল।]

জয়মতী ॥ খাও বাবা। আমি আসছি। [অন্দরে প্রস্থান]

ময়না ॥ সারাদিন উপোস রয়েছো বুঝি তুমি একা ?

কানাই ॥ এই যা ! তাই তো। আরে এসো এসো।

[একটি খাবার জোর করিয়া ময়নামতীর মুখে পুরিয়া দিলো।]

ময়না ॥ না—না—

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আমিও খাচ্ছি। খেতে খেতে একটা মন্ত্র শোনো। যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব। বলতো মানে কি? জানোনা তো? তবে আর একটা গোল্লা খাও। হ্যাঁ হ্যাঁ—। জানোতো ইস্কুলে পড়া না পারলেই গোল্লা। এইবার মানেটা শোনো। তোমার আর আমার হৃদয় এক হয়ে গেল।

[এমন সময় জয়মতী অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া চট্ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

জয়মতী ॥ [অন্দরের দিকে তাকাইয়া] চটপট আয় গণেশ—

ময়না ॥ মা!

[পিঁড়ি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাই টপাটপ মিষ্টিগুলি গিলিতে লাগিল। গণেশ এক ঝাঁকা খাবার মাথায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে কানাইও আহারাদি শেষ করিয়া জয়মতীর সামনে দাঁড়াইল।]

জয়মতী ॥ পেট ভরেছে বাবা?

কানাই ॥ এতো খাবার—একজনের কেন দু'জনের পেট ভরে।

জয়মতী ॥ এই খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে গণেশ তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। যদি সময় পায়, সুযোগ হয়—ইন্দ্র যেন সবাইকে খাইয়ে দেয়।

কানাই ॥ চলো, চলো গণেশ। বিয়ের এই ভোজ খেলে গায়ের জোর হবে ডবল। আসি মাসিমা। আসি ময়না।

[গণেশকে লইয়া কানাই চলিয়া গেল।]

ময়না ॥ বাবা কেমন আছেন মা?

জয়মতী ॥ দেখলাম চোখ বুজে আছেন। ছটফট একটু কমেছে। এবার তুইও চল, একটু শুবি চল।

ময়না ॥ না মা, আমার শোবার উপায় নেই। আমাদের কেউ আহত হলে দাদা তাকে পাঠাবে এখানে। শুশ্রূষার ভার আমার।

জয়মতী ॥ তবে থাক। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। আমি গিয়ে শুয়ে পড়ছি। কপালে যা আছে তাই হবে। ভেবে করবো কি? [জয়মতী ভিতরে যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

জয়মতী ॥ শোন মা, গণেশ ফিরে এলে এই সতরঞ্চি, ওই লণ্ঠনগুলো, ওই কলাগাছ, মালাটালা সব সরিয়ে ফেলতে বলিস। হ্যাঁ মা নইলে শত্রু-মিত্র সবাই হাসবে। সে আমি সইতে পারবো না, সে আমি সইতে পারবো না।

[অন্দরে প্রস্থান।]

ময়না ॥ [জয়মতীর উদ্দেশে] বিয়ের আসর তো আর নেই মা। বোমা

আর কোথাও না পড়ুক, এখানে পড়েছে। এখানে সবাই জখম এটা এখন হাসপাতাল। এটা এখন হাসপাতাল।

[সজল চোখে সতরঞ্চি ইত্যাদি নিজেই গুছাইতে লাগিল।]

---

* চতুর্থ দৃশ্য *

[গ্রাম হইতে একটি মেঠো পথ বাহির হইয়া উঁচু একটি পাকা সড়কে মিশিয়াছে। কাঁচা এবং পাকা সড়কের সংযোগস্থলটির সংলগ্ন বনবীথি এই দৃশ্যের কর্মস্থল। গভীর রাত্রি। আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। দেখা গেল ইন্দ্র ও মধু রুদ্ধনিঃশ্বাসে কিসের যেন অপেক্ষা করিতেছে।]

মধু ॥ ইন্দ্রদা।

ইন্দ্র ॥ বল্।

মধু ॥ তোমার চাঁদ তো পশ্চিমে হেলে পড়ল।

ইন্দ্র ॥ হুঁ।

মধু ॥ তোমার কাঁচা সড়কে না পাচ্ছি গরুর গাড়ির শব্দ, পাকা সড়কে না পাচ্ছি জীপের শব্দ।

ইন্দ্র ॥ ধৈর্য্য ধর। সবুরে মেওয়া ফলে।

মধু ॥ আমার কী মনে হচ্ছে জানো ইন্দ্রদা ?

ইন্দ্র ॥ কী ?

মধু ॥ হরিদাসী তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছে ?

ইন্দ্র ॥ হরিদাসীকে তুই চিনিস না।

মধু ॥ শুধু আমি কেন ? আজ পর্যন্ত নাকি ওকে কেউ চেনেনি।

ইন্দ্র ॥ দেখা যাক।

মধু ॥ তোমার হরিদাসীর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলব এদের কী দুঃসাহস !

ইন্দ্র ॥ দুঃসাহস তো বটেই। আমাদের, সাহসটাই বা কম কী ? হ্যাঁরে, হাতবোমাগুলো সব সময়মত কাজ দেবে তো ?

মধু ॥ বোমা ঠিকই কাজ করবে। এখন আমাদের হাতগুলো ঠিকমত কাজ করে তবেই হয়।

ইন্দ্র ॥ তবে এদ্দিন কি শেখালাম আমি তোদের ?

মধু ॥ শিকার আসুক। তারপর সেটা দেখে নিও। ইন্দ্রদা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। একটু বসছি।

ইন্দ্র ॥ বসতে পেলে আবার শুতে চাসনি যেন।

মধু ॥ ইচ্ছে যে হচ্ছে না, তা নয়। অভিসারের জায়গাটা কেমন বেছে নিয়েছে দেখেছ! এ পাশে কাঁচা সড়ক, ও পাশে পাকা সড়ক। মিলনমুখে অভিসারকুঞ্জটি। নাঃ রাজেন দত্তের বুদ্ধি আছে।

ইন্দ্র ॥ বুদ্ধি আছে বলেই তো এত পয়সা করেছে।

মধু ॥ এখন আর পয়সা নয় দাদা, এখন সোনা করছে। গাঁয়ের মেয়েকে, হোক না কেন সে বেশ্যা, বিদেশী নেকড়ের হাতে তুলে দিয়ে, বস্তা বস্তা চাল তার গ্রাসে দিয়ে, লুটে নিচ্ছে সোনা। শালাকে একবার পেলে হয়।

ইন্দ্র ॥ মধু, একটা হাতবোমা হাতে নে, আমি একটা শব্দ পাচ্ছি।

[উভয়ের রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা। একটা গরুর গাড়ীর বলদের গলার ঘণ্টা শোনা গেল। ছুটিয়া আসিল বুদ্ধু।]

বুদ্ধু ॥ [ইন্দ্রনাথকে] ক্যাপ্টেন, আমাদের গাঁ থেকে গরুর গাড়ীটা এসে পড়েছে।

মধু ॥ দেখিস, গাড়ীতে আবার তোর দাদা না থাকে। রাজেন দত্তের চ্যালা তো।

বুদ্ধু ॥ দাদাই হোক আর মামাই হোক দেশের সংগে বেইমানী করলে সে শালা আমার হাতেই মরবে।

ইন্দ্র ॥ কাঁচা সড়কে গরুর গাড়ী এসে গেল কিন্তু পাকা সড়ক দিয়ে কোন জীপ আসার শব্দ তো পাচ্ছি না এখনও।

মধু ॥ ওদের সব পাকা কাজ। জীপটা হয়ত কিছুটা দূরে অনেক আগেই এসে বাতি নিভিয়ে অপেক্ষা করছে। যেই না শুনবে গরুর গলার ঘণ্টা, বিদেশীশালাদের নেচে উঠবে মনটা। আর তখনই জীপ নিয়ে ছুটে আসবে এখানে।

বুদ্ধু ॥ সঙ্গে সঙ্গে খাবে আমাদের বোমা।

ইন্দ্র ॥ আরে বোমাগুলো ফাটবে তো ?

বুদ্ধু ॥ ক্যাপ্টেন, বোমাগুলো আমার হাতের কাজ। সেজন্য জামিন থাকছি আমি।

মধু ॥ ক্যাপ্টেন, জীপের শব্দও পাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ পাকা সড়ক থেকে জীপটা এখানে আসবার জন্যে যেই কাঁচা সড়কে নামবে, আমাদের কাটা খাদে পড়েই জীপটা খাবে একটা ঝাঁকুনী। ঠিক সেই সময় আমাদের সিধু যদি বোমাটা ফাটাতে পারে ড্রাইভারের ওপরে, ওরে পারবে তো, পারবে তো ?

বুদ্ধু ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ক্যাপ্টেন, সিধুর টিপ সিওর।

[গরুর গাড়িটা এইস্থানের নিকটতম পথে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ইন্দ্র ॥ [উত্তেজিত স্বরে] হরিদাসী নেমেছে।

মধু ॥ কিন্তু রাজেন শালাকে তো দেখছি না।

ইন্দ্র ॥ লোকটা হয়ত মালপত্র নিয়ে গাড়িতেই রইল।

[উত্তেজিতভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরিদাসীর প্রবেশ।]

হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা, আমি এসেছি।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু তোমার হাতে কী ?

হরিদাসী ॥ মদের বোতল।

ইন্দ্র ॥ তুমি একা কেন ? রাজেন দত্ত কই ?

হরিদাসী ॥ তোমাদের দুর্ভাগ্য সে আজ এল না। কী কাজ আছে।

ইন্দ্র ॥ তবে তোমাকে নিয়ে এসেছে কে ?

হরিদাসী ॥ দত্তমশাই-র ডান হাত সেই গোমস্তাবাবু।

ইন্দ্র ॥ তিনি এলেন না যে এখানে ?

হরিদাসী ॥ মাল খাইয়ে তাকে বেসামাল করে রেখে এসেছি গাড়িতে।

ইন্দ্র ॥ গাড়োয়ান ?

হরিদাসী ॥ তাকেও।

ইন্দ্র ॥ গাড়ীতে আর কী ?

হরিদাসী ॥ বস্তা বস্তা চাল।

মধু ॥ ঐ জীপও আসছে।

বুদ্ধু ॥ হ্যাঁ ঐ যে হেড-লাইটের আলোতে সব দেখা যাচ্ছে।

হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা, তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে আমার কাছে।

ইন্দ্র ॥ ভয় করছে বুঝি ?

হরিদাসী ॥ (ইন্দ্রের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া) তা' একটু করছে বইকি।

ইন্দ্র ॥ তোর আবার ভয় ? ভয়ই তো তোকে দেখে ভয় পায়।

[বুদ্ধু হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

নো—নো—নো—বুদ্ধু, হাসি নয়। আর একটা কথাও নয়। ঐ জীপটা এসে গেছে, ঐ যে কাঁচা সড়কেও নামছে। হ্যাঁ ঐ খাদে পড়েছে। ঝাঁকুনী খেয়েছে—। বোমা—বোমা—

[সংগে সংগে কিছুদূরে বোমার আওয়াজ। আনন্দে নৃত্যরত বুদ্ধু অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সংগে সংগে রাইফেলের একটি গুলি আসিয়া তাহার পায়ে বিঁধিল। সে আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।]

বুদ্ধু ॥ ইন্দিরদা, শালা গুলি মেরেছে। আমার পায়ে লেগেছে।

ইন্দ্র ॥ হরিদাসী, তুই বুদ্ধুকে দেখ্। মধু, হাতবোমা নিয়ে ছোট্।

[বুধু যন্ত্রণায় কাৎরাইতে লাগিল। হরিদাসী তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল।]

হরিদাসী ॥ এই বুদ্ধু, কোথায় লেগেছে ?

বুদ্ধু ॥ [কাৎরাইতে, কাৎরাইতে] পায়ে। এই দ্যাখ ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

হরিদাসী ॥ ওটা আমি বন্ধ করছি। যাক তোর মাথাটা বেঁচে গেছে। বলিহারি যাই তোর বুদ্ধি দেখে। অমন কোরে হাসতে গেলি কেন, বুদ্ধু ?

বুদ্ধু ॥ কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিওনা হরিদাসীদি।

হরিদাসী ॥ আঃ, কতকাল পরে আবার সব এক সংগে খেলা হচ্ছে বুদ্ধু।

বুদ্ধু ॥ আঃ! আমি জলজ্যান্ত মারা যাচ্ছি আর উনি কিনা খেলা দেখছেন।

[ছুটিয়া আসিল ইন্দ্র।

ইন্দ্র ॥ দেখি, কোথায় লেগেছে ?

হরিদাসী ॥ পায়ে।

ইন্দ্র ॥ যাক্ বেঁচে যাবি। এখন দরকার 'ফাষ্ট' এইড্' [হরিদাসীকে] চল্ ওকে নিয়ে চল।

হরিদাসী ॥ কোথায় ?

ইন্দ্র ॥ আপাততঃ গরুর গাড়ীতে।

হরিদাসী ॥ তারপর ?

ইন্দ্র ॥ ঐ গোমস্তাবাবু আর চালের বস্তা, সেই সংগে তোকে আর এটাকে চালান দিচ্ছি তোর বাড়িতে।

হরিদাসী ॥ তারপর ?

ইন্দ্র ॥ জীপটাকে চালু করতে পারে কিনা দেখছি। জীপের ড্রাইভার শালা খুব অল্পের জন্য পালাতে পেরেছে। কিন্তু আসল শালা খতম্— যে শালা তোর বাড়িতে গিয়ে রাতে ঢলাঢলি করেছিল।

[বুধু হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে হরিদাসীও।]

বুদ্ধু ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ, এখন কুপোকাৎ। চলাঢলিই করছে।

ইন্দ্র ॥ এই বুদ্ধু আবার ? তোর না পায়ে গুলি বিঁধেছে !

বদ্ধু ॥ মুখে তো বেঁধেনি দাদা, চল।

[সকলে অগ্রসর হইল।]

হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা তোমার পায়ে গুলিটা লাগল না। আশ্চর্য !

ইন্দ্র ॥ সেজন্য তোর কি দুঃখ হ'চ্ছে ?

হরিদাসী ॥ তা হ'চ্ছে বৈকি। ভেবেছিলাম হয় তুমি মরবে না হয় আমি মরব। কার চোখে জল আসে দেখতেন বিধাতা।

ইন্দ্র ॥ পাগলামী রাখ। চল।

———

* পঞ্চম দৃশ্য *

শেষ রাত্রি।

[মহেন্দ্রের বহির্বাটীর সেই গৃহপ্রাঙ্গণে ময়না আহতদের অপেক্ষায় ছিল। অদূরে অন্ধকারের মধ্যে একটি শীষ শোনা গেল। ইহাতে ময়না চমকিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে অন্ধকারে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইতে আবির্ভূত হইল মাণিক।]

ময়না ॥ কে ?

[মাণিক পুনরায় একটি শীষ দিয়া হাতছানিতে তাহাকে কাছে ডাকিল।]

ময়না ॥ মাণিকদা! ওখানে কেন? এখানে এসো না।

[মাণিক ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মাণিক ॥ ময়নামণি! তুমি বুঝি ভেবেছো আমি ভয়ে পালিয়ে গেছি ?

ময়না ॥ না, তা ভাববো কেন? তোমার সাহস যে আমি জানি।

মাণিক ॥ ঠাট্টা!

ময়না ॥ না, না, ঠাট্টা কেন! এ গাঁয়ের সব জোয়ান ছেলেরা বিদেশী দুষমণদের হটিয়ে দেবার জন্য একজোট হয়ে কুচকাওয়াজ শিখছিলো দাদার কাছে এ কয়দিন। দাদা তোমাকেও ডাকতে গিয়েছিলেন, তুমি তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছো শত্রুর ভয় তুমি করো না।

মাণিক ॥ হ্যাঁ, না—তা বলেছিলাম। মামা বলে কিনা, তাই বলেছিলাম। মামার দু'দুটো বন্দুক আছে যে। কাউকে ভয় পায় না।

ময়না ॥ আ হা-হা—তাই তো! দু'দুটো বন্দুক! দাদা তবে কেন মিছামিছি গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের নিয়ে—

মাণিক ॥ মামা তো বলেন, তোমার দাদা একটি ইষ্টুপিড।

ময়না ॥ আমার দাদাকে ইষ্টুপিড বলছ? ইষ্টুপিড ?

মাণিক ॥ আমি না, মামা। তোমার দাদা মিলিটারীতে বছর দুই চাকরী করে তোমার বিয়ে দিতে এক মাসের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। গাঁয়ের বোকা ছেলেগুলোকে দুদিন কুচকাওয়াজ করিয়ে খুব সর্দারী করছে। বলছে গোরিলা লড়াই করবে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। [ময়নার দিকে তাকাইয়া ভয়ে] আমি না, মামা।

ময়না ॥ এদের ঢাল তরোয়াল নেই বটে, কিন্তু তোমাদের রয়েছে দু' দু'টো বন্দুক। কেমন ?

মাণিক ॥ এই তো বুঝেছো! আর আমি তাই তোমাকে নিয়ে যেতেই সেছি।

ময়না ॥ কোথায় ?

মাণিক ॥ আমাদের বাড়ি।

ময়না ॥ তোমাদের বাড়ি ? আমি যাবো কেন ?

মাণিক ॥ আমাদের বাড়ীই তো এখন তোমার বাড়ি। বাকি ছিলো শুধু মন্ত্রপাঠটা, নইলে বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে।

ময়না ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। বিয়ে হয়ে গেছে ?

মাণিক ॥ না হয় আর একবার হবে। আমরা আজ শেষ রাতে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিনা ?

ময়না ॥ চলে যাচ্ছো ?

মাণিক ॥ হ্যাঁ ! এখানকার এসব হাঙ্গামায় মামা আমাদের আর রাখতে চাইছেন না। আমামাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আজ এই শেষ রাতে মামার শ্বশুর বাড়ি। কিন্তু তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমি যেতে পারছি না ময়নামণি। তোমাকে তো আজ আমি নতুন ভালোবাসছি না গো।

ময়না ॥ কে বলছে সে কথা ? বহুদিন থেকেই যে তুমি আমাকে জ্বালাচ্ছো সে কথা গাঁয়ের লোক সবাই জানে। মাঝে মাঝে এমন জ্বালাতন হতাম, আমি মা'কে বলতাম, না মা আর পারিনে, ঐ মানুকের সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও।

মাণিক ॥ এ্যাঁ, তুমি বলতে ? বলতে ?

ময়না ॥ তোমাদের কত টাকা-পয়সা, জমিজমা দেখে মা'রও ছিলো না আপত্তি—।

মাণিক ॥ বা বা—বা, তাই নাকি ?

ময়না ॥ আপত্তি হলো বাবার আর দাদার। তাঁরা বলতেন, চোরাকারবার, জাল-জোচ্চুরি আর মুনাফাবাজীতেই নাকি তোমাদের অত টাকা পয়সা। সব ধনই নাকি তোমাদের অধর্মের ধন।

মাণিক ॥ এই দ্যাখো। এই সব কথা আমিও মামাকে মাঝে মাঝে বলি। তা মামা বলেন, টাকা-পয়সার আবার জাত আছে নাকি ? ধর্মের টাকারও যা দাম, অধর্মের টাকারও সেই দাম। ঐ সেই ষোলো আনা। সেই একশো নয়া পয়সা। কমও নয়, বেশীও নয়।

ময়না ॥ তাই তো এ কথাটা তো ভেবে দেখিনি।

মাণিক ॥ তবেই দ্যাখো, মামার বুদ্ধিটা দ্যাখো। তোমার কাছে আর গোপন করবার কি আছে, বিদেশী শত্রুরা আসছে দেখে এ গাঁয়ের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে পালাই পালাই করছে ! কিন্তু মামার ব্যবসা আরো জেঁকে উঠছে।

ময়না ॥ বলো কি ? তাই নাকি ?

মাণিক ॥ হ্যাঁ গো। যা কেউ পারেনি, মামা পেরেছে। হ্যাঁ, মামা ঐ বিদেশী শত্রুদের সঙ্গেও যোগাযোগটা রেখেছে। মামার মাল সোনার দামে বিকোচ্ছে। নোট নয়—টাকা নয়—একেবারে খাঁটি সোনা ! ভাবছো কি ? সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো আমি তোমাকে। এসো ময়নামণি, এসো।

ময়না ॥ [রাগে ফুলিয়া] এবার বরঞ্চ তুমি এসো।

মাণিক ॥ সে কি গো ?

ময়না ॥ আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো। একটা বন্দুক পেলে গুলি করে তোমাকে মারি।

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, আমাকে মারবে ? বিধবা হবে যে।

ময়না ॥ [কৃত্রিম কোপে] বিধবাই হচ্ছি। [কোমরে কাপড় জড়াইল]

মাণিক ॥ ওরে বাবা। এ যে মাকালী !

> [পলায়ন। ময়না ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল কিশোর।]

কিশোর ॥ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় !

ময়না ॥ কেউ না, কেউ না। কিন্তু ব্যাপার কি কিশোর ?

কিশোর ॥ ফার্ষ্ট-এডের বাক্সটা শিগ্‌গীর আমাকে দাও।

ময়না ॥ কেন কিশোর ? দাদা তো সেটা আমার কাছেই রাখতে বলেছে।

কিশোর ॥ কিন্তু দাদাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, সেটা নিয়ে যেতে, এক্ষুণি।

ময়না ॥ কেন, কেন কিশোর ? কেউ জখম হয়েছে নাকি ?

কিশোর ॥ হ্যাঁ ময়নাদি, শত্রুর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে।

ময়না ॥ সে কি ? আমাদের কেউ মারা গেছে নাকি ?

কিশোর ॥ না না, এখনো আমাদের কেউ মরেনি। হয়েছিলো কি জানো ? একটা জীপ গাড়ীতে ওদের কজন মিলিটারী ছুটে আসছিলো আমাদের গাঁয়ের দিকে জঙ্গলের ধারের রাস্তাটা দিয়ে।

ময়না ॥ কিন্তু ও রাস্তাটায় তো তোরা একটা খাদ কেটে দিয়েছিস।

কিশোর ॥ হ্যাঁ, সেই খাদে ছিটকে পড়ে ওদের গাড়ীটা লোকগুলো জখম হয়ে চীৎকার করে ওঠে। সেই চীৎকার শুনে পাশের জঙ্গল থেকে হো হো করে হেসে উঠে আমাদের বুদ্ধুদা সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন বন্দুক ছোঁড়ে সেই হাসি লক্ষ্য করে। ব্যাস, বুদ্ধুদা কুপোকাত ! ডান পায়ে বিঁধেছে গুলী—দাদা তাকে পিঠে করে এনেছে আর একটা জায়গায়। কিন্তু আর এখন এখানে আনার উপায় নেই, তাই ফার্ষ্ট-এডের বাক্সটা—

ময়না ॥ আমি আনছি।

> [ময়না ছুটিয়া ঘরে গেল। কিশোর আলোটি নামাইয়া সেই আলোতে তাহার পায়ের একটি কাঁটা তুলিতে চেষ্ট করিতে লাগিল। ফাষ্ট-এইডের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিল ময়না।]

কিশোর ॥ [কাঁটা তুলতে গিয়ে আপন মনে] বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই কর কর সবে সাজ। শালা পায়ে ধরেছিস, তাই কিছু বলিনি।

ময়না ॥ ওকি, তোর পায়ে কি হয়েছে ?

কিশোর ॥ বিদেশী দস্যু কাঁটা হয়ে পায়ে ফুটে গেছে ময়নাদি। এই যে—এই যে—শালাকে টেনে বের করো। পা ছাড় শালা।

ময়না ॥ তাই তো! কত বড় কাঁটাটা—

[ময়না কাঁটাটি টানিয়া বাহির করিল।]

কিশোর ॥ আঃ! মর শালা [কাঁটাটি ফেলিয়া দিল] পা ধরেছিলি তাই বেঁচে গেলি। এবার খুব ছুটতে পারবো।

ময়না ॥ দাঁড়া। একটু টিন্‌চার আয়োডিন দিয়ে দিচ্ছি।

[ময়না বাক্সটি খুলিয়া টিন্‌চার আয়োডিন লাগাইয়া দিলো।]

কিশোর ॥ ভাগ্যিস বাক্সটা খুলেছিলে। এটুকু ব্যাণ্ডেজে কি হবে—আরো ব্যাণ্ডেজ চাই যে।

ময়না ॥ কিন্তু আর তো নেই কিশোর।

কিশোর ॥ একটা পুরোনো কাপড়-টাপড় ছিঁড়ে দাও না। না থাক্, দেরী হয়ে যাবে।

ময়না ॥ না না দেরী হবে না, আমি দিচ্ছি।

[নিজের বাড়ীর সম্পূর্ণ আঁচলটি ছিঁড়িয়া দিতে গেল। কিশোর বাধা দিল।]

কিশোর ॥ করছো কি ময়নাদি! বিয়ের শাড়িটা—

ময়না ॥ লড়াইটাই আজ বিয়ে।

[ময়না দাঁতে শাড়ির আঁচলটি কাটিবে এমন সময় বুদ্ধুকে লইয়া ইন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ময়না ছুটিয়া গিয়া বুদ্ধুকে ধরিল।]

ইন্দ্র ॥ [কিশোরকে] ফার্ষ্ট এইডের বাক্সটা আনতে ছ'মাস লাগে ইডিয়ট?

[ধরাধরি করিয়া বুদ্ধুকে শোয়াইয়া দিল। বুদ্ধ কাতরাইতেছে।]

জল! পাখা!! [কিশোর ও ময়না ঘরে ছুটিল] এই বুদ্ধু তুই তো হাসছিলি।

বুদ্ধু ॥ [কাতরাইতে কাতরাইতে] হাসছি, এখনো হাসছি। আঃ—উঃ।

[কিশোর ও ময়না, জল, পাখা আনিয়া সেবার কাজে লাগিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ ফার্ষ্ট-এইডের বাক্স খুলিয়া বুদ্ধুর পায়ের কাছে রাখিল। ফার্ষ্ট-এইড আরম্ভ করিয়া ছুরিটা বাহির করিল।]

ইন্দ্র ॥ হাস্, বুদ্ধু, হাস্।

বুদ্ধু ॥ উঃ—আঃ—আমি তো হাসছি,—আমি তো হাসছি।

ময়না ॥ কেঁদোনা বুদ্ধুদা, শত্রু হাসবে।

বুদ্ধু ॥ উঃ—আমি তো হাসছি, আমি হাসছি। আঃ—ওঃ—

ইন্দ্র ॥ [ইন্দ্রনাথ ব্যাণ্ডেজ করিতে করিতে] ঐ যে আমাদের চারণ দল পথে পথে গান গেয়ে পাহারা দিচ্ছে—গলা মেলা বুদ্ধ, গলা মেলা—

[চারণগণের গান]

সীমান্তে আজ দিচ্ছে হানা
রক্ত আঁখি ঘোর।
শক্ত সিধে রুখে দাঁড়া পরখ হবে জোর
বন্দে মাতরম্ চির অভয় মন্ত্র তোর ॥
প্রভাতখানি ছিল রঙ্গীন স্বর্ণরোদে মোড়া
মানবতার পুণ্যপথে তীর্থগামী মোরা।
বিশ্বটারে ভেবেছিলাম বাঁধবো প্রেমহারে
ভাঙলো স্বপন দ্বারের পাশে অস্ত্র ঝনৎকারে।
বিঘ্ন-বিপদ সয়েছি ঢের আর করিনে ভয় (মোরা)
শুভাশুভের দ্বন্দ্ব এতো নতুন কথা নয়।
জিনবো তারে জীবন-পণে ঐক্যে বাঁধা প্রাণ
দুষ্কৃত দমনের সাথী আছেন ভগবান ॥

[গীতিকার শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

* প্রথম দৃশ্য *

প্রভাত।

[মহেন্দ্রের বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের বৈঠক। মহেন্দ্র, শিবনাথ, হলধর, দীননাথ, শীতল—এই পঞ্চপ্রধান উপস্থিত। তাহা ছাড়া গ্রামরক্ষীদের নায়ক মিলিটারী পোষাক পরিহিত ইন্দ্র, কানাই ও কিশোরও এ সভায় উপস্থিত। বারান্দায় জয়মতী ও ময়না ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত। কিন্তু তাহাদের কাণ রহিয়াছে বৈঠকের আলোচনায়। কানাই পোষ্টার লিখিতেছে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "শত্রু যদি আসে ঝুঁকে, থাবড়া কষে মারবো বুকে।" কিশোরের বুকে পিঠে দুইটি পোষ্টার বাঁধা। তাহাতে লেখা—(১) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়,রে, কে বাঁচিতে চায়। (২) বিদেশী শত্রু আসিছে রে ওই, কর কর সবে সাজ।—সে পঞ্চপ্রধানকে তামাক, জল ইত্যাদি পরিবেশন করিতেছে।]

শিবনাথ ॥ হয়তো কোনো একটা ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিরোধ বেধেছিলো।

শীতল ॥ রাখো ওসব বড় বড় কথা। শাস্ত্রটাস্ত্র বরং আমরা বুঝি। রাজনীতির কী-ই বা আমরা জানি, কী-ই বা আমরা বুঝি।

হলধর ॥ তা নয়তো কি? সহর থেকে কতদূরে অজ পাড়াগাঁয়ে আমরা থাকি। গাঁয়ের একমাত্র রাজপুরুষ রামু চৌকিদার। তা সেও তো হকচকিয়ে গেছে কিচ্ছু জানে না সে।

মহেন্দ্র ॥ আরে বাপু, বিরোধ তো আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসা করা যেতো।

শিবনাথ ॥ তা নয়তো কি? জোত-জমি, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ আপোষে নিষ্পত্তি করে দিচ্ছে না কি এই পঞ্চায়েত?

হলধর ॥ মামলা মোকদ্দমা করে, দু'পক্ষকেই হতে হয় সর্বস্বান্ত, এটা মানুষ ঠেকেও শেখে না গো, দেখেও শেখে না।

ইন্দ্র ॥ ওসব হা-হুতাশ এখন রাখুন। সামনে এখন যে বিপদ সে দিকে তাকান। বিদেশী সৈন্য অতর্কিতে আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। কোনো যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে কিনা আমরা জানি না। আমাদের সৈন্যবাহিনী হয়তো এগিয়ে আসছে শত্রুর অগ্রগতি রুখতে। কিন্তু মাইলের পর মাইল জবর দখল করে এরই মধ্যে শত্রু এসে পড়েছে আমাদের গাঁয়ের সীমানায়, আমাদের ঘাড়ের উপর। আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?

মহেন্দ্র ॥ সরকার নিশ্চই চান না আমরা নতি স্বীকার করি—আবার আমরা পরাধীন হই।

ইন্দ্র ॥ জাতীয় সরকার তা কখনো চাইবেন না। কঠোর সংগ্রাম করে দু'শো বছরের বিদেশী শাসন দূর করে এ দেশ হয়েছে স্বাধীন। এখন আবার বশ্যতার কথা চিন্তা করাও পাপ। সহজ বুদ্ধিতে আমি এইটুকু বুঝি, দেশের মাটি আমার মা টি। আমার দেশ আর আমার এই মা, দুই ই এক। রক্ষা করবার ভার সন্তানের।

কানাই ॥ [পোষ্টারটি ঝুলাইয়া] "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী।"

জয়মতী ॥ বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। মায়ের মান-সম্মান তোদেরই হাতে।

ইন্দ্র ॥ তুমি ভেবো না মা। শত্রু যদি এ গাঁয়ে ঢুকে পড়ে আমরা ছেড়ে কথা কইবো না।

মহেন্দ্র ॥ শোনো বাবা, শোনো। একটা কথা বিবেচনা করবার আছে। শত্রু দলে ভারী।

হলধর ॥ শুনেছি গাঁয়ের সীমান্তে এখন পর্যন্ত যা এসে পড়েছে তার সংখ্যাই শ' দুই।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ তাই। এরা হলো গিয়ে অগ্রগামী দল।

মহেন্দ্র ॥ ওরা মিলিটারী। সশস্ত্র। তোমরা নিরস্ত্র।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আমরা জানি, আমরা নিরস্ত্র।

মহেন্দ্র ॥ তবে কি করে লড়াই করবে তোমরা ?

ইন্দ্র ॥ গেরিলা লড়াই করবো আমরা।

কানাই ॥ তাকে তাকে থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রু নিপাত করবো আমরা।

মহেন্দ্র ॥ তোমরা কারা ?

কানাই ॥ এ গাঁয়ের সব ছেলেরা।

ময়না ॥ মেয়েরাও।

ইন্দ্র ॥ এ ক'দিন মিটিং করে আমাদের যা করণীয় তা আমরা ঠিক করে ফেলেছি।

ময়না ॥ আমরাও।

জয়মতী ॥ বিদেশী শত্রু তাড়াও, মায়ের দুধের মান রাখো সবাই।

মহেন্দ্র ॥ শুধু এই আফশোষ আমাদের হাতিয়ার নেই।

জয়মতী ॥ হাতিয়ার না থাক হাত আছে।

কিশোর ॥ নখ আছে। দাঁত আছে।

কানাই ॥ আর কিছু না পারি, মরার আগে মরণ কামড় দিয়ে মরতে পারবো আমরা।

ইন্দ্র ॥ মিলিটারী হাতিয়ার আমাদের নেই সত্যি, কিন্তু বিপাকে ফেলে টুঁটি চেপেও মারা যায় মানুষকে।

কিশোর ॥ [একটি পোস্টার দেখাইয়া] "শত্রু যদি আসে ঝুঁকে, থাবড়া কষে মারবো বুকে।"

[কেউ কেউ হাসিয়া উঠিল।]

ইন্দ্র ॥ আসবে কিরে ? শত্রু তো এসে গেছে। কাল রাতে। ঘরের দুয়ারে।

[রাজেন্দ্রর প্রবেশ।]

ময়না ॥ ঘরের দুয়ারে বলছো কেন দাদা ? বরং বলো এসে গেছে ঘরে।

রাজেন্দ্র ॥ কে ?

ইন্দ্র ॥ শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটা রব তুলে খুব একটা হৈ হৈ সুরু করেছো বটে তোমরা। যতো সব হুজুক আর হুজ্জত। তা পঞ্চায়েত, তোমার সভায় এ অধমকে তলব কেন ?

মহেন্দ্র ॥ পরামর্শ চাই। বসো ভাই বসো।

রাজেন্দ্র ॥ পরামর্শ ! তবে তামাক।

জয়মতী ॥ তামাক খাবার এখন তোমার খুব সুবিধে হবে ঠাকুর পো।

রাজেন্দ্র। কেন, কেন ?

জয়মতী ॥ লড়াইয়ের আগুন জ্বললো দেশে।

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই ? কোথায় লড়াই ? কে বলছে লড়াই !

মহেন্দ্র ॥ বিদেশী সৈন্য গাঁয়ের সীমান্তে এসে পড়েছে। শোন নি ? জানো না ?

রাজেন্দ্র ॥ বিদেশী আর সৈন্য হলেই যে শত্রু হবে, তা কে বলছে ? শত্রু যদি হতো আমাদের সৈন্য ছুটে এসে ওদের রুখতো না ? ওরা যে আমাদের সরকারের নেমন্তন্নে এদেশে বেড়াতে আসেনি, কে বলতে পারে ?

হলধর ॥ দেখো ওরা তোমার জামাই-টামাই নয়তো ?

[সকলের হাস্য]

রাজেন্দ্র ॥ প্রাণ যা চায় বলো। আমার হচ্ছে গণ্ডারের চামড়া। যা ভালো বুঝি, সে আমি বলবোই।

শীতল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো' মারো আর ধরো পিঠে বেধেছি কুলো। শাস্ত্র বাক্য।

রাজেন্দ্র ॥ [চটিয়া] প্রমাণ কি যে, ঐ বিদেশী সৈন্য আমাদের শত্রু ? শত্রুই যদি হতো, তবে কি আমাদের সরকার ঘুমিয়ে আছে ? আমি বলছি ওরা এসেছে সরকারী নিমন্ত্রণে এদেশে বেড়াতে। যুদ্ধ করতে নয়।

দীননাথ ॥ ইংরাজ যখন এদেশে ঢুকে পড়ে, মীরজাফরের দলও তাই বলেছিলো বটে। বলেছিলো, ওরা এসেছে ব্যবসা করতে, রাজ্য করতে নয়।

অনেকে ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলো।

রাজেন্দ্র ॥ বলো ভাই বলো, প্রাণ যা চায় বলো। মুখের তো আর ট্যাক্স নাই। তা আমাকে তলব কেন ? আমার সঙ্গে কী পরামর্শ ?

ইন্দ্র ॥ কাল আমরা প্রথম দেখতে পাই একদল বিদেশী সৈন্য আমাদের জঙ্গলের ওধারে আনাগোনা করছে। তখনই বুঝতে পারি, তাদের উদ্দেশ্য আমাদের গ্রাম আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিতে আমরা গ্রামবাসীদের প্রস্তুত থাকতে বলি।

রাজেন্দ্র ॥ কিন্তু তাতে তোমার বাপই হলেন সবচেয়ে বেশী অপ্রস্তুত। মেয়ের বিয়েটাই হল পণ্ড। ঐ মেয়েকে আর কে ঘরে নেবে ? নিতে পারতাম একমাত্র আমি। রাজীও হয়েছিলাম মাণকের সঙ্গে বিয়ে দিতে। কিন্তু এমন অপয়া মেয়েটা, ঠিক সময় বুঝেই ডেকে নিয়ে এলো মাথার উপরে একটা এরোপ্লেন।

ময়না ॥ এই অপয়া মেয়ে যে আপনার ঘরে যায়নি এ আপনি খুব বেঁচে গেছেন খুড়োমশাই।

কানাই ॥ আমরাও বেঁচেছি।

মহেন্দ্র ॥ আঃ! তোমরা থামো। [ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া] তারপর?

ইন্দ্র ॥ এ গ্রামে বিদেশী সৈন্য আসবার যে সব পথঘাট ছিলো, এ কয়দিনে আমরা তাতে বড়ো বড়ো খাদ কেটে দিয়েছি। গাড়ী নিয়ে এই সব পথঘাটে যাতায়াত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়েছে। কাল রাতে বিদেশী মিলিটারী জীপ গাড়ীতে চড়ে গ্রামে ঢুকতে গিয়ে পড়ে যায় ওই খাদে। আরোহী সৈনিকরা আহত হয়ে গাড়ীটা ফেলেই গেছে পালিয়ে।

সকলে ॥ সাবাস! সাবাস!

দীননাথ ॥ কতো বড়ো আনন্দের কথা।

রাজেন্দ্র ॥ বটেই তো, বটেই তো। পঞ্চায়েতের উচিত তোমাদের ভরপেট মিষ্টি খাইয়ে দেওয়া। বৌঠান; বিয়েটা তো কাল মাঠেই মারা গেছে, মিষ্টি-টিষ্টিগুলো যদি থাকে, ভোজটা আজ হতে দোষ কি! 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' —বল না হে শীতল।

জয়মতী ॥ বিয়েটা মারা গেছে বটে কিন্তু ভোজটা মারা যায়নি ঠাকুরপো।

কিশোর ॥ আমাদের গেরিলা বাহিনী পেটপুরে খেয়েছে সেই ভোজ কাল রাতে।

মহেন্দ্র ॥ না না, চায়ের টিনগুলো পড়ে রয়েছে দেখেছি।

জয়মতী ॥ চা করতে আমি বলেছি। কিছু মিষ্টিও আছে। এ কয়েক-জনের হবে। আমি দিচ্ছি। আয় তো ময়না।

ইন্দ্র ॥ [কিশোরকে ইঙ্গিতে] কিশোর তুমি যাও ভাই। চা-টা একটু ভালো করে তৈরী করে আনো। আমার গলাটাও কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে ঐ চায়ের কথা শুনে।

কিশোর ॥ সেই মিলিটারী চা তো?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, মিলিটারী চা।

[জয়মতী, ময়না এবং কিশোর অন্দরে চলিয়া গেল।]

ইন্দ্র ॥ কিন্তু এ আনন্দ আমাদের ক্ষণস্থায়ী। এর পরেই আসছে অনেক দুঃখের কথা। কাল ছিলো শুক্লপক্ষের মেঘলা রাত। এই আবছা আঁধারের সুযোগ নিয়ে শত্রুদের মতলব ছিল, এ গাঁয়ে সরাসরি ঢুকে গাঁয়ের অবস্থাটা দেখা। হ্যাঁ আরো হয়তো কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিলো—যাকগে সে কথা। এখন সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—শত্রু কাল থেকে আমাদের ঘরের দুয়ারে। আজ আর তারা বসে থাকবে না, আজ করবে আক্রমণ।

রাজেন্দ্র ॥ তাই কি? তাহলে কাল করেনি কেন?

ইন্দ্র ॥ আজকাল লড়াইয়ের ধারাটা একটু বদলে গেছে। যাদের আক্রমণ করবে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মিত্র খুঁজে বেড়ায় শত্রু। হ্যাঁ, প্রথমে সেই

চেষ্টাই করে। তাতে লড়াইটা তাদের পক্ষে হয় সহজ। কাল পর্যন্ত শত্রু হয়তো সেই চেষ্টাই করেছে। কিন্তু অপেক্ষারও একটা সীমা আছে। আজ করবে না।

রাজেন্দ্র ॥ বলো পঞ্চায়েত, এখন কি করা। আমাদের এইসব নিধিরাম সর্দারের ভরসায় গাঁয়ে বসে থাকবে, না পালাবে।

মহেন্দ্র ॥ সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাতে পারবো না।

সকলে ॥ না, না, পালানো চলবে না।

হলধর ॥ কোথায় পালাবো? পালিয়ে যেখানে যাবো, সেখানেও তো পিছু পিছু ধাওয়া করবে এই শত্রুই।

শীতল ॥ পালিয়ে কার দোরে যাবো? কে দেবে আশ্রয়? কে দেবে খেতে? মরতে হয় লড়াই করেই মরবো। শাস্ত্রেও বলে 'মাভৈঃ!'

অনেকে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। লড়াই করেই মরবো।

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই! তোমাদের সম্বল তো ওই বাঁশের লাঠি। বড়জোর কুড়ুল, কাস্তে আর বঁটি দা। তাই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে তোমরা মিলিটারীদের! কামান, বন্দুক, মেশিনগান—এ্যাটম বোম! আবার বলে কিনা মাভৈঃ।

দীননাথ ॥ তুমি কি করতে চাও রাজেন?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমার মতটা আমরা জানতে চাই রাজেন। সেইজন্যই তোমাকে ডেকেছি।

রাজেন্দ্র ॥ পালাবো? কোথায় পালাবো?

হলধর ॥ তবে গাঁয়ে থেকেই লড়াই করবে?

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই? তা নিধিরাম সর্দাররা করতে পারে। লড়াই করবার শক্তি আমার নেই।

মহেন্দ্র ॥ তবে কি শত্রুর কাছে জোড়হাত হবে?

রাজেন্দ্র ॥ প্রজাকে রক্ষা করার ভার আমাদের সরকারের। সরকার যদি আমাদের রক্ষা না করে, জোড়হাত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? আমার বাপু স্পষ্ট কথা। এই যে চা-জলখাবার এসে গেলো। আঃ! এখনি যদি আমাদের জাতীয় সরকারের সৈন্য বাহিনীটা এসে যায়—তাহলে শালাদের একবার দেখে নিতাম।

[ময়না, জয়মতী, কিশোর চা-জলখাবার ইত্যাদি পরিবেশন করিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ খুড়োমশাইও তবে পালাচ্ছেন না। এটা আমি বিশ্বাস রাখি যে, ওঁর বাড়ির লোক পালালেও উনি পালাবেন না। কারণ চট্ করে এত বিষয়-সম্পত্তি উনি পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতে পারেন না। তা ভালোই হলো। আমরা তো সবাই একমত—গাঁয়ে থাকব। শত্রুকে যে যতটা পারি বাধা দেবো। মেয়েদের জন্যই বেশী ভাবনা। ইতিহাসে লেখা আছে আগেকার দিনে শত্রুর

হাতে অসম্মানের ভয়ে মেয়েরা বিষের আঙটি হাতে পরে থাকতো। আমারও তাই বেদেদের কাছ থেকে সাপের বিষ যোগাড় করে রেখেছি বেশ কিছু।

অনেকে ॥ বিষ!

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বিষ। লড়াইয়ের সময়ে বিষ অনেক কাজে লাগে। সম্মান রক্ষা করতে আত্মহত্যা করা যায়। আবার সুযোগ পেলে পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে শত্রুনাশও করা যায়।

রাজেন্দ্র ॥ বিদেশী শত্রু—বিদেশী শত্রুকে দেবে বিষ? সে সুযোগ তারা বুঝি তোমাকে দেবে? না, এসব ছেলেমানুষি আর সইতে পারছি না। ওহে খাবার তো খাচ্ছি। কিন্তু চা দিতে দেরী করছো কেন?

কিশোর ॥ দিচ্ছি, দিচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কাল রাতে আমরা একটা আশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার করেছি।

কেউ কেউ ॥ কি আবার আবিষ্কার করেছো?

ইন্দ্র ॥ বলছিলাম না, হানাদাররা ওদের গাড়ীটা ফেলেই চম্পট দিয়েছে। আবিষ্কারটা করেছি আমরা সেই গাড়ীটিতে আজ রাত পোহালে, ফর্সা হলে—

হলধর ॥ কি পেয়েছো হে?

ইন্দ্র ॥ বেশ কিছু গানি ব্যাগ, চটের বড়ো বড়ো থলি।

দীননাথ ॥ তাই নাকি? কি ছিলো হে তাতে?

শীতল ॥ বোমা বারুদ নাকি?

ইন্দ্র ॥ না—না, বস্তাগুলো ছিলো খালি।

মহেন্দ্র ॥ তবে হয়তো এই খালি বস্তাগুলো নিয়ে এ গাঁয়ে আসছিলো রসদ জোটাতে।

শিবনাথ ॥ তবে হয়তো ওদের রসদে টান পড়েছে।

ইন্দ্র ॥ এ অনুমান মিথ্যা নয়। খুব সম্ভব শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা সৈন্যদের রসদ যোগাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এইজন্য শত্রু এদেশ থেকে বে-আইনীভাবে রপ্তানী খাদ্যদ্রব্যের জন্য যে কোন মূল্যে দিতে রাজী। আমরা বিশ্বাস করি কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী গোপনে সীমান্তের অপরদিকে খাদ্য রপ্তানী করছে।

রাজেন্দ্র ॥ এ ছেলেকে আর ঘরে ধরে রাখতে পারবে না বৌঠান। দিল্লীতে টেনে নিয়ে যাবে কোনদিন, সেনাপতি করে। দে বাবা এক পেয়ালা চা।

কিশোর ॥ এই যে। নিন।

ইন্দ্র ॥ বস্তাগুলোর মালিক কে তা আমরা জানতে পেরেছি।

রাজেন্দ্র ॥ কে? [চায়ে চুমুক দিয়া] বাঃ বেশ গরম চা।

ইন্দ্র ॥ যার বস্তা, সে এখানেই বসে আছে। হাতে-নাতে ধরা যাবে।

কেউ কেউ ॥ কে? কে সে?

ইন্দ্র ॥ তারই চায়ে বিষ দেওয়া হয়েছে। সে বিষ খেয়েছে।

রাজেন্দ্র ॥ (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) এ্যাঁ ?

[থর্ থর্ করিতে লাগিল।]

তোমরা আমাকে বিষ খাইয়েছো, তোমরা আমাকে বিষ খাইয়েছো।

ইন্দ্র ॥ বিষটা তোমার মনে, চা-তে নয়।

[চট করিয়া রাজেন্দ্রের চায়ের কাপটি লইয়া বাকি চা-টুকু সে খাইয়া ফেলিল।]

ইন্দ্র ॥ একটা বস্তা এনে দেখা। দেখুক সকলে।

কানাই ॥ [সে প্রস্তুত ছিলো। চট করিয়া একটি বস্তা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিল] এই যে। এই দেখুন, বস্তায় লেখা রয়েছে, R. N. D. মানে, রাজেন্দ্রনাথ দাস।

সকলে ॥ ওকে মারো, ওকে মারো, মেরে ফেলো।

শীতল ॥ ঘরভেদী বিভীষণ, শাস্ত্রেই বলেছে, 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ'—

হলধর ॥ শালা পঞ্চমবাহিনী, আজ তোকে আমি [সে জুতা তুলিল]।

ইন্দ্র ॥ থামুন, থামুন, আপনারা সব থামুন। আমার কথা শুনুন।

[সকলে নিরস্ত হইল।]

ইন্দ্র ॥ [রাজেন্দ্রকে] আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে সোজা চলে যেতে হবে গাঁয়ের বাইরে। যদি না যাও, যে শত্রুকে আমরা প্রথম মারবো, সে হচ্ছো তুমি।

রাজেন্দ্র ॥ বেশ আমি যাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু খবরদার। এখান থেকে সোজা চলে যেতে হবে গাঁয়ের বাইরে। বাড়ীতে আর যাওয়া চলবে না।

রাজেন্দ্র ॥ বাড়ি না গেলে আমার কাপড় চোপড়, খরচপত্র—

ইন্দ্র ॥ না। বাড়ি ঢোকা আর চলবে না। তুমি দেশদ্রোহী, এ দেশের মাটি, এ দেশের ধনসম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার যা সম্পত্তি—ধান, চাল, টাকাকড়ি, দু'দুটো বন্দুক, এসব দেশরক্ষার কাজে লাগবে। এখন আমাদের, ভারতীয় সৈন্যরা এলে তখন তাদের।

রাজেন্দ্র ॥ এ্যাঁ ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ। এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত।

কানাই ॥ না না, ও হচ্ছে সাপ, সুযোগ পেলেই আবার কামড়াবে।

শীতল ॥ কি করছ! শাস্ত্রে বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

মহেন্দ্র ॥ না না। ওর বিষদাঁত ভেঙে গেছে। ওকে মেরে ফেললে তো বেঁচে যাবে। ও বরং বেঁচে থেকে ভোগ করুক গোটা দেশের, সমস্ত মানুষের ঘৃণা আর অভিশাপ।

দীননাথ ॥ হ্যাঁ, পালাও, এখনি পালাও, নইলে আমি তোমার মুখে থুথু দেব।

রাজেন্দ্র ॥ না—না, আমি যাচ্ছি। [রাজেন্দ্র চলিয়া গেল।]

ইন্দ্র ॥ কানাই, তোমরা কেউ ওঁর পিছু নাও। আর এই পঞ্চায়েতকে আমরা অনুরোধ করছি ঐ দেশদ্রোহীর বাড়ি দখল করে ওখানেই এখন থেকে বসুক পঞ্চায়েতের অফিস—আমাদের আত্মরক্ষার ঘাঁটি।

সকলে ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয়। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

॥ সংযোজন ॥

[সংবাদপত্র হস্তে রামু চৌকিদারের প্রবেশ।]

রামু ॥ ঐ আওয়াজ ঐ আওয়াজ—শুনে এলাম শহরেও। লালচীন নাকি আমাদের দেশের মাটিতে শুধু ঢুকে পড়েনি, ধেয়ে আসছে। এই দেখ খবরের কাগজে কি সব লিখেছে।

ইন্দ্র ॥ (সংবাদপত্রটি ব্যস্ততার সঙ্গে লইয়া পাঠ) "নয়া দিল্লী, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪২। জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর বেতার ভাষণ। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে—শান্তিকামী ভারতের সীমান্ত সমস্যা মীমাংসার সর্বচেষ্টা অগ্রাহ্য করে, লাদাক্ ও নেফা-সীমান্তে লালচীনের অতর্কিত অভিযানে গুরুতর পরিস্থিতি। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত কখনো এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়নি। আমাদের প্রত্যেককে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে বিশ্বাসঘাতক শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে, মাতৃভূমি থেকে বিদেশী শত্রুর শেষ সৈন্যটিও বিতাড়ন করতে। আমি জানি, আমরা তা পারব।"

সকলে ॥ পারব। পারব। পারব।

ইন্দ্র ॥ জয় হিন্দ।

সকলে ॥ জয় হিন্দ।

ইন্দ্র ॥ বন্দেমাতরম্।

সকলে ॥ বন্দেমাতরম্।

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

[প্রভাত-ফেরীর গান।]

ভারতের হবে জয়।
ভুলি নাই মোরা ফাঁসীর মঞ্চে গাহি জীবনের গান—
ভুলি নাই মোরা দধীচির মতো অস্থি করি যে দান ॥
মোদের ধমনী প্রবাহে বহিছে সে রাঙা রক্ত-আজো।
বিদেশী শত্রু হেনেছে আঘাত সাজো—সাজো—সাজো।
বাজোরে শংখ বাজো ॥

ভারত, ভারত, মোদের ভারত
ভারতের হবে জয়।
মুক্ত করিব ভারতভূমিরে শত্রু করিয়া ক্ষয় ॥
মহাভারতের সন্তান মোরা এক জাতি এক প্রাণ।
ধ্বংস করিব মহাশত্রুর মুক্ত করি কৃপাণ।
গাহি উল্লাসে লয়ে তেরঙা নিশান।
সুমেরু শিখরে রাজো ॥

[কবি নরেশ চক্রবর্তী'র সৌজন্যে]

---

* তৃতীয় দৃশ্য *

দ্বিপ্রহর।

[অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ির অন্দরমহল। মধ্যস্থলে রাজেনের শয়নকক্ষ। এই শয়নকক্ষের দরজা এবং জানালা রুদ্ধ। রাজেন্দ্রের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী এই রুদ্ধদ্বারকক্ষে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। রাজেনের ভাগিনেয় মানিক রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া মামীমাকে ডাকিতেছে।]

মানিক। মামী, ও মামী, দরজা বন্ধ করে কী করছ?

[কোন সাড়া না পাইয়া]

বা—রে, দরজা খুলছ না যে? [সাড়া না পাইয়া] কী

ব্যাপার বলতো? চার মাইল পথ হেঁটে দাদুকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি আর তুমি কিনা—

[শয়নকক্ষের জানালাটি খুলিয়া রাজেন্দ্রের স্ত্রী আত্মপ্রকাশ করিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা এসেছেন? কোথায় তিনি?

মানিক ॥ গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই, গাঁয়ের লোকজন তাঁকে ছেঁকে ধরেছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তা' তুমি তাঁকে একলা ফেলে চলে এলে মানিক?

মানিক ॥ ক্ষিদেয় পেট যে চোঁ-চোঁ করছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তোমার মামার কোন খোঁজ পেয়েছ?

মানিক ॥ রামু চৌকিদার বল্‌ল যে, মামা নাকি সদরে গেছেন মামলা করতে আর পুলিশ ডেকে আন্‌তে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তারা এলে তবে আমি দোর খুলব।

মানিক ॥ বা—রে, খেতে দেবে না?

ভুবনেশ্বরী ॥ যারা আমাদের খেয়েছে আগে তাদের খাব, তারপর তোমাদের খেতে দেব।

[জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।]

মানিক ॥ কী বিপদ! এখন আমি করি কী? পেটে ছুঁচো ডন মারছে।

[কতকগুলি প্যাণ্টের কাপড় লইয়া ময়নার প্রবেশ।]

মানিক ॥ এই যে, এসে গেলে? ওগো সেই তো এলে তবে কেন মন খসালে?

ময়না ॥ মানে?

মানিক ॥ আমাদের বাড়ি আসবে না বলেছিলে, কিন্তু আসতে তো হোল ময়নামণি।

ময়না ॥ এটা আর তোমাদের বাড়ি নয়। এটা এখন গ্রাম প্রতিরক্ষার আপিস।

মানিক ॥ ও সে বুঝি জান না। শহরে আজকাল বিয়ে-টিয়ে আপিসেই হয়। বিয়ের আপিস।

ময়না ॥ মাণিকদা, তোমার আক্কেল হবে কবে বলতো? তোমাকে এখানে দেখতে পেলে ভলাণ্টিয়াররা সব ঠ্যাঙাবে জান না বুঝি?

মানিক ॥ কে কাকে ঠেঙায় দেখবি এখন। আমার দাদু আসছেন, সদরে মোক্তারি করতেন একদিন। কতলোককে জেলে পুরেছেন।

ময়না ॥ তাই নাকি?

মানিক ॥ হ্যাঁ, আমি গিয়ে নিয়ে এলাম যে।

ময়না ॥ তা' কোথায় তিনি?

মানিক ॥ আছেন, আছেন। দেখবে এখনি। এলেন ব'লে। কত লোককে জেলে পুরেছেন। এলেই তাঁকে আমি কি বলব জান ময়নামণি ?

ময়না ॥ কি মানিকদা ?

মানিক ॥ তোমাকে জেলে পুরতে সবার আগে।

[নিজের বুক দেখাইয়া]

এই জেলে।

[ময়না হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মানিক ॥ হাসছো ?

ময়না ॥ হাসবো না ! একটা থুরথুরে বুড়ো মানুষ এসে করবে কি— যেখানে বীরপুরুষ তোমার মামাই গেলেন পালিয়ে !

মানিক ॥ মামা পালাবেন ? সেই লোকই কিনা তিনি ? তোমাদের কচুকাটা করে ছাড়বেন।

ময়না ॥ (কোমরে কাপড়ে বাঁধিয়া) বটে !

মানিক ॥ আমি না, আমি না। মামা।

ময়না ॥ (মৃদু হাসিয়া) তাই বল।

মানিক ॥ তবে শোন ময়নামণি, চুপি চুপি বলছি, পালিয়েছেন মামা।

ময়না ॥ কোথায় জান ? জাননা তো। কি করে জানবে ! তোমাকে তো ব'লে ক'য়ে পালাবেন না। তোমাকে যে মানুষ বলেই গ্রাহ্যি করে না কেউ।

মানিক ॥ আমায় চটিয়ো না ময়নামণি। তবে আমি সব ফাঁস করে দেব কিন্তু।

ময়না ॥ জানলে তো ফাঁস করবে।

মানিক ॥ জানি না মানে ? রামু চৌকিদার দেখেছে মামা গে.ছ সদরে। তোমাদের নামে মামলা করতে। এসে কেমন ঠেঙানি দেবে তোমাদের—দেখো।

[ইন্দ্র ও তাহার পশ্চাতে দীননাথের স্ত্রী সারদার প্রবেশ।]

ইন্দ্র ॥ (সারদাকে) আসুন, মাসীমা, আসুন।

ময়না ॥ (মানিককে) কিন্তু তার আগে ওই দেখ, তোমার ঠ্যাঙ ভেঙ্গে না দেয়। পালাও, পালাও।

মানিক ॥ ওরে বাবা, পালাচ্ছি। কিন্তু তুমি পালিও না যেন।

[পলায়ন।]

ইন্দ্র ॥ মানুকেটা ওরকম করে পালাল কেনরে ময়না ?

ময়না ॥ ওর কথা ছেড়ে দাও। এখন ওর মামার কথাটা শোন।

ইন্দ্র ॥ কী ?

ময়না ॥ তিনি নাকি গেছেন সদরে মামলা করতে।

ইন্দ্র ॥ করুন মামলা, হোক বিচার। আমরাও চাই দেশদ্রোহীর বিচার

হোক। মাসীমা, তাহ'লে আমি চলি। এই ময়না, শোন—আজ এই দুপুরেই এই গাঁয়ের আশে-পাশের লোক নিয়ে আমাদের এক জনসমাবেশ হবে। কিছু লোককে খেতে দিতে হবে। আর তার ব্যবস্থার ভার দিয়েছি—এই মাসীমার 'পর।

ময়না ॥ কত লোক খাবে দাদা ?

ইন্দ্র ॥ অন্ততঃ জনপঞ্চাশ লোকের ডাল-ভাতের আয়োজন রাখতে হবে। আর চিড়েমুড়ির ব্যবস্থাও থাকবে।

সারদা ॥ তাতো বুঝলাম, কিন্তু এই শত্রুপুরীতে কোথায় এসব করব বাবা ?

ইন্দ্র ॥ শত্রুপুরী কাকে বলছ মাসীমা ? একথা তোমাদের কতবার বলব —যে রাজেন দত্তের এই ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি সব এখন আমাদের।

[কানাইয়ের প্রবেশ।]

কানাই ॥ ইন্দ্রদা, রাজেন-কর্তার শ্বশুরমশাই এসে গেছেন। একটা গোল-মাল তিনি করবেন মনে হয়।

ইন্দ্র ॥ বেশ তো, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়। কোথায় তিনি ?

কানাই ॥ গেছেন তোমার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

ইন্দ্র ॥ বোঝাপড়া সব শেষ। চল, সভায় চল।

সারদা ॥ দাঁড়াও বাবা। এ বাড়ির লোকজন ত' কাউকে দেখছি না। রাজেনবাবুর বউ—ভুবনেশ্বরী, সে কোথায় ?

ইন্দ্র ॥ ভুবনেশ্বরী যে ভুবনেই থাকুন না কেন এ বাড়ির ভাণ্ডারের ভার এখন তোমার। বলে-ক'য়ে দেখ, ভাণ্ডার না খোলে তো ভাণ্ডারের দরজা ভাঙতে হবে। ময়না, ও প্যাণ্টগুলো সেলাই করবি পরে। ছুটে যা' দেখি, আগে ক'জন ভলাণ্টিয়ার ডেকে আন। দরকার হ'লে ভাণ্ডার ভাঙবে।

কানাই ॥ লোকজন দরকার নেই ইন্দ্রদা। আমি থাকছি। একা আমিই পারব।

ইন্দ্র ॥ [কানাইকে] তুই থাকছিস ?

কানাই ॥ হ্যাঁ।

ইন্দ্র ॥ বেশ তবে তুই থাক। ময়না, তবে তুই চল আমার সঙ্গে।

কানাই ॥ এ্যাঁ! না, না, তবে বরং ময়নাই থাক, আমিই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। [সারদাকে] তা' দরকার হ'লে তুমি আমাকেই ডেক মা। আমার মতো ভাণ্ডারী পাবে না তুমি।

সারদা ॥ হ্যাঁ, চুরি করে খেতে অতবড় ওস্তাদ আর নেই।

কানাই ॥ কেন, কতদিন বাটনাও তো তোমাকে আমি বেটে দিয়েছি মা।

সারদা ॥ তা থেকে তোমাকে আমি রেহাই দিচ্ছি যখন আমার ময়না মাকে ঘরে পাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কেমন হ'লো তো ?

কানাই ॥ মা যে কি ! কিচ্ছু বোঝে না ।

[ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল । কানাই আড়চোখে ময়নাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ময়না উহাকে জিভ ভেঙাইল । ইন্দ্র কানাই বাহির হইয়া গেল ।]

সারদা ॥ কবে যে তুমি আমার ঘরে আসবে মা, কেবল সেই কথা ভাবি । শুভকাজে এত বাধা হয় জানতাম মা । যাক সেকথা । এখন এই পঞ্চাশজন লোকের রান্নাবান্না—

ময়না ॥ সে আপনি ভাববেন না মাসীমা । আমি আছি কেন ? কিন্তু আসল কথা হ'চ্ছে—এ বাড়ির গিন্নীর ঘুম ভাঙানো । তিনি যে ঘরে খিল এ'টে কী মতলবে জেগে জেগে ঘুমুচ্ছেন বুঝি না । চলুন তো ডাকি ।

[উভয়ে দরজার কাছে আসিল ।]

ডাকুন মাসীমা, আপনি ডাকুন ।

সারদা ॥ বৌঠান, ও বৌঠান । বেলা যে গড়িয়ে পড়ল । এখনও ঘুম ভাঙেনি নাকি ?

[ময়না ঘনঘন কড়া নাড়িতে লাগিল, সজোরে । জানালা খুলিয়া ভুবনেশ্বরী আত্মপ্রকাশ করিল ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ কাটাঘায়ে সব নুনের ছিটে দিতে এসেছ, না ? কিন্তু এটাও জেনে রেখ তোমরা, আইন আদালত এখনও উঠে যায়নি । চন্দ্র-সূর্য এখনও উঠছে ।

সারদা ॥ তুমি অমন মেজাজ দেখাচ্ছ কেন বৌঠান ? যা হবার তা' হ'য়ে গেছে । দেশের এখন এতবড় বিপদ, শিয়রে শমন । গাঁয়ের লোক একজোট হ'য়ে বিদেশী দুষমনদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে । এস ভাই, তুমিও এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও ।

ভুবনেশ্বরী ॥ হাত মেলাও ! আমার বাড়িতে শত্রুর দল ঢুকে পড়েছে । তোমাদের না তাড়িয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাব ? কার যে কী মতলব সেসব আমার জানা আছে।

ময়না ॥ আমাদেরও জ'না আছে । আপনি চলে আসুন মাসীমা । চলুন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ি , অতগুলো লোকের রান্নাবান্না !

সারদা ॥ রান্না তো নয়, যজ্ঞি !

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ যজ্ঞিই হবে । একেবারে দক্ষযজ্ঞি ।

সারদা ॥ কোথা থেকে যে এখনও তোমার এত তেজ আসে, বুঝি না ভাই । স্বামী যার অমন, সে মুখ দেখায় কী ক'রে তাও জানি না, ঝগড়া করে কী করে সেও বুঝি না ।

ময়না ॥ কেন মাসীমা জানেন না—চোরের মায়ের বড় গলা।

ভুবনেশ্বরী ॥ কী, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা।

[মানিকের প্রবেশ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ এই যে মানুকে, শুনছিস ?

মানিক ॥ [ভুবনেশ্বরীকে] উপোস করেও গলায় অত জোর পাও কি করে মামী ? ক্ষিধেয় আমার মুখে তো আর কথা সরছে না।

ভুবনেশ্বরী ॥ মামা-ভাগ্নে মিলে যতক্ষণ না এ-সব ভূতপেত্নী তাড়াচ্ছ ততক্ষণ আমি বেরুচ্ছি না। আর কাউকে খেতেও দিচ্ছি না আমি।

ময়না ॥ বুঝলে মাণিকদা, জেঠাইমা ভাবছেন, উনি খেতে না দিলেই বুঝি আমি না খেয়ে থাকব। দাও-না ভাঁড়ারটা তুমি খুলে—এক্ষুণি তোমাকে পোলাও মাংস রেঁধে খাইয়ে দিচ্ছি !

মানিক ॥ সেটা আমাকে বলতে হয় ময়নামণি ! এতক্ষণ বলনি কেন ? এস।

ময়না ॥ [সারদাকে] আসুন মা, আসুন।

মানিক ॥ মা বলছ কেন ? মাসীমা বল।

ময়না ॥ ওঃ হ্যাঁ, আসুন মাসীমা, আসুন।

মানিক ॥ কেউ ভুল করলে আমার বুকে সয় না।

[উহারা দুইজনে চলিয়া যায়। মানিক ছিল পিছনে, ভুবনেশ্বরী তাহাকে ডাকিলেন।]

ভুবনেশ্বরী ॥ মানিক !

মানিক ॥ এই দেখ যাচ্ছি একটা শুভকাজে, পিছু ডাকলে তো ?

ভুবনেশ্বরী ॥ ওরা খেতে দিলে খেওনা তুমি। ওরা তোমাকে বিষ দেবে, বিষ দেবে বলে রাখছি।

মানিক ॥ তুমি না খেতে দিয়ে মারছ, ওরা না হয় খেতে দিয়ে মারবে।

ভুবনেশ্বরী ॥ হায় ভগবান ! কী কুষ্মাণ্ডকে আমি মানুষ করছি ! [সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।]

[ময়নার প্রবেশ।]

ময়না ॥ কি মানিকদা ? তুমি আসছ না যে ?

মানিক ॥ মামী বলছিল, তুমি নাকি আমাকে বিষ খাইয়ে মারবে ময়নামণি ?

ময়না ॥ মাণিকদা, তুমি আমাকে এতটা অবিশ্বাস কর ?

মানিক ॥ এই দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করব আমি ? প্রাণের কোন্ কথাটা তোমাকে আমি বলিনি ময়নামণি ?

ময়না ॥ তা যদি বল মানিকদা, প্রাণের কথা তুমি এখনও আমাকে কিছু বলনি।

শুধু বিয়ের কথাটাই বারবার বলেছ। তা' বিয়ের কথা তো কত লোকেই বলে। আচ্ছা মানিকদা, তুমি যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছ—কি করে বিয়ে হবে বলতো? তোমাদের বাড়ি-ঘর তো সব ভলাণ্টিয়াররা দখল করে নিয়েছে। গ্রাম থেকে তোমার মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বৌ নিয়ে ঘর করবে কোথায়? সংসার পাতবে কোথায়? আর নিজেই-বা খাবে কী, বৌকেই-বা খাওয়াবে কী? তোমাদের টাকাকড়ি ত' সব এখন ওদের হাতে।

মানিক ॥ ওরে বাবা, আমার পেটের সব কথা বের করে নিতে চাইছ তুমি। আমাকে যত বোকা ভেবেছ, আমি তত বোকা নই ময়নামণি। টাকাকড়ির কথা বলছ, আমাদের কোথায় কত টাকা আছে কারোর সাধ্যি আছে জানার? হেঃ হেঃ, ভেবেছ টাকা শুধু সিন্দুকেই থাকে, ঘরের দেওয়ালের চোরাবাক্সে যে টাকা থাকতে পারে এ বুদ্ধি তোমাদের আছে?

ময়না ॥ কি আশ্চর্য,আমরা ত' কেউ ভাবতেই পারিনি এটা!

মানিক ॥ হেঃ হেঃ, গাঁয়ের লোক ভাবছে আমাদের তাড়িয়ে দিলেই বুঝি আমাদের পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এ বুদ্ধি কি তাদের আছে যে রাতা-রাতি আমরা টাকাকড়ি নিয়ে হাওয়া হ'তে পারি বিদেশে, বলো, ভাবতে পারে ওরা কেউ? হেঃ হেঃ, এসব কথা মাথায় ঢুকবে তোমার ওই কানাইদার?

ময়না ॥ মাথাই নেই, তার মাথায় ঢুকবে, কি যে তুমি বল মানিকদা। কিন্তু তোমার মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। না-জানি তোমার কি রাক্ষুসে ক্ষিধেই পেয়েছে মানিকদা, নইলে মুখ কখনও অত শুকনো হয়?

মানিক ॥ এই দ্যাখ, তোমাদের সঙ্গে কথা কইলেই ক্ষিধে-তেষ্টা আমি একে-বারেই ভুলে যাই। মনে করিয়ে দিতেই জ্বলে উঠল একেবারে রাক্ষুসে ক্ষিধে। এখন আমি কী খাই? কাকে পাই?

ময়না ॥ ওরে বাবা, তাইতো। ভাঁড়ারটা খুলে দাও-না, এক্ষুণি খেতে দিচ্ছি।

মানিক ॥ ভাঁড়ারের চাবি রয়েছে মামীর কাছে। কিন্তু আমি তালা ভেঙ্গে ভাঁড়ার খুলে দিচ্ছি। হেঃ হেঃ, তুমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে বসবে এস।

[সারদার প্রবেশ।]

সারদা ॥ যোগাড়-যন্ত্র কিছু নেই। পঞ্চাশজন মানুষের রান্না। এ কী করে সম্ভব বল তো ময়না?

ময়না ॥ হ'চ্ছে হ'চ্ছে। এই তো মানিকদা ভাঁড়ার-ঘর খুলে দিতে যাচ্ছে মা।

মানিক ॥ আমার মা!—আমি যাচ্ছি না—।

[চটিয়া অন্যত্র প্রস্থান।]

সারদা ॥ [শঙ্কিত হইয়া] দ্যাখ ময়না, মানিকের মতিগতি আমি ভাল

ঝুঝলি না কখন কী করে বসে কে জানে। তুই একটু সাবধানে থাকিস মা। ইন্দ্রনাথ তো বলে গেছে—দরকার হ'লে ভলান্টিয়ার ডেকে আনতে। এখন ভাঁড়ার খোলাতে তো তাদেরই ডাকতে হ'চ্ছে মা। এই ফাঁকে তুই আমার কাছে একটু বোস দেখি মা।

ময়না ॥ কেন মাসীমা ?

সারদা ॥ এই তো বেশ মা বলে ডাকছিলি, আবার মাসীমা কেন রে ?

ময়না ॥ ডেকেছি নাকি—দেখুন তো কী ভুল করে ফেলেছি আমি।

সারদা ॥ কিন্তু ওই ভুলটা আমার এত মিষ্টি লেগেছে মা—না, না কিছু ভুল হয়নি।

[ইতিমধ্যে আঁচল হইতে একটি মিষ্টির পুঁটলি বাহির করিয়া।]

মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে—এই মিষ্টিটুকু খেয়ে নে।

ময়না ॥ ওমা, সে কি ?

সারদা ॥ হ্যাঁ। এই ফাঁকে খেয়ে নে।

ময়না ॥ তুমি মিষ্টি কার জন্যে এনেছিলে মা ? এই যাঃ তুমি বলে ফেললাম।

সারদা ॥ (হাসিয়া) না, না, এটাও কিছু ভুল হয়নি। ওবে, আমার প্রাণ্য এই তো চাইছে।

ময়না ॥ এই মিষ্টি কার জন্যে এনেছিলেন মা ?

সারদা ॥ আবার ভুল করলি ? বল—কার জন্যে এনেছিলেন মা।

ময়না ॥ মা যে কি ? না, আমি মিষ্টি খাব না। আমার জন্যে তো আনোনি, তবে কেন খাব ?

সারদা ॥ এনেছিলাম—কানাইয়ের জন্যে। সেই শেষ রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এত বেলা হ'য়ে গেল, পেটে হয়ত এখনও কিছু পড়েনি।

ময়না ॥ বটেই তো। দেখেছি যে। তোমার ওই আদুরে ছেলেকে জোর করে কিছু খাইয়ে না দিলে নিজে কখনো খায় নাকি ? তা' রেখে দাও। আমি ওকে ধরে এনে দেব। দিয়ো গিলিয়ে।

সারদা ॥ কিন্তু তুই এখন কিছু না খেলে ওকেও আমি দেবনা এ খেতে।

ময়না ॥ তবে ত' খেতেই হ'চ্ছে। নইলে তোমার ছেলেকে ত' আর উপোসী রাখতে পারি না। দাও।

[সারদা তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। এমন সময়ে জয়মতীর প্রবেশ।]

সারদা ॥ যাক্, এই যে দিদি এসে গেছেন।

[ময়না লজ্জা পাইয়া দূরে সরিয়া গিয়া মুখ মুছিয়া লইল।]

জয়মতী ॥ এসে গেছি মানে—ছুটে এসেছি। পঞ্চাশটি ছেলে নাকি আজ

এ গাঁয়ের অতিথি। তাদের খাবার জোগাড় নাকি করে গেছে এই বাড়িতে? শুনেই আমি ছুটে আসছি। রান্না চাপিয়েছ কি?

সারদা ॥ ভাঁড়ারই খোলা হয়নি এখনও। ভাঁড়ারে তালাচাবি দিয়ে গিন্নী তার ঘরের দোর জানালা বন্ধ ক'রে মটকা মেরে পড়ে আছেন। নরম গরম বলেও বের করতে পারিনি তাকে। ভাঁড়ার খোলা হবে, চাল ডাল পাব, তবে ত' রান্না হবে।

জয়মতী ॥ রান্না হয়নি?

ময়না ॥ ভাঁড়ারই তে খোলা হয়নি। ভলাণ্টিয়ার ডেকে এনে দোর ভেঙ্গে ভাঁড়ারে ঢুকব আমি।

জয়মতী ॥ না, না, থাক। দরকার নেই।

ময়না ॥ কেন মা, দাদা তো বলে গেছে, পঞ্চায়েত বিধান দিয়েছে—এ বাড়ির সব কিছু এখন আমাদের— প্রতিরক্ষা কমিটির।

জয়মতী ॥ হোক মা, তা হোক। কিন্তু এ বাড়ির অন্ন নয়, এ বাড়ির অন্নে বেইমানী মেশানো আছে। সে অন্ন কখনও তুলে দেবে না আমরা আমাদের সন্তানদের মুখে। দেশরক্ষার পবিত্র ব্রত নিয়েছে তারা। তাদের অপবিত্র করো না। এসো তোমরা আমার সঙ্গে। আমার ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে তাই দাও ফুটিয়ে। বেলা যে গড়িয়ে গেল। ছেলেদের না জানি কত ক্ষিদে পেয়েছে।

ময়না ॥ ক্ষিদে পেয়েছে! ক্ষিদে বুঝি কেবল ছেলেদেরই পেয়েছে, আমাদের পায়নি মা?

জয়মতী ॥ ওরে, ওরা সব লড়াই করবে। রোদে পুড়ে শীতে কেঁপে রাত জেগে দেশের মান রাখতে ওরা জীবন পণ করেছে। ওরা বাঁচলে তবে দেশ বাঁচবে আজ ওদের সেবাই সবায় আগে। চল বোন, আয় মা, আর কথা নয়।

[তাহারা তিনজনে বাহির হইয়া গেল। বিভিন্ন দিক হইতে মানিক ও নলিনীর প্রবেশ।]

মানিক ॥ বারে বারে ঘুঘু তুই খেয়ে যাস ধান, এইবার ঘুঘু তোর বধিব পরাণ।

নলিনী ॥ এইরে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

মানিক ॥ আমি কি বাঘ যে পালিয়ে বেড়াস্? আজ আমি ছুঁচো রে ছুঁচো। কোথায় একটু খাবার পাই তার জন্য নর্দমাগুলোও ঘাঁটছি।

নলিনী ॥ তবে শোন মাণিকদা সেটা আমি দেখেছি। [চুপি চুপি] তোমার জন্যে লুকিয়ে তাই কিছু খাবার এনেছি।

মানিক ॥ এ্যাঁ! এনেছিস—আমার জন্যে তুই খাবার এনেছিস!

নলিনী ॥ চুপ, চুপ। কেউ জানলে আর দেওয়া হবে না। এই নাও, চটপট খেয়ে নাও।

[কিছু খাবার বাহির করিয়া দিল।]

মানিক ॥ [খাইতে খাইতে] বাঁচালি রে নলিনী, আমাকে তুই বাঁচালি। দুনিয়ায় কত লোকই তো রয়েছে' কেউ কি আমার কথা ভাবছে ? আছেন এক মামী, তা তিনিও গোঁসাঘরে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। তা খাচ্ছেন খান—কিন্তু আরও তো কত সব মেয়ে রয়েছে এই গাঁয়ে—কেউ কি আমার কথা ভাবছে—এতো করেও কারও মন পেলাম নারে নলিনী।

নলিনী ॥ ময়নার কথা বলছ ?

মানিক ॥ তোর তো খুব বুদ্ধি, ধরে ফেললি দেখছি। কতবার এলো—কতবার গেল—কিন্তু মেয়েটার মনের কথাটা আজও ধরতে পারলাম নারে। আচ্ছা নলিনী তোকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোরা মেয়েরা কি চাস।

নলিনী ॥ মানে ঐ ময়না কি চায়, এই তো ? তা ময়না কেন, সব মেয়েই যা চাই বলছি—

মাণিক ॥ বল, বল।

নলিনী ॥ চায় তুমি এমন হাবাগঙ্গারাম না হয়ে থেকে একটা কাজ কর যাতে সকলের তাক লেগে যায়।

মানিক ॥ কি—সে ভাল কাজটা কি ?

নলিনী ॥ যে কোন ভাল কাজ—যে কাজ করলে লোকে তোমাকে বাহবা দেবে—যেমন কানাইদাদাকে দিচ্ছে—ইন্দিরদাকে দিচ্ছে। তাই না সব মেয়েদের নজর রয়েছে ওদের ওপর।

মানিক ॥ তোর নজরও রয়েছে নাকি ?

নলিনী ॥ আমার নজরের কোন মানে হয় না মাণিকদা—বাপ-মা নেই। পরের বাড়ি কুকুর বেড়ালের মত মানুষ হচ্ছি—আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না মাণিকদা।

মানিক ॥ কিন্তু আমি তো তাকাই।

নলিনী ॥ ভারী তাকাও ! আর কেউ তাকায় না কিনা, ভাই। ওরে বাবা, কে যেন আসছে। পালাই—

মানিক ॥ পালাবি যদি আমার সঙ্গে পালা।

[প্রস্থান]

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।]

[ভুবনেশ্বরী পিতা সর্বানন্দের প্রবেশ।]

সর্বানন্দ ॥ বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। মাণিক, মাণিক ভায়া কোথায় গেলে হে।

[ক্রমশঃ ভুবনেশ্বরীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।]

এরা সব গেল কোথায় ? ভুবন, ভুবনেশ্বরী !

[ভুবনেশ্বরী জানালা খুলিয়া তাহার পিতাকে দেখিয়া দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা ! [প্রণাম করিল]

সর্বানন্দ ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি না। মাণিককে নিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে এস আমার সঙ্গে।

ভুবনেশ্বরী ॥ সেকি বাবা ?

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ দেশের শত্রুর এই বাড়ি; এ বাড়িতে তোমার থাকাও পাপ।

ভুবনেশ্বরী ॥ এ আপনি কি বলছেন বাবা ?

সর্বানন্দ ॥ আমি উপযুক্ত প্রমাণ পেয়েই বলছি। বিদেশী শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। আর সেই শত্রুকে সোনার দরে রসদ বেচে সেই সোনা ঘরে তুলেছে তোমার স্বামী। কিন্তু সেটা সোনা নয়। সেটা বিষ্ঠা।

ভুবনেশ্বরী ॥ [বিস্ময়ের সহিতে] তাই—কি ?

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ মা, আমি তোমার বাবা। পাপের প্রণাম না পেলে বাপ হয়ে মেয়েকে আমি স্বামীর ঘর ছাড়তে বলতাম মা।

ভুবনেশ্বরী ॥ তুমি যখন বলছ' আমি বিশ্বাস না করে পারছি না। বাবা—

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ মা, এতে আমিও বড় আঘাত পেয়েছি। দেশ আজ যে স্বাধীনতা ভোগ করছে—সেই স্বাধীনতা ভোগ করছে—সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে এক সৈনিক ছিলাম আমিও। তাই এ বাড়িতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মানুকেকে নিয়ে তুমি মা একবস্ত্রে বেরিয়ে এস। এ মাটি আজ অশুচি।

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু বাবা, স্বামীর ঘর আমিই বা কি করে ছাড়ি ? যখন নারায়ণ সাক্ষী রেখে তাঁরই হাতে তুমি আমাকে তুলে দিয়েছ গোত্রান্তর করে ? না বাবা, তোমার ঘর আর আমার ঘর নয়। স্বামীর ঘরই আমার ঘর।

সর্বানন্দ ॥ ও। আমি তোমাকে চিনি ভুবনেশ্বরী। তাই তোমাকে দু'বার আর বলব না। তুমি থাক। পাপের ঘব জেনেও স্বামীর ঘর করতে চাও কর।

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা !

সর্বানন্দ ॥ মা !

[হঠাৎ আবেগে বাপের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া]

ভুবনেশ্বরী ॥ প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই তো আমার থাকা দরকার বাবা।

[সর্বানন্দ তাহার মাথায় পরমস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

• চতুর্থ দৃশ্য •

গ্রাম্যপথ।

[চারণগণের গান]

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো॥
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

[রবীন্দ্রনাথ]

• পঞ্চম দৃশ্য •

গভীর রাত্রি।

[রাজেন্দ্রের শয়নকক্ষ। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, শেয়াল কুকুরের ডাক, চৌকিদারের হুঁসিয়ারী। ভুবনেশ্বরী বাতায়ন পথে তাকাইয়া আছে। অকস্মাৎ দরজায় করাঘাত হইল। ভুবনেশ্বরী চমকাইয়া উঠিল। সে উদ্যান সংলগ্ন পশ্চাৎ দরজার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

ভুবনেশ্বরী॥ কে?

রাজেন্দ্র॥ [বাহির হইতে চাপা স্বরে] আমি। শীগগীর দরজা খোলো।

[ভুবনেশ্বরী দরজা খুলিল। বিপর্যস্ত রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিল।]

আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?

ভুবনেশ্বরী॥ খেতে? কি দেবো!

রাজেন্দ্র॥ বুঝলাম, তুমিও তবে খাওনি। জল আছে? এক গ্লাস জল?

ম-১৬১

[ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে এক গ্লাস জল দিল। রজেন্দ্র উহা এক নিঃশ্বাসে পান করিল।]

মানুকে কোথায় ?

ভুবনেশ্বরী ॥ তার ঘরে ঘুমুচ্ছে।

রাজেন্দ্র ॥ কিছু খেয়েছে ? তার পেটে কিছু পড়েছে ?

ভুবনেশ্বরী ॥ সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিছু খেতে পেরেছে কিনা জানিনা।

রাজেন্দ্র ॥ রান্নাবান্না আজ ?

ভুবনেশ্বরী ॥ হয়নি।

রাজেন্দ্র ॥ ঠাকুর-চাকর ?

ভুবনেশ্বরী ॥ সব কাজ ছেড়ে চলে গেছে।

রাজেন্দ্র ॥ কেউ কোন অত্যাচার করেছে তোমাদের ওপর ?

ভুবনেশ্বরী ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ আমার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে, শুনেছো তুমি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ শুনেছি। বিদেশী শত্রুর দালালী করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়েছো।

রাজেন্দ্র ॥ আমি ব্যবসায়ী লোক, আমি ব্যবসা করেছি। ব্যবসায় লাভ-লোকসান দুই-ই আছে। হ্যাঁ—আজ আমার চরম লোকসান হয়েছে। কিন্তু আবার লাভ হবে। তুমি ভেবোনা ভুবন।

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু তাই বলে দেশের ক্ষতি করে ব্যবসা ?

রাজেন্দ্র ॥ ব্যবসায়ীর কোন দেশ নেই। সব দেশই তার দেশ, আবার কোন দেশই তার দেশ নয়। কিন্তু আর আমাদের সময় নেই,—মানুকেকে ডাকো। চোরা দেওয়াল বাক্সের চাবিটা আমাকে দাও। শেষ সম্বল যা আছে, সব নিয়ে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি—এই অন্ধকারে।

ভুবনেশ্বরী ॥ সেকি ?

রাজেন্দ্র ॥ না, না, কোন ভয় নেই। দু'জন বন্দুকধারী বিদেশী সৈন্য পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যাও তুমি, মানুকেকে ডেকে আনো। চাবিটা কৈ ? চাবিটা দাও।

ভুবনেশ্বরী ॥ আমি যাবো না।

রাজেন্দ্র ॥ যাবে না ! সেকি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ ধর্মসাক্ষী করে আমার বাবা, আমাকে যাঁর হাতে দিয়েছেন, তাঁর ঘরই আমার এই ঘর। তাঁর ভিটে ছেড়ে আমি যাবো না।

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, সে লোক আমি। আমি যাব, আর তুমি যাবে না ?

ভুবনেশ্বরী ॥ দেশের মাটিতে লাথি মেরে যে স্বামী বিদেশী হয়, সে

বিদেশী আমার স্বামী নয়। আমার স্বামী এই দেশেরই মানুষ, বিদেশের পরপুরুষ নয়।

রাজেন্দ্র ॥ তুমি যাবে না ?

ভুবনেশ্বরী ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ বেশ। চাবি দাও।

ভুবনেশ্বরী ॥ তাও পাবে না।

রাজেন্দ্র ॥ পাবো না ! [রুখিয়া গেল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ খবরদার। তুমি আর এক পা এগোলেই আমি চেঁচাবো। পাশের সব ঘরেই রয়েছে, এই গাঁয়ের সব ভলেণ্টিয়ার।

রাজেন্দ্র ॥ ও ! দেশের পরপুরুষে তবে দোষ নেই !

ভুবনেশ্বরী ॥ [দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া] কী ?

রাজেন্দ্র ॥ তুমি ভয় পেয়েছো ভুবন। অনর্থক ভয় পাচ্ছো। জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ টাকা। টাকা যদি থাকে, মান, সম্মান, সবকিছু গড়ে নেওয়া যায়, এখানে না-হয়, অন্য কোনখানে।

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ, তা যায়। বিভীষণ লঙ্কা ছেড়ে রামের শিবিরে এসে পেয়েছিলো রাজমুকুট, কিন্তু শ্রদ্ধা পায়নি কারো—ভালোবাসা পায়নি কারো—ঘৃণাই পেয়েছে চিরদিন—চিরকাল, যুগে যুগে, আজও।

রাজেন্দ্র ॥ হুঁ। কিন্তু যে দেশপ্রেমে তুমি আমাকে দিচ্ছো তাড়িয়ে, সেই দেশপ্রেমই হবে তোমার কাল। থাকো তুমি। চলি আমি। যতকাল এ ভিটেতে তুমি থাকবে, যত দেশপ্রেমই তোমার থাক, লোকে কিন্তু বলবে, এই বিভীষণেরই স্ত্রী। যতদিন বাঁচবে, থুথু দেবে তোমার মুখে সবাই—সবাই।

ভুবনেশ্বরী ॥ দিক্। কিন্তু আমার মনে এইটুকু শান্তি থাকবে, বিভীষণকে নিয়ে ঘর করিনি আমি। হ্যাঁ, সেই হবে আমার একমাত্র শান্তি। আমার এ শান্তিটুকু কেউ কেড়ে নিতে পারবে না,—কেউ না। কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি যদি এখনি আমার চোখের সামনে থেকে দূর না হও—আমি চেঁচিয়ে উঠবো।

রাজেন্দ্র ॥ যাচ্ছি। কিন্তু একথা ভেবোনা যে আমি আর আসবো না। আর, যেদিন আসবো, বোঝাপড়া করবো সেইদিন, এই গাঁয়ের লোকের সঙ্গে, আর তোমারও সঙ্গে।

ভুবনেশ্বরী ॥ [চীৎকার করিয়া] বটে ! কে কোথায় আছো শীগ্‌গীর এখানে এসো—কে কোথায় আছো শীগ্‌গীর এখানে এসো—কে কোথায় আছো শীগ্‌গীর এখানে এসো—

[চিৎকার করিয়া কক্ষের সদর দরজা খুলিয়া দিল। রাজেন্দ্র ঝড়ের বেগে

পশ্চাৎ দরজা দিয়া পলায়ন করিল। কয়েকজন গ্রামরক্ষী সদর দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল।]

গ্রামরক্ষীগণ ॥ কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

ভুবনেশ্বরী ॥ [চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল রাজেন্দ্র নাই]....স্বপ্ন! না দুঃস্বপ্ন! না কি আমি পাগল হয়ে গেলাম?

[ছুটিয়া গিয়া সে দেওয়ালের চোরা সিন্ধুকটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে মুঠো মুঠো নোট, টাকা ও মোহর লইয়া গ্রামরক্ষীদের দিকে ছুঁড়িতে লাগিল]

নিয়ে যাও, দেশরক্ষার কাজে লাগাও—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—

[উন্মত্তবৎ অর্থ নিক্ষেপ।...সকলে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী উন্মত্তের ন্যায় নোট ছুঁড়িয়াই চলিল।]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

* প্রথম দৃশ্য *

অপরাহ্ন।

[মহেন্দ্র পঞ্চায়েতের বাড়ি। গ্রাম্য মহিলারা ছোট ছোট টিনের কৌটা জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছে।]

ময়না। আর তো টিন নেই মা। এই শেষ।

জয়মতী ॥ টিনের অভাবে খাবার ভরে দিতে পারবো না ছেলেদের!

[একটি গহনার বাক্স আঁচলের তলে লুকাইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।]

ময়না ॥ একি! গরীবের বাড়িতে হাতির পা!

[সকলে ভুবনেশ্বরীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল—কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ এসব আমি সইতে পারবো। কিন্তু যা সইতে পারবো না—যা বইতে পারছি না—তাই নিয়ে এসেছি আজ আমি তোমাদের কাছে—[গহনার বাক্সটি জয়মতীর সামনে ধরিয়া] দয়া করে এটা নাও।

জয়মতী ॥ একি! এত গয়না!

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ, আমার সব গয়না। তোমাদের দেশের কাজে দিচ্ছি।

সারদা ॥ কি একটা মতলব আছে দিদি।

ভুবনেশ্বরী ॥ এসব কথা আমাকে সইতে হবে জানি ॥ কিন্তু তা জেনেও আমি এই গয়নার বাক্স নিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে—তুলে দিচ্ছি তোমাদের হাতে, দেশের কাজে। জেনো, বন্দুক হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে আমার স্বামী। এই গয়না যদি তোমরা না নাও জোর করে কেড়ে নেবে সে।

জয়মতী ॥ সে পাপিষ্ঠ এখনও এই গ্রামে আছে? ছেলেরা তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল, পায়নি তো!

ভুবনেশ্বরী ॥ আছে কিনা এখনই দেখবে। ছেলেরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর, বন্দুক হাতে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে—আমার জন্য নয়, আমার গয়নার জন্য।

জয়মতী ॥ এতদিন কি ভুলই না বুঝেছিলাম আমরা তোমাকে। গয়না আমরা যে যা পেরেছি, দেশের কাজে তুলে নিয়েছি পঞ্চায়েতের হাতে। পঞ্চায়েত রয়েছেন ভেতরে—তুমি চলে যাও তাঁর কাছে। ময়না, নিয়ে যা তোর খুড়ীমাকে।

[ময়না ভুবনেশ্বরীকে লইয়া অন্দরে গেল।]

সারদা ॥ গয়না চুরির দায়ে তোমরা না পড়, ভাবছি আমি তাই।

জয়মতী ॥ ভুবনকে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী চিনি ভাই! ক। ওর বাপকেও আমি জানি। ওর বাপ একজন মহাপুরুষ। তার মেয়ে অত ছোট হতে পারে না যত ছোট তুমি ভাবছ।

[হন্তদন্ত হইয়া মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ আমার মামী কৈ গো? আমার মামী?

সারদা ॥ একে একে ও বাড়ির সবাই দেখছি এখানে আসছে! ব্যাপার কি?

মানিক ॥ কিন্তু এবার আসছে যম—সাক্ষাৎ যম। বন্দুক হাতে নিয়ে পাগল হয়ে মামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই আর দেখতে হবে না—ছেলে-পিলে নেই, শ্রাদ্ধ করতে হবে আমাকেই। এসেছে মামী এখানে?

[কেহ উত্তর দিল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বন্দুক হস্তে রাজেন দত্তের প্রবেশ। অস্বাভাবিক, অমানুষ মূর্তি।]

রাজেন্দ্র ॥ মানিক!

মানিক ॥ মামা!

রাজেন্দ্র ॥ পেলি সেই হারামজাদীকে?

মানিক ॥ না মামা।

রাজেন্দ্র ॥ এই বাড়িতেই সে লুকিয়ে আছে। আমার হাত থেকে বাঁচতে

হলে সে জানে এই বাড়িই তার একমাত্র আশ্রয়। এই যে বৌঠাকরুণ, আগে তোমাদের জানিয়ে দি—আমার হাতে গুলি ভরা এই বন্দুকে যে আজ কার প্রাণ যাবে আমি জানিনা। আমি প্রথমে চাই আমার প্রাণেশ্বরী ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তারও আগে চাই পেট পুরে খেতে। খেতে না পাওয়ার যে কি জ্বালা আগে বুঝিনি। আমাকে খেতে দাও—

জয়মতী ॥ বন্দুক হাতে ভয় দেখিয়ে খাবার চাইলে খেতে আমি দেবনা ঠাকুরপো।

সারদা ॥ দিদি কেন ঝামেলা করছ? খেতে চাইছে খেতে দাও। কুকুর বেড়ালকেও কোনদিন না বলনি তুমি।

[সারদার ভয়ে ভয়ে অন্দরে প্রস্থান।]

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ—আজ আমি কুকুর বেড়ালেরও অধম এই গাঁয়ে। কিন্তু আর কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে। খিদের জ্বালায় আমি জ্বলছি—আমাকে আর জ্বালিও না। [হুঙ্কারে] আনো খাবার।

মানিক ॥ আরে বাপু, ওঁর পেটটা আগে ঠাণ্ডা করো। তবে তো মাথা ঠাণ্ডা হবে। আর পেট ভরে খেতে কিন্তু আমিও পাই না এখন। মাথাটা আমারও এখন বেশ গরম, মনে রেখো তোমরা।

জয়মতী ॥ যতক্ষণ ঐ বন্দুক রয়েছে হাতে—হাতে করে আমি দিতে পারব না ওকে খেতে। যে দিতে পারবে তাকে দিয়েই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি খাবার।

[জয়মতী অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

মানিক ॥ বুঝলে মামা—খাবার আনবে ময়না। সেই ময়না—যার সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। ময়না তো নয় একটা কেউটে। ওর বিষ দাঁত আজ আমি ভেঙ্গে দেবই দেব।

[একথালা খাবার হাতে লইয়া ভুবনেশ্বরী আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মানিক ॥ একি! মামী!

[রাজেন দত্ত পৈশাচিক হাসি হাসিল।

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ। বেইমানকে খাবার দেবার পাপ থেকে আমি ওদের বাঁচিয়ে দিলাম। খাও—পেট পুরে খাও। হাতে হোক জোর। তারপর গুলি কর আমাকে। তোমার সঙ্গে ঘর করার প্রায়শ্চিত্ত হোক আমার।

[এক গ্লাস জল হাতে জয়মতী আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

জয়মতী ॥ (ভুবনেশ্বরীকে) জল আনতে ভুলে গেছ ভাই।

[জলের গ্লাসটি ভুবনেশ্বরীর হাতে দিলেন।]

মানিক ॥ ও জল তুমি খেয়োনা মামা—বিষটিষ দিয়েছে হয়তো।

জয়মতী ॥ বিষ দিলেও দোষ হতো না। কিন্তু পারলাম কই। (গ্রাস হইতে একটু জল পান করিয়া) নাও এইবার নিশ্চিন্ত মনে খাও।

রাজেন্দ্র ॥ মানকে, বন্দুকটা ধর।

[মানিক বন্দুকটি হাতে লইল। মুহূর্তের মধ্যে রাজেন দত্ত তাহার রাক্ষুসে ক্ষুধা দূর করিতে নিঃশেষ করিয়া খাইল সব খাবার। ঢক্‌ঢক্ করিয়া জলটুকুও খাইল এবং আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ গায়ে এখন জোর হয়েছে। এইবার গুলি করে আমাকে মার—মুক্তি দাও আমাকে।

রাজেন্দ্র ॥ চল বাড়ি। তোমার সব গয়না এখনই আমি চাই।

জয়মতী ॥ ভুবন তার সব গয়না দিয়েছে দেশের কাজে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে।

রাজেন্দ্র ॥ দেশের কাজে, মানে মহেন্দ্রর হাতে! বেশ তবে তুমিই বিধবা হলে আজ—মানিক বন্দুকটা—

[সকলে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

জয়মতী ॥ আমি বিধবা হলে পৃথিবীশুদ্ধ লোক আজ জানবে—বেইমান কী চীজ্! বেইমান কী চীজ্!

রাজেন্দ্র ॥ মানিক—বন্দুকটা—

[মহেন্দ্র ময়নাসহ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন।]

মহেন্দ্র ॥ মার, আমাকে মার। আমি চাই আমার ছেলেরা দেখুক ঘরে-বাইরে আজ আমাদের কতবড় সব শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ দেখুক তাই দেখুক। মানিক বন্দুকটা—

[মানিক সরিয়া গেল।]

মানিক, বন্দুকটা—

মানিক ॥ না দেবনা। এদ্দিন পর একটা সুযোগ আমি পেয়েছি দেখাতে—আমি দেশের শত্রু নই, দেশের শত্রু নই, দেশের শত্রুই আমার শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ [হুঙ্কারে] মানিক!

মানিক ॥ [বন্দুকটা রাজেন্দ্রর দিকে লক্ষ্য করিয়া] বন্দুক দিয়ে এদ্দিন খরগোসই মেরেছি—আজ মারতে চাই একটা বুনো শুয়র। [রাজেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তাক করিল।

জয়মতী ॥ মানিক! মানিক! আমার ভুবনের সীঁথের সিন্দুর মুছে দিস না বাবা।

ভুবনেশ্বরী ॥ দিলেও কোন ক্ষতি নেই দিদি। এ সিন্দুর আজ আমার কলঙ্ক।

[মানিককে উদ্যত বন্দুক হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া। রাজেন দত্ত পিছু হটিতে লাগিল। চোখে-মুখে হিংস্রতা—কিন্তু অবশেষে নিরুপায় রাজেন দত্তকে পরাজয়ই স্বীকার করিতে হইল।]

রাজেন্দ্র ॥ শেষে কিনা—শেষে কিনা—বেশ আমি যাচ্ছি।

[রাজেন দত্তের প্রস্থান।]

ময়না ॥ মানিকদা! মানিকদা! তুমি আজ আমাদের বাঁচালে।

মানিক ॥ কিন্তু তাই বলে আর বিয়ে করতে চাইব না তোকে। আমার বৌ হবে বলেছে ঐ নলিনী। [ছুটিয়া নলিনীর কাছে গিয়া] বল নলিনী, কাজের মতো একটা কাজ আমি করতে পেরেছি কিনা আজ!

নলিনী ॥ পেরেছো, পেরেছো মাণিকদা। [কাঁদিয়া ফেলিল।]

মহেন্দ্র ॥ এমন সব ছেলেমেয়ে ছিল বলেই স্বাধীনতার-যুদ্ধে আমরা জিতেছিলাম।

জয়মতী ॥ এমন সব ছেলেমেয়ে আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধেও আমরা জিতব।

ময়না ॥ জয়হিন্দ্।

সকলে ॥ জয়হিন্দ্।

জয়মতী ॥ বন্দেমাতরম্।

সকলে ॥ বন্দেমাতরম্।

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

রাত্রি।

[মহেন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণ। ডে-লাইট লণ্ঠন জ্বলিতেছে। জয়মতী ব্যাণ্ডেজ তৈরী করিতেছেন। ময়না ধনুকে ছিলা পরাইতেছে। বৃদ্ধ মহেন্দ্র একপাশে বসিয়া একটি বাঁশ চাঁছিয়া লাঠি তৈয়ারী করিতেছেন।]

মহেন্দ্র ॥ ওরে, এ লাঠিটা তো প্রায় তৈরী হলো। আর বাঁশ আছে?

ময়না ॥ কিশোর বাঁশ আনতে গেছে। এলো বলে।

মহেন্দ্র ॥ এখন রাত কত?

ময়না ॥ গোটা ন'য়েক হবে।

মহেন্দ্র ॥ কোন আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস? গুলী-গোলার শব্দ?

ময়না ॥ না বাবা।

জয়মতী ॥ মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকছে।

মহেন্দ্র ॥ ছেলেটা তো এখনো ফিরলো না।

জয়মতী ॥ না খেয়ে বেরিয়ে গেছে। ধূমকেতুর মতো হয়তো ফিরে আসবে, আর এসেই বলবে—না মা, খাবার সময় আর নেই। পায়ের ধূলো দাও, চললাম। ওরে ময়না, আরো ব্যাণ্ডেজ করবো নাকি ?

ময়না ॥ হ্যাঁ মা, যতটা পারো করো।

জয়মতী ॥ তৈরী করছি, আর কি মনে হচ্ছে জানিস ? যেন আমাদের ছেলেগুলো রক্তারক্তি হয়ে আমার সামনে পড়ে রয়েছে, আর কাতরাচ্ছে। থাক এখন। আর আমি পারছি না। ঠাকুর, আমার হাতের তৈরী এই ব্যাণ্ডেজ, এর যেন কোনো দরকার না হয়। ভালোয় ভালোয় ছেলেগুলো যেন আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে।

[অন্দরে যাইতেছিলেন]

ময়না ॥ কোথায় চল্‌লে ?

জয়মতী ॥ জলগরম চাপিয়ে রাখি। ছেলেটা এলেই হয়তো চা খেতে চাইবে।

ময়না ॥ তুমি শুধু ছেলের কথাই ভাবছো মা। আমি যে এতগুলো ধনুক তৈরী করে হাঁপিয়ে পড়েছি একটি বারও তো বললে না, ময়না—এক পেয়ালা চা খাবি ?

জয়মতী ॥ দিচ্ছি মামণি, দিচ্ছি।

মহেন্দ্র ॥ শোনো, তোমার মিলিটারী ছেলের পিঠে ঝোলানো থাকে সেই যে একটা বোতল, লাক্স না ফ্লাক্স কি বলে, সেটাতে চা পুরে দিতে ভুলো না।

ময়না ॥ লাক্স তো সাবান। ওটা ফ্লাক্স।

মহেন্দ্র ॥ বাপ্‌স কি সব নাম।

[জয়মতী চলিয়া গেলেন। লাঠির মাপে কর্তিত কয়েকটি বংশদণ্ড হাতে কিশোর আসিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, কিশোরের সম্মুখে এবং পশ্চাতেও পোস্টার দুইটি বাঁধা রহিয়াছে।]

কিশোর ॥ এই নাও বাঁশ। আমাদের বাগান থেকে কেটে আনলাম।

[বংশদণ্ডগুলি মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিল।]

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁরে—এ বাঁশগুলো সত্যিই ভালো।

কিশোর ॥ ভালো কি মন্দ সে বোঝা যাবে কাজে। এক এক ঘায়ে এক একটা দুষমন যদি ফেলতে পারি, তবে বলবো এটা বাঁশ—নইলে বাঁশ নয়, ঘাস। চলি।

মহেন্দ্র ॥ দাঁড়া। ইন্দ্র কোথায় রে ?

ময়না ॥ আর আর ছেলেরাই বা কোথায় ?

কিশোর ॥ [ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া] বলা নিষেধ। হুকুম নেই।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।"
"বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই
করো করো সবে সাজ।"

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

মহেন্দ্র ॥ সোনার চাঁদ এইসব ছেলে। যতো লাঠিই তৈরী করি না কেন, যতো তীর-ধনুকই হাতে তুলে দিস না কেন কোনো কাজে লাগবে না ওদের। বন্দুকের এক-একটা গুলীতে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। কাজে হয়তো শুধু লাগবে জয়মতীর ওই ব্যাণ্ডেজ।

ময়না ॥ কাজেই যদি না লাগে তবে এসব তৈরী করছি কেন ?

মহেন্দ্র ॥ [দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া] তৈরী করবো না ? একশোবার করবো।—এসব বিদেশী দস্যুর গায়ে যদি একটা আঁচড় দিয়ে মরতেও পারি আমরা, সে মৃত্যু হবে সার্থক। শত্রু বুঝতে পারবে, এদের ভয় নেই। আত্ম-সমর্পণ এরা জানেনা। স্বাধীনতা এদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পরাধীনতা এরা সইবে না। অস্ত্র থাক আর না থাক' এদের দাঁত আছে, এরা কামড়াবে, কামড়াবে।

ময়না ॥ একথা তোমার মুখেই সার্থক বাবা। আর এক বিদেশী শত্রুর বন্দুকের গুলিতে, ১৯৪২ সালে তোমার বড় ছেলে গেছে মারা। তবু তুমি ভেঙে পড়ো নি, মচকাও নি। এই যে দাদা এসে গেছে।

[ইন্দ্রের প্রবেশ।]

ইন্দ্র ॥ এই খুকী !

ময়না ॥ আবার তুমি আমাকে খুকী বলছো ?

ইন্দ্র ॥ ও হ্যাঁ। তুই তো এখন আমাদের ঝান্সীর রাণী। শোন, এখনি আবার আমাকে বেরুতে হবে।

[এক কেতলী চা এবং দুইটি পেয়ালা হাতে জয়মতীর প্রবেশ।]

জয়মতী ॥ ইন্দ্র এসেছিস বাবা ?

ময়না ॥ আচ্ছা মা—মাইলখানেক দূরে থেকেই দাদার পায়ের শব্দ তুমি শুনতে পাও, না ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ পায়। তাই ওই তৈরী চা।

জয়মতী ॥ [হাসিয়া ময়নাকে] তোর পায়ের শব্দও পাই রে পাই।

ময়না ॥ এক মাইল দূরে থেকে পাও না মা। দুপদাপ করে যখন ঘরে এসে দাঁড়াই পাও তখন।

ইন্দ্র ॥ পাবে পাবে। এক মাইল দূরে থেকে তোর পায়ের শব্দ আর একজন পাবে। হয়তো এখনি পায়। ভবে সে মা নয়। বলবো কে?

ময়না ॥ দাদা ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

ইন্দ্র ॥ আচ্ছা আচ্ছা। আমি থামছি। তুই আমার পোষাক টোষাকগুলো ঝেড়ে- ঝুড়ে দে তো। যাকে বলে একেবারে রণসাজে সাজিয়ে দে। না না, টাট্টা নয়। এখনি।

জয়মতী ॥ এখন আবার কোথায় যাবি বাবা?

মহেন্দ্র ॥ কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের রাতটা ভালো নয়। মনে হচ্ছে এ রাতে অনেক কিছু ঘটবে।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা : আজ রাতে হয় এস্পার, নয় ওস্পার।

সকলে ॥ মানে?

ইন্দ্র ॥ বলছি। একি? এতো রাতে আবার কে?

[নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ আমি নবীন।

ইন্দ্র ॥ এসো, এসো নবীনদা, এসো। খুকু না না ঝান্সী, আমার পোষাক।

[ময়নার অন্দরে প্রস্থান।]

জয়মতী ॥ যেখানেই যাও বাবা, খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। [প্রস্থান]

মহেন্দ্র ॥ নবীন, তুমি! আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমার মেয়ের বিয়েতে এতো করে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তবু তুমি আসোনি।

নবীন ॥ মেয়ের বিয়েটা যদি হতে পারতো তবে না আসাটা হয়তো অপরাধ হতো। অপরাধ হয়েছে আজ। গাঁয়ের এই বিপদে পঞ্চায়েতের সভায় আজ সকালে আমি আসিনি। অপরাধ হয়েছে সেখানে। আর তারাই প্রায়-শ্চিত্ত করতে এসেছি এখন।

মহেন্দ্র ॥ সে কি! সে কি নবীন!

নবীন ॥ আমি খোলাখুলি বলছি। এ গাঁয়ে দু'টি দল। একটি আপনার আর একটি রাজেনদার। চিরদিনই আমি রাজেনদার চেলা, তাঁর অনুচর।

ইন্দ্র ॥ [এতক্ষণ লাঠি-তীর-ধনুক-ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে] আমরা জানি। তুমি তার চোরাকারবারের অংশীদার।

মহেন্দ্র ॥ আঃ! ইন্দ্র!

নবীন ॥ ইন্দ্র মিথ্যে বলেনি। আমার সামনে না বললেও গাঁয়ের সবাই একথা বলে থাকে। আর কথাটা মিথ্যে নয়। দু'হাতে পয়সা কুড়িয়েছি বটে, কিন্তু এ

ব্যবসায় খেসারতও দিতে হয়েছে। গাঁয়ের লোক বিশ্বাস করে ভোট দেয়নি আমাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের দল গেছে হেরে। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করতে আসিনি এখানে আজ।

মহেন্দ্র ॥ তবে কেন এসেছো নবীন ?

নবীন ॥ আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বুদ্ধু, আমারই ছোটো ভাই, শত্রুর গুলীতে একটা পা খোঁড়া ক'রে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। শুনলাম গুলী লাগার সময় এই ইন্দ্রই দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে—ভিন্ন দলের ছেলে।

ইন্দ্র ॥ আমরা কে কোন্ দলের, শত্রু বুঝি সেটা জানতো ? আর সেটা বিচার করেই বোধহয় গুলীটা ছুঁড়েছিলো, তাই না নবীনদা ?

নবীন ॥ না না। বুদ্ধুর কাছে শুনলাম জঙ্গলের আড়ালে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলে দু'দলের তোমরা দুজন। গুলীটা তোমার পায়েও লাগতে পারতো। শত্রু যখন গুলী করলো তখন দল দেখে, দল বুঝে গুলি করেনি। তার কাছে সবাই শত্রু। আর তাই যদি হয় আমাদের এ দলাদলির মূল্য কি ? বিশেষ করে ঐ শত্রুর সামনে। শত্রুর চোখে আমরা সবাই সমান।

মহেন্দ্র ॥ নবীন ! নবীন ! তবে তুমি লড়াই করবে ?

নবীন ॥ পঞ্চায়েত, লড়াই কি আমি জানি না। এইটুকু জানি, লড়াই করতেও লাগে টাকা। সেই টাকা আমি কিছু এনেছি। দিচ্ছি পঞ্চায়েত তোমার হাতে। আমার বিরুদ্ধ দলের দলপতি তুমি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা—সেটা সকল দলাদলির ওপরে এ। কাজে আমরা সবাই ভাই ভাই।

মহেন্দ্র ॥ নবীন ! নবীন ! আমার মুখে কথা সরছে না নবীন।

ইন্দ্র ॥ নবীনদা ! আমাকে ক্ষমা করো। কত টাকা এনেছো নবীনদা ?

নবীন ॥ একশো টাকা এনেছি। এর বেশী আজ পারলাম না ভাই। কিন্তু ভাবনা কি ? বৌয়ের গয়না বেচেও যদি আর কিছু দিতে হয়, কাল দেবো।

ইন্দ্র ॥ আমি তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি নবীনদা। তুমি আমার একটা কথা শুনবে নবীনদা ?

নবীন ॥ শুনতেই হবে। আমাদের এ লড়াইয়ের সেনাপতি তুমি।

ইন্দ্র ॥ টাকাটা আমি তোমার হাতেই দিচ্ছি। এখুনি, এখান থেকে সাইকেলে ছুটে চলে যাও শহরে। সারারাত সাইকেল চালিয়ে পেঁছে যাও খুব ভোরে। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে এই টাকায় কিনে নিয়ে এসো বোমা তৈরীর মালমশলা। হ্যাঁ, যাবার আগে দেখা করে যাও বুদ্ধুর সঙ্গে। সে-ই বলে দেবে কি কি জিনিষ তোমাকে কিনে আনতে হবে। দেখবে তার পায়ের যন্ত্রণা, গায়ের জ্বর সব উধাও।

নবীন ॥ আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ দাঁড়াও। আর একটা কথা। বোমার মাল-মশলা নিয়ে কাল ফিরে যদি দেখো আমি নেই, বোমা তৈরী করার ভার তোমার। বুদ্ধু জানে। সে-ই দেখিয়ে দেবে।

নবীন ॥ ঠিক আছে। আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

মহেন্দ্র ॥ আজ রাতটা কেবলই মনে হচ্ছে কালরাত্রি। '৪২ সালে এমনি সব রাত্রি আমার জীবনে এসেছিলো। হ্যাঁরে ইন্দ্র, তোর সেই মিলিটারী পোষাক -পরা ফটোটা তো আমায় দিসনি।

ইন্দ্র ॥ দিইনি কি? তুমি তো সেটা তোমার সিন্ধুকে পুরে রেখেছো।

মহেন্দ্র ॥ তাই কি? আমি দেখে আসছি। এই যে তোর পোষাক-টোষাক, খাবার-দাবার সব এসে গেছে। কিন্তু এখানে এই বাইরে কেন? আমার ঘর দোর কি শত্রুর বোমায় উড়ে গেছে?

ইন্দ্র ॥ না বাবা। আজ সন্ধ্যায় অমৃতযোগ দেখে মা আমাকে ঘর থেকে যাত্রা করিয়ে দিয়েছে। আর আমি ঘরে ঢুকবো না।

[গণেশ ঘরের ভিতর হইতে দুইটি টুল রাখিয়া গেল। মা জয়মতী তাহাতে ইন্দ্রের খাবার সাজাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ময়না ইন্দ্রের জামায় একটি বোতাম লাগাইতেছে।]

মহেন্দ্র ॥ ওর সেই লাক্সটা?

ময়না ॥ [হাসিয়া উঠিল] লাক্স নয় বাবা, ফ্লাক্স। তুমি ভেবোনা বাবা। চা দিয়ে সেটা ভরে দেওয়া হবে।

মহেন্দ্র ॥ আচ্ছা আচ্ছা। ভুলিসনি যেন। [অন্দরে প্রস্থান]

[ইন্দ্র খাইতে লাগিল]

ময়না ॥ আশ্চর্য। বাবার আজ ভুল হচ্ছে না কিছু।

ইন্দ্র ॥ একি মা! একি করছো? এতো খাবার? মিলিটারীরা এতো খাবার খেলে লড়াই করবে কি করে?

জয়মতী ॥ বেশ তো, যা পারিস খা।

ময়না ॥ কিছুই তুমি ফেলতে পারবে না দেখো। মা ভারি চালাক। ঠিক তুমি যা যা খেতে ভালবাসো আজ তাই রেঁধেছে মা।

ইন্দ্র ॥ [হাসিয়া] কিন্তু কেন মা? তোমার কি মনে হচ্ছে আর ফিরবো না?

জয়মতী ॥ ষাট। ষাট। সেকি কথা। ওঠ, আর খেতে হবে না তোকে।

ইন্দ্র ॥ রাগ করলে মা?

জয়মতী ॥ [হাসিয়া] না বাবা। তুই ঠিকই বলেছিস। ভরা পেটে

ছুটোছুটি করতে কষ্ট হয়।

ময়না ॥ মা আমি একটা রফা করে দিচ্ছি। বাড়তি খাবারগুলো দাদার টিফিন বাক্সে ভরে দিচ্ছি মা।

ইন্দ্র ॥ এর নাম রফা! মুখপুড়ী তোর মতলবটা বুঝি আমি বুঝিনি। খাবারটা টিফিন বাক্সে কার জন্যে দিতে বলছে জানো মা?

ময়না ॥ এই দাদা, ভালো হচ্ছে না কিন্তু বলছি—

জয়মতী ॥ [হাসিয়া] বেশতো বেশতো। একটু বেশী করেই দিচ্ছি, এক-জন কেন দু'জনেই খাবে এখন।

[মা টিফিন বাক্সে খাবার দিতে প্রস্তুত হইলেন। ময়না দাদাকে জামা পরাইয়া দিতেছে।]

ময়না ॥ তোমরা কি আজ সারারাত বাইরে থাকবে না কি?

ইন্দ্র ॥ ময়নার মুখে এখন তুমি শুনি না মা। সবই তোমরা।

ময়না ॥ ভালো হচ্ছে না কিন্তু দাদা। পরো তুমি পোষাক।

[পোষাক পরানো ছাড়িয়া দিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়া ইন্দ্রের জুতো পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ আরে আরে, তার খবর জানবার জন্যে আমার পায়ে ধরতে হবে না। ঐ দেখ, সে এসে গেছে।

[ময়না জুতো ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইয়ের প্রবেশ। তাহার দুই হাতে দুইটি বন্দুক।]

ইন্দ্র ॥ একি কানাই? দু'টো বন্দুকই নিয়ে এলে? রাজেন খুড়োর বাড়িটা অরক্ষিত রয়ে গেলো না।

কানাই ॥ তা থাক। একটা তোমার। একটা আমার।

ময়না ॥ [আশ্চর্য আনন্দে] বন্দুক! মা মা দেখো, সত্যিকার দু'-দু'টো বন্দুক!

জয়মতী ॥ এই বন্দুক নিয়ে তোরা আজ লাড়াই করবি?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ মা।

জয়মতী ॥ বন্দুক দুটো আমার হাতে একটিবার দিবি? আমি আমার ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে আনবো।

[বন্দুক দুইটি জয়মতী লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।]

ইন্দ্র ॥ কিশোরটা এতো দেরী করছে কেন? আমি দেখছি।

[বাহিরে চলিয়া গেল।]

কানাই ॥ দেখলে তো?

ময়না ॥ কি?

কানাই ॥ দাদার বুদ্ধিটা? আমাদের কেমন একলা রেখে গেল। বিয়ের সেই পিঁড়িগুলো কোথায় গেল?

ময়না ॥ শিকেয় তোলা আছে।

কানাই ॥ আবার নামবে তো ?

ময়না ॥ তুমি নামালেই নামবে।

কানাই ॥ কিন্তু সে সুযোগ যদি আর না পাই ? [নিস্তব্ধতা]

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর কানাই হঠাৎ নিজের আঙটিটি খুলিয়া তাহা ময়নার হাতে পরাইয়া দিলো। ময়না কানাইকে প্রণাম করিল। কানাই তাহাকে তুলিতে গেল, এমন সময় ইন্দ্র তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই এবং ময়না দাঁড়াইতেই—]

ইন্দ্র ॥ একটা প্রণাম পাওনা হয়েছে আমারও।

কানাই ॥ [হাসিয়া] একটা কেন, দু'-দুটো।

[লজ্জিতা ময়নাকে টানিয়া লইয়া উভয়ে যোড়ে প্রণাম করিল।]

ইন্দ্র ॥ কই, মা কোথায় ? বাবা কোথায় ? আমাদের যে এখুনি যেতে হবে।

[দরজায় জয়মতীর আবির্ভাব। তাঁহার হাতের বন্দুক দুইটি সিন্দুরে চর্চিত হইয়া শোভা পাইতেছে।]

জয়মতী ॥ এই যে বাবা। আসছি।

[*অন্দর হইতে মহেন্দ্র একটি ফটো হস্তে আসিতেছেন।*]

মহেন্দ্র ॥ এই যে তোর সেই ফটোটা আমি পেয়েছি বাবা।

জয়মতী ॥ ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে দিলাম এই বন্দুক। মঙ্গলচণ্ডীর সিঁন্দুরও মাখিয়ে দিলাম। শত্রু নাশ করে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরে এসো।

[কানাই ও ইন্দ্র বন্দুক দুইটি হাতে লইয়া জয়মতীকে প্রণাম করিয়া উঠিল।]

মহেন্দ্র ॥ আমাকে বলে যা—তোরা কোথায় যাচ্ছিস ? কেন যাচ্ছিস ? বলে যা—বলে যা—আমি মানস চক্ষে তা দেখবো। আর ঠাকুরের কাছে তোদের জন্য শক্তি ভিক্ষা করবো।

ইন্দ্র ॥ [কানাইকে] বলবো ?

কানাই ॥ বলো দাদা, বলো।

ইন্দ্র ॥ শ'দুই শত্রু-সৈন্য ছাউনি ফেলেছে আমাদের গাঁয়ের সীমান্তে। বড়ো জঙ্গলটার ও পাশে।

কানাই ॥ শ্মশানকালীর মাঠে।

মহেন্দ্র ॥ দু'শো ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা। দিনের বেলায় গোণাগুনতিতে তারা দু'শো। কিন্তু এই গভীর রাতে ছাউনির তলায় তারা ঘুমুচ্ছে। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে জন দশেক শান্ত্রী।

কানাই ॥ রাত ভোর হতেই এই দু'শো লোক আমাদের করবে আক্রমন !

কিন্তু আজ রাতে এখন যদি আমরা ওদের আক্রমণ করি—তাহলে ওদের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে মাত্র দশজন।

ইন্দ্র ॥ যে দশজন শান্ত্রি রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

মহেন্দ্র ॥ আক্রমণ করবে তোমরা দু'জন ঐ দশজনকে ?

কানাই ॥ আমরা দু'জন নয়। আমরা বিশ জন।

মহেন্দ্র ॥ ওদের দশ দশটা বন্দুক। তোমাদের মাত্র দুটো।

কানাই ॥ আমাদের হাতে যথেষ্ট বোমা আছে। আচমকা বোমা মেরে ওদের হতবুদ্ধি করব—ছত্রভঙ্গ করব আমরা।

মহেন্দ্র ॥ ছাউনির সামনে নিশ্চয় বড়ো বড়ো সব আলো রয়েছে। ওদের কাছে ঘেঁষবে কি করে তোমরা ? আধ মাইল দূরের জিনিষও শান্ত্রীরা দেখতে পাবে।

ইন্দ্র ॥ পাবে কি ? শেষরাতে ঘুমে ওদের চোখ জড়িয়ে আসবে না ?

মহেন্দ্র ॥ পাহারার শান্ত্রীর চোখে আসবে ঘুম ?

ইন্দ্র ॥ আমাদের মনে হয় আসবে। আমরা যখন পাহারা দিই তখন আমাদের চোখে আসে না, কিন্তু ওদের চোখে আসবে। কেন জানো বাবা ? কেন জানো মা ? ওরা পররাজ্য গ্রাস করতে আসছে—এ লড়াই ওদের বিলাস। আর আমাদের লড়াই—স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব—একটা জাতির জীবনমরণের প্রশ্ন।

মহেন্দ্র ॥ সাবাস, ব্যাটা সাবাস !

> [মহেন্দ্রকে দু'জনেই প্রণাম করিয়া উঠিল। ময়না বোমার থলিটি দিল ইন্দ্রের হাতে এবং ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কানাইকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই কানাই বন্দুক হইতে আঙুলে করিলা সিঁদুর টানিয়া লইয়া ময়নার সিঁথিতে পরাইয়া দিলো।]

মহেন্দ্র ॥ জয় হোক্—তোদের জয় হোক্

জয়মতী ॥ দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার বুকে যেন আবার ওরা ফিরে আসে।

> [মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে হাত যোড় করিয়া প্রণাম।

* তৃতীয় দৃশ্য *

গ্রাম্যপথ

[চারণগণের গান]

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দেমাতরম্‌ ॥
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দেমাতরম্‌ ॥
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দেমাতরম্‌ ॥

[রবীন্দ্রনাথ]

---

* চতুর্থ দৃশ্য *

ঊষা।

[মহেন্দ্রর বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণ। দূর হইতে গুলীগোলা, বোমা প্রভৃতির আওয়াজ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে। অন্দর হইতে জ্বর বিকারের রোগীর মতো বাহির হইয়া আসিলেন মহেন্দ্র। বুকে হাঁটিয়া আচমকা শত্রু শিবিরের পাহারারত শান্ত্রীকে আক্রমণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন তিনি।]

মহেন্দ্র ॥ ঐ ঐ শত্রুর ছাউনি হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলেরা ঠিকই বলেছে। এই শেষ রাত্রে, ঐ যে শান্ত্রীগুলো পাহারা দিচ্ছে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওরা ঘুমে ঢুলছে। আমার ইন্দ্র ঠিকই বলেছে ওদের লড়াই ওদের বিলাস। আর আমাদের লড়াই আত্মরক্ষার লড়াই। রোসো।

[মহেন্দ্র বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিকটা গিয়া, দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বুকে হাঁটা সুরু করিলেন। খানিকটা

ম-১৭৭

যান, আবার থামেন, আবার চলেন। এবার তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন ম্বয়ম্ভু শাস্ত্রীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন। চোখে মুখে তাঁহার জিঘাংসা ফুটিয়া উঠিল। তখন তিনি হঠাৎ ব্যাঘ্র বিক্রমে সেই কল্পিত শাস্ত্রীর টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়াস করিতে গিয়া নিজেই নিঃশেষিত শক্তিতে পড়িয়া গিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রীর টুঁটি চাপিয়া ধরিবার উল্লাসে তিনি বিকট চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল প্রথমে ময়না এবং তৎপশ্চাতে জয়মতী।]

ময়না ॥ এ কী ?

জয়মতী ॥ কি হয়েছে ?

ময়না ॥ পড়ে গেলে কেমন করে ?

মহেন্দ্র ॥ চুপ ! আমি একটা শত্রু নিপাত করেছি। টুঁটি টিপে মেরেছি। ইন্দ্ররা যেমন মারছে।

জয়মতী ॥ কৈ ?

ময়না ॥ কোথায় ?

মহেন্দ্র ॥ ঐ দ্যাখ। মড়াটা ওখানে পড়ে আছে।

ময়না ॥ বাবা, বাবা, এসব তুমি কি বলছ। [তাহাকে ঝাঁকাইতে লাগিল।]

জয়মতী ॥ ওকে তোল, তোল। [নিজেই তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া] এ কী ! জ্বর ! গা'টা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ওগো ওঠো, ওঠো।

[জয়মতী এবং ময়না মহেন্দ্রকে টানিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। মহেন্দ্র তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিলেন। পরে সম্মুখের শূন্য প্রাঙ্গণটি দেখিলেন। চৈতন্য হইল।]

মহেন্দ্র ॥ আমার কি হয়েছে ? তোমরা আমাকে এমনি করে ধরেছ কেন ?

ময়না ॥ তুমি এখানে পড়ে গিয়েছিলে বাবা।

মহেন্দ্র ॥ [এবার স্মরণ হইতে লাগিল] ও, হ্যাঁ--হ্যাঁ। কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। শত্রুর ছাউনি। পাহারাদার—শাস্ত্রী। আমি—আমি—না না, সবই স্বপ্ন সবই মিথ্যা। উঃ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। গাটা পুড়ে যাচ্ছে। ইন্দ্ররা ফিরে এসেছে ? অতো গোলাগুলীর শব্দ কেন ? লড়াই তবে এখনো চলছে ? কার' যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি ? দেখো, কে আসছে।

[বন্দুক হাতে ছুটিয়া আসিল কানাই। তাহার হাতে একটি নিবন্ত মশাল।]

ময়না ॥ তুমি !

জয়মতী ॥ একজন আমার ফিরেছে, কিন্তু আর একজন ?

মহেন্দ্র ॥ ওরে সে বেঁচে আছে তো ? বেঁচে আছে ?

কানাই ॥ আছে। আছে। তোমরা শোনো। আমি তাঁর জরুরী হুকুম এনেছি।

মহেন্দ্র ॥ আগে আমায় বল, তোরা কি জিততে পেরেছিস ? জিতেছিস ?

কানাই ॥ জিতেছি। কাল রাতে আমরা জিতেছি। এই শেষ রাতে শত্রু শিবিরে আচমকা বোমার পর বোমা মেরে, বন্দুকের গুলী ছুঁড়ে ঐ শ' দুই দুষমনকে ঘায়েল করেছি আমরা। কিছু মরেছে। আমাদেরও দু'চারজন গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা এই, ছত্রভঙ্গ হয়ে দুষমনরা পালিয়েছে।

জয়মতী ॥ গেছে ! আমাদেরও দু'চারজন গেছে ? ওরে কে গেছে, কে গেছে ?

মহেন্দ্র ॥ না না, তা শুনতে চেও না জয়মতী। কে গেছে, তা শুনতে নেই। তবে জেনে রাখো স্বর্গে গেছে—স্বর্গে গেছে।

জয়মতী ॥ [এ কথাতে যেন আত্মস্থ হইয়া ভাবাবেগ বর্জন করিয়া শান্ত কণ্ঠে] বেশ। কি বলতে এসেছো, বলো তুমি। পাষাণ হয়েই আমরা শুনবো।

কানাই ॥ শ'-দুই দুষমন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে বটে কিন্তু এবার এসে পড়েছে হাজার দুই। পথে আমরা যেসব খাদ কেটেছিলাম, এবার এরা সেসব দিচ্ছে মাটি দিয়ে বুজিয়ে কাল রাতে ওদের কিছু বন্দুক আর গোলাগুলী পেয়েছি সত্য কিন্তু তা আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। আমরা সবাই ঠিকমতো বন্দুক চালাতে জানি না। এ গ্রামরক্ষার আশা আর নেই আমাদের।

মহেন্দ্র ॥ আমার ছেলেটা কি বশ্যতা স্বীকার করতে বলেছে আমাদের ?

কানাই ॥ ইন্দ্রদা তোমার সে ছেলে নয়।

মহেন্দ্র ॥ তাই বল। তাই বল। এইবার বল ! কি বলেছে সে।

কানাই ॥ এ গাঁয়ের বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে চলে যেতে বলেছে এর পরের গাঁয়ে।

জয়মতী ॥ সাত পুরুষের এই ভিটে ছেড়ে যেতে হবে আমাদের ?

কানাই ॥ লড়াইটা চালিয়ে যেতে হলে আমাদের তাই যেতে হবে মা।

ময়না ॥ দাদা ঠিকই বলেছে। এখানে আমরা থাকলে আমাদের মরতে হবে। লড়াই করা হয়ে যাবে আমাদের শেষ। কিন্তু আমরা বাঁচতে চাই! লড়াই করে একদিন না একদিন আমরা জিততে চাই।

জয়মতী ॥ কিন্তু আমার এই গোলাভরা ধান—ক্ষেতভরা ফসল—

কানাই ॥ দাদার হুকুম—যাবার আগে পুড়িয়ে দিতে হবে সব।

মহেন্দ্র ॥ না না। ছেলেগুলোর বুদ্ধি আছে। দে সব পুড়িয়ে। আগুন ধরিয়ে দে। বিদেশী দুষমনের হাতে পড়ে না যেন দেশের একদানা চাল। এক মুঠো ফসল।

জয়মতী ॥ কিন্তু—কিন্তু—

মহেন্দ্র ॥ না না, আর কিন্তু নয়। ময়না—দেখাদেখি ঘরে টাকাকড়ি কি আছে। ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল, খন্তা, দা, বঁটি—শত্রুর কাজে লাগে এমন যা-কিছু আছে চটপট গুছিয়ে নে সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে—

[অন্দরের দিকে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ময়না, জয়মতী ও কানাই—তাহারও। দীননাথ সপরিবারে একটি ছাগ-শিশুসহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্য কিছু জিনিষপত্র একটি বাঁকের দুই প্রান্তে বাঁধা। সকলেই শোকাচ্ছন্ন।]

দীননাথ ॥ কই গো পঞ্চায়েত ? তোমার হলো ? ওরে কানাই, এত দেরী হচ্ছে কেন ?

[অন্দর হইতে প্রথমে বাহির হইলেন মহেন্দ্র।]

দীননাথ ॥ একা বেরিয়ে এলে যে পঞ্চায়েত ?

মহেন্দ্র ॥ [ছুটিয়া কাছে আসিয়া] না না—ছেলেরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

দীননাথ ॥ সে কি !

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। এই যে, এই যে। একটি বড়, একটি ছোট।

[দুইটি ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন। ইতিমধ্যে কানাই, জয়মতী এবং ময়না আসিয়া দাঁড়াইল। ময়নার হাতে একটা টিনের বাক্স। জয়মতীর হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলি। কানাই একটি মশাল জ্বালিতে ব্যস্ত।]

দীননাথ ॥ এই যে, ওঁরাও এসে গেছেন। হা ভগবান ! এইবার তবে চলো পঞ্চায়েত।

মহেন্দ্র ॥ ধানের গোলায় আগুন দিয়ে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে তবে তো যাবো ?

জয়মতী ॥ ওগো না না—আমরা চলে গেলে আগুন দেবে ছেলেরা।

দীননাথ ॥ তাই দিয়েছে। ঐ যে আমার বাড়ির আগুন দেখা যাচ্ছে।

[দীননাথের স্ত্রী সারদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।]

দীননাথ ॥ ঐ দ্যাখো, রাজেনের অতগুলো ধানের গোলা, অতগুলো টিনের ঘর কেমন সুন্দর পুড়ছে। আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে !

সারদা ॥ আমার কানাই ? আমার কানাই কই ?

জয়মতী ॥ [ময়নাকে সারদার হাত দিয়ে] এই তোমার কানাই। কিন্তু আমার ইন্দ্র ?

মহেন্দ্র ॥ ওদের ফটো নিয়েছি বুকে। ওদিকে আর তাকিয়ে দেখো না। জয়মতী—জয়মতী—পেছন ফিরে কি দেখছো ? দেখো না, দেখো না। চলে এসো, চলে এসো।

[জয়মতী গৃহ এবং ধানের গোলার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভাবাবেগ বিসর্জন দিলেন।]

জয়মতী ॥ চলো।

[কানাই ব্যতীত সাশ্রুনেত্রে সকলে অগ্রসর হইল।]

কানাই ॥ [একটা থাল দেখাইয়া] ময়না, এটা ভুলে গেছো।

[ময়না ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে উহা লইল।]

আমাকে ভুলো না।

[ময়না কানাইকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।—শোক-যাত্রাটি অদৃশ্য হইল।]

দাদা -দাদা, এরা সব চলে গেছে। তুমি আসতে পারো। এসো। আমি ধানের গোলায় আগুন দিচ্ছি।

[মশালটি কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইল। বাহিরের লুক্কায়িত স্থান হইতে ইন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখা গেল পায়ে গুলী লাগিয়া সে আহত। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ বিপর্যস্ত। অতি কষ্টে সে আসিতেছিল— হঠাৎ পড়িয়া যাইতেই মুখে যন্ত্রণার শব্দ শোনা গেল। কানাই চমকিয়া উঠিল। সে মশালটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে ঘসিয়া নিভাইয়া ছুটিয়া আসিল ইন্দ্রের কাছে।]

কানাই ॥ এ কি? পায়ের ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভেসে গেল যে!

ইন্দ্র ॥ গুলীটা বোধহয় পায়ের ভিতরেই রয়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখলে ওরা কেউ যেতো না। ওরা গেছে, এখন একটু মনের সুখে আঃ! করে চেঁচাতে পারবো কানাই —আঃ—।

[সত্যিই তাহা করিতে লাগিল।]

কানাই ॥ মনে হচ্ছে যন্ত্রণাটা আর সইতে পারছো না দাদা। এর উপর একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি। একটা কাপড় পেলে—

সংযোজন

[কাপড় আনিতে ঘরে গেল। আত্মগোপন করিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল হরিদাসী। তাহার হাতে ছিল একটি ফার্স্ট-এডের বাক্স। তাহা হইতে একটি ব্যাণ্ডেজ লইয়া সে ইন্দ্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ইন্দ্র ॥ তুই! পালাসনি তুই হরিদাসী!

হরিদাসী ॥ আমার জীবনের কী দাম যে পালাব! আছে আমার স্বামী? আছে একটা ছেলে কি মেয়ে? কিসের আশায় আমি পালাব? [বলিতেছিল, আর ইন্দ্রের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল।]

ইন্দ্র ॥ কিন্তু, এখানে থাকলে তুই যে মরাব হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ তাতেই আমি বাঁচবো ইন্দিরদা।

[কাপড় লইয়া কানাই-এর প্রবেশ।]

কানাই ॥ [হরিদাসীকে দেখিয়া] এ কি!

ইন্দ্র ॥ থাক্ ও থাক্। ও যেদিন জন্মেছিল বিধাতাপুরুষ লিখে দিয়েছিলেন আমিই ওকে মারব। তাই আজ এখানে ও এসেছে।

হরিদাসী ॥ হ্যাঁ, তাই এসেছি। মরতে এত আনন্দ এ আমি জানতাম না ইন্দিরদা। এ যেন পুতুল খেলা—জীবনটাও-মরণটাও।

ইন্দ্র ॥ চুপ। শুনেছিস—

[দূর হইতে সৈন্যদের মার্চের শব্দ নিকটতর হইতে লাগিল।]

কানাই ॥ শালারা আসছে।

[দুইজনেই কান পাতিয়া মার্চের ক্রমবর্ধমান শব্দ শুনিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ বন্দুকটা বাগিয়ে ধর।

কানাই ॥ কিন্তু—

ইন্দ্র ॥ [কর্কশকণ্ঠে] না পারিস আমার হাতে দে। মারতে মারতে একটাকে মেরে মরবো।

কানাই ॥ কপাল দেখো। গুলী আমার ফুরিয়ে গেছে।

ইন্দ্র ॥ ওরা ওই এসে গেছে। বাড়ির সামনেই এসে গেছে। মরতেই যদি হয় বন্দেমাতরম্ বলে মরবো। বল কানাই—বন্দেমাতরম্।

কানাই ॥ [চীৎকার করিয়া] বন্দেমাতরম্।

[উহারা পুনঃ পুনঃ বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ্ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। দারুণ উত্তেজনায় ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কানাই তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া সেখানে আসিল একজন ভারতীয় মিলিটারী অফিসার। তাহার পশ্চাতে একজন জাতীয় পতাকাবাহী সৈনিক। তাহাদের কণ্ঠেও বন্দেমাতরম এবং জয়হিন্দ্ ধ্বনি।]

ইন্দ্র ॥ তোমরা এসে গেছো, তোমরা এসে গেছো ?

অফিসার ॥ হ্যাঁ। এসে গেছি। তোমাদের নিয়ে দুষমনদের তাড়াবো।

[অফিসার ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন এবং পতাকাবাহী সৈনিক জড়াইয়া ধরিল কানাইকে। যবনিকা দ্রুত পড়িয়া আবার উঠিল। এবার দেখা গেল মিলিটারী অফিসার এবং তাহার সঙ্গী এখানে নাই। ইন্দ্র একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। তাহার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্দ্র ও কানাই গাহিতেছে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা—আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি। ক্রমে ক্রমে সানন্দে ফিরিয়া আসিতে লাগিল সকলের পরিজন—তাহাদের জিনিষপত্রসহ। তাহাদের মধ্যেও অনেকেই ইন্দ্র কানাইয়ের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিল এই জাতীয় সঙ্গীত। আনন্দ দৃশ্যের মধ্যে নামিল শেষ যবনিকা।]

—য ব নি কা—

খনা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

নাট্যনিকেতন শুভ উদ্বোধন
বৃহস্পতিবার, ২৬শে আষাঢ় ১৩৪২

অখিল নিয়োগী

বন্ধুবরেষু—

মন্মথ রায়

লেখকের কথা

'খনা' লিখিয়াছিলাম নিজের প্রেরণায়, ১৯৩২ সালে, পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গৃহীত হয়, দিনাজপুর নাট্যসমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়, অধুনালুপ্ত "নাট্যকুঞ্জ" (কলিকাতা) কর্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়, "বাঙলার বাণী" সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, অবশেষে বর্ত্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় "নাট্যনিকেতনে"—গত ১১ই জুলাই (১৯৩৫) সাড়ে সাতটায়। "মেগাফোন" নামক সুপরিচিত গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রথম নাট্যার্ঘ্য "খনা" আমার এই নাটকেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। খনার কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা এবং চারি আনা কিংবদন্তী।

"খনার" জন্য আমি অনেকের নিকটই ঋণী। প্রাথমিক উপদেশ দিয়াছিলেন পরম বান্ধব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। উৎসাহ দিয়াছিলেন নাট্যকার-বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর। সঙ্গীত-রচনা করিয়াছেন কবি-শিল্পী বন্ধুবর শ্রীঅখিল নিয়োগী। তাহাতে সুর সংযোগ করিয়াছেন সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য সুর-সুন্দর বন্ধু শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন কলা-লোকের লক্ষ্মী-কল্পা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নীহারবালা। দৃশ্যপটের চারুকল্পনা এবং গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অংকন করিয়াছেন শিল্পীবর বন্ধু শ্রীনরেন দত্ত। নাটকের প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন বন্ধু-বৎসল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশংকর নিয়োগী। নাটক প্রযোজনার কণ্টকর প্রাথমিক আয়োজন করিয়া দিয়াছেন নট-তিলক শ্রীযুক্ত মণী ঘোষ। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সর্ব্বশেষে স্মরণ করিতেছি তাঁহাদিগকে····যাঁহারা পরমাত্মীয়ের মত আমার খনাকে নাট্যনিকেতনোপযোগী রূপসজ্জায় ঐশ্বর্য্যময়ী করিয়াছেন। তাঁহারা নাট্য-নায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং বাঙলার নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী। সর্ব্বশেষ—শেষ নিশ্বাসে লোকে কাহাকে স্মরণ করে তাঁহারা তাহা জানেন।

"বরদা ভবন",
বালুর ঘাট
দিনাজপুর
১৮ই জুলাই, ১৯৩৫।

মন্মথ রায়

অভিনেতৃগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	ভারত সম্রাট	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
বিভাবসু	মন্ত্রী	ব্রজেন্দ্র সরকার
ধর্ম্মাধিকার		আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বরাহ	জ্যোতিষার্ণব	অহীন্দ্র চৌধুরী
মিহির	বরাহের পুত্র	জীবন গাঙ্গুলী
কামন্দক	শিষ্য	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ভৈরব	ক্রীতদাস	মণি ঘোষ (এমেচার)
মহাকাল	লঙ্কার জ্যোতিষী	ননীগোপাল মল্লিক
বিশালাক্ষ	রক্ষ-সেনাপতি	খগেন্দ্রনাথ দাস
রাহুল	শেষ রক্ষ-রাজ-বংশধর	আদিত্য ঘোষ
তিলক	খনার দেহরক্ষী	বেচু সিংহ
রক্ষসৈন্যগণ		ভবানী ভট্টাচার্য্য, গিরিজা মিত্র, সুধাংশু গুহ, কালীকুমার বসু
সিংহলের মন্ত্রীত্রয়		ভবানী ভট্টাচায্য, গিরিজা মিত্র, বিমল ভট্টাচায্য
চাষা		সন্তোষ দাস (ভুলো)
জনৈক লোক		অমূল্য হালদার
পথিক		গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী

খনা	লঙ্কার সিংহরাজকন্যা	সরযূবালা
ধরণী	বরাহের স্ত্রী	চারুশীলা
মর্দনিকা	ঐ কন্যা	নিরুপমা
তরলিকা	মর্দনিকার সহচরী	তারকবালা (লাইট)
উন্মাদিনী নারী		হেনাবালা
চাষা-স্ত্রী		কোহিনুরবালা
ছাত্র-ছাত্রীগণ ও পুরনারীগণ		পুষ্পরাণী, মুকুলমালা, সুবাসিনী, রাধারাণী, তারকবালা, হেনাবালা, রাণীবালা, লীলাবতী, আশালতা

খনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহল

মহাকালের চতুষ্পাঠী—অদূরে সমুদ্র

ছাত্র-ছাত্রীগণ, খনা ও এক চাষা-দম্পতি

ছাত্র-ছাত্রীগণের গান

দাগ কেটে আর আঁক কষে ভাই হস্তরেখা করবো বিচার
মোদের কথার ভুল ধরিলে, বিধাতাকেও বলবো কি ছার।
কবে তোমার জনম হ'লো? কখন যাবে যমের বাড়ি?
মোর মগজে জমা আছে—সকল রকম কথার সারি!
সাচ্চা কথা—বলবো সোজাই—ধার ধারিনা নিছক মিছার॥
আপনি বুঝি হাত দেখাবেন? কিসের খবর জানতে চান?
মোদের কাছে বাঁধা আছেন—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান।
ফাঁড়া আছে?—চান তাড়াতে?
চান কি কোন রোগ সারাতে?
ফস্ ক'রে সব ফর্দ করুন—ইচ্ছে আছে জানতে কি আর!

মিহিরের প্রবেশ

চাষা॥ আমরা আর কতক্ষণ ব'সে থকবো! মহাকাল মশায় সেই কখন গেছেন, এখনো ফিরলেন না—এদিকে বেলাও পড়ে' গেল।

মিহির॥ রাজবাড়িতে গেছেন, কেন গেছেন জানিনে। (খনাকে) রাজকন্যা কি জানেন?

খনা॥ যে জন্যই গিয়ে থাকুন তা জেনে এঁদের কি লাভ! আপনাদের কি দরকার ওঁকে (মিহিরকে দেখাইয়া) বলুন—গুরুদেবের প্রধান শিষ্যই উনি।

চাষা॥ এসেছিলাম গণাতে।

খনা॥ ওঁকে বলুন—উনি গণে দেবেন।

চাষা॥ তবে মশায় আপনি····কথাটা একটু গুরুতরই····(স্ত্রীকে দেখাইয়া) উনি আমার পরিবার। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই····কথাটা একটু গুরুতরই····

মিহির ॥ বলুন—

চাষা ॥ বলছেন "দিব্যি কর আমি মরলে আর বিয়ে করবে না।" আমি বলছি···এমনটি কি হবে ? উনি বলছেন "হোক না হোক কর দিব্যি।" আমি বলছি, তাহলে মহাকাল মশাংকে দিয়ে গুণিয়ে দেখতে হয়। তাই এখন বলুন এমনটী কি হবে ?

মিহির ॥ *কেমনটি ?

চাষা ॥—এই যে উনি কি সত্য সত্যই স্বর্গারোহণ করছেন—অবিশ্যি আমার পূর্বে ?

মিহির ॥ কথাটা গুরুতরই বটে ! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি বরং কাল আসবেন—গুরুদেব থাকবেন—তিনিই—

খনা ॥ এ কথা বললে, কার বেশী অপমান হ'চ্ছে বুঝছি না ! শিষ্যের না গুরুর—যে গুরুর এমন শিষ্য ?

চাষা ॥ (স্ত্রীকে) কি গো, একটা দিন সবুর করতে পারবে ?

চাষা স্ত্রী ॥ একটা-দিন ! একটা মুহূর্তও আমার সইছে না। যে স্বপ্ন আমি দেখেছি—না, আর আমার তর সইছে না—দিব্যিটা ক'রে ফেল—ফেল বলছি—ভাল চাও তো··

চাষা ॥ (মিহিরের প্রতি) দেখলেন—দেখলেন তো ?

মিহির ॥ আমার যা বলবার আমি বলেছি—

খনা ॥ অর্থাৎ উনি এত সামান্য গণনা করেন না।

চাষা ॥ তা মা—আপনার নাম ডাকও খুব শুনেছি। শুনেছি মেয়ে মানুষ আর রাজার মেয়ে না হ'লে মহাকাল মশাই আপনাকেই নাকি তাঁর গদী দিতেন। তা মা, দেখছেন তো···যদি দয়া ক'রে আপনিই—

খনা ॥ তা উনি যখন এত তুচ্ছ গণনা ক'রবেন না, তখন ওঁর অনুমতি হ'লে—

মিহির ॥ কারও অক্ষমতা নিয়ে এত বড় রহস্য করা রাজকন্যার পক্ষেই শোভা পায়। আমি তা ধরছি না। বরং গুরুর সম্মানটা রক্ষা পাক্ শিষ্য এই কথাই বল্‌ছে···

খনা ॥ আসুন আপনি—আপনিও মা আসুন, এগিয়ে আসুন—

> অক্ষরে দ্বিগুণ, চৌগুণ মাত্রা
> নামে নামে করি সমতা
> তিন দিয়া হরে আন
> তাহে মরা বাঁচা জান ॥
> এক শূন্যে মরে পতি
> দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

(চাষাকে) মহাশয়ের নাম ?

চাষা ॥ উল্টট।

খনা ॥ উল্টট··অক্ষর সংখ্যা হ'ল তিন। (স্ত্রীকে) আপনার নাম ?

চাষা-স্ত্রী ॥ বলনা গো কি—

চাষা ॥ আমি বলব কি গো ?

খনা ॥ (স্ত্রীকে) আপনিই বলুন না—

চাষা-স্ত্রী ॥ নামের কি ঠিক আছে··মিন্সে ঘড়িতে ঘড়িতে নতুন নতুন নামে ডাকে···

খনা ॥ বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা বলুন।

চাষা-স্ত্রী ॥ মক্ষিকা।

খনা ॥ মক্ষিকা···তাহ'লে অক্ষর সংখ্যা হ'ল ছয়। তাকে কর দুই দিয়ে গুণ, হ'ল বার। এইবার মাত্রা। উল্টটের মাত্রা "উ" আর মক্ষিকার মাত্রা হ'ল "ই" আর "আ"। উভয় নামের মাত্রার সংখ্যা হল "উ" "ই" "আ" কিনা তিন। কর তাকে চার দিয়ে গুণ। হ'ল বার। অক্ষরের বার, আর মাত্রার বার, যোগ দাও—হ'ল চব্বিশ। কর তাকে তিন দিয়ে ভাগ। ভাগ শেষ রইল শূন্য। অতএব....

চাষা ॥ অতএব—

স্ত্রী ॥ হুঁ—

খনা ॥ এক শূন্যে মরে পতি।
দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

চাষা ॥ অর্থাৎ—?

খনা ॥ অর্থাৎ ভাগশেষ যখন শূন্য, সুতরাং স্বর্গারোহণ করেছেন আপনিই আগে।

চাষা ॥ বটে! (স্ত্রীকে) দিব্যিটা ত তাহলে তোমাকেই করতে হ'চ্ছে মক্ষিরাণী—জানতে যখন পারলামই তখন তো আর ছাড়তে পারি না। যে দিনকাল পড়েছে বাবা, এক সঙ্গে বিশ বৎসর ঘর-কন্না ক'রেও স্বামী জীবিত থাকতেই মাগ বলে ও আমার স্বামী নয়—শ্রাদ্ধ হ'তে না হতেই যে তুমি আর এক শালার গলায় মালা দেবে, আর সেই শালা পরমানন্দে আমার যথা সর্ব্বস্ব করবে ভোগ, স্বর্গ থেকে তাই আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখবো·· আর ক'রতে পারবো না কিছুতেই—তাতো হ'তে পারেনা মক্ষিরাণী। দিব্যিটা এখনই কোরে ফেল দেখি—আমিটি স্বর্গে গেলে বিয়েটি আর কোরবেনা—

স্ত্রী ॥ ভালো বিপদ! তাই কি আমি পারি ?

চাষা ॥ খুব পারো। বাপ-মা জ্ঞানী লোক—সাধে কি আর নাম রেখেছিলেন মক্ষিরাণী—তাই ত আমি বলি—

মিহির ॥ থাক্ থাক্ ওসব ঘরের কথা....ওসব ঘরে গিয়েই....

চাষা ॥ ঘরের কথা! কে না জানে মশাই! আচ্ছা বেশ, চলো ত ঘরে —তারপর—সে আমি দেখে নিচ্ছি—(খনাকে) যে উপকারটা আজ করলে মা — (স্ত্রীকে) দিব্যি কর—দিব্যি কর—কর এখনও দিব্যি—

মিহির ॥ আ হা-হা থাক না এখন। আসুন—আপনারা এখন আসুন।

ছাত্র-ছাত্রীগণকে ইঙ্গিত করিতে তাহারা কোলাহল করিয়া উভয়ের পিছনে ধাওয়া করিল।

মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তো খনা দেবী?

খনা ॥ অর্থ?

মিহির ॥ কিন্তু আমি বলি লোক-সমক্ষে আমাকে এত হেয় করবার এই চেষ্টার কি কোন প্রয়োজন ছিল? শৈশবে সাগর-জলে ভেসে এসে আমি এই সিংহলে কূল পেয়েছিলুম; তোমার পিতা-মাতা দয়া ক'রে আমাকে লালন-পালন করলেও আমি কুলহীন গোত্রহীন—এই অখ্যাতি এই অমর্য্যাদাই কি যথেষ্ট নয় রাজকন্যা?

খনা ॥ যে আমাকে রাজকন্যা ব'লে সম্বোধন করে তার কথা উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন।

মিহির ॥ তার পূর্বে জানা আবশ্যক অন্য কোন নামে অভিনন্দন ক'রবার অধিকার আমার আছে কিনা! বিশেষ গুরুদেবকে রাজপুরীতে যে উদ্দেশ্যে ডেকে নেওয়া হয়েছে—তা জানবার পরও?

খনা ॥ সেই অধিকারই সত্যিকার অধিকার—যা কোনক্রমে কেউ কোনদিনই ত্যাগ করবে না! না—আজও না। যে কোন নামে, যে কোনরূপে অভিনন্দন ক'রবার অধিকার আমি দিতে পারি · হয়ত বা দিয়েওছিলাম, কিন্তু সে অধিকার যদি কেউ ত্যাগ করে—ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্—আমি বল্‌বো সে আমাকে কোন-দিনই গ্রহণ করে নি— অন্তরের সঙ্গে।

শশব্যস্তে মহাকালের প্রবেশ।

মহাকাল ॥ এই যে! তোমরা! শুনেছ তো মা! শুনেছ মিহির? খনা মার বিয়ে (কোন উত্তর না পাইয়া) শুনেছ নিশ্চয়। সবাই শুনেছ—আমি বরং শুনলুম অনেক পরে। তা হোক্ আর সময় নেই....মহারাজ বলেছেন আজই যোটক বিচার ক'রে দিতে হবে। মিহির, এসো ত বাবা—আমাকে একটু সাহায্য কর। খনা মা! বিয়ে হলেও জ্যোতিষ চর্চ্চাটা ছেড়না—তুমি মা সাক্ষাৎ সরস্বতী · এস মিহির—এই হ'চ্ছে খনার জন্মপত্রিকা—আর এই হচ্ছে রাহুলের—

খনা ॥ মাকে আমি বলেছি গুরুদেব, রাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না।

মহাকাল ॥ সে কি মা ! সব যে ঠিক ! অবশ্য যোটক বিচারাদি এখনও হয়নি। কিন্তু তা—

খনা ॥ যোটক বিচার করতে হয় করুন। কিন্তু আমি আমার ভাগ্যরেখা বিচার ক'রেছি। অন্য কোন বিচার না হয় থাক্। আমি বলছি রাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না ।

মহাকাল ॥ বড্ডো গোলমেলে কথা। কিন্তু মা, আমি ত যোটক বিচার না ক'রে পারি না। মহারাজ আমায় ডেকে বল্লেন—কালই আছে লগ্ন—কালই হবে বিয়ে। আমি বরং বলেছিলাম এত তাড়া কেন ? তিনি বল্লেন, বিশেষ কারণ আছে। গোপনে আমায় বল্লেন—তা তোমাদের বলতে বাধা নেই, কারণটা বিশেষই বটে। মহারাজ হয়েছেন বৃদ্ধ—জরা-জীর্ণ। সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, লঙ্কার রক্ষবংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তারা বলছে বাঙলার বিজয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত সিংহ-বংশের শাসন আর আমরা সইবো না—তোমার পিতার নিকট এর মধ্যেই তারা দাবী জানিয়েছে—লঙ্কার সিংহল নাম তুলে দিতে হবে। কথাটা তো অন্যায় নয় মা। মহারাজ এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু স্থির করেন নি—কিন্তু রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির ক'রে ফেলেছেন। রাহুল হচ্ছে বিজিত রক্ষ রাজবংশের শেষ বংশধর। তার সঙ্গে সিংহ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তোমার বিয়ে হ'লে লঙ্কার রক্ষ রাজ-বংশের সঙ্গে বাঙলার সিংহ-বংশের যে মিলন সংস্থাপিত হবে তাতে সম্ভাবিত রক্ষ-বিদ্রোহ অসম্ভব হবে—দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তা রাহুলও মা তোমার অনুরাগী এবং বংশমর্য্যাদায় ও গুণ-গরিমায় তোমার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ....নয় মা ? কি বল মিহির ?

মিহির ॥ দেশের শান্তি রক্ষার্থে।

খনা ॥ (দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া) দেশের শান্তি অশান্তি বিচার না ক'রে গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন কর্ত্তে যোটক বিচার করাই বরং ভালো (ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া) গুরুদেব ! গুরুদেব ! স্বামী স্ত্রীর অগ্র-পশ্চাৎ মৃত্যু গণনা যে করতে পারেনা তাকে আপনি আপনার সাহায্যের জন্য ডাকছেন তাও বা সহ্য হয়—কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারিনা ·· যে····এত আঘাতেও আপনার ঐ শিষ্যের চৈতন্য হয় না। ···কাপুরুষ আর কাকে বলে আমি ত জানি না গুরুদেব !

মহাকাল ॥ ব্যাপার কি মিহির ? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কি কোন কলহ হয়েছে ?

অদূরে রাহুলের প্রবেশ।

না—না কলহ করবে কেন ! ছিঃ তোমরা দুজনে একসঙ্গে আশৈশব প্রতি-পালিত হয়েছ ঠিক যেন সহোদর ভাই বোন। উভয়েই একসঙ্গে খেলা ধূলা

করেছ, আমার এখানে বিদ্যাভ্যাস করেছ, তোমাদের মধ্যে যে কলহ বড়ই অশোভন—বিশেষ খনার এই শুভ পরিণয়ের প্রাক্কালে। খনার বিবাহের অনেকখানি ভারই যে তোমাকে নিতে হবে মিহির। উৎসবের ব্যবস্থা, বিবাহের আয়োজন, সবই যে তোমাকে দেখতে হবে। না—মিহির, খুব উৎসাহ নিয়ে আমার সঙ্গে এসো দেখি··চল আমার নিভৃত-কক্ষে···যোটক বিচারটা খুব ভালো ক'রে করতে হবে। খনা মা হচ্ছে খেয়ালী মেয়ে। ব'লে কিনা রাহুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। মেয়েরা অমন ব'লেই থাকে। এ ত ঐ বলছে·· অন্য মেয়ে হ'লে বলতো—

রাহুল ॥ বলতো....“সে কি মা বিয়ে! আমি কর্ব্ব না”।

মহাকাল ॥ এই যে রাহুল! এসে পড়েছ বাবা। ভালই হয়েছে। শুনলে ত সব। দু ভাই বোনের এই ঝগড়া মেটাতেই বিলম্ব হ'য়ে গেল। তা তুমি খনা মার সঙ্গে একটু গল্প কর আমি আর মিহির একটু যোটক বিচার করছি।—

মিহিরকে লইয়া অন্যত্র প্রস্থান।

রাহুল ॥ খনা দেবী! আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে না একথাটা তোমার নিজের মুখে শুনলে বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পার্ত্তাম ওটা বিরাগ সূচক কি অনুরাগ সূচক। (খনা উত্তর দিল না) “মৌনং সম্মতি লক্ষণম্” শাস্ত্র বাক্য। অতএব ধরে' নিচ্ছি·

খনা ॥ বেশ তো ধরুন না, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল। তারপর?

রাহুল ॥ ফুলশয্যা—

খনা ॥ নিশ্চয়। তারপর?

রাহুল ॥ জীবনের স্বপ্ন! স্বপ্নের জীবন!

খনা ॥ বেশ—বেশ! তারপর?

রাহুল ॥ তারপর···তুমি বল খনা, আমিই কি আজ সব কথা কইব? তুমি কি কিছুই বলবে না?

খনা ॥ বলবার জন্য আমি ছট্-ফট্ করছি। বলি?

রাহুল ॥ বল—বল—

খনা ॥ বৃদ্ধ পিতা আর কয়দিন। যেই চোখ বুজেছেন অমনি—আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে মহা-মহাসমারোহে হবে অভিষেক উৎসব। কি উজ্জ্বল দৃশ্য! স্বর্ণ-সিংহাসনে রাজ-ছত্রতলে রক্ষকুল বন্দিতা বাঙলার সিংহ-কন্যা আমি। আর পদতলে তুমি কি উচ্চপদ চাও রাহুল?—মন্ত্রীত্ব? মন্ত্রীত্ব চাওনা?···সেনাপতিত্ব তোমায় দিতে পারব না··বেশ তবে···কৃষিবিভাগ?

রাহুল ॥ খনা! খনা!

খনা ॥ কৃষিবিভাগ যদি অভিলাষ নয়,····কলাবিভাগ ?

রাহুল ॥ খনা ! আমি তোমার স্বামী !

খনা ॥ (সহজভাবে) তুমি ভুলে' যাচ্ছ যোটক বিচারও বাকী—

রাহুল ॥ যোটক বিচারের আবশ্যকতা যার আছে তার থাক্। অন্য কোনরূপ বিবাহে আমার অরুচি নেই, তবে আমি নিজে বিশ্বাস করি রাক্ষস বিবাহ। রাক্ষস বিবাহ কি জানো ?

খনা ॥ নিশ্চয়ই জানি। হই না কেন বাঙালীর মেয়ে কিন্তু রাজত্ব করছি রাক্ষসের দেশে। রাক্ষস কি তাও জানি—রাক্ষস বিবাহও জানি। কিন্তু তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ কেন বলত ? যেরূপ বিবাহই হোক্ উত্তরাধিকারীত্বের বিধান বদলাবে না ! রাজকুমার যেখানে নেই, সেখানে সিংহাসন হ'চ্ছে রাজকন্যার, রাজ-জামাতার নয়। না—না রাহুল, রাক্ষসের রক্ত-চক্ষুতে কিংবা তার পশুশক্তিতেও এ বিধান বদলায় না····বদলাবে না।

রাহুল ॥ যদি তোমাকে হত্যা করি ?

খনা ॥ তবে আমাকে বিয়ে করা হয় না !

রাহুল ॥ আমি তোমাকে—আমি তোমাকে ভালবাসি খনা—

খনা ॥ কিন্তু খনা কাকে ভালবাসে তা তুমি জানো না।

রাহুল ॥ সে আমি অনুমান কর্তে পারি খনা—তবু আমাকে দয়া কর্তেই বল্‌ছি খনা। সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। রাক্ষসের ক্ষুধার মতো সুতীব্র অত্যুগ্র আমার প্রেম···তুমি উপেক্ষা করোনা, করোনা খনা····তুমি আমায় দয়া কর, দয়া কর····খনা !

খনা ॥ দয়া ক'রে প্রেম হয় না রাহুল। তুমি কিচ্ছু জানো না—কিচ্ছু জানো না রাহুল।

রাহুল ॥ যদি বলি সিংহাসনে তুমিই উপবেশন করো খনা····পদতলেই আমি বস্‌বো—

খনা ॥ বলোনা, বলোনা রাহুল····ও কথা বলোনা। এতক্ষণ যদিও কথা বলছি—চেয়ে দেখ্‌ছি—ও কথা বল্‌লে এইখানেই নিবেদন ইতি—এবং যবনিকা পতন !

রাহুল ॥ খনা !

খনা ॥ আর যে কি তোমার বলবার আছে এবং আমার শোনবার আছে ভেবে পাচ্ছিনা। বরং তুমি শুন্‌তে পার—

রাহুল ॥ কি ?

খনা ॥ একটা গান—

চাঁদ ওঠে উজলিয়া গগনে—
কতজনে মুঠি ভরি ধরে তারে স্বপনে !

তারে কিবা কব আর—
যেবা জেগে অনিবার—
চায় সুদূরের শশী—তার নিজ ভবনে!

মহাকাল ও মিহিরের প্রবেশ। হাতে জন্ম পত্রিকাদ্বয়

মহাকাল ॥ এই যে! বেশ! বেশ!···কিন্তু একটু গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে যে—

ক্ষত্র বিট্ শূদ্র বিপ্রাঃ স্যুঃ
ক্রমান্মেষাদি রাশয়ঃ।
পুংসাং বর্ণাধিকা কন্যা
নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন।

বরের বর্ণাপেক্ষা কন্যার বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবে না। এখানে ঠিক তাই হ'চ্ছে—চিন্তনীয় বটে।—

মিহির ॥ চিন্তনীয় কি বলছেন প্রভু! এ বিবাহ কখনও হ'তে পারে না। অষ্টমে পাপগ্রহ···যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, এ বিবাহের ফল কন্যার মৃত্যু।

মহাকাল ॥ মহারাজ এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত ক'রে ফেলেছেন—অথচ এই বিচারের পর আমিই বা তাঁকে কি ক'রে বলি এ বিবাহ হোক্—তিনিই বা কি ক'রে এ'সব জেনে শুনে এ বিবাহ দেন?—

খনা ॥ তাইতো! কি হবে গুরুদেব!

রাহুল ॥ বুঝলাম। উত্তম। আমার পথ আমিই দেখ্‌ছি। উত্তম! উত্তম!··· এখনি যদি বিবাহের বাদ্য বেজে ওঠে···চম্‌কে উঠোনা রাজকন্যা—

খনা ॥ বিবাহের বাদ্য শোনবার জন্য কুমারীরা উন্মুখ হ'য়েই থাকে রাহুল! চমকায় না! (রাহুলের প্রস্থান)

মহাকাল ॥ না—না—এ সব কি কথা! মিহির···এস তো—আর একবার বরং ভাল ক'রে—

খনা ॥ ঐ অন্যমনস্ক শিষ্য নিয়ে? তবেই হোয়েছে। যদিওবা কিছুমাত্র আশা ভরসা ছিল···তাও গেল।

মহাকাল ॥ না—না,—তা হ'লে··· মিহির তুমি বরং ···হ্যাঁ আজ তোমাকে একটু অন্যমনস্কই দেখ্‌ছি বটে। আচ্ছা, খনা মা, তুমি নিজেই এসে দেখনা—

খনা ॥ আমি ত দেখেছি এ বিয়ে হবে না। বরং আপনি দেখুন আমার ভুল হ'ল কোথায়!

মহাকাল ॥ হ্যাঁ মা···কিন্তু বিয়েটা হ'লেই বড় ভাল হ'তো···আমাদের রক্ষ কুলের বধূ যদি তুমি হও মা, আমাদের কুল হবে উজ্জ্বল, আনন্দ হবে আমার সব চেয়ে বেশী—কারণ আমি জানি তুমি কি! না—মা, আর দেরী ক'রব না···রাহুলের গতিকটা ভাল দেখ্‌লাম না, কখন কি ক'রে বসে কে জানে। আমি বরং মহারাজের কাছে গিয়েই সব ব'লে আস্‌ছি—

খনা ॥ না, তা হলে তো আপনার আর কিছুতেই দেরী করা চলে না।—

মহাকালকে রওনা করিয়া দিলেন।

সত্যই আর দেরী করা চলে না। কখন কি হয় কে জানে (ভূমিতে রেখাপাত করিয়া কি দেখিয়া) শনিবার—বার-দোষ নেই, তিথি নিষেধ নেই—প্রশস্ত-নক্ষত্র —অতএব গোধূলি লগ্নেই আজ আমার বিয়ে। মিহির!

মিহির নীরব রহিলেন।

কি কথা কইছ না যে? দেশের শান্তি?

মিহির ॥ রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না। কখনো না— এ বিবাহ হ'লে তোমার নিশ্চিত অকাল মৃত্যু—

খনা ॥ দেশের শান্তি অশান্তি যে বিচার কর্তে যায় তার মুখে একথা! কিন্তু একথা শোনে কে! দলবল নিয়ে রাহুল এখুনি আস্‌ছে···আজই হবে আমার বিয়ে!

মিহির ॥ অসম্ভব! রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ—আমি জীবিত থাকতে নয়।

খনা ॥ আমার জীবনের জন্য তোমার এ দরদ বিচিত্রই বোধ হচ্ছে মিহির!

মিহির ॥ বিচিত্র বোধ হবে বৈকি! ভূমিকম্প যেদিন হয় সেদিন বিচিত্রই বোধ হয়··কিন্তু সে কি একদিনের রচনা? একদিনের রচনা খনা? দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—বর্ষের পর বর্ষ, তোমার চোখের আড়ালে··· তোমার জ্ঞানের অন্তরালে···তোমার মনের অজ্ঞাতে··· তিলে তিলে ···ধীরে ধীরে ··চুপি চুপি সে হয়েছে রচিত। আজ··আজ হয়ত সেই ভূমিকম্প খনা! যে বিবাহে তোমার জীবনহানি অবধারিত, আমার জীবন থাক্‌তে সে বিবাহ আমি হ'তে দেব না—দেব না খনা!

খনা ॥ যদি আমার পিতামাতা এ বিবাহ চান?

মিহির ॥ আমি তা মান্‌বো না। অনুভব কর্তে পারি—অনুভব কর্তে পাচ্ছি আমি··জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন মনে হয় এবং তা মিথ্যা নয় যে, তোমার পিতামাতার চেয়েও আমি বড়··আমার জীবনে সেই মুহূর্তই হয়তো এসেছে। তাই আজ আমি সকল বাধা সকল বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রতে পারব তোমার জন্য।

খনা ॥ হ্যাঁ ভূমিকম্পই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আমার কি গতি হবে বলত? রাহুলকে না হয় তাড়ালে, কিন্তু তারপর?

মিহির ॥ সে আমি জানিনা খনা।

খনা ॥ তবে কি জানব আমি! এ কি সেই মুহূর্ত নয় মিহির যে মুহূর্তে তোমার মনে হ'চ্ছে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন পরিজন সবার চেয়ে বড়? তা যদি হয় আমার মনের দিকে···মুখের দিকে তুমি চাইতে বাধ্য—বাধ্য—

মিহির ॥ আমি কি বুঝছি না খনা···বুঝছি না খনা তুমি কি বলছ? কিন্তু তুমি হয়তো ভুলে গেছ,—হ্যাঁ ভুলেই গেছ খনা, আমি গোত্রহীন, গৃহহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিঃস্ব যুবক। এই রূঢ় সত্যিটি স্মরণ ক'রেও কি আমার সঙ্গে এমনি খেলা খেলবে তুমি?

খনা ॥ খেলা! যা হ'ল জীবন-মরণের কথা—মান-সম্মানের কথা—তাই হ'ল খেলা! বাঙলার সিংহ-বংশের এক কন্যাকে ভয়ে আত্মদান ক'রতে বাধ্য করবার জন্য আস্‌ছে লঙ্কার অনার্য্য রাক্ষস···তার নাম খেলা! ভারতীয় আর্য্য রক্তকে কলঙ্কিত, লাঞ্ছিত করবার জন্য উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে আসছে অনার্য্য রাক্ষস পার্শ্বে দণ্ডায়মান তুমি··· এক ভারত সন্তান—

মিহির ॥ ভারত সন্তান!

খনা ॥ হ্যাঁ তুমি ভারত সন্তান···নির্বিকার চিত্তে বলছ কিছু নয়, খেলা!

মিহির ॥ আমি ভারত সন্তান?

খনা ॥ হ্যাঁ, তুমি ভারত সন্তান?

মিহির ॥ কি ব'লছ খনা? মি কি ব'লছ খনা?

খনা ॥ জ্যোতিষ যা ঘোষণা করেছে তাই বল্‌ছি মিহির!

মিহির ॥ আমি ভারত সন্তান!

খনা ॥ তুমি ভারত সন্তান!

মিহির ॥ কে বলে?

খনা ॥ আমি। বহু বর্ষের সাধনায় আমি স্বয়ং রচনা করেছি তোমার জন্ম-পত্রিকা। যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য হয়, আমি ঘোষণা কচ্ছি তুমি ভারত সন্তান, ভারতবর্ষের পরম পবিত্র আর্য্য-বংশ জাত। পিতা তোমার বিশ্ববিখ্যাত মণীষী, মাতা তোমার সাক্ষাৎ ভগবতী।

মিহির ॥ সত্য! সত্য?

খনা ॥ অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মিহির ॥ খনা! খনা! তুমি যখন বলছ···তবে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নব জন্ম—আজ আমার নব-জন্ম। কোথায়···কোথায় আমার সেই জন্ম-পত্রিকা? কে···কে আমার পিতা....কে আমার মাতা?

খনা ॥ পিতৃ-পরিচয় লাভ ক'রবার সে শুভক্ষণ তোমার জীবনে এখনও আসে নি মিহির। যখন আস্‌বে···তোমার প্রশ্নের অপেক্ষা কর্ব্বনা।·· সেই হবে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত···কিন্তু তা আজ নয়।

মিহির ॥ কিন্তু খনা—কিন্তু খনা—

খনা ॥ বৃথা তুমি ব্যাকুল হ'চ্ছ মিহির! পিতৃ-পরিচয়ের জন্য শুভ মুহূর্তের যে অপেক্ষা ক'রতে হয়। জ্যোতিষের এ জ্ঞানটুকুও কি তুমি

হারালে ? (হঠাৎ কি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন) এ কি ! তিলক ! এমন কেন ? কি সর্বনাশ !

মিহির ॥ তিলক ! তাইতো ! উন্মত্ত রক্তাপ্লুত অসি হস্তে ছুটে আস্ছে—

কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে অবস্থিত তিলক উন্মত্ত
রক্তাপ্লুত অসি হস্তে ছুটিয়া আসিল।

খনা ॥ এ কি তিলক ! এ ভাবে তুমি—

তিলক নীরব রহিল।

কি করেছিস্ ! তুই কি করেছিস্ ?

তিলক ॥ রাহুলকে আমি বধ ক'রে এলাম দেবী !

খনা ॥ উঃ....কেন—কেন তিলক ?

তিলক ॥ তুমি তাকে কি ব'লেছ জানিনা। সে এখান থেকে গিয়ে একদল রাক্ষসকে ধর্মের দোহাই দিয়ে উত্তেজিত ক'রে—অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এখানে আস্‌ছিল, আর ঘোষণা করছিল "সিংহ-বংশের সিংহিনী আজ রক্ষ-বংশের দাসী হবে—কে দেখ্‌বে এস।" আমি তোমাকে রাজপুরীতে নিয়ে যেতে আস্‌ছিলাম। পারলাম না আমি তোমার সে লাঞ্ছনা সইতে। সোজা গিয়ে রাহুলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলাম···সে আমাকে কশাঘাত ক'রে হেসে উঠ্‌লো। অশ্লীল অভদ্র ভাষায় সে পুনরায় তোমায় লাঞ্ছিত ক'রল। সহ্য কর্‌তে পারলাম্ না, আমি ছুটে গিয়ে তার বুকে তোমার দেহরক্ষার এই অসি আমূল বিদ্ধ ক রে তার রসনা দিলাম চিরতরে স্তব্ধ ক'রে।

খনা ॥ তিলক ! তিলক ! তুমি আজ আমার জয় তিলক ! তারপর —তারপর তিলক ?

তিলক ॥ কথার সময় নেই দেবী ! উত্তেজিত রক্ষগণ তোমায় বন্দিনী ক'রতে ছুটে আসছে। এই নাও আমার অস্ত্র, রাহুলের রক্ত রঞ্জিত এই বিজয়-অস্ত্র ...আমি রক্ষ-বিদ্রোহের সংবাদ মহারাজকে জ্ঞাপন ক'রতে চললাম—যতক্ষণ না রাজসৈন্য এসে উপস্থিত হয়, যে প্রকারে পার আত্মরক্ষা ক'র।

খনাকে অসি দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মিহির ॥ এখ্‌খুনি তারা আস্‌বে। তোমার ঐ অসি আমায় দাও খনা—

খনা ॥ জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এই পুণ্য-পূত অসি আমি শুধু তারই হাতে তুলে দিতে পারি মিহির—যে ধর্মসাক্ষী ক'রে আমায় বুকে টেনে নিয়ে বল্‌বে, আমি তোমার ইহকালে —পরকালে—

মিহির ॥ খনা —খনা !

খনা ॥ হ্যাঁ, তারই হাতে,—শুধু তারই হাতে আমি দিতে পারি এই অসি···তা যদি না দিতে পারি···এ অসি নারীর দুর্বল হস্তেই শোভা পাবে —বলিষ্ঠ সবল পুরুষ তুমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বে।

মিহির ॥ খনা! ধর্মসাক্ষী ক'রেই বল্‌ছি খনা, দাও তোমার অসি··· আমার ভীরু প্রেমকে তুমি—তুমিই যখন দিলে সাহস, আর আমি ভয় করি না খনা। ঊর্দ্ধ্বের আকাশ—অন্তরের অন্তর্যামী—তিলকের অসি এবং রাহুলের রক্ত সাক্ষ্য রেখে আজ এই গোধূলি লগ্নে আমি তোমার পাণিগ্রহণ কর্‌লাম খনা!

তরবারি হইতে রক্ত লইয়া তদ্দ্বারা খনার সীমন্তে
সিঁদুর রেখা টানিয়া দিলেন, খনা তাহাকে
প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

খনা ॥ মিহির! প্রিয়তম! আর দেরী নয় এইবার তবে ছুটে চল—

মিহির ॥ কোথায়? কোথায়?

খনা ॥ সমুদ্রের বুকে—

মিহির ॥ কেন—কেন খনা?

খনা ॥ পিত্রালয়ের খেলা ভাঙলো। বধূ চল্‌লো স্বামীর হাত ধ'রে—শ্বশুরালয়ে—সমুদ্রের ওপারে···ভারতবর্ষে!—

মিহিরকে টানিয়া লইয়া খনা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল।
সানুচর রক্ষনায়ক বিশালাক্ষের প্রবেশ।

বিশালাক্ষ ॥ ঐ যে খনা···পালাচ্ছে, সাবধান!

রক্ষগণ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপে উদ্যত হইল। খনা ফিরিয়া আসিলেন।
পশ্চাতে আসিলেন মিহির। বিশালাক্ষের সম্মুখে গিয়া।

খনা ॥ কি চাও?

বিশালাক্ষ ॥ প্রতিশোধ—রাহুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

খনা ॥ অর্থাৎ আমার মৃত্যু চাও?

বিশালাক্ষ ॥ না। যত অসভ্যই তোমরা আমাদের মনে কর না কেন, স্ত্রী-হত্যা আমরা করি না।

খনা ॥ তবে?

বিশালাক্ষ ॥ রাহুলের অন্তিম-বাসনা আমরা ক'রব চরিতার্থ। সিংহ-বংশের সিংহিনী! দর্প আমরা তোমার ক'রব চূর্ণ। রাহুলের শবদেহের সঙ্গেই হবে তোমার বিবাহ—;

খনা ॥ শবদেহের সঙ্গে বিবাহ! চমৎকার! কিন্তু একটু বিলম্ব হ'য়ে গেছে সেনাপতি! বেশী নয়, সামান্য, বিবাহ আমার হ'য়ে গেছে!

বিশালাক্ষ ॥ বটে! কার সঙ্গে বিবাহ হ'ল শুনি?

খনা ॥ কুলত্যাগ ক'রে যার সঙ্গে অকূলে ভাস্‌তে যাচ্ছি—দেখ্‌ছো না?

বিশালাক্ষ প্রভৃতি ॥ মিহির

খনা ॥ মিহির!

বিশালাক্ষ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ওসব আমরা মানি না। (অনুচরদের প্রতি) বন্দী কর।

খনা ॥ বন্দী কর! বটে! উত্তম ফিরে চল মিহির—প্রাসাদে।

মিহির ॥ সে কি খনা····

খনা ॥ হ্যাঁ ফিরে চল প্রাসাদে। মূর্খের দল।····ওরা এসেছে আমাকে বন্দী ক'রতে। ভুলে গেছে যে আমি রাজকন্যা, সিংহল-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী। না তবে আর দ্বিধা নয় মিহির! ফিরে চল,—ফিরে চল প্রাসাদে।

মিহির ॥ কিন্তু—

খনা ॥ কিন্তু নয়। ফিরে আমাকে যেতেই হবে। কেননা, ওরা স্বাধীনতা চায় না। ওরা চায় চির-অধীনতা। ওরা চায়—আমি ফিরে গিয়ে ওদের শাসন করি, পেষণ করি, পীড়ন করি। শুধু আজ নয়—বংশ-পরানুক্রমে, চিরদিন—চিরকাল—

রক্ষগণ ॥ না, কখনো না—

খনা ॥ হ্যাঁ তাই। তা না হ'লে আমার অভাবে—সিংহ-বংশের উত্তরাধিকারীত্বের অভাবে—লঙ্কায় রাক্ষস-রাজত্বের হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা—এ কথা জেনেও কেন—কেন বাঙলার সিংহ-কন্যাকে বন্দনা করবার জন্য বন্দী ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে চায়? কেন? কেন?

রক্ষগণ ॥ না না, চাই না।

খনা ॥ সেনাপতি!

বিশালাক্ষ ॥ না, চাই না।

খনা ॥ তবে বিদায়।

মিহিরের হাত ধরিয়া সমুদ্রের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময়
অদূরে সামরিক বাদ্যসহ রাজ-সৈন্যগণের ধ্বনি শোনা গেল—
ক্রমে ক্রমে সেই ধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল।

সিংহলেশ্বর জয়তু!
সিংহলেশ্বর জয়তু!
সিংহলেশ্বর জয়তু!

বিশালাক্ষ ॥ (সাতঙ্কে) রাজসৈন্য!

রক্ষসৈন্যগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য—তাহারা পালাইতে যাইবে এমন সময়ে।

খনা ॥ রক্ষদল! বন্ধুদল! যদি দেশের স্বাধীনতা চাও, পালিয়ো না পালাতে দাও আমাকে। রাজসৈন্য এসে যদি দেখে তাদের রাজকন্যা রাজ্য ছেড়ে—সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে স্বামীর হাত ধরে'—স্বামীর ঘর ক'র্‌তে চল্‌লো চিরতরে—তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছুটে এসে আমায় ধরে' রাখ্‌বে।····বধূ হারাবে

স্বামীর ভিটা—তোমরা হারাবে স্বাধিকার, বুঝেছ—বুঝেছ কি বন্ধুদল ? যদি বুঝে থাক—জীবন পণ ক'রে স্বাধীনতার এই অপূর্ব সংগ্রামে ক্ষণেক দাঁড়াও শুধু ততক্ষণ-যতক্ষণ না আমরা সমুদ্রের ঐ দিক্‌চক্রবালে মিশে যাই চিরতরে বন্ধু—চিরতরে।

বিশালাক্ষ ॥ দেবী ! দেবী ! আজ তোমার এ কি রূপ দেখলাম দেবী ! নির্য্যাতিত-উৎপীড়িত-রক্ষকুলের মহিমময়ী মা ! তোমার সৈন্য আজ আমরা । (জানু পাতিয়া) আশীর্বাদ কর ।

খনা ॥ নির্ভয় হও । লঙ্কা স্বাধীন হোক ।

বিশালাক্ষ ও সৈন্যগণ নতজানু হইয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিল—খনা মিহিরের হাত ধরিয়া সমুদ্র-পথে ছুটিলেন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

* প্রথম দৃশ্য *

বরাহের পাঠগৃহ

সন্ধ্যা-রাত্রি

গান গাহিতে গাহিতে মদনিকা ও তরলিকা ধূপের ধোঁয়া দিয়া সন্ধ্যা-রাত্রিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল ।

তরলিকা ॥ সন্ধ্যায় অলকে
নীপ বাঁধি বল কে
বাতায়নে বসে একা নীরবে,

মদনিকা ॥ ধূপ-ধোঁয়া-গন্ধে
মন নাচে ছন্দে
জোছনায় একা ঘরে কি রবে !

তরলিকা ॥ আজি এই সন্ধ্যায়
কার পানে মন ধায়
বল দেখি মুখ খুলে বালিকা—

মদনিকা ॥ যেবা আসে স্বপনে
তারি গলে গোপনে
দেবো কবে তুলে মম মালিকা !

তর ॥ কি সুন্দর জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।

মদ ॥ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বিভাবরী বিষধরি ভোগস্য ভিমোমনিঃ—

তর ॥ সে আবার কি ?

মদ ॥ ওকি চাঁদ না সূর্য্য ?

তর ॥ সন্ধ্যারাতে সূর্য্য ?

মদ ॥ তাইত, তবে চাঁদই। না, তাও নয়। চন্দ্রের কিরণ ত এত প্রখর নয়। ও দাবানল সখি, দাবানল !

তর ॥ দাবানল আকাশে ? সে কি সখি ?

মদ ॥ তবে বজ্র।

তর ॥ কিন্তু আকাশে মেঘই বা কই ?

মদ ॥ হ'য়েছে সখি হ'য়েছে। রাত এলেই বিরহিণীদের কি মনে হয় জান ? মনে হয় এ রাত নয়, যেন সাপ, আকাশের ঐ যে চাঁদ সে ঐ সাপেরই মণি !

তর ॥ এ কবিত্বের কাছে কালিদাসও পরাজয় স্বীকার ক'র্‌বেন সখি !

মদ ॥ ছিঃ সখি, (কালিদাসের উদ্দেশে নমস্কার) ও কথা মুখে আনলেও পাপ হয়। এ যে তাঁরই শ্লোক !

তর ॥ মাভৈঃ ! মাভৈঃ !

মদ ॥ কাকে ব'লছ সখি ?

তর ॥ তোমাকেও আর ঐ যে লোকটি হন্তদন্ত হ'য়ে এদিকে ছুটে আস্‌ছে … ওকেও।

মদ ॥ (তাহাকে দেখিয়া সোল্লাসে) সখি ! সে আস্‌ছে…ছুটে আস্‌ছে—

তর ॥ মাভৈঃ ! মাভঃ !—

ছুটিয়া পুঁথিহস্তে কামন্দকের প্রবেশ।

কামন্দক ॥ রক্ষ মাং—রক্ষ মাং—

তর ॥ মাভৈঃ… মাভৈঃ… ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?

কাম ॥ (পশ্চাতে অবলোকন করিতে করিতে) বিষম। ভীষণ ! ভয়ানক ! পুঁথিগুলি ধর তরলিকা !

তর ॥ (পুঁথি লইয়া) মদনিকা !

ব্যজন করিতে ইঙ্গিত।

মদ ॥ (ব্যজন করিতে করিতে) ভয় পেয়েছেন ?

কাম ॥ আমি পুঁথিগুলি নিয়ে শাস্ত্রালোচনার জন্য তোমাদের এখানে আস্‌ছিলাম—হঠাৎ ঐ বাড়ির সম্মুখে এক হস্তিনী—

তর ॥ হস্তিনী ?

কাম ॥ মাভৈঃ—স্ত্রীলোক। শুঁড় নয়, হাত দিয়ে ইসারায় আমায় ডাক্‌লো। কাছে গিয়ে দেখি—কাঁদ্‌ছে। জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি ?

তর ॥ কি বল্‌লো ?

কাম ॥ "হে পান্থ পুস্তককর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠ
বৈদ্যোঽসি কিং গণিতশাস্ত্রবিশারদোঽসি।
কেনৌষধেন বদ, পশ্যতি ভর্ত্তুরম্বা
কোঽহ্যাগমিষ্যতি পতিঃ সুচির প্রবাসী ॥

আমার হাতে পুঁথি দেখেই ধরে' নিয়েছে আমি হয় বৈদ্য না হয় জ্যোতির্বিদ এবং তাই সকাতরে তার অনুনয়, যদি বৈদ্য হও, তবে বল, কোন্ ঔষধি দ্বারা আমার ভর্ত্তুরম্বা কিনা আমার শাশুড়ীর কাণা চোখ ভাল হয়! আর যদি জ্যোতির্বিদ হও তবে গণনা ক'রে বল, আমার দীর্ঘকাল প্রবাসী পতি কতদিনে গৃহে আগমন ক'রবেন। অর্থাৎ—

মদ ॥ অর্থাৎ ?—

কাম ॥ আমার শাশুড়ী কাণা, চোখে দেখ্‌তে পাননা—পতিও প্রবাসে। অতএব—

তর ॥ অতএব ?—

কাম ॥ ব'লেই হাত ধরে' টানাটানি। একটি ফুৎকারে তার হাতের প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে—

তর ॥ এখানে এলেন ? এসে ভালই করেছেন। সখীও এখানে বড়ই বিপন্না। এ গৃহে আর কেউ নেই, মাত্র আমরা দু'টি অবলা। একটি মাত্র ভৃত্য। সে কাণা নয়, বোবা।

কাম ॥ কেন, আচার্য্য ? আচার্য্যাণী ?

মদ ॥ বাবা আর মা উভয়েই রাজপুরীতে আরতি দর্শন ক'রতে গেছেন ; শুধু আছে ঐ ভৈরব।

কাম ॥ প্রহরী তবে র'য়েছে ?

মদ ॥ ওর ভয়েই তো মরি।

কাম ॥ কেন ? কেন ?

মদ ॥ ও যেন একটা মূকদৈত্য····ক্রীতদাস বটে, কিন্তু কি জানি কেন, ওকে দেখলেই আমার গা শিউরে ওঠে !

কাম ॥ আমারও। ও রকম কুৎসিত বীভৎস ক্রীতদাস, তোমাদের মত সুন্দরীর পার্শ্বে যখন এসে দাঁড়ায়....চন্দ্রগ্রহণ লেগে যায়। ও বৃদ্ধ হ'য়েছে···· আচার্য্যদেব ওকে মুক্তি দেন না কেন ?

মদ ॥ ও মুক্তি চায় না।

তর ॥ ঐ যে দূরে ওর ছায়া দেখ্‌লাম।

মদ ॥ প্রভুর অনুপস্থিতিতে প্রভু-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ ক'রছে, কিন্তু ওর কাণ্ড দেখ্‌লে বোঝা শক্ত, ও আমাকে রক্ষণ ক'র্‌বে না ভক্ষণ ক'র্‌বে!

কাম ॥ তবু ভাল ও বোবা! নইলে ওর অভিযোগ আর অভিশাপে অন্ততঃ আমি ভস্ম হ'য়ে যেতাম!

তর ॥ আকারে-ইঙ্গিতে ও বাচালের চেয়েও বাক্‌পটু।

মদ ॥ হ্যাঁ সখি! আমার ভয়ই হ'চ্ছে। ও হয়ত পিতার নিকট অভিযোগ ক'র্‌বে আমরা বিশ্রম্ভালাপ ক'রছি।

তর ॥ অর্থাৎ সখি বল্‌ছে, বিশ্রম্ভালাপের চেয়ে কোন গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হবার ব্যবস্থা করুন।

কাম ॥ না, না, না,—এসো আমরা শাস্ত্রালোচনা করি। আচার্য্যদেব এসে তো দেখ্‌লে প্রীত হবেন।

মদ ॥ আমাকে কবিতা রচনা শিক্ষা দিন্।

কাম ॥ কবিতা? আচ্ছা, তবে শোন—

"কবিতা বণিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা
বলাদাকৃষ্যমানাচেৎ সরসা বিরসায়তে।"

কবিতা এবং বণিতা ইহারা উভয়েই স্বেচ্ছায় আগমন ক'র্‌লেই সুখপ্রদ হয়। বলাৎকারে ইহাদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়--

"কবিতা কোমল বণিতা রসেন রসিতা
রসয়তি রসিকং যদি স পততি কঠিন হৃদয়ে
ভবত্যলগ্না প্রতিপদ ভগ্না।"

কবিতা এবং কোমল-বণিতা উভয়েই রসবতী, উভয়েই রসিক ব্যক্তিকে পরম প্রীতিদান করে। কিন্তু অরসিকের হস্তে পতিত হ'লে প্রতি পদে দুরবস্থাপন্ন হয়। বুঝ্‌লে?

তর ॥ সখীর পরম সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় রসিকের হস্তেই—

কাম ॥ বল কি তরলিকা, বল কি?

তর ॥ সখীর কবিতা শিক্ষা হ'চ্ছে।

মদ ॥ (তরলিকার প্রতি কৃত্রিম কোপে) যাঃ!—(বলিয়াই মুখ ঢাকিল)

কাম ॥ কালিদাস বলেন—

"অচুচুরচ্চারু চকোর লোচনা
শ্রিয়ং কিমিন্দোরথবাম্বু জন্মনঃ
যতোজনঃ কশ্চনবীক্ষ্যতে যদা
পিধায় গোপয়তি চাননং তথা।"

তর ॥ অর্থাৎ?

কাম ॥ ঐ যুবতী বোধ হয় চন্দ্রমার জ্যোতি অথবা নলিনীর শোভা

অপহরণ করেছে। নতুবা মুখ ঢাকে কেন?

মদনিকা অধিকতর লজ্জায় মস্তক আবৃত করিয়া বসিল।

কালিদাস বলেন—

"মধ্যং হরিণাং নয়নং মৃগীনাং
জহার সা চারুরুতং পিকীনাম্
নচেদমীষাং কথ মায়তাক্ষী
সদৈব সংকোচন মাতনোতি।"

বোধ হয় সুন্দরীগণ সিংহের কটিদেশ, হরিণের নয়ন এবং কোকিলের স্বর অপহরণ ক'রেছে। নতুবা—(মদনিকাকে দেখাইয়া) ওরূপ কেন?

তর ॥ সখী রাগ ক'রেছে।

কাম ॥ তবে আমি নই—কালিদাস কি বলেন শোন—

"কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষী
সোহস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত পূর্বমুচ্চৈ-
র্দন্তক্ষতং মম সমর্পয় চুম্বনঞ্চ।"

হে পঙ্কজাক্ষী! তোমার মনে যদি আমার প্রতি ক্রোধ হ'য়ে থাকে তবে আমি তোমায় যা দিয়েছি, তুমি আমায় তা ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আমার আলিঙ্গন—আমার চুম্বন।

ভৈরবের প্রবেশ ও সকলকে অবলোকন করিয়া প্রস্থান।

কাম ॥ (ভৈরবকে দেখিয়াই) এরূপ কলহ হবেই কিনা?

"মঙ্গলস্য দশয়াস্তু কলহো বন্ধুভিঃ সহ।"

আর এই যে অকস্মাৎ ভয়, এই যে মনস্তাপ তার কারণ বৃহস্পতির দশায় রাহুর অন্তর্দশা, কিনা—

তর ॥ নিন্, আর কথায় কাজ নেই। ঠাকুর ঠাকুরাণীর আস্‌বার সময় হ'য়েছে।

কাম ॥ এরূপ জ্যোতিষ-চর্চ্চা হ'চ্ছে দেখ্‌লে আচার্য্যদেব সুখীই হবেন—সুখীই হবেন।

নেপথ্যে বরাহ ॥ ভৈরব! ভৈরব!

তর ॥ ঐ আচার্য্যদেব!

মদনিকা সভয়ে উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল।

আমার বড় জল পিপাসা পেয়েছে—আস্‌ছি (পলায়ন)

কাম ॥ তাই ত আমারও যে কি একটা—ও ভাল কথা মনে পড়েছে—আমি জ্যোতিষ-গ্রন্থই ভুলে' ফেলে এসেছি। সেগুলি বাড়ি থেকে নিয়ে আস্‌ছি।

বাতায়ন-পথে পলায়ন।

মদ ॥ তা হ'লে আমিও বরং—

পলায়নে উদ্যত এমন সময় নেপথ্যে বরাহ ডাকিল—"মদনিকা!"
মদনিকা শয্যায় পড়িয়া ঘুমের ভান করিল। বরাহের প্রবেশ।

পরে ধরণী ও ভৈরবের প্রবেশ।

বরাহ ॥ মদনিকা এইখানে নিদ্রাভিভূতা?

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল তাহা নহে।

হাঁ, ঐ যে—

ভৈরব শয্যাপার্শ্বে গিয়া নতজানু হইয়া মদনিকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ধরণী ॥ ভৈরব!

ভৈরব ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল।

ধরণী ॥ তুমি আমার মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িওনা।

বরাহ ॥ কেন? কেন?

ধরণী ॥ মেয়ে ওকে ভয় পায়। ওর চেহারার দিকে চাইলে তার মাথা ঘোরে। একদিন মূর্চ্ছাও গিয়েছিল। ভৈরব! তোমাকে পূর্বেও কতদিন বলেছি—আজও বল্‌ছি—তুমি ওর সম্মুখে যেয়ো না। তোমার ছায়া যেন ওর গায়ে না লাগে। বুঝলে?

ভৈরব মনে ব্যথা পাইল কিন্তু আদেশ পালন করিবে সম্মতি জানাইল।

বরাহ ॥ তরলিকা—সে কোথায়? ভৈরব, তরলিকাকে ডাক।

ভৈরবের প্রস্থান।

ধরণী ॥ আমি বলি আর কেন? ভৈরব বৃদ্ধ হ'য়েছে ওকে এখন মুক্তি দাও।

বরাহ ॥ ও মুক্তি চায় না।

ধরণী ॥ ক্রীতদাস মুক্তি চায় না অদ্ভুত কথা। ওর হয়তো কোন দুরভিসন্ধি আছে। সেই জন্যই তাকে বিতাড়ন করা আরো বেশী প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রভু!—

বরাহ ॥ দুরভিসন্ধি! ভৈরবের দুরভিসন্ধি! হাঁ-না-তা (সহসা) এতকাল আমাদের সেবা ক'রেছে, মায়ায় বদ্ধ হ'য়েছে, তাই ও মুক্তি চায় না।

বেদীর উপর রক্ষিত পুস্তকগুলি দেখিতেছিলেন হঠাৎ চমকিয়া।

এ কি! শৃঙ্গার-তিলকম্! এ গ্রন্থ কে পড়ছিল! মদনিকা! এ গ্রন্থ এখানে এলই বা কি ক'রে!

ধরণী ॥ ও সব প্রশ্নের চেয়ে আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দাও প্রভু···

বরাহ ॥ কি ?

ধরণী ॥ কন্যার বয়স কত হ'ল স্মরণ হয় ?

বরাহ ॥ যতই হোক ; কিন্তু তাই ব'লে—এই শৃঙ্গার-তিলকম্ ! এ গ্রন্থ এখানে এলো কি ক'রে ?

ধরণী ॥ ও গ্রন্থটা নিয়েই বা তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ? ওতে কি আছে ?

বরাহ ॥ তোমারই বা সে প্রশ্ন কেন ? কন্যার বিবাহের কথা বল্‌ছিলে, তাই বল—

ধরণী ॥ তা শুন্‌ছ কই ? কন্যার কৈশোর তো গেছেই—যৌবনও যে যায়—

বরাহ ॥ হ্যাঁ, আমি পাত্র দেখ্‌বো।

ধরণী ॥ পাত্র ত চোখের ওপরেই র'য়েছে।

বরাহ ॥ কে ?

ধরণী ॥ ঐ কামন্দক।

বরাহ ॥ কামন্দক ব্রাহ্মণ ?

ধরণী ॥ তোমার কন্যা বুঝি চণ্ডাল ?

বরাহ ॥ ও হো হো—তাইতো ! এই গ্রন্থখানা আমার বুদ্ধি বিলোপ ক'রেছে, এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তরলিকা ও পশ্চাতে ভৈরবের প্রবেশ।

(তরলিকাকে) এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তর ॥ কি গ্রন্থ পিতা ?

বরাহ ॥ নাম না হয় নাই শুন্‌লে। এইখানা—এইখানা —

তর ॥ দেখি···

বরাহ ॥ দেখ্‌ছ না ? এইখানা—

তর ॥ নাম না জেনে. পুঁথি না দেখে····কি ক'রে বল্‌বো পিতা ?

বরাহ ॥ (ধরণীকে) পুস্তকখানা অগ্নিদগ্ধ ক'র্‌বে, আজই····এখনই—

ধরণী ॥ (পুঁথিখানা লইয়া) ওগো মেয়ে কি তোমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল ? মেয়ে যা চাইবে, তুমি তা দেবেনা ; যা চাইবে না, তুমি তাই দেবে। কেন ?

বরাহ ॥ দাও, আমাকেই দাও ! (পুঁথিখানা লইয়া ভৈরবকে) এটা অগ্নিদগ্ধ ক'রবে····নাও।

ভৈরবের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভৈরব লইয়া প্রস্থানোদ্যত।

মদ ॥ (কৃত্রিম নিদ্রা হইতে উঠিয়া) মা ! মা ! কী ভীষণ এক দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লাম মা !

ধরণী ॥ কি স্বপ্ন মা ?

মদ ॥ দেখ্‌লাম কি একখানা গ্রন্থ আগুনে পুড়্‌ছে—সেই সঙ্গে আমিও—আমিও—(ক্রন্দন)।

ধরণী ॥ (মদনিকাকে বুকে লইয়া) ওরে····ওরে কি সর্বনাশ !

ভৈরব মদনিকার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বরাহের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া পুঁথিখানি যাহাতে না পোড়ান হয় তাহার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল।

বরাহ ॥ (ভৈরবকে) আচ্ছা দাও।

ভৈরব মহাখুসি হইয়া বরাহের পদতলে পুঁথি রাখিল। চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল।

এ গ্রন্থ আজ রক্ষা পেল, তোমাদের ক্রন্দনে নয়। ভৈরবের প্রার্থনায়। [পুঁথি লইয়া প্রস্থান]

ধরণী ॥ এতদূর ! তোমার কাছে আমাদের মূল্য এইটুকু ? (মদনিকাকে বুকে লইয়া) আয় মা,—(তরলিকাকে) আয়—

তর ॥ কোথায় মা ?

ধরণী ॥ আমার পিত্রালয়ে ·যেখানে কন্যার আদর আছে····ভৃত্য যেখানে সর্বস্ব নয়।

মদ ॥ চল মা—

ভৈরব তাহাদের সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে যাইতে নিষেধ করিল।

ধরণী ॥ (ভৈরবকে) তুমি থাক্‌তে আমরা আর এখানে ফির্‌ছি না।

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল সে-ই যাইতেছে। কাঁদিতে লাগিল। মদনিকাকে শেষ দেখা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল।

ধরণী ॥ আমাদের কথায় যে গেল তা যেন উনি না জানেন। ক্রীতদাস পালিয়েও ত যেতে পারে !

নেপথ্যে বরাহ ॥ ভৈরব ! ভৈরব !

ধরণী ॥ আমি গিয়ে শেষ রক্ষা কর্‌ছি। [প্রস্থান]

মদ ॥ আপদ দূর হ'ল।

তর ॥ আহা বেচারা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে গেল !

মদ ॥ কষ্ট যে না হ'চ্ছে তা নয় তরলিকা ! ভৈরব আমার সেবা ক'রবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ফিরত—কিন্তু—যাক্‌····

তর ॥ চল·সখি মা'র কাছে চল।

মদ ॥ না সখি সে আবার আসতে পারে।

তর ॥ এত রাত্রে ?

মদ ॥ তাকে সাবধান ক'রবার জন্যই আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে।

তর ॥ শুধু শুধু ব'সে থাক্‌বি ?

মদ ॥ ঐ পুঁথিখানা পেলে হ'ত। তরলিকা, যদি কোনমতে পারিস্‌—ঐ পুঁথিখানা—বুঝলি। (ইঙ্গিত)

তর ॥ দেখ্‌ছি—

মদ ॥ এই পথে সে পালিয়েছে, হয়ত এই পথেই সে ফিরবে। বড় ঘুম পাচ্ছে—

তর ॥ তবে শোবে চল—

মদ ॥ তুই গিয়ে শো— আমি আজ সারারাত জেগে শাস্ত্র পড়বো।

তর ॥ হ্যাঁ শাস্ত্রই পড়—কিন্তু প্রেমে প'ড়োনা সখি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

মদনিকা ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চোরের মত ভৈরব প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল। পরে শয্যার কিছু দূরে বসিয়া মদনিকাকে ব্যজন করিতে লাগিল। বরাহ প্রবেশ করিয়াই এই দৃশ্য মুগ্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া দেখিলেন। পরে ভৈরবের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন।

বরাহ ॥ ভৈরব !

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া ব্যজনি রাখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ওঠ ভৈরব, তুমি মদনিকাকে নিয়ে আজই এদেশে থেক পালিয়ে যাও—দূরে—দূরে—বহুদূরে, তোমার এ কষ্ট আমি আর সইতে পারিনা—ভৈরব।

ভৈরব অস্বীকার করিল। জানাইল—না—

হাঁ ভৈরব, আমি মদনিকাকে জাগরিত ক'রে আর আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে····উভয়ের নিকট এই মিথ্যাচার প্রকাশ করি। ভৈরব! ভৈরব! এ মিথ্যাচার যে তোমাকেই শুধু বেদনা দেয়—তা নয়—আমাকেও—আমাকেও—

ধরণীর পুনঃ প্রবেশ।

ধরণী ॥ একি ? ভৈরব! আবার !

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

ধরণী ॥ ও নিশ্চয়ই আমাদের কোন সর্বনাশ ক'রবে! ওর লক্ষণ ভাল নয়।

বরাহ ॥ ভুল—ভুল ধরণী! ক্রীতদাসেরা প্রভুর জন্য অমানুষিক আত্মত্যাগ করে। ব'স ধরণী, ওদের আত্মত্যাগ যে কতদূর ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, আমি বলছি শোন—

ধরণী ॥ গল্প শোনবার কি এই সময়? [প্রস্থানোদ্যতা]

বরাহ ॥ তোমার সঙ্গে আমি পণ রাখলাম ধরণী, এ গল্প শুনে তুমি আতঙ্কে কেঁপে উঠবে।

ধরণী ॥ গল্প শুনেই আতঙ্কে কাঁপবো?

বরাহ ॥ পরিহাস নয়—হয়তো পরে মূর্চ্ছাও যেতে পারো, অথবা ...অথবা —তার চেয়ে আরও কিছু ভীষণ—

ধরণী ॥ (হাসিয়া) বল। না দাঁড়াও, কি পণ?

বরাহ ॥ সাধ্য মত যে কোন পণ—যে কোন পণ—

ধরণী ॥ বেশী কিছু নয়, আমি যদি হাসি-মুখেই এ গল্প শুনে যেতে পারি, তাহ'লে সাতদিন তুমি জ্যোতিষ-চর্চ্চা বন্ধ ক'রে ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকবে।

বরাহ ॥ সাতদিন কেন? চিরজীবন জ্যোতিষ-চর্চ্চা ছেড়ে দেব। তুমি শোন—

ধরণী ॥ বল—বল—

বরাহ ॥ এই ধর, কোন রাজার আমারই মত এক বৃদ্ধ সভাপণ্ডিত ছিল।

ধরণী ॥ কিন্তু সেই পণ্ডিতের আমার মত কোন স্ত্রী ছিল না নিশ্চয়!

বরাহ ॥ হ্যাঁ, স্ত্রী ছিল এবং তাঁরা আমাদেরই মত প্রথম-জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন।

ধরণী ॥ পরেও কোন সন্তান হ'ল না?

বরাহ ॥ হ'ল—সেই কথাই বলছি। যেদিন হ'ল সেইদিনই সেই পণ্ডিত ঐ ভৈরবের মত এক ক্রীতদাস দম্পতী ক্রয় করেন।

ধরণী ॥ মিলছে! ভৈরবের মতই সে ক্রীতদাসের স্ত্রী মারা গেল নাকি?

বরাহ ॥ হ্যাঁ, মারা যায়—সন্তান প্রসবকালে।

ধরণী ॥ সন্তান প্রসবকালে! কিন্তু ভৈরবের তো তা নয়। শুনেছি—

বরাহ ॥ শোন বলছি। ক্রীতদাস তখন সেই সদ্যজাতা কন্যা নিয়ে মহা বিব্রত হ'য়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি সেইদিনই সেই সভাপণ্ডিতের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীও এক পুত্র প্রসব করে।

ধরণী ॥ মিললো না। আমি প্রসব ক'রলাম এক কন্যা!

বরাহ ॥ শোন বলছি। সভা পণ্ডিত জ্যোতিষ চর্চা ক'রতেন। তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'লেই তিনি জাতকের আয়ু গণনা ক'রে দেখেন, জাতকের আয়ু মাত্র এক বৎসর।

ধরণী ॥ তুমিও কি তোমার সন্তানের আয়ু সেই রাত্রেই গণনা ক'রেছিলে ?

বরাহ ॥ ক'রেছিলাম। আমিও ক'রেছিলাম। তারপর পণ্ডিত কি ভাবলেন জান ?

ধরণী ॥ কি ?

বরাহ ॥ তাঁর পুত্রের আয়ু যখন মাত্র এক বৎসর, তখন আর ঐ বৎসরায়ু সন্তানকে লালন পালন ক'রে মায়াবদ্ধ হওয়া কেন ? তিনি সেই সদ্যজাত শিশুকে তাঁর প্রসূতির অজ্ঞানাবস্থাতেই এক তাম্র পাত্রে রক্ষা ক'রে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

ধরণী ॥ উঃ, কি নিষ্ঠুর ! পিতা হয়ে কি ক'রে তা পারলো ?

বরাহ ॥ তুমি এখনই বিচলিত হ'চ্ছ ধরণী !

ধরণী ॥ না না, কিন্তু সেই শিশুর মাতা ? জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন তার স্বামীর এই নিষ্ঠুরতা জানতে পারল··· তখন ?

বরাহ ॥ তিনি তো জানতে পারলেন না।

ধরণী ॥ জানতে পারলেন না ? তার অর্থ ?

বরাহ ॥ পত্নীকে প্রবোধ দেওয়া যাবে না ভেবে সেই পণ্ডিত বিষম ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। তিনি ছুটে গেলেন তার সেই ক্রীতদাসের গৃহে।

ধরণী ॥ কেন ?

বরাহ ॥ গিয়ে ক্রীতদাসের বুক থেকে কেড়ে আনলেন ক্রীতদাসের সেই কন্যা—

ধরণী ॥ তারপর বুঝি ক্রীতদাসের সেই কন্যাকে তাঁর স্ত্রীর বুকে—

বরাহ ॥ রাখলেন।

ধরণী ॥ তুমি ব'লছ কি স্বামী ?

বরাহ ॥ স্ত্রীর যখন জ্ঞান হ'ল, তখন তিনি জানলেন, তার পুত্র হয়নি। হয়েছে ঐ কন্যা।

ধরণী ॥ কি সর্বনাশ—আর সেই ক্রীতদাস ?

বরাহ ॥ ক্রীতদাস প্রথমটায় খুবই দুঃখিত হ'য়েছিল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় সে তার চোখের জল মুছে ফেললো। শুধু তাই নয়। পণ্ডিত সেই ক্রীতদাসকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, সে এ ঘটনা জীবনে কারো নিকট প্রকাশ ক'রবে না। এমন কি ঐ কন্যার নিকটও না।

ধরণী ॥ তার ফলে ? তার ফলে ?

বরাহ ॥ তার ফলে সেই ক্রীতদাসের কন্যা পণ্ডিতের কন্যারূপেই মানুষ হ'ল। প্রকৃত ঘটনা জানলেন পৃথিবীতে মাত্র দুইটী প্রাণী। আমি আর তিনি।

ধরণী ॥ (বিষম চাঞ্চল্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) তুমি ? তুমি ?

বরাহ ॥ (সামলাইয়া লইয়া) আমি আর সেই পণ্ডিত।

ধরণী ॥ (সন্দিগ্ধচিত্তে) আর সেই ক্রীতদাস ?

বরাহ ॥ হ্যাঁ, আর সেই ক্রীতদাস।

ধরণী ॥ তোমাকে তারা একথা ব'ল্‌লো কেন ?

বরাহ ॥ (নীরব রহিলেন। কিন্তু এ নিস্তব্ধতা তাঁহার অসহ্য হইল) তবে সত্য কথা শুনবে ধরণী ? এ মিথ্যা আমি আর সইতে পারিনা—সইতে পারিনা—

ধরণী ॥ কি মিথ্যা ? কি মিথ্যা স্বামী ?

বরাহ ॥ (বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বে বক্তব্য বলিবেন কি বলিবেন না ঠিক করিতে পারিলেন না) ঐযে ম—দ—নি—কা—

ধরণী ॥ বল, ওগো বল ! আমার সর্বশরীর আতঙ্কে কাঁপছে। ঐ যে মদনিকা—

বরাহ ॥ চীৎকার কোরনা—ও জেগে উঠবে।

ধরণী ॥ তুমি বল—তুমি বল ! ঐ মদনিকা—

বরাহ ॥ (নীরব)

ধরণী ॥ ওকি আমার নয় ? যে আমার ছিল তাকে কি তুমি—

বরাহ ॥ (কি বলিবেন বুঝিলেন না। একটা আর্তনাদের মধ্য দিয়া) ধরণী ! ধরণী !

ধরণী ॥ (সক্রন্দনে) বল—বল—যে আমার ছিল তাকেই কি তুমি সহস্তে নদীর জলে—ও—হো—হো—বল—

বরাহ ॥ (বুঝিলেন ধরণী মূর্ছিতা হইতে পারেন, চেষ্টা করিয়া হাসিয়া) হা-হা—হা মিথ্যা—মিথ্যা ! আমি এতক্ষণ যা বল্‌লাম, তার প্রত্যেকটী অক্ষর মিথ্যা। আমি ছল করে পণে জিতলাম।

ধরণী ॥ সত্য ? এই কথাই সত্য ?

বরাহ ॥ এই কথাই সত্য। (হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধতা)

ধরণী ॥ (বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহা বিশ্বাস করিল) তাই বল। কিন্তু এ রকম প্রাণান্তকর ছলনা কি মানুষে করে ? এখনও আমার বুক কাঁপ্‌ছে—ছিঃ ! ছিঃ !—আমি এখনই ঠাকুর প্রণাম ক'রে আসছি। [প্রস্থান]

বরাহ ॥ (বাতায়ন পার্শ্বে গিয়া চাপা গলায়) ভৈরব !

ভৈরবের প্রবেশ। সে বরাহের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি পারলাম না ভৈরব ! বল্‌তে আমি চেয়েছিলাম,—কিন্তু আমার কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এল !

ভাবাবেগ লুকাইবার জন্য বাহিরে পালাইলেন।

ভৈরব মদনিকাকে দেখিতে লাগিল। তাহার বেদীপ্রান্তে সস্নেহে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিল—পিতা যেমন সন্তানের দেহে হাত বুলায়।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

উজ্জয়িনী পথ

পথিক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে

সম্মুখ পানে চল্‌রে ভোলা—
মনের-মাণিক খুঁজতে হ'লে সইতে হবে ঝড়ের দোলা
খেলুক তড়িৎ, আসুক না ঝড়
চলার পথে করিস্‌নে ডর—
হয়তো পথের শেষে পথিক, রতন দিয়ে ভরবি ঝোলা [প্রস্থান]

মিহির ও খনার প্রবেশ।

মিহির ॥ নিষ্ঠুরা নারী! আর কত দিন এ খেলা আমার সঙ্গে খেল্‌বে? আর যে আমি ধৈর্য্য ধ'রতে পারছি না খনা! দেশের পর দেশ, পর্বতের পর পর্বত, নদীর পর নদী পার হ'য়ে এলাম, কিন্তু কোথায়—কোথায় আমার জন্মভূমি?

খনা ॥ তোমার কষ্ট হ'চ্ছে মিহির?

মিহির ॥ ভারতবর্ষের কি শেষ নাই খনা?

খনা ॥ তাতে কি তোমার দুঃখ হ'চ্ছে মিহির? আমার হচ্ছে গর্ব।

মিহির ॥ গর্ব?

খনা ॥ হ্যাঁ গর্ব। আমাদের দেশ··· সে কত বড় দেশ। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত··· পথ চলেছি, দেহ অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে···তবু কি এই ভেবে আনন্দ হ'চ্ছে না যে আমরা আমাদের দেশের একাংশও অতিক্রম করিনি?

মিহির ॥ আনন্দই হয়েছে খনা। দুস্তর সাগর দেখে দুঃখিত হইনি। মনে করেছি আমার জন্মভূমির সাগর—সাগরই, এতটুকু নদী নয়। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত লঙ্ঘন ক'রবার সকল কষ্ট আমরা হাসিমুখে বরণ করেছি। মনে করেছি··· আমার জন্মভূমির পর্বত, মাটীর স্তূপ নয়। আমার দেশের যা কিছু আছে, সবই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার মাঝেও আমার সূতিকাগার····আমার স্বর্গ। কোথায় আমার সেই স্বর্গ?

উদ্‌ভ্রান্তা এক নারীর প্রবেশ।

নারী ॥ স্বর্গ! স্বর্গ ছিল আমার বুকে····এখন সে আমার বুকে

ঘুমিয়ে পড়তো। স্বর্গ ছিল আমায় ঘরে যখন সে আমার ঘরে খেলা করতো। স্বর্গ ছিল আমার মুখে···যখন সে আমার মুখে চুমো খেত।

খনা॥ কে মা, কে?

নারী॥ শোননি তার কথা? সে যখন হাস্‌তো তখন মাণিক ঝরতো। যখন হাঁট্‌তো মনে হতো মাটীর বুকে পদ্ম ফুটেছে···শোন নি তার কথা?

মিহির॥ আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। কে মা? সে কে?

নারী॥ সে ছিল আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো! কখনও কি তা দেখ নি?

মিহির॥ তোমার পুত্র!

নারী॥ লোকে বলে পুত্র. কিন্তু পুত্র বললেই কি সব বলা হ'ল? সে যে ছিল আমার চোখের মণি, বুকের মাণিক!

খনা॥ কোথায় সে?

নারী॥ খেল্‌তে খেল্‌তে পালিয়ে গেল। লোকে বলে চোর চুরি ক'রেছে! আমারও তাই মনে হয় মা! আমারই মনে হ'ত তাকে চুরি ক'রে ধরে' রাখি। আর খুঁজে পেলাম না। কি করেই বা খুঁজবো? চোখে আলো নেই—বুকে আশা নেই—মনে ভরসা নেই—কি ক'রে খুঁজবো?

খনা॥ রাজদ্বারে সংবাদ দিয়েছ মা?

নারী॥ সে কি মা?

খনা॥ রাজাকে জানিয়েছ?

নারী॥ রাজা আমি চিনি না মা!

খনা॥ তবে এস মা আমাদের সঙ্গে এস—উজ্জয়িনী চল—

নারী॥ হ্যাঁ মা, চল। দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। চল মা চল—

মিহির॥ (খনাকে) কোথায়?

খনা॥ তোমার সূতিকাগারে—তোমার স্বর্গে।

মিহির॥ উজ্জয়িনী?

খনা॥ হ্যাঁ উজ্জয়িনী।

মিহির॥ তবে এস মা—তুমি হারিয়েছ পুত্র—আমি হারিয়েছি পিতা-মাতা! চলে এস রাজদ্বারে—আমি গণনা ক'রে ব'ল্‌ব কোথায় তোমার সন্তান! এই গণনাতেই—এই গণনাতেই আমি বিশ্ব বিশ্রুত বিক্রমাদিত্যের সভায় আত্ম-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে খুঁজে বের ক'রব—কে আমার পিতা। হ্যাঁ খনা, সন্ধান যখন পেয়েছি—এই উজ্জয়িনী আমার জন্মভূমি—সহস্র লোকের মধ্যেও আমি তাঁকে চিনবো—আর তিনি—তিনিও কি আমায় চিন্‌বেন না খনা?

সকলের প্রস্থান।

---

* তৃতীয় দৃশ্য *

বিক্রমাদিত্যের বিশ্রামাগার

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিশ্রাম করিতেছিলেন ; নর্তকীগণ।
লাস্যনৃত্যে—সম্রাটের চিত্তবিনোদন
করিতেছিল। নৃত্যান্তে বরাহের প্রবেশ।

বরাহ ॥ সম্রাট !

বিক্র ॥ জ্যোতিষার্ণব !

বরাহ ॥ হ্যাঁ আমি ! অনধিকার প্রবেশের মার্জনা ভিক্ষা করি—কিন্তু না এসে আমার উপায় ছিল না। সম্রাট ! এক মহা সমস্যা উপস্থিত।

বিক্র ॥ সমস্যা ! কি সমস্যা জ্যোতিষার্ণব ?

বরাহ ॥ ধর্মাধিকরণে বিচার হ'চ্ছিল। বিচারপ্রার্থী ছিল উন্মাদিনী প্রায় এক নারী। সঙ্গে তার এক বিদেশী দম্পতি—পরিচয়ে প্রকাশ সিংহল হ'তে তারা সদ্য-আগত—ব্যবসা জ্যোতিষ-চর্চা। উন্মাদিনী এসে অভিযোগ করলো—উজ্জয়িনীর কালী মন্দিরের পুরোহিত তার একমাত্র শিশু সন্তানকে নরবলি-দানার্থে অপহরণ ক'রেছে ! এই অভিযোগের প্রমাণ দানে আদিষ্টা হ'লে—সে বললো, অন্য কোন প্রমাণ নাই, সিংহলাগত জ্যোতিষ-দম্পতির গণনাতেই সে পুরোহিতের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ আরোপ করেছে। সম্রাট ! জ্যোতিষ গণনায় যদি অপরাধীর নির্দেশ হয়, তবে শাসন সংরক্ষণের জন্য আমিই কি যথেষ্ট নই ? সহস্র সহস্র মহামাত্য, গুপ্তচর, চৌরদ্ধরণিক, নগরপাল, শান্তি রক্ষকের তবে কি আবশ্যক '

বিক্র ॥ অবশ্য।

বরাহ ॥ কিন্তু কি ব'লব সম্রাট, ঐ অপরিচিত জ্যোতিষী-দম্পতির গণনার উপর নির্ভর ক'রে পুরোহিতকে বন্দী করা সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রার্থনা করায় আমি ব'ললাম, পুরোহিতকে বন্দী না করে বন্দী কর সেই উন্মাদ জ্যোতিষীকে—যে জ্যোতিষের নামে এক মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে—

বিক্র ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়—। তারা বন্দী ?

বরাহ ॥ না সম্রাট ! বন্দী নয় বরং—এই যে ওরাও এসেছেন—শুনুন—ওদের কাছেই শুনুন।

ধর্মাধিকার ও বিভাবসুর প্রবেশ।

ধর্মা ॥ জ্যোতিষার্ণব বিচারের অপমান করেছেন সম্রাট!

বিক্র ॥ আমি শুনেছি ॥ সিংহলাগত সেই দম্পতীকে এখনও বন্দী করা হয় নি কেন মন্ত্রীবর?

বিভা ॥ আমাকে ব'লতে দিন ধর্মাধিকার!

বিভা ॥ ধর্মাধিকার তাদের বন্দী ক'রতে আদেশ দেবেন - ঠিক সেই সময় রোমাঞ্চকর এক ঘটনা ঘটল! ভীতা, ত্রস্তা হ'য়ে ছুটে এলেন, স্বয়ং পুরোহিতের পত্নী—বুকে তার এক শিশুসন্তান—মমতাময়ী সেই নারী ধর্মাধিকারের পদতলে রাখল সেই শিশু—এবং কি ব'লব সম্রাট—সত্য সত্যই দেখা গেল—ঐ শিশুই বিচারপ্রার্থিনী সেই উন্মাদিনীর অপহৃত সন্তান! "মা" ব'লে তার বুকে গিয়ে পড়ল ঝাঁপিয়ে।

বিক্র ॥ কি আশ্চর্য্য—তারপর? তারপর মন্ত্রী?

বিভা ॥ বিচার-সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী সিংহলাগত জ্যোতিষী-দম্পতির জয়ধ্বনি ক'রে উঠল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে চীৎকার ক'রছে—পুরোহিতকে বন্দী কর—বিচার কর—বিচার কর—ঐ পুরোহিতের বিচার কর।

বিক্র ॥ তারপর। তারপর? পুরোহিত?

ধর্মা ॥ আমি পুরোহিতকে বন্দী ক'রবার আদেশ দিলাম—কিন্তু—কিন্তু সম্রাট—ঐ জ্যোতিষার্ণব—অনাধিকার হ'লেও তারস্বরে সভামধ্যে ঘোষণা ক'রলেন, সিংহলাগত ঐ দম্পতি জ্যোতিষীই নয়। ওদের গণনা জ্যোতিষী-গণনা নয়—যাদুকর যাদুকরীর ইন্দ্রজাল।

বরাহ ॥ সহস্রবার এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি শাস্ত্রসম্মত নয়, ভোর্জাবিদ্যা, সে সিদ্ধান্ত সত্য হ'লেও অশাস্ত্রীয় বলে প্রামাণ্য নয়—গ্রাহ্য নয়। সেই জন্যই শুধু গণনার উপর নির্ভর ক'রে পুরোহিত দণ্ডার্হ নন।

বিক্র ॥ সমস্যাই বটে। তারপর—

বিভা ॥ বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল—তুমুল কোলাহল হ'তে লাগল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ক'রে বিচারসভা ভঙ্গ ক'রে আমি এদের নিয়ে এসেছি—

বিক্র ॥ সিংহলাগত সেই দম্পতী?

বিভা ॥ আপনার দ্বারে।—আসুন। সম্মুখে সম্রাট।

মিহির ও খনার প্রবেশ।

মিহির ॥ সম্রাট জয়তু। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট!

বিক্র ॥ আপনারা জ্যোতিষী?

বরাহ ॥ (উত্তেজিতভাবে) সম্রাট—সম্রাট—শুনুন সম্রাট! আমি ঘোষণা করছি—ওরা জ্যোতিষী নয়—ওরা রাক্ষস—লঙ্কার মায়াবী রাক্ষস—

মিহির ॥ সম্রাট ! সম্রাট ! এ কথা মিথ্যা। আমরা ভারত-সন্তান।

বরাহ ॥ ভারত-সন্তান ! ভারত-সন্তান !

বিক্র ॥ ভারত-সন্তান পরিচয় যথেষ্ট নয় যুবক, ভারতের কোন্ বিখ্যাত পণ্ডিত তোমার পিতা ?

বরাহ ॥ বল—বল—কে তোমার পিতা ?

মিহির ॥ খনা—খনা, এখনও—এখনও কি তুমি নীরব থাকবে ?

খনা ॥ এর অতিরিক্ত পরিচয় দিতে বর্তমানে আমরা অক্ষম !

বরাহ ॥ অক্ষম ! পিতৃ-পরিচয় দিতে অক্ষম ! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ সম্রাট ! শুনলেন ?

মিহির ॥ খনা—খনা—

খনা ॥ ছিঃ মিহির !

বরাহ ॥ অথচ এদের গণনার উপর নির্ভর ক'রেই—পুরোহিতের ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে—ঐ ধর্মাধিকার—

ধর্মা ॥ হ্যাঁ সম্রাট, আমি সত্য ঘটনাকে উপেক্ষা ক'রতে পারি না—আমার বিচার যদি বিচার বলে গ্রাহ্য হয়—তবে আমার বিচারে পারিপার্শ্বিক ঘটনা-মূলে পুরোহিতই অপরাধী—এবং বিরুদ্ধরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্তি তার আজীবন কারাবাস। এই নবাগত যুবকের অদ্ভুত গণনা সাহায্যে সন্তান-হারা এক নারী ফিরে পেয়েছে এক সন্তান—যাকে হারিয়ে সে হয়েছিল উন্মাদিনী। বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ধর্মাধিকার আমি—আমি সম্রাট সম্মুখে সানন্দে তোমাকে দিচ্ছি এই জয় পত্র—

বরাহ ॥ সম্রাট। সম্রাট !

বিক্র ॥ দাঁড়ান ধর্মাধিকার। আপনার বিচার অবশ্যই গ্রাহ্য। কিন্তু আপনার বিচারের বিরুদ্ধে—ঊর্দ্ধতন ধর্মাধিকরণ, সম্রাটের সমীপে প্রতিবাদ হওয়ায় বিচার করছি আমি। বিচারে গণনার স্থান নাই—বিচার প্রমাণ-সাপেক্ষ। সত্য বটে পুরোহিতের গৃহে পাওয়া গেছে সেই অপহৃত শিশু—কিন্তু শুধু তাতেই প্রমাণ হয় না—যে ঐ শিশু অপহরণ ক'রেছিল পুরোহিত। বিশেষ জ্যোতিষার্ণব বরাহের মতে যখন এই গণনা অশাস্ত্রীয়—তখন এই গণনাকে আমরা ভোজবিদ্যা বা রাক্ষসীর ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কোন আখ্যা দিতে পারি না। আমার বিধানে ঐ জয়-পত্র জ্যোতিষার্ণব বরাহের। শোন সিংহলাগত দম্পতি ! তোমাদের গণনায় ফল জয়যুক্ত হ'লেও যেহেতু তোমরা সিংহলাগত, যেহেতু তোমরা পিতৃ পরিচয় দিতে অস্বীকৃত—তজ্জন্য—তজ্জন্য বিপরীতরূপে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমার বিধানে তোমরা লঙ্কাবাসী মায়াবী রাক্ষস।

খনা ॥ কিন্তু সম্রাট—

বিক্র ॥ না মা, সম্রাটের বিধান প্রতিবাদের নয়। আমার রাজ্যে মায়াবীর স্থান নেই। স্থান হ'তে পারে—যদি কেউ দয়াপরবশ হ'য়ে তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কে গ্রহণ ক'রবে, তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব ?

খনা ॥ (বরাহের প্রতি) প্রভু! প্রভু! দয়া ক'রে অবহিত হন প্রভু! আপনার পদতলে ব'সে ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা ক'রব এই অদ্য কামনা নিয়েই আমরা এসেছি—সুদূরে এই ভারতে! আমাদের আশ্রয় দিন—আপনার পদতলে আমাদের আশ্রয় দিন—

বরাহ ॥ এ কি ব'লছ! এ কি ব'লছ মা ?

খনা ॥ যা ব'লছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দয়া করুন—দয়া করুন প্রভু!

বরাহ ॥ তাইতো!

বিক্র ॥ মায়াজাল প্রসারিত! সাবধান জ্যোতিষার্ণব!

বরাহ ॥ সত্য—সত্য—অতি সত্য। মায়াজাল! মায়াজাল! না মা—আমি পারব না। তোমাদের কামনা পূর্ণ ক'রতে আমি পারব না—না—না—না—

খনা ॥ আপনার পায়ে পড়ছি—আপনার পায়ে পড়ছি—

বিক্র ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

বরাহ ॥ (ক্রুদ্ধ হইয়া) সাবধান।

খনা ॥ বটে! উত্তম। স্বামী—

মিহির ॥ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সুবিশাল রাজ্যে বিদ্যার্থী এই দুইটি প্রাণীর স্থান নেই। সত্য সত্যই কি তুমি বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যোৎসাহী বিক্রমাদিত্য—

বিক্র ॥ ক্রন্দনে অথবা ভৎর্সনায় বিক্রমাদিত্য তার কর্তব্য পথ হ'তে বিচলিত হয় না।

খনা ॥ সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র একটি নিবেদন আছে অতি ক্ষুদ্র নিবেদন—

বিক্র ॥ বল মা—

খনা ॥ জ্যোতিষার্ণব বরাহের নিকট আমার একটি কথা ব'লবার আছে—একটি মাত্র কথা—কিন্তু ব'লব আমি তা—গোপনে।

বরাহ ॥ না—না—

খনা ॥ মাত্র একটি কথা—একটি কথা—

বরাহ ॥ না—না—আমি গোপনে কোন কথা শুনতে অসম্মত—

বিক্র ॥ হাঃ হাঃ হাঃ···জ্যোতিষার্ণবের রাক্ষস ভীতি উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

খনা ॥ উত্তম। তবে আমি প্রকাশ্যেই বলছি। জ্যোতিষার্ণব···

মিহিরকে তাহার সম্মুখে লইয়া গিয়া।

ইনি আমার স্বামী। সত্য সত্যই কি এঁকে সিংহলবাসী মায়াবী ব'লে মনে হয়? দেখুন দেখি এঁর মুখের দিকে চেয়ে!

বরাহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এস স্বামী চ'লে এস। (গমনোদ্যত)

বরাহ ॥ দাঁড়াও—শোন—

খনা ॥ একটি কথাই ব'লব বলেছিলুম, বলা তো তা হ'য়েছে।

বরাহ ॥ না—না—(মিহিরকে ধরিয়া) তোমার বয়স?

খনা ॥ যাদের একটি কথা শুনতেই আপত্তি—দ্বিতীয়বার কথা কইবার তাদের সাহস নাই জ্যোতিষার্ণব!

বরাহ ॥ তুমি বল—তুমি বল—তোমার বয়স?

মিহির ॥ বিশ বৎসর।

বরাহ ॥ বিশ বৎসর! বিশ বৎসর!

বিক্র। কি হ'ল জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ ॥ এঁ্যা—না ভাবছিলুম....হাঁ ভাবছিলুম—ভাবছিলুম—এই যে এরা নিতান্ত বালক বালিকা—হ্যাঁ নিতান্ত অসহায়—এদের নির্বাসিত ক'রলে—বিদেশে—হ্যাঁ অপরিচিত দেশে—নির্বাসিত হ'লে এদের দুঃখের সীমা থাকবে না—এটা বিবেচনার কথা বটে সম্রাট!

বিক্র ॥ বুঝলুম—বুঝলুম জ্যোতিষার্ণব—

বরাহ ॥ (বিরক্ত হইয়া) কি বুঝলেন সম্রাট? যাই বুঝুন—এটা স্বীকার ক'রতেই হবে—যে রাক্ষসীয় জ্যোতিষ অশাস্ত্রীয়—হ্যাঁ অশাস্ত্রীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু, সেটাও জ্যোতিষ—সেটাকে আলোচনা ক'রে দেখতে দোষ কি! আপনারা হাসছেন. হাসুন—কিন্তু আমি হাসতে পারছি না—আমি হাসতে পারছি না। তোমরা থাকবে। সম্রাট, আমি এদের বুঝতে চাই, জানতে চাই, এরা কে? কে এরা! কেউ যদি তোমাদের আশ্রয় না দেয় আমি আশ্রয় দিলাম। এস তোমরা আমার অতিথি! এবং—এবং সত্যই যদি তোমরা আমার শিষ্যত্ব চাও—জানি না তাতে কার দর্পচূর্ণ হ'চ্ছে—কিন্তু সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হ'লাম সানন্দে—সানন্দে।

মিহির ও খনা বরাহ চরণে প্রণত হইল। বরাহ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

* প্রথম দৃশ্য *

বরাঙ্গের বাসভবন

অন্তঃপুরের একাংশ। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। অন্য পার্শ্বে সুবিস্তৃত অলিন্দ। বসন্ত সন্ধ্যা। একটি চ্যুত-লতিকা বসন্ত সমাগমে নব পুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়া মলয় পবন-সংযোগে মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। প্রসাধন-রতা মদনিকা। মদনিকার সখিগণ তার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাঙ্গণটিকে নৃত্যে ও সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

দেবাশীষে আজ বেঁধেছে কবরী, ঘিয়ের প্রদীপে নয়ন কালো—
জনম তিথিরে সফল করিতে—ঐ চোখে শুভ প্রদীপ জ্বালো।
অগুরু গন্ধে শুভ্র এ মন—
শঙ্খ করিছে শুভ আলাপন
শুভ ললাটে চন্দন-রেখা—এ নব তিথিতে সাজিবে ভালো।

নিপুণিকা ॥ নাও, এইবার জন্মদিনের শেষ উৎসবটি হোক্‌। শোন সখি, তোমার এই জন্মদিনে তোমার মনের কথাটি আমাদের বল—শুনে খুসী হ'য়ে ঘরে যাই—

মদনিকা ॥ ব'লব ভাই, কিন্তু আমি মুখে ব'লতে পারব না—

সখিগণ ॥ তবে—

মদনিকা ॥ আমি লিখে দিচ্ছি—

পদ্মের চারটি পাপড়ি ছিঁড়িয়া তাহাতে একে একে কাজল-লতা সহকারে চন্দন যোগে কি লিখিয়া তরলিকার হাতে দিল—তরলিকা তাহা একে একে চার সখির হাতে দিয়া আসিল—

মদনিকা ॥ এইবার পড়—

নিপুণিকা ॥ "কা"

চতুরিকা ॥ "ম"

মালবিকা ॥ "ন্দ"

বাসন্তিকা ॥ "ক"

নিপুণিকা ॥ কি না—"কামন্দক"। তোমার পেটে এত! গিয়ে বলছি

ঠাকুরকে—মনের ঠাকুরটিকে গিয়ে বলছি—আয়রে আয়—ঠাকুরের সন্দেশ নিবি তো আয়!

মদনিকা ও তরলিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তর॥ ধন্য তোর জন্মদিন! বসন্তের কি সুন্দর সন্ধ্যা! মানিনী, ঐ চ্যুত-লতিকার দিকে চেয়ে দেখ। বসন্ত-সমাগমে নব-কুসুমিতা ঐ মানিনীকে মলয়ানিল দোলা দিচ্ছে। মানিনী সোহাগে কাঁপছে।

আসিল মলয়-অনিল, দিল সে কুঞ্জে হানা—
হব তোর রাতের সাথী, লতা, না কর মানা!
সম্মুখে আঁধার নিশা
হে সখি, হারাই দিশা
তোমারি বুকের মাঝে সুখনীড় আছে জানা।

বহু পথ একা চলে আজিকে আমি অবশ আমি
দেখিব সুখের স্বপন, কাটাবো মধুর যামি
সরমে নরম লতা
কহে না মরম কথা—
তনুতে কাঁপন লাগে মুখে কয় না—না—না—!

গানের ভিতরেই পুঁথির বোঝা হস্তে কামন্দক প্রবেশ করিল।

কাম॥ কালিদাস—কালিদাস—

তর॥ অর্থাৎ ?—

কাম॥ "ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্তমলয়াৎ
তদেকাং তৎগেহে বিনয়রতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণেত্যুক্তা নব কুসুমিতা চ্যুত-লতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানি নহি নহি নহীত্বেব কুরুতে॥"

অর্থাৎ··· সন্ধ্যা সমাগত, বহুদূর মলয় পর্বত হ'তে আমি এসেছি—ওগো বিনয়বতী, আজ একটি রাত্রি তোমার গৃহে যাপন করতে অভিলাষ করছি—সমীরণের এই বাক্যে নব-মুকুলিতা, কিনা—নব পুষ্পিতা চ্যুত-লতিকা মাথা নেড়ে বলছে, না, না, না! তিনবার কেন না বলছে জান কি?

তর॥ আমি কি জানি! কিন্তু কেন বলুন তো?

কাম॥ আজ না, কাল না, পরশু না, এই তিন দিন না এ কালিদাসের কবিতা—এ কবিতাও যদি না জান—তবে তুমি জান কি?

মদ॥ ও যা জানে····তা আর কেউ জানে না!

কাম॥ অর্থাৎ ?

তর॥ অর্থাৎ····অর্থাৎ··· অর্থাৎ····চুল বাঁধতে জান?

কাম॥ বাঁধতে জানি না কিন্তু কেন বাঁধ তা জানি।

মদ ॥ অর্থাৎ ?

কাম ॥ যাতে মন্মথসমরে রণকৃতাং সৎকার মাতন্বতী
বাসেদাজঘনে সুপীন কুচয়োর্হারং কটৌ কিংকিণী
তাম্বুলস্য চ বীটিকাং মুখবিধৌ হস্তেরণং কঙ্কণং।
পশ্চাদবর্ত্তিনী কেশপাশ নিচয়ে যুক্তংহি বন্ধক্রম ॥

মদ ॥ অর্থাৎ ?

কাম ॥ অর্থাৎ আমি না···কবি কালিদাস বলেন—সুন্দরী মন্মথ-সমরে জয়লাভ ক'রে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে যুদ্ধ-সময়ে যে যেরূপ সাহায্য দান ক'রেছিল, তাদের তদুপযুক্ত উপহার দান করলেন—কটিকে দিলেন কিঙ্কিণী, স্তনে দিলেন হার, নিতম্বকে দিলেন মেখলা, বদনে দিলেন তাম্বুল, হস্তে দিলেন বলয়···শুধু কেশপাশ কোন উপহার পাবে না। কেন না যুদ্ধের সময় সে পশ্চাৎবর্তী হ'য়ে ছিল। অতএব—

তর ॥ অতএব ?

কাম ॥ (তরলিকাকে) বাঁধ এই চুল। আমরা কিছু বুঝি না ?

মদ ॥ ভারি তো বুঝেছেন !

কাম ॥ তবে হ্যাঁ, আবার এমন সব ব্যাপারও আছে যা একেবারে বুঝি না।

তর ॥ সত্যি না কি ?

কাম ॥ যেমন "কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।"

তর ॥ অর্থাৎ ?

কাম ॥ অর্থাৎ হে সুন্দরী ! পুষ্পের উপর পুষ্পের উৎপত্তি হয় কোন দিন দেখি নি, শুনিও নি। কিন্তু—

মদ ॥ কিন্তু—

কাম ॥ 'বালে ! তব মুখাম্বুজে কথমিন্দিবরদ্বয়ং ॥

—হে বালা ! তোমার বদন-রূপ কমলের উপর নয়ন-রূপ দুই দুইটি নীল-পদ্ম। বোকার মত শুধু চেয়েই দেখি। কিন্তু অর্থ যে ওর কি···কিছুই বুঝি না !

ধরণীর প্রবেশ।

ধরণী ॥ কি বোঝ না কামন্দক ?

কাম ॥ কালিদাসের কবিতা।

ধরণী ॥ কিন্তু উনি বলেন, তুমি কালিদাস নিয়েই অস্থির। জ্যোতিষে তোমার মনোযোগ নেই।

কাম ॥ গুরুর কৃপায় জ্যোতিষ আমার করকবলিত। দুঃখ এই যে কেউ আমায় প্রশ্ন করে না।

তর ॥ (হাত মুঠা করিয়া সম্মুখে আসিয়া) বলুন ; আমার হাতে কি ?

ধরণী ॥ নাও এবার তোমার দুঃখ দূর হ'ল কামন্দক !

কাম ॥ (মনে মনে বিড় বিড় করিতে লাগিল। আকাশের দিকে তাকাইল। ভূমিতে রেখা টানিল। পরে বলিল) প্রাণী ! জীবিত !

তর ॥ তারপর ?

কাম ॥ (পূর্ববৎ) চতুষ্পদ।

তর ॥ চতুষ্পদ। তারপর ?

কাম ॥ (পূর্ববৎ) শুঁড় আছে।

তর ॥ হ্যাঁ আছে। নাম বলুন।

কাম ॥ হাতী, হাতী ! হাতী না হ'য়েই যায় না। চতুষ্পদ এবং শুঁড় আছে। খোল হাত।

তর ॥ সাবধান ! হাতীটা যদি উড়ে পালায় ?

কাম ॥ সে কি ! হাতী উড়্‌বে ?

তর ॥ যে হাতী হাতের মুঠোয় ধরে' রাখা যায়, সে হাতী বন্‌ বন্‌ ক'রে ওড়ে !

কাম ॥ কই দেখি ! (তরলিকা মুঠা খুলিয়া কামন্দকের নাকের কাছে ছাড়িয়া দিল—কামন্দক তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিয়া) এ কি ! মশা ? কিন্তু তা হ'লেও চতুষ্পদ ·· শুঁড় আছে ! ছোট হাতী, ছোট হাতী····বলেছি কিনা—

ধরণী ॥ বেঁচে থাক বাবা ! মর্দনিকার জন্মদিনে মিহির ও খনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। তারা আস্‌ছে। এই সময়টায় তুমি—

তর ॥ না বরং উনি থাকলে আমাদের সময়টা কাট্‌বে ভাল।

কাম ॥ তাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে ? কে নিমন্ত্রণ ক'রেছে ?

ধরণী ॥ প্রভু স্বয়ং ! ওদের ব্যবহারে তিনি ভারী প্রীত হ'য়েছেন। ওদের দেখে যত মুগ্ধ হ'চ্ছেন, ততই বিরক্ত হচ্ছেন তোমার ওপর। তুলনায় তুমি বড়ই নীচে নেমে যাচ্ছ কামন্দক !

কাম ॥ মায়া ! মায়া ! মায়া—রাক্ষসী মায়া ! গেল, সব গেল ! হয়তো এখনও সময় আছে। কোথায় প্রভু ?

ধরণী ॥ প্রভু যথাস্থানেই আছেন। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বরং—

তর ॥ আঃ ছোট হাতীগুলোর কি অত্যাচার ! ওদের তাড়াবার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ?

কাম ॥ করছি। মারণ-যজ্ঞ। দেখ— [প্রস্থান]

তরলিকা মর্দনিকার গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল।

মদ ॥ গণনায় না হয় একটু ভুলই হয়েছে, তাই ব'লে ওকে অতটা অপদস্থ করা আমাদের উচিত হয় নি তরলিকা—

ধরণী ॥ হাতের মুঠোয় হাতী আছে যে ভাবতে পারে, তাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা কারও নেই মা! আমি শুধু ভাবি ঐ খনার কপাল। কি বরই পেয়েছে!

মদ ॥ খনার কপাল তোমার না ভাবলেও চলবে মা!

ধরণী ॥ তোর কপালের কথা ভাবতে গিয়েই তো তার কপালের কথা মনে জাগে। যাই বল মা, মিহিরের কথা যতই শুনছি, ঐ কামন্দককে—

মদ ॥ জ্যোতিষ আমি ঘৃণা করি মা, ঘৃণা করি। আসুন মিহির, কাব্য আর কবিতা নিয়ে দু-চারটা প্রশ্ন কি আমিই ক'রব না।

তর ॥ সখি, তিনি এলেই সেই প্রশ্ন··· চুল বাঁধি কেন?

ধরণী ॥ চুল বাঁধি কেন এও আবার একটা প্রশ্ন নাকি? হ্যাঁ ভাল কথা —সম্রাট তোর জন্মদিনে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী উপহার পাঠিয়েছেন···সেই শাড়ী পর্‌বি আয়।

সকলের প্রস্থানোদ্যোগ। এমন সময় একগুচ্ছ ফুল হস্তে ভৈরবের প্রবেশ
ভৈরব অতি যত্নে মদনিকার সম্মুখে ফুলগুচ্ছ ধরিল।

মদ ॥ আচ্ছা, একে কে ফুল আনতে বলেছে? জন্মদিনে একটা শুভকার্য্যে যাচ্ছি····সম্মুখেই এই অযাত্রা!

ধরণী ॥ ফুলগুলি ত বেশ! নে মদনিকা! ঘরের লোক কি অযাত্রা হয়?

মদ ॥ তুমি জান না মা, ওকে দেখলেই আমার গা শিউরে ওঠে। তখনি একটা না একটা কিছু অনর্থ ঘটে।

ভৈরবকে এড়াইয়া সকলের প্রস্থান। ভৈরব দুঃখে লুটাইয়া পড়িল। তাহার হাত
হইতে ফুলগুচ্ছ পড়িয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মত বরাহের প্রবেশ।

বরাহ ॥ (চাপা গলায়) আমি পরাজয় স্বীকার ক'রছি। আমি—আমি বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন আমি—ঐ সিংহলাগত যুবক যুবতীর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রছি। আমি স্বীকার করি, আমার চেয়ে ওদের জ্যোতিষের জ্ঞান লক্ষগুণে বেশী। ওদের যা শক্তি · তা, আমার কল্পনাতীত। আমার ইচ্ছা হয়, আমার কেবলই ইচ্ছা হ'চ্ছে—নবরত্ন সভাতেও নয়, বিশ্বসভায় আমি এ কথা ঘোষণা করি। জগতের সকল জ্যোতিষী মিলে ঐ দেব-দম্পতীকে পূজা করি—দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করি—কে কোথায় অবিশ্বাসী আছ, এইবার এস—আমরা মূর্খ····তোমাদের সংশয় দূর ক'রতে পারিনি কিন্তু এইবার এস দেখি! আমার ইচ্ছা হয়····আমি ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে' বলি,

আমি কিছু জানি না···কিছু না। যেটুকু শিখেছিলাম, এতকাল তারই দর্পে আর এক পদ অগ্রসর হই নি। তোরা আমায় দয়া কর্···দয়া ক'রে আমায় দীক্ষা দে—শিক্ষা দে—

ক্ষণকাল কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন।

এই কথা আমি ব'লতে পারি? আমি বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রেষ্ঠ বরাহ -আমি—আমি এই কথা বলতে পারি? (হাসিয়া উঠিলেন—হঠাৎ ভৈরবকে দেখিয়া তাহার প্রতি বজ্রনির্ঘোষে) তুই ওখানে! আমি এতক্ষণ এখানে কি ব'লেছি?বল—বল—

ভৈরব কিছুই বলিতে পারিল না।

(হাসিয়া উঠিলেন) ভৈরব! প্রভুভক্ত মূক ভৃত্য আমার! যা ব'লেছি ···সাক্ষ্য নেই—কেউ তার সাক্ষ্য নেই! ভৈরব! ভৈরব! আমার ইচ্ছা হয়, ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন একখানা ছুরি ওদের বুকে—

কল্পনায় তাহাদিগকে ছুরিকাঘাত করিতে গিয়া ভৈরবকে দেখিয়া চমকিত হইয়া তাহার নিকট পরম অপরাধীর মত।

না, না, না আমি না।

ভৈরব সান্ত্বনা দিবার জন্য পদসেবা করিতে লাগিল, যখন বুঝিলেন তাহার সম্মুখে ভৈরবই আর কেহ নহে তখন বরাহের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

ও তুই? ভৈরব? সংবাদ কি? তোর মা কোথায়? মদনিকা কই? তরলিকা? তোমরা কোথায়? [ভৈরবের প্রস্থান।] মিহির আর খনা কিন্তু রওনা হ'য়েছে। তোমাদের আয়োজন সব—

ধরণী, মদনিকা এবং তরলিকার প্রবেশ।
মদনিকা বিচিত্র সাজে সজ্জিতা।

ধরণী॥ সব প্রস্তুত। কিন্তু কই, তারা কই?

বরাহ॥ তারা রওনা হ'য়েছে—

ধরণী॥ তোমার সঙ্গে তারা এল না কেন?

বরাহ॥ এক সঙ্গেই রওনা হ'য়েছিলাম, কিন্তু পথে—

ধরণী॥ পথে কি হ'ল?

বরাহ॥ অজস্র লোক জমে গেল। যত সব অসভ্যের দল!

ধরণী॥ পথেও লোক ভাগ্য-গণনার জন্য ধরবে? পথেও কি তোমার মুক্তি নেই?

বরাহ জোর করিয়া কথাটা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে

বরাহ ॥ তাতে তোমার কি ?

ধরণী ॥ আমার আর কি ? আমার তাতে বরং গর্ব কিন্তু—

মদ ॥ লোকেরা কি তাঁদের পথরোধ করেছে ? তাঁরা কোথায় ? তাঁদের এত দেরী কেন ?

বরাহ ॥ আমি জানি না।

ধরণী ॥ তারা হয়ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, তাই বিলম্ব হ'চ্ছে। তা, তুমি গিয়ে না হয় তাদের উদ্ধার ক'রে আন ! রাত্রি যে ক্রমেই গভীর হ'য়ে আসছে !

বরাহ ॥ প্রয়োজন থাকে তুমি যাও, আমি পারব না। নিস্তব্ধতা

ধরণী ॥ এই ঘরে তাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রেছি। আমি নিজেই এ ঘর আজ সাজিয়েছি। আজ ওরা আসবে শুনে শুধু মনে হ'চ্ছে...এ যেন আমারই ছেলে...বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আনছে। কেন যেন শুধু মনে হ'চ্ছে —ঐ মিহির—ও কেন আমার গর্ভে জন্ম নিল না ?

মদ ॥ (ধরণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সাভিমানে) মা !

ধরণী ॥ কি মা ? ও কথা শুনে তোর বুঝি অভিমান হ'ল ? ছি মা, তুই—তুই-ই যে আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ! (বরাহকে) আজ ওর জন্মদিনে তুমি ওকে আশীর্বাদ কর।

মদ ॥ বাবা !

বরাহকে প্রণাম করিল।

বরাহ ॥ ওঃ !

একটা অস্ফুট আর্তনাদ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল।

ধরণী ॥ তুমি পিতা, আজ ওর জন্মদিনে ওকে আশীর্বাদ কর।

বরাহ ॥ ভৈরব ! ভৈরব !—

ধরণী ॥ ভৈরবকে আবার এখন কি প্রয়োজন ? এই শুভ মুহূর্তে—

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ।

মদ ॥ (ভৈরবকে) আমার সম্মুখ থেকে দূরে হও।

ভৈরব পিছাইয়া গেল।

বরাহ ॥ (মদনিকাকে) কেন ?

মদ ॥ (প্রায় কাঁদিয়া) আমি জানি না—আমি জানি না।

ধরণী ॥ পিতা যখন কন্যাকে আশীর্বাদ করবে তখন ও কেন ? কতবারই তো তোমাকে বলেছি- -মদনিকা ওর চেহারা দেখেই শিউরে ওঠে। ওকে দেখলেই—

মদ ॥ আমার ভয় হয়। মনে হয় ও একটা দৈত্য। (বরাহকে) ওর আচরণ তো জান না তুমি, পারে ত আমায় গ্রাস করে।

বরাহ ॥ ভৈরব !

নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত।

মদ ॥ মা !—

ধরণীর প্রতি অভিযোগসূচক দৃষ্টিতে

ধরণী ॥ (বরাহের প্রতি) তবু ? তবু ?

বরাহ ॥ ভৈরব !

ভৈরব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, মদনিকাকে।

আজ তোমার এই জন্মদিনে ওকে প্রণাম কর মদনিকা !

মদ ॥ প্রণাম ! ! ওকে ?

ঘৃণায় মুখ ফিরাইল।

বরাহ ॥ ও তোমার যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী, তেমন তোমার আর কেউ নাই, আমিও না—তোমার এই মাতাও নয়।

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল প্রণামের প্রয়োজন নাই প্রণাম সে চায় না। সে এক হাতে চোখের জল ঢাকিয়া অন্য হাতে মদনিকাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ধরণী ॥ (বরাহকে) তুমি ওকে আশীর্বাদ করলে না ?

বরাহ ॥ জগতের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ও লাভ করেছে। মা !—

মদনিকা প্রণাম করিল।

দীর্ঘ জীবন লাভ কর, পিতাকে সুখী কর।

ধরণী ॥ মাতার কথাটা বাদ গেল কেন ? (হাসিয়া) কি স্বার্থপর তুমি !

নেপথ্যে কোলাহল।

ও কিসের কোলাহল ?

বরাহ ॥ তারা আসছে।

ধরণী ॥ আমি আহারের আয়োজন করছি। তোমরা ওদের নিয়ে এস।

ধরণীর প্রস্থান। বরাহ ও মদনিকা বাহিরে চলিয়া গেলেন।
বাহিরে কোলাহল :—

নেপথ্যে ॥ "আমার কি হবে দেবী ?"
"সমুদ্র যাত্রা তবে আমার হবেই ?"

"আমার বৌ মর্‌বে, সে কি ?"
"কলার চাষ এই মাসে ?"
"আমার সন্তান হবে একুশটি ? আরে সর্বনাশ !"
"গুপ্ত ধনটা কোথায় ? বল দেবী ?"

বহুকণ্ঠে ॥ "কখন যাত্রা কর্‌লে শুভ হয় ?"

নেপথ্যে খনা ॥ মঙ্গলের ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা
রবি গুরু মঙ্গলে ঊষা
আর সব ফাসা ফুসা

বহুকণ্ঠে উহার পুনরাবৃত্তি হইল।

উত্তেজিতভাবে বরাহের প্রবেশ।

বরাহ ॥ অশাস্ত্রীয়—নিতান্ত অশাস্ত্রীয় !

পশ্চাতে পশ্চাতে মিহিরের প্রবেশ।

মিহির ॥ কি অশাস্ত্রীয় আচার্য্য ?

বরাহ ॥ খনা দেবী যেরূপ যাত্রার শুভলগ্ন নিরূপণ করছেন—"মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা,—যথা ইচ্ছা তথা যা ! যদি তখন মঘা, কিম্বা অশ্লেষা—কিম্বা ত্র্যহস্পর্শ হয়—তবু ?

মিহির ॥ হ্যাঁ, তবু মঙ্গলবারের নিশাবসানে ঊষাকালে, বুধবারের প্রারম্ভে, যদি যাত্রা করা যায়, সে যাত্রা পরম শুভ।

বরাহ ॥ আর্য্য ঋষিগণ কি মূর্খ ছিলেন ? অথবা ঘুম ভাঙতো মধ্যাহ্নে, ঊষার সন্ধানই তাঁরা পান নি ?

মিহির ॥ তথাপি ঊষার মাহাত্ম্য লোপ হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাইরের ঐ যত লোক এসেছে, সবাই খনা দেবীর বচন অনুযায়ী যাত্রা ক'রে সফল মনোরথ হ'য়েই, ওই বচন লিখে নিচ্ছে।

মর্দনিকার প্রবেশ।

মদ ॥ (বরাহকে) দিদিকে বাঁচাও বাবা ! (মিহিরকে) না হয় আপনিই যান। এ কি অত্যাচার ! এক মুহূর্তের অবসরও কি ওঁর মিল্‌বে না ?

বরাহ ॥ কি হ'য়েছে মা ?

মদ ॥ তা কি দেখ্‌ছ না বাবা ? রাজ্য শুদ্ধ লোক এসে যে খনা-দিদিকে পাগল করে তুল্‌ল ! কারও প্রশ্ন, পেটে কি আছে ? ছেলে না মেয়ে ? কলার চাষ কোন্ মাসে ? গুপ্ত ধনটা কোথায় ? এমনি সব কত প্রশ্ন ? রক্ষা কর বাবা, তুমি গিয়ে দিদিকে রক্ষা কর !

বরাহ ॥ আচ্ছা মা, আমি যাচ্ছি— [হাসিমুখে বরাহের প্রস্থান]

মদ ॥ আমি শুধু ভাবছি, দিদি কি করে হাসিমুখে এই অত্যাচার সহ্য করে ?

মিহির ॥ হ্যাঁ, ও পারে। কিন্তু আমি পারি না।

মদনিকা ও মিহিরের বাহিরে প্রস্থান।

নেপথ্যে বরাহ ॥ কার কি গণনা আছে বল ?

নেপথ্যে জনতা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

নেপথ্যে বরাহ ॥ মা-লক্ষ্মী আমার গৃহে অতিথি। তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে দাও। কার কি গণনা আছে আমায় বল !

নেপথ্যে জনতা ॥ আমরা আর ঠক্‌ছি না। বরং কাল এসে মা মক্ষ্মীর পায়ে পড়্‌ব। চল হে চল—

নেপথ্যে বরাহ ॥ আমি কি তোমাদের ঠকিয়েছি ?

নেপথ্যে জনতা ॥ মা-লক্ষ্মীর গণনা দেখে এখন তাই মনে হচ্ছে ঠাকুর!

নেপথ্যে বরাহ ॥ বটে! বটে!

নেপথ্যে খনা ॥ তোমরা অবোধ, তাই ঐ মহাপুরুষের মর্য্যাদা জান না। ঐ মহাপুরুষের চরণতলে শিক্ষালাভের আমরা যোগ্য নই।

নেপথ্যে জনতা ॥ তোমার মা এ অনর্থক বিনয়! শোন মা—

নেপথ্যে খনা ॥ তোমাদের কথা শুন্‌লেও পাপ হয়।

বরাহ, খনা, মিহির ও মদনিকার প্রবেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ জনতা ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

(বরাহের নিকটে গিয়া) দেব! ওরা অবোধ, ওদের ক্ষমা করুন! আমায়ও ক্ষমা করুন!

ইহাতে জনতার মধ্যে কেহ বলিয়া উঠিল।

জনৈক জনতা ॥ "আহা মা'র কি বিনয়!"

খনার মুখখানা সহসা ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল। একটা অব্যক্ত যাতনায় দুই হাতে মুখখানা চাপিয়া ধরিল।

খনা ॥ ওঃ!

মিহির ॥ কি বিড়ম্বনা! কে জান্‌ত এমন হবে! মহাপুরুষের এই অসম্মান আর তো দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না খনা!

খনা ॥ চল, চল, আমায় এখান হ'তে নিয়ে চল—

জনতার মধ্যে কেহ ॥ আমরাও তবে নিশ্চিন্ত হই। মহাপুরুষের মতিভ্রম হ'তে কতক্ষণ? এস মা শীগ্‌গীর এস—এই রাত্রিযোগে এই নেমন্তন্নের কথাটাই আমাদের ভাল লাগ্‌ছে না।

মদ ॥ (মহা ক্রোধে) ভৈরব ! ভৈরব !

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ।

বাইরের ঐ লোকগুলোকে—

বরাহ ॥ (ভৈরবকে) না—

ভৈরব মদনিকার ইঙ্গিত মাত্র জনতার উদ্দেশে ছুটিতেছিল।
বরাহের আদেশে ক্ষান্ত হইল বটে কিন্তু জনতা
ভয়ে ছুটিয়া পালাইল।

(খনাকে) যাও, মা, ওদের নিরাশ ক'রো না, ওদের কাছে যাও।

খনা ॥ বাহিরের ঐ নরকে আমাদের তাড়াবেন না! আপনার চরণে আমাদের আশ্রয় দিন্ দেব!

ধরণীর প্রবেশ।

ধরণী ॥ তোমাদের গল্প কি ফুরাবে না? খাবার যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল!

খনা ॥ মা!

কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণীকে জড়াইয়া ধরিল।

ধরণী ॥ এ কি মা, কাঁদছ নাকি?

খনা ॥ না মা, হ্যাঁ মা ক্ষিদে পেয়েছে, কাঁদব না? শিগ্‌গীর চল, খেতে দাও।

মদ ॥ ধন্যি মেয়ে! (মিহিরকে) আসুন।

মিহির ॥ (বরাহকে) চলুন।

ধরণী ॥ ওঁর খাবার সময় এখনও হয় নি। সে সেই দুপুর রাতে। তোমরা এস।

বরাহ ॥ না—না—চল আমি যাচ্ছি। তোমাদের আহার দেখ্‌ব।

ধরণী ॥ না—না—তুমি গণনাই কর। নইলে কাল সকালে লোক এসে তোমার মাথা খাবে। (মিহির ও খনার প্রতি) একটুও সময় যদি পান! বড় হওয়ার এ যে কি বিপদ, যখন হবে বুঝ্‌বে।

বরাহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অন্যদিক হইতে একজন লোককে ধরিয়া লইয়া কামন্দকের প্রবেশ।

কাম ॥ পালাবে কেন? ভয় কি? কি গুণ্‌তে হবে বল। দেখছ না সম্মুখে সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য।

লোক ॥ আমি অনেক দূরে দেশ হ'তে এসেছি মশাই! শুন্‌লাম, এখানে এলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সেই আশায় কষ্টকে কষ্ট মনে করিনি, অর্থ

ব্যয় সার্থক মনে করেছি। কিন্তু এখানে পেঁাছেই দেখ্‌লাম, বহু লোক প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—

কাম ॥ ওদের ফাঁড়া আছে কিনা! প্রভুর গণনা শুনেই সবাই দৌড়ে পালাল—

লোক ॥ তবে ত আরও বিপদ। শুনেছি সর্প-দংশনে আমার মৃত্যুযোগ আছে। ফাঁড়া যদি সত্য হয়, কি হবে? আমার যে বাতব্যাধি। পালাতে ত পারব না!

কাম ॥ পালাবে কেন? গ্রহশান্তি—অব্যর্থ! অব্যর্থ! দক্ষিণা তিন রজতমুদ্রা। সদ্য ফলপ্রদ বিশেষ গ্রহশান্তি—দক্ষিণা নব সংখ্যক রজত মুদ্রা। এবং··· বা—রা—হী কবচ সর্ববিঘ্নবিনাশন···সর্বভয় প্রশমন···সর্বসিদ্ধি-সংঘটন—দক্ষিণা অষ্টদশ রজতমুদ্রা। যজ্ঞও কর্‌তে পার—সর্পযজ্ঞ! জন্মেজয় করেছিল, শোন নি?

লোক ॥ না শুনি নি। কিন্তু শুনেছি ঐ প্রভুর অদ্ভূত গণনা। তাই কোন্‌ দিন, কোথায়, কি অবস্থায়, কোন্‌ দণ্ডে, কোন্‌ পলে, কোন্‌ অনুপলে, সেই কালসর্প—

চমকিয়া সভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত।

কাম ॥ এত ভয় কেন? সম্মুখে দেবতা।

লোক ॥ দেবতা জেনেই জান্‌তে এসেছি—কবে, কোথায়, কখন, কোন দণ্ডে, কোন্‌ পলে, কোন্‌ বিপলে, সর্প আমায় দংশন করবে? ফাঁড়াটা বহু জ্যোতিষীকে দিয়ে গুণিয়েছি। কারও সঙ্গে কারও গণনা মেলে না। কেউ বলে বিশ বৎসর পর, কেউ বলে এখনও ত্রিশ বৎসর বাকী। কেউ বলে আমার ম'রবার পর সেই ফাঁড়াটা! অবশেষে শুনলাম বিক্রমাদিত্য রাজসভায় অপহৃত শিশুর উদ্ধারের সেই অলৌকিক কাহিনী। নব-রত্নের অন্যতম রত্নরূপে পরিচিত বরাহকে মূর্খ প্রতিপন্ন করে (রবাহকে দেখাইয়া) ঐ সিংহল দেবতার অত্যাশ্চর্য্য গণনা! (হঠাৎ) আমার মা কোথায়? খনা মা?

কাম ॥ আছেন, আছেন, ভাত রান্না করছেন। সাবধান, কোন বাজে কথা নয়। দেখ্‌ছ না প্রভু ধ্যানমগ্ন! দর্শনী আমার হাতে দিয়ে তুমি গিয়ে শুধু বল—প্রভু! সাপে আমাকে কবে খাবে? ব্যস্‌ আর কোন কথা নয়··· দর্শনী?

লোক ॥ (দর্শনী দিবার ভান করিয়া হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া বরাহের চরণ ধরিয়া) প্রভু! আমি আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হবার পূর্বেই কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি। সূর্য্যদেব নিতান্ত যে গরীব তাকেও আলো দিতে কার্পণ্য করেন না। আমাকেও আপনি তেমনি দয়া করুন··দয়া করে আপনার মিহির নাম সার্থক করুন।

বরাহ ॥ আমার নাম মিহির ?

লোক ॥ আপনার নাম আজ কে না জানে ? সিংহল হ'তে যে দিন—

বরাহ ॥ তুমি ভুল করেছ—আমি বরাহ।

লোক ॥ ব—রা—হ ? আপনাকে তো আমি চাই নি ! আমি যে সেই সিংহল-দেবতা মিহিরকে চাই। সাক্ষাৎ সরস্বতী খনা মাকে চাই।

বরাহ ॥ কি প্রয়োজন তোমার ?

কাম ॥ সর্প দংশনে ওর মৃত্যু-যোগ আছে। সেই ফাঁড়াটা কবে, কোথায়, কখন—

বরাহ ॥ বেশ, আমিই গণনা ক'র্‌ছি। এ ত অতি সহজ গণনা।

লোক ॥ না, না মশাই, আপনার কথা আমার জানা আছে আমি চাই সেই সিংহল দেব-দেবীকে। শুনলাম, তাঁরা এখানে, এই গৃহেই—

কাম ॥ (রাগিয়া তাহাকে তাড়াইবার মানসে চীৎকার করিয়া) সাপ্ ! সাপ্ ! সাপ্ !

লোক ॥ বাপ্ ! বাপ্ ! বাপ্ ! [দৌড়িয়া পলায়ন]

বরাহ ॥ এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল কামন্দক····মৃত্যু ভাল।

কাম ॥ আমিও তাই ভাব্‌ছি মৃত্যু ভাল, কিন্তু আপনার নয়।

ভৈরব ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

বরাহ ॥ জীবনে এত অপমান কখনও সইনি। অথচ এও বুঝ্‌ছি—এর জন্য ওরা এতটুকু দায়ী নয় !

কাম ॥ এ সব ষড়যন্ত্র প্রভু, ষড়যন্ত্র ! আপনি বুঝছেন না—তাই ওদের নেমন্তন্ন করে ঘরে ডেকে এনেছেন। শুধু কি তাই ? ওদের জন্য ফুলশয্যা রচনা হচ্ছে ! দুধ দিয়ে মানুষ কাল সাপ পোষে—আমি এই প্রথম দেখ্‌ছি। শোন ভৈরব—

ভৈরবকে কি বলিতে লাগিল।

বরাহ ॥ না, না, ওদের কি দোষ ? আমি দেখেছি, ওদের গণনা অব্যর্থ। আমি বুঝেছি, ওদের বিদ্যা অলৌকিক বিদ্যা। ওদের প্রতিভাও অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক কামন্দক, ওদের বিদ্যা রাক্ষসী-বিদ্যা—সনাতন শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু কি ক'র্‌ব, আজ আমি বৃদ্ধ, আমার সে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা নেই—তর্ক-যুদ্ধের শক্তি নেই, সাহসের অভাব হ'য়েছে, অধ্যবসায় হারিয়েছি। আজ আমি আমার যৌবনের জীর্ণ কঙ্কাল—আজ আমার বুকে শুধু এক হাহাকার—কি জান কামন্দক ?

কাম ॥ কি প্রভু ?

বরাহ ॥ আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই—আজ যদি আমার পুত্র থাক্‌ত, রূপে সে কারও কাছে ম্লান হ'ত না। শিক্ষায় সে কারও কাছে মাথা নত

ক'রত না। বিদ্যায়, প্রতিভায়, হয়ত বিশ্বের বিস্ময় হ'ত। আজ আমার পুত্র নাই—তাই আজ এই বার্দ্ধক্যে অসহায়ভাবে দেখ্‌তে হ'চ্ছে রাক্ষসী-মায়ায় কিরূপে দেশ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'চ্ছে···সনাতন জ্যোতিষ কিরূপে ক্রমে ক্রমে রাহুগ্রস্ত হচ্ছে। থাক্‌ত যদি আমার পুত্র—

কাম ॥ সে এ অপমান কিছুতেই সহ্য ক'র্‌ত না··· এর প্রতিকার ক'র্‌ত। সে নেই—কিন্তু আমরা ত আছি··· এস ভৈরব,—

ভৈরবকে লইয়া কামন্দকের প্রস্থান।

বরাহ ॥ বৃথা—বৃথা—বৃথা, আমার জীবনই ব্যর্থ হ'ল—শুধু এক পুত্রের অভাবে— [প্রস্থান]

ধরণী, মর্দানিকা, মিহির ও খনার প্রবেশ।

ধরণী ॥ আর রাত করোনা বাবা! মা মর্দানিকা, এবার ওরা বিশ্রাম কর্‌বে। প্রভু কোথায়? তবে কি আবার পাঠাগারে গেলেন? আয় মর্দানিকা, —(খনা ও মিহিরকে) আসি বাবা—আসি মা! আর রাত ক'রো না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আয় মর্দানিকা!— [ধরণীর প্রস্থান]

মদ ॥ যাই মা!—

খনা ॥ (মর্দানিকাকে) একটা গান—

মদ ॥ (খনাকে) একটা গান—

খনা ॥ তুমি—

মদ ॥ না ভাই তুমি—

মিহির ॥ কলহ কেন? না হয় আমিই—

খনা ॥ না, না, রক্ষে কর! এত রাত্রে শান্তিভঙ্গ সুবিধার কথা নয়! তুমি গাও ভাই!

—মর্দানিকার গান—

এল, জীবন-মাঝে আজি পরম-রাতি
সখি, কনক-দীপে জ্বালো উজল-বাতি।
এল দখিন হাওয়া,
কার পরশ পাওয়া—
এল, রঙিন হ'য়ে এল নেশায় মাতি।
আছি, দুয়ার খানি মোর আধেক খুলে—
রেখে, কদম-কেশর সই, খোঁপার চুলে—
মিছা মেঘের শাড়ী,
মোছ নয়ন-বারি—
বিনা, জীবন-সাথী মোর মলিন ভাতি॥

ধরণীর প্রবেশ।

ধরণী ॥ এখনও শুতে যাও নি বাবা! আয় মদনিকা!

ধরণী ও মদনিকার প্রস্থান।

খনা ॥ এ জন্মদিনেও ও সুখী নয়।

মিহির ॥ এ বয়সে বিয়ে না হ'লে অ-সুখ হবারই কথা খনা!

খনা ॥ আজ তোমারও জন্মদিন মিহির!

মিহির ॥ আমারও জন্মদিন আজ! বল কি খনা?

খনা ॥ গণনা করেই বল্‌ছি মিহির। বিশ বৎসর পূর্বে এই উজ্জয়িনীতে ঠিক এই দিনটিতেই তুমি প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিলে!

মিহির ॥ কার ঔরসে? কার গর্ভে? কোথায়? কোন্‌ গৃহে?

খনা ॥ উতলা হ'য়ো না মিহির! উপযুক্ত দিন-ক্ষণ হ'লেই আমি ব'ল্‌ব।

মিহির ॥ তার আর কত বিলম্ব?

খনা ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাক মিহির! তুমি যত অধীরই হও না কেন, অসময়ে আমি কোন কথাই ব'ল্‌ব না। ব'লবার হ'লে বহু পূর্বে—সেই সিংহলেই আমি ব'ল্‌তাম। (নিস্তব্ধতা)

মিহির উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল।

যাচ্ছ যে?—

মিহির ॥ যে অক্ষম, ঘুমিয়ে থাকাই তার পক্ষে শান্তি।

ঘরে গিয়া শয়ন।

খনা ॥ বটে, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

ঘরে গিয়া দুয়ার দিয়া শয়ন।

দেহ আবৃত করিয়া চোরের মত কামন্দক ও তৎপশ্চাতে ভৈরবের প্রবেশ। ভৈরবের হাতে মশাল। কামন্দক ভৈরবকে ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিল—ঐ ঘরে আগুন দিতে হইবে। ভৈরব চকমকি দ্বারা মশাল জ্বালিবার উপক্রম করিতেই নেপথ্য হইতে।

বরাহ ॥ কে? কে ওখানে? পালিও না, দাঁড়াও!

বরাহের কণ্ঠ শুনিয়াই উভয়ের পলায়ন। বরাহ তাহাদের ধরিবার জন্য সেই দিকেই গেলেন।

খনা দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

খনা ॥ কেউ ত নেই! তবে কি শুন্‌তে ভুল ক'র্‌লাম! ভারতবর্ষে

কি সবই সুন্দর! কি সুন্দর চাঁদনী রাত! মিহির ঘুমিয়েছে। এই চাঁদের আলো ছেড়ে ঘরে যেতে মন চায় না! (সোপানে উপবেশন)

মন ভুলে অবহেলে—
সোনার-কমলে পাষাণ-পরাণে দিয়েছিলে জলে ফেলে!
স্রোতের সে ফুল উতলা হাওয়ায়
কত গাঙ্ ভেসে ফিরে এল হায়—
ও ভোলা, তাহারে বুকে তুলে নাও—দিয়ো নাক দূরে ঠেলে।

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ ॥ খনা!

খনা ॥ আপনি? এ সময়? খানিক পূর্বে—সে কি তা হ'লে আপনারই কণ্ঠ—

বরাহ ॥ হ্যাঁ মা। কিন্তু, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে মা?

খনা ॥ কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন পিতা!

বরাহ ॥ তুমি কি আমাকে উদ্দেশ্য করেই ও গান গাইছিলে?

খনা নিরুত্তর।

বল মা, চুপ ক'রে রইলে কেন? বুঝেছি, আমাকে ব্যঙ্গ করাই তোমাদের উদ্দেশ্য!

খনা ॥ সে কি পিতা?

বরাহ ॥ এই জন্যই তোমরা সুদূর সিংহল হ'তে এখানে এসেছ?

খনা ॥ এ ভ্রান্ত ধারণা কি ক'রে আপনার মনে উদয় হ'ল?

বরাহ ॥ না আমার ধারণা ভ্রান্ত নয়। যদি তাই হয় তা হ'লে বল—তোমাদের এখানে আসার প্রকৃত কারণ?

খনা ॥ এখন ব'ল্‌তে পারব না। সময়ে জান্‌তে পার্‌বেন।

বরাহ ॥ তা হ'লে আমার অনুমানই সত্য?

খনা নিরুত্তর।

এ বৃদ্ধ বয়সে আমার অপমৃত্যুর আয়োজন না করে আর কিছুকাল অপেক্ষা ক'র্‌লে কি তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হ'ত?

খনা ॥ সে কি পিতা?

বরাহ ॥ জীবনের চেয়ে যশ বড়। তোমরা আমার সেই যশ—

খনা একবার কিছু বলিবার উপক্রম করিল,
কিন্তু পরক্ষণেই চুপ করিল।

আমি বৃদ্ধ। আর সে শক্তি নাই যে, তোমাদের উদীয়মান

প্রতিভার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াই। কিন্তু মা, এ শক্তিও নাই, যে এই অপমান, এই লাঞ্ছনা সহ্য করি। ঘরে লাঞ্ছনা, বাইরে লাঞ্ছনা···বল মা, তোমরা কি আমার মৃত্যু চাও ?

খনা ॥ দুর্ভাগ্য যে আপনি আমাদের এতখানি ভুল বুঝেছেন! সুদূর সিংহল হ'তে কেন এখানে এসেছি ?

বরাহ ॥ কেন তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। ওঃ! আজ যদি আমার পুত্র থাকত!

খনা ॥ মনে করুন না কেন যে আমরা আপনারই সন্তান···মনে করুন না কেন আমরা আপনারই পুত্র—পুত্র-বধূ!

বরাহ ॥ তা যদি হ'তে—তা যদি হ'তে মা, না যাক্—

খনা ॥ দীর্ঘনিশ্বাস কেন ? তা মনে করা কি একেবারেই অসম্ভব ?

বরাহ ॥ আমি তা মনে ক'র্‌লেও লোকে তা মনে ক'র্‌বে কেন ?

খনা ॥ লোকে কি আজ এই কথাই মনে কর্‌তে পারে যে আপনি অপুত্রক নন্, পুত্র আপনার হ'য়েছিল ?

বরাহ ॥ খনা! খনা!—

খনা ॥ যে—আপনি, আপনার সেই পুত্রকে তার জন্ম-দিনেই, বিশ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনে স্বহস্তে জলে নিক্ষেপ ক'রেছিলেন ?

বরাহ ॥ তাম্রপাত্রে—এই তাপ্তির জলে – তুমি—তুমি—তুমি এ কথা কি ক'রে জান্‌লে ?

খনা ॥ যেমন ক'রেই হোক্ আমি জেনেছি।

বরাহ ॥ গণনায় ? গণনায় ?

খনা ॥ হাঁ গণনায়। কিন্তু গণনায় ত এ কথা জান্‌তে পার্‌লাম না যে পিতা হ'য়ে কেন আপনি স্বয়ং সেই সন্তানকে—

বরাহ ॥ গণনা—গণনা ক'রে দেখ্‌লাম, মাত্র এক বৎসর তার আয়ু—

খনা ॥ এক বৎসর—না একশত বৎসর ?

বরাহ ॥ এক বৎসর।

খনা ॥ না, একশত বৎসর ?

বরাহ ॥ হ'তে পার তোমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী—কিন্তু জাতকের আয়ু গণনার সামান্য জ্ঞানটুকু আমার আছে।

খনা ॥ কিন্তু মানবমাত্রেরই ত ভুল হয়—আপনারও—

বরাহ ॥ সাবধান!

খনা ॥ আপনি ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন কিন্তু এ কথা যদি আজ জানেন যে আপনার পুত্র আজও বর্তমান, তথাপি কি আপনি ক্রুদ্ধই হবেন ?

বরাহ ॥ সাবধান! সাবধান!

খনা বক্ষাবরণ হইতে একখানি গণনাপত্র বাহির করিয়া
বরাহের সম্মুখে ধরিয়া।

খনা॥ তবে দেখুন, আমি আপনার সেই পুত্রের জন্ম-পত্রিকা রচনা করেছি। এই দেখুন, আয়ু ছিল তার একশত বৎসর—অথচ আপনি তার পিতা, গণনায় দু'টি শূন্য ভুল ক'রে—

তাহার হাত হইতে গণনা পত্র কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া দিয়া—

বরাহ॥ সাবধান! সকল অপমান আমি সইতে পারি, কিন্তু এ অপমান—

খনা॥ অপমান? না আনন্দ?

বরাহ॥ (সেই জন্ম-পত্রিকা কুড়াইয়া লইয়া) এই পত্র তোমার ভ্রান্ত গণনার সাক্ষী হ'য়ে রইল রাক্ষসী! আমি বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ ক'রব—(পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) দাঁড়াও দেখ্‌ছি, কোথায় তোমার ভুল—(মনোনিবেশ সহকারে দেখিয়া চীৎকার করিয়া) এ কি? (পুনরায়) এ কি? সত্যই তো—সত্যই তো—(আবার গণনা পর্য্যবেক্ষণ) তাই তো—(বসিয়া উন্মাদের মত পুনরায় গণনা) কি ক'রেছি! এ আমি ক'রেছি!

খনা॥ আপনি শান্ত হন। আপনার পুত্র জীবিত আছে।

বরাহ॥ কে সে? কোথায় সে?

খনা॥ কিন্তু ব'ল্‌বার সে শুভ মুহূর্ত্ত যে এখনও আসেনি পিতা!

ইতিমধ্যে কামন্দক ইহাদের অলক্ষ্যে মিহিরের ঘরের শিকল টানিয়া
দিয়াছে। ভৈরব ঘরে আগুন দিয়াছে।
আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বরাহ॥ তা হোক্, তবু তুমি বল কে আমার পুত্র—

মিহির॥ (ভিতর হইতে) আগুন! আগুন!

খনা॥ ও কি! সর্ব্বনাশ—

বরাহ॥ বল মা! কে আমার পুত্র!

মিহির॥ খনা—খনা—ঘর থেকে আমি বেরুতে পারছি না, আমি পুড়ে মরলুম—

খনা॥ হাত ছাড়—হাত ছাড়—আমার স্বামী—আমার স্বামী—

বরাহ॥ আমার পুত্র—আমার পুত্র—

মিহির॥ খনা, এই মৃত্যু মুহূর্ত্তেও কি তুমি বল্‌বে না—কে আমার পিতা?

বরাহ॥ বল কে আমার পুত্র? বল কে আমার পুত্র?

খনা॥ তোমার পুত্র—তোমার পুত্র—

হাত ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া দিয়া।

আমার স্বামীই তোমার পুত্র।

মিহির ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

মিহির ॥ তুমি। তুমি! পি—তা?

বরাহ ॥ আমি— আমি—

মিহিরকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অগ্নিদগ্ধ গৃহপ্রাঙ্গণ। গভীর রাত্রি। বরাহ প্রেতের মত পদচারণা করিতেছিলেন।

পুঁথি হস্তে কামন্দক মদনিকার খোঁজে যাইতেছিল—

হঠাৎ বরাহ তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন।

কামন্দক চমকিয়া উঠিল।

বরাহ ॥ কামন্দক!

কাম ॥ প্রভু!

বরাহ ॥ তুমিই ঘরে আগুন দিয়েছিলে?

কাম ॥ সে কথা ত কেউ বল্‌ছে না—সে কথা কেউ তুল্‌ছেই না। সবাই বল্‌ছে—কি আশ্চর্য্য প্রভু—এ কথা এরই মধ্যে সারা উজ্জয়িনীতে রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সম্রাটের কানে পেঁাছেছে—আপনার বহিপ্রাঙ্গণে জনতারও অন্ত নাই· এবং সে কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। আপনি নাকি লাঞ্ছনার হাত এড়াবার জন্য জোর করেই বল্‌ছেন ঐ মিহির নাকি আপনার পুত্র—এবং ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিশ বছর পরে ফিরে পাওয়ার যে গল্প রচনা করেছেন, সবাই সে গল্প শুনে বল্‌ছে, কল্পনায় আপনি কালিদাসকেও পরাজিত করেছেন।

বরাহ ॥ হুঁ তুমি যাও। আমাকে একাকী থাকতে দাও। যাও—যাও কামন্দক। [কামন্দকের প্রস্থান]

ধরণীর প্রবেশ।

ধরণী ॥ প্রভু।

বরাহ ॥ বল।

ধরণী ॥ এতদিন আমার কাছে এ সংবাদ গোপন রেখেছিলে কেন?

বরাহ ॥ ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম ধরণী—কিন্তু—কিন্তু—নিজের দুর্বলতার জন্য তা পারি নি।

ধরণী ॥ তা হ'লে—মদনিকা আমার কন্যা নয়—কন্যা সেই ক্রীতদাসের অর্থাৎ ঐ ভৈরবের? সেদিনকার সেই গল্প তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য?

বরাহ ॥ অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ধরণী ॥ মদনিকা—মদনিকা আমার কন্যা নয়? যাকে আজ বিশ বৎসর দেহের রক্ত জল করে লালন ক'রলাম, পালন ক'রলাম—সে আমার কন্যা নয়? পুত্র হ'ল ঐ মিহির—যে আমার এক বিন্দু স্তন্য পর্য্যন্ত পান করে নি! প্রভু! প্রভু! মিহিরকে আমি ফিরে পেয়েছি—এ আনন্দ আমি সইতে পারছি—কিন্তু মদনিকাকে হারাবার দুঃখ আমি সইতে পারব না। না—না—পারব না।

নেপথ্যে মদ ॥ মা! মা!

ধরণী ॥ মদনিকা! কি বল্‌ব প্রভু! আমি তাকে কি ব'ল্‌ব?

মদনিকার প্রবেশ।

মদ ॥ মা! মা! যা শুন্‌লাম তা কি সত্য?

ধরণী ॥ (নীরব রহিলেন)

মদ ॥ তুমি কথা কইছ না কেন মা? তোমরা কি মানুষ মা? এত সব ঘটনা যে ঘটেছিল, কই একটিবারও ত আমায় বল নি?

ধরণী ॥ তবে শোন মা—আজ তোমায় বল্‌ছি—কত বড় অবিচার যে আমরা তোমার ওপর করেছি—

মদ ॥ একশবার করেছ। এত বড় একটা ঘটনা সবার কাছে লুকিয়েছ—লুকোও, কিন্তু তাই ব'লে আমার কাছেও লুকোবে?

ধরণী ॥ কিন্তু আজ আর না ব'লে পারছি না—আমি সব বল্‌ছি—

মদ ॥ থাক্ আর ব'ল্‌তে হবে না। যেন আমি কিছুই শুনি নি!

ধরণী ॥ শুনেছিস্?

মদ ॥ না শুনেই বুঝি লাফাচ্ছি?

ধরণী ॥ কি শুনেছিস্ বল্ দেখি—

মদ ॥ ঐ মিহির আমার দাদা ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—আয়ু গুণতে ভুল করে। শিশু-হত্যার অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরে কথাটা গোপন রেখেছিলে তোমরা। ভারী দুঃখে ছিলে তোমরা—যদ্দিন না আমি হলুম। মিহির আমার ক' বছরের বড় মা?

বরাহ ॥ (ছুটিয়া আসিয়া) না না, তুমি ভুল শুনেছ মদনিকা! প্রকৃত কাহিনীর অনেকখানিই তুমি শোনোনি।

ধরণী ॥ (বরাহকে বাধা দিয়া) ও ঠিক শুনেছে, তুমি থাম।

বরাহ ॥ না, না ধরণী!

ধরণী ॥ তোর পিতা আনন্দে উম্মাদ। চলে আয় মদনিকা,—আমি ব'লছি। [মদনিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

ছুটিয়া কামন্দকের প্রবেশ।

কাম ॥ প্রভু! সর্বনাশ!

অদূরে খনা ও মিহিরের প্রবেশ।

বরাহ ॥ কি কামন্দক?

কাম ॥ সম্রাট এই অভাবনীয় ঘটনার কথা শোনা মাত্র তাঁর প্রধান অমাত্য বিভাবসুকে আপনার গৃহে প্রেরণ করেন। আমাকে দেখেই সে প্রকৃত ঘটনা কি জান্‌তে চাইলে। আমি বল্‌লাম, আমি এখনও সব শুনিনি। সে ব'ল্‌ল সম্রাট বল্‌ছেন, যদি বরাহদেব নিজের পুত্রের আয়ু গণনা ক'রতেই ভুল করেন, তাঁর গণনার ওপর লোকের কোন আস্থা থাক্‌তে পারে না। তাঁকে জ্যোতিষীই বলা চলে না। সে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইছে। এই যে খনা দেবী, আর কেন? যা হবার হয়েছে, মিহির ঠাকুর সুস্থ হ'য়েছেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দয়া ক'রে আমার বৃদ্ধ প্রভুটীর স্কন্ধ ত্যাগ করে অন্য একটি শ্বশুরের সন্ধান দেখুন। অমাত্যবর একলা ব সে আছেন, আমি দেখছি। [প্রস্থান]

খনা ও মিহির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিহির ॥ পিতৃ সম্বোধনের সৌভাগ্যের বিনিময়ে আমি আপনার শিরে এত বড় অসম্মানের ডালি তুলে দিতে পারি না, পারি না পিতা!

খনা ॥ তাই স্থির করেছি আমরা চলে যাব। দূরে—দূরে—বহু দূরে—কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। আপনি ভাববেন না পিতা!

মিহির ॥ আপনি এখনই ঘোষণা করে দিন—আমরা রাক্ষসের দেশ হ'তে এসেছিলাম, মায়াবী আর মায়াবিনী। দুদিন মায়ার খেলা খেলে আবার চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু—কিন্তু পিতা, এই দুদিনের খেলাই আমাদের বাকী জীবনের পাথেয় হ'য়ে রইল। (পায়ের ধুলি লইয়া) বিলম্ব নয়—আর বিলম্ব নয় খনা।—

বিভাবসুর প্রবেশ।

বিভা ॥ এই যে আপনারা সবাই এখানে। আমি বিভাবসু। সম্রাট আমার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় বিনিদ্র-চক্ষে ব'সে আছেন বলে আমি আর বিলম্ব ক'রতে পারলাম না। আপনাদের সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী সম্রাট বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলছেন, বরাহদেব যদি নিজের পুত্রের আয়ু গণনায় ভুল করে থাকেন, তবে কে আর তাঁর গণনায় আস্থা স্থাপন ক'রবে? কে তবে তাঁকে জ্যোতিষী ব'ল্‌বে? তাই তিনি সত্য-মিথ্যা অবগত হবার জন্য আমাকে

এই রাত্রেই প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি প্রচারিত পল্লবিত এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কি বলেন জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ ॥ না, এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। এই আমার সেই হারানিধি পুত্র।

বিভা ॥ জ্যোতিষার্ণব! আপনি কি বল্‌ছেন?

মিহির ॥ (বিভাবসুকে) না, না, শুনুন—

বরাহ ॥ যা শোনবার উনি তা শুনেছেন। অথবা আবার শুনুন—ভুল আমি করেছিলাম। সোনার-কমল জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। লোকে যদি তাতে বলে জ্যোতিষ আমি জানি না, বলুক। রাজা যদি বলেন—আমি জ্যোতিষীই নই—বলুন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আমি সে ভুল ক'রব না। পারব না আজ আমি একে পুনরায় ভাসিয়ে দিতে—আমার জীবন নদীর-ওপারে!

মিহির ও খনাকে লইয়া প্রস্থান। বিস্মিত বিভাসুরেরও প্রস্থান।

পুঁথির বোঝা স্কন্ধে কামন্দকের প্রবেশ। কামন্দক আসিয়া দেখিল কেহ কোথায়ও নাই। পুঁথির বোঝা নামাইয়া রাখিয়া সে অন্দরের দিকে উঁকি মারিয়া যেই দেখিল তথায় মদনিকা রহিয়াছে, ছুটিয়া আসিয়া পুঁথির স্তুপ সম্মুখে রাখিয়া অধ্যয়নের ভান।

কাম ॥ "অসারভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী ইতি
সঞ্চিত্যবৈ শম্ভূরর্দ্ধাঙ্গে পার্বতীং দধৌ ॥"

অস্যার্থ—অসার সংসার। এই অসার সংসারে রমণী একমাত্র সার পদার্থ। দেবাদিদেব মহাদেব এই জন্যই পার্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধাবণ করিয়াছেন।

মদনিকার প্রবেশ। তাহার হস্তেও পুঁথির বোঝা।

(তাহাকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়াই অধিকতর মনঃসংযোগ করিল)।

"রমণী মধুরাধর মধুমধুরিমা পরিমাণজগাসিৎ।
হরিরেব যৎ সুরেভ্য দত্তামৃতমিন্দিরাং হৃতবাম।"

কিনা—রমণী মধুরাধরের আস্বাদ স্বয়ং হরিই জানেন। নতুবা সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য দেবতাকে অমৃত দান করে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীকে গ্রহণ ক'রলেন কেন? (চীৎকার করিয়া) অতএব—

মদনিকা পুঁথি খুলিয়া পাঠ করিল।

"নির্বানদীপে কিমু তৈল দানম্,
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।

বয়োগতে কিং বণিতা বিলাস
পয়োগতে কিং খল্ সেতবন্ধঃ ॥

কিনা !—দীপ নির্বাপিত হ'লে তাতে আর তৈল প্রদান ক'রে লাভ কি ? চোর চুরি ক'রে চলে গেলে সাবধান হ'য়ে কি ফল ? যৌবন অতীত হ'লে বণিতা-বিলাসে কি প্রয়োজন ? জল নির্গত হ'লে সেতুবন্ধের কি আবশ্যক ? অতএব—

কাম ॥ অতএব—

উঠিয়া মদনিকার গলায় মাল্যদান করিতে গেল
এমন সময় ছুটিয়া তরলিকার প্রবেশ ।

তর ॥ অতএব—(নেপথ্যে দেখাইয়া)—কিন্তু—

বরাহের প্রবেশ ।

বরাহ ॥ (কামন্দক পালাইতে উদ্যত হইয়াছিল) কামন্দক ! দাঁড়াও—

কাম ॥ কি গুরুদেব ?

বরাহ ॥ কালিদাস-কাব্যকুঞ্জের কোকিল তুমি, তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি ।

কাম ॥ সে কি প্রভু ?

বরাহ ॥ হ্যাঁ আমি পরিহাস জানি না । তুমি আমার শিষ্যত্ব হ'তে মুক্ত । এখন হ'তে স্বচ্ছন্দে তুমি কালিদাসের কবিতা-নিকুঞ্জে বিহার করতে পার ।

কাম ॥ আমি একা ?

বরাহ ॥ আবার কে ?

কাম ॥ ক্রুদ্ধ হবেন না প্রভু !

বরাহ ॥ বল !

কাম ॥ মদনিকা— কালিদাসের কাব্য ওর কণ্ঠস্থ । অবশ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ওর পাণ্ডিত্য কম নয় । হ্যাঁ, আমা অপেক্ষা অধিক । কিন্তু কালিদাস……

বরাহ ॥ তুমি বল্‌তে চাও মদনিকা আমার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে কালিদাসের আশ্রয় গ্রহণ ক'রবে ?

কাম ॥ না প্রভু !

বরাহ ॥ তবে ?

কাম ॥ আমাদের উভয়ের মন—

থামিয়া গেল ।

বরাহ ॥ বল—

কাম ॥ অভয় দিন্ তো বলি—

ম-২৪১

বরাহ ॥ বল !

কাম ॥ আমাদের উভয়ের মন, উভয়ের প্রাণ কাব্যাকাশে বিচরণ ক'রতে ক'রতে একত্রীভূত হ'য়ে—

বরাহ ॥ তুমি ওকে বিবাহ ক'রবে ?

কাম ॥ প্রভুর অনুমতি অপেক্ষা—

বরাহ ॥ যদি জান ও আমার কন্যা নয়—?

কাম ॥ অধমের সঙ্গে পরিহাস কেন প্রভু ?

বরাহ ॥ আমাকে পরিহাস ক'রতে কখনও দেখেছ কামন্দক ?

কাম ॥ না প্রভু।

বরাহ ॥ যদি এই কথাই সত্য হয় যে ও এক ক্রীতদাসের কন্যা ! আমি এবং আমার স্ত্রী পালন করেছি মাত্র ?

কাম ॥ দাসের সঙ্গে ছলনা ক'রবেন না প্রভু !

মদ ॥ বাবা তুমি কি ব'লছ ?

বরাহ ॥ ঠিক ব'লছি। মদনিকা ! মদনিকা ! ঐ ভৈরবই তোমার পিতা তুমি মাতৃহীনা। আমরা তোমাকে লালন পালন করেছি মাত্র।

মদ ॥ বাবা !

ধরণী প্রবেশ।

মা ! মা !

ধরণী ॥ কি মা ?

মদ ॥ বাবা আমাকে—বাবা আমাকে (ক্রন্দন)

ধরণী ॥ কি হ'ল ? তুমি কি বলেছ ?

বরাহ ॥ যা সত্য—আমি আর তা গোপন ক'রতে পারছি না। আমি মদনিকাকে তার পিতৃ-পরিচয় দিয়েছি।

কাম ॥ কি যে বলেন প্রভু ! এতে আপনার বিশেষ (ধরণীকে দেখাইয়া) ঐ মা জননীর যে কতখানি অসম্মান হচ্ছে তা কি আপনি বিবেচনা ক'চ্ছেন না ?

বরাহ ॥ (ক্রোধে) রহস্য আমি জানি না কামন্দক ! আমি ঘোষণা ক'রছি —ঐ ক্রীতদাসের কন্যা ঐ মদনিকা। ভৈরব ! ভৈরব !

মদ ॥ তুমি—তুমি বল মা—এ কথা সত্য ?

ধরণী নীরব রহিলেন।

কথা কইছ না যে মা ? বল মা, বল—এ কথা সত্য ?

ধরণী ॥ সত্য।

কাম ॥ ঐ ক্রীতদাস মদনিকার পিতা ?

শশব্যস্তে ভৈরবের প্রবেশ।

মদ ॥ ভৈরব ! ভৈরব ! তুমি বল তুমি বল—তুমি আমার পিতা ?

ভৈরব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

মদ ॥ বল ভৈরব—বল—

ভৈরব মদনিকাকে বিচলিত দেখিয়া সেও
মহা বিচলিত হইয়া উঠিল।

বরাহ ॥ বল ভৈরব, আজ এই মহা সন্ধিক্ষণে আমি আদেশ করছি, আর তুমি নীরব থেকো না ভৈরব! ভৈরব! প্রভুভক্ত ভৃত্য আমার, কথা কও—কথা কও আজ। আমার মিথ্যাচারকে সুরক্ষিত রাখতে স্বেচ্ছায় এই বিশ বৎসর ধরে মূক হয়ে আছ তুমি—ওরে ভৃত্য—ওরে বন্ধু—আমি আজ যখন নিজে সেই মিথ্যার গ্রন্থি করছি উন্মোচন—তোর আত্মত্যাগের অবসান কি আজও হবে না? ওরে আজও হবে না ভৈরব? ওরে তুই কথা বল্—কথা বল্ আজ। সম্মুখে তোর মাতৃহারা একমাত্র সন্তান—ওকে বুকে নে—বুকে নিয়ে বল্—এই সুদীর্ঘ বিশটী বৎসর—ওঃ হো—হো—

বিশ বৎসর কথা না বলিবার অনভ্যাসে
জড়তা জনিত কণ্ঠে বহুকষ্টে।

ভৈরব ॥ মা! মা আমার!

মদ ॥ তুমি? তুমি আমার পিতা?

ভৈরব ॥ আমি—আমি—আমি!

মদ ॥ বাবা!—(তাহার বুকে পড়িতে গেল)

ভৈরব ॥ (শিহরিয়া সরিয়া গিয়া) না—মা—আমাকে তুমি,—আমাকে তুমি—

মদ ॥ ঘৃণা করতুম। কিন্তু—কিন্তু—আজ—আজ যে তুমিই আমার সব বাবা!

ভৈরব ॥ মা! মা আমার!

বুকে লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

বরাহ ॥ আঃ—আঃ—

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

কামন্দক ধীরে ধীরে বরাহের নিকট গেল।

কাম ॥ প্রভু!

বরাহ ॥ কি কামন্দক!

কাম ॥ মদনিকা—

বরাহ ॥ এখনও তুমি মদনিকার পাণি-প্রার্থী?

কাম ॥ প্রভু অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না। আপনার কাছে জ্যোতিষ-চর্চা

ক'রলেও মূলতঃ আমি মহাকবি কালিদাসেরই শিষ্য। তাই বিচার ক'রে দেখলাম, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—অতএব—

ভৈরবের পদতলে মদনিকাকে লইয়া নতজানু হইয়া কামন্দক বলিল।

আমাদের আশীর্বাদ কর ভৈরব।

সর্ব্বাগ্রে প্রভুর আশীর্বাদ আবশ্যক বিবেচনায় ভৈরব মদনিকা ও কামন্দককে হাত ধরিয়া বরাহের সম্মুখে লইয়া গেল এবং এই মিলনকে আশীর্বাদ করুন, এই প্রার্থনা সকাতরে জানাইল।

বরাহ॥ তোমাদের প্রেম অসাধারণ। জাতি-ধর্ম্মের গন্ডী তোমরা অতিক্রম ক'রেছ! এ বিবাহে আমি সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি। আশীর্বাদ ক'রছি।

ধরণী॥ আশীর্বাদ করেছি সুখী হও।

তৃতীয় দৃশ্য

পুরনারীগণ বরণডালা লইয়া মঙ্গল-গীতে বধূবেশে মদনিকাকে বরণ করিয়া লইল।

মঙ্গল-শঙ্খে—মঙ্গল কণ্ঠে মঙ্গল-সুরে শোনাবো গান—
সিন্দুর ভালে—মঙ্গলময়ী, শুকতারা সম জাগাও প্রাণ!
পারুল-চাঁপায় গাঁথিব নূতন মালা—
শত উপচারে সাজাবো বরণডালা—
তব তরে হ'ল পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালা
মালা-চন্দনে সাজাবো বদনখানি—
শঙ্খের সুরে শোনাবো মধুর বাণী—
চঞ্চল-চোখে কাজল দিয়ে নব-রূপ তারে করিব দান।

তখন ভৈরব সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধচিত্তে সে উহাদিগের উৎসব নিরীক্ষণ করিল এবং বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে উহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

বরাহের বাসভবন

বিভাবসু ও বরাহ

বিভা ॥ মহাকবি যথার্থ বলেছেন ঃ—

"শর্বরী দীপকচন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম সৎপুত্র কুলদীপক ॥"

অভাবিতরূপে সেই সৎপুত্র লাভ ক'রে আপনি ধন্য হ'য়েছেন। ভুলের ফলে যে এত বড় লাভ হয়—এ আমরা এই প্রথম দেখলাম।

বরাহ ॥ শুধু পুত্র? পুত্র-বধূ?

বিভা ॥ পুত্র-বধূর ত আপনার তুলনাই নাই। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আপনার পুত্র-বধূ সম্বন্ধে সম্রাটের ধারণা—তিনি মানবী নন—দেবী। বিশেষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তিনি যে অলৌকিক প্রতিভা প্রদর্শন ক'রেছেন, তাতে এই কথাই মনে হয়—আমরা এতকাল জ্যোতিষ নিয়ে শুধু অসার খেলাই খেলেছি। মনে হয় শুধু মরীচিকার পেছনে পেছনে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটীই করেছি, প্রকৃত জ্যোতিষের অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না। কি বলেন জ্যোতির্ষার্ণব?

বরাহ ॥ ঠিক তা নয়, তবে কিনা—প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, অর্থাৎ····এই কথাটাই আমি বল্‌তে চাই যে—

বিভা ॥ যে কথাই বলুন, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার ক'রতে পারবেন না যে সেই দেবীর সহজ স্বাভাবিক, অথচ অভ্রান্ত অব্যর্থ গণনা আপনারা কিছুই অবগত নন্। আপনার পুত্রও না। আপনারা যা জানেন তাতে অন্ধকারেই ঢিল ছোঁড়া হয়, লক্ষ্য-স্থলে কোনটা লাগে, কোনটা লাগে না।

বরাহ ॥ এ কথা আমি স্বীকার ক'র্‌তে পারি না মন্ত্রিবর!

বিভা ॥ আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, যাক্ সে কথা, শুনুন জ্যোতির্ষার্ণব! আমি আজ শুধু আপনাকে অভিনন্দিত ক'রতে আসিনি। আমি রাজাদেশে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি। সম্রাট অধীর হ'য়ে উঠেছেন—তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব ক'রতে স্বীকৃত নন্।

বরাহ ॥ কেন, তিনি কি চান?

বিভা ॥ তিনি ব'ল্‌ছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-মনিষা, শ্রেষ্ঠ-প্রতিভার একত্র সমাবেশের জন্যই নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা। সত্য কিনা আপনিই বলুন।

বিভা ॥ সে সভায় শুধু তাঁরই স্থান হওয়া আবশ্যক যিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে জ্ঞানে, প্রতিভায়—বিশ্বজয়ী। সে ক্ষেত্রে—

বক্তব্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

বরাহ ॥ (উত্তেজিত হইয়া) আপনি কি বল্‌তে চান বলুন!

বিভা ॥ আপনিই কি এ কথা বল্‌তে চান, নবরত্ন সভায় যোগ্যতম লোকের স্থান না হ'য়ে—অযোগ্য, অকর্মণ্য লোকের ক্রীড়াভূমি হয়ে থাকবে?

বরাহ ॥ আমি কিছুই ব'ল্‌তে চাই চাই না। আমি আপনাকে কোন কথাই ব'লতে চাই না।

বিভা ॥ আপনি ওরূপ বিচলিত হচ্ছেন কেন? সম্রাট কখনই অবিচার ক'রবেন না।

বরাহ ॥ (বিড় বিড় করিয়া) বিচার! বিচার! সম্রাটের বিচার!

বিভা ॥ এ ক্ষেত্রেও বিচার করবার জন্য সম্রাট অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি আজই—সন্ধ্যার পূর্বে—

বরাহ ॥ বোধ হয় নবরত্ন সভা হ'তে আমাকে বহিষ্কৃত ক'রতে চান?

বিভা ॥ আপনি ভুল বুঝেছেন। তিনি চান নবরত্ন সভায়—আপনি আপনার আসন সুদৃঢ় করুন! সেই উদ্দেশ্যেই তিনি—

বরাহ ॥ তিনি!

বিভা ॥ এক বিচারের আয়োজন করেছেন।

বরাহ ॥ কিরূপ?

বিভা ॥ আজ সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের উত্তর চান।

বরাহ ॥ কি প্রশ্ন?

বিভা ॥ আকাশে ক'টী তারা? আপনি উত্তর দিতে পারলে নবরত্ন সভায় আপনার আসন ধ্রুবতারার মতই স্থির। অন্যথায়—

বরাহ ॥ অন্যথায়?

বিভা ॥ নবরত্ন সভায় আপনার পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠিত হবেন—যিনি এই উত্তর দেবেন। নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

বরাহ ॥ আকাশে ক'টী তারা?

বিভা ॥ হ্যাঁ, আকাশে ক'টী তারা। [প্রস্থান]

বরাহ ॥ আমার তারা অস্ত গেছে বলেই না—বৃদ্ধ আমি, জীর্ণ আমি, আমাকে আজ এই প্রশ্ন?—আকাশে ক'টী তারা! [প্রস্থান]

খনা ও মদনিকার প্রবেশ।

খনা ॥ মদনিকা! মদনিকা! এখানে আমি স্বামীর সংসারে শৃঙ্খলিতা

—আর লক্ষ যোজন দূরে—সাগর পারে রয়েছে স্নেহান্ধ এক বৃদ্ধ, শোকার্তা এক বৃদ্ধা। এপারে ওপারে শুধু এক আর্তনাদ উঠছে—আয় আয়—যাই—যাই। কিন্তু যাবার উপায় নাই। আসবার উপায় নাই। মদনিকা—এ যে কি ব্যথা তুমি বুঝবে না, কেউ বুঝবে না।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির ॥ কি বুঝবে না খনা ?

খনা ॥ না, কিছু না।

মদ ॥ ঐ মা আস্‌ছেন।

ধরণীর প্রবেশ।

মা ! বাপ-মার জন্য বৌদির মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

ধরণী ॥ স্বামীর ঘর ক'রতে এসে বাপ-মার জন্য কাঁদ্‌লে ত চল্‌বে না মা ! বিয়ের পর বৌকে ভুলেই যেতে হয় যে তার বাপ-মা আছে।

খনা ॥ (মদনিকাকে) তুমি যদি পারো ভুলো। কিন্তু (ধরণীকে) কোন মেয়ে কি তা পারে মা ?

ধরণী ॥ রাজকন্যারা হয় তো পারে না। কিন্তু—

মিহির ॥ না মা রাজকন্যা বলে ওকে অপমান ক'রো না।

মদ ॥ রাজকন্যা ব'ল্‌লে যে কারও অপমান করা হয়—তা ত জানা ছিল না মা !

মিহির ॥ যদি তা না জেনে থাক, তবে আজ জান, রাজকন্যা হয়েও যখন ঐ নারী স্বেচ্ছায় বরণ ক'রল অজ্ঞাতকুলশীল, দীনহীন এই অনাথকে, তখনও কি ওকে, ব'লবে রাজকন্যা ? সাম্রাজ্যের সম্পদ তুচ্ছ করে পিতা-মাতার অগাধ স্নেহ উপেক্ষা করে, আমার হাত দুখানি ধরে ও যখন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল তখনও কি বল্‌বে ও আর কিছু নয়, শুধুই রাজকন্যা ?

মদ ॥ অপরাধ হয়েছে দাদা ! চল মা বাবার কাছে যাই। বাবাকে ভারী বিষণ্ণ দেখলাম কেন মা ?

ধরণী ॥ (খনার দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া) প্রসন্ন থাকবার উপায় কই মা ?

মদ ॥ তোমার জামাইয়ের মুখে আমিও কথাটা শুনেছি মা ! হ্যাঁ বৌদি রাণী না হয়ে বধূপনা ক'রতেই যখন এসেছ তখন আর জ্যোতিষ চর্চাটা কেন ?

ধরণী ॥ ঘর কন্না ক'রতে হলে ঘর-কন্নাই ক'রতে হয় মা। জ্যোতিষ-চর্চাটা যাঁদের কাজ তাঁরাই করুন।

মদ ॥ এই বা কি কথা বুঝি না বৌদি—যে রাজ্যশুদ্ধ লোক এসে ঘরের বউয়ের কাছে ধন্না দেবে, কপালের লিখনটা পড়ে দাও। দেশের শ্রেষ্ঠ

জ্যোতির্বিদ বাবা যেখানে বর্তমান সেখানে তুমিই বা কোন্ সাহসে তাদের ভাগ্য-বিচার ক'রতে বসো বলতো ?

ধরণী ॥ কথাটা ভালও ত নয় মা !

মদ ॥ নবরত্নের পণ্ডিত যেখানে বর্তমান সেখানে তাঁকে দিয়ে গণনা না করিয়ে তোমাকে দিয়ে গণনা করানোর অর্থ এই তো—যে তোমার মুখখানি সুন্দর !

ধরণী ॥ যে দিক্ দিয়েই দেখ, এতে যে কর্তার মাথা হেঁট হ'চ্ছে, এ কথাটা আমি তোমাকে কি ক'রে বোঝাব মা ? আয় মদনিকা !

মদ ॥ চল মা ! বৌদি না বুঝলেও দাদা যে একথাটা কেন বোঝে না, তা' আমি বুঝি না।

মদনিকা ও ধরণীর প্রস্থান।

খনা ॥ আমাকে নিয়ে চল। এই যদি সংসার হয় তবে আমায় এখান থেকে উদ্ধার কর—রক্ষা কর—

মিহিরের বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিহির ॥ যদি তুমি আমায় ভালবাস খনা, তবে আমার মুখ চেয়ে এ নির্য্যাতন সহ্য করা কি একান্তই অসম্ভব ?

খনা নীরব রহিল।

রামের মুখ চেয়ে সীতা যে লাঞ্ছনা সানন্দে সহ্য করেছিলেন, তারই নাম রামায়ণ। পঞ্চপাণ্ডবের মুখ চেয়ে দ্রৌপদী যে নির্য্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন তারই নাম মহাভারত। সেই রামায়ণ··· সেই মহাভারত তোমাকে কি শান্ত ক'রতে পারবে না খনা ?

খনা নীরব রহিল।

নেপথ্যে বরাহ ॥ মা !—

মিহির ॥ পিতা !

পরস্পর আলিঙ্গন-মুক্ত হইল। বরাহের প্রবেশ।

বরাহ ॥ মিহির ! তুমি এখানে ? আচ্ছা তুমি- (খনা চলিয়া যাইতেছিল) না মা তুমি দাঁড়াও ! (মিহিরকে) তুমিই বরং— [মিহিরের প্রস্থান]

(ক্ষণিক নীরবতা) খগোল তুমি জান মা ?

খনা ॥ জানি।

বরাহ ॥ একটা গণনা করো তো মা !

খনা ॥ গণনা আর আমি ক'রব না পিতা !

বরাহ ॥ কেন ?

খনা নীরব।

কেন গণনা ক'রবে না মা ?

খনা ॥ আমি আজ হ'তে জ্যোতিষ-চর্চা ত্যাগ ক'রলাম দেব !

বরাহ ॥ সে কি মা ? জ্যোতিষের সর্বোচ্চ ষ.শাশিখর যখন তোমার আয়ত্তাধীন, তখন তুমি এ কথা কেন বল ?

খনা ॥ হ্যাঁ দেব যে কথা বলেছি, সেই কথাই সত্য।

বরাহ ॥ হঠাৎ তোমার এ সিদ্ধান্তের কারণ কি মা ?

খনা ॥ আমাকে ক্ষমা করুন দেব !

বরাহ ॥ তোমাকে কেউ ক্ষমা ক'রবে না মা ! মূর্তিমতী সরস্বতীর মত তুমি জ্যোতিষে নব নব আবিষ্কার ক'রেছ। সনাতন শাস্ত্রের সঙ্গে তার বিরোধ হয় বলেই আমি তা গ্রহণ ক'রতে পারি না—আজন্মের সংস্কার এসে বাধা দেয়। কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলেও, তোমার গণনা, তোমার বচন যে অভ্রান্ত তা ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বের এত বড় কল্যাণ আয়োজন করে মধ্য পথে তুমি নিবৃত্ত হ'লে আমিই যে তাতে বাধা দেব মা !

খনা ॥ তাই কি !

বরাহ ॥ তুমি হয় ত শুনেছ, আমি তোমায় হিংসা করি—শুনেছ আমি তোমায় ঘৃণা করি—ভেবেছ তোমার জয়ে আমি ক্ষুব্ধ—কিন্তু যদি জানতে মা—

খনা নিরুত্তর।

যদি জান্‌তে মা, নিশীথ রাত্রে—

খনা। কি ?

বরাহ ॥ নিশীথরাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সারা বিশ্বে একটি প্রাণীও জেগে থাকে না তখন, তখন—আমার এই দেহ-পিঞ্জর হ'তে বের হ'য়ে আসে আমার অনাবিল অকলঙ্ক আমি—হিংসা জানে না—দ্বেষ জানে না—তোমার জয়ে ক্ষুব্ধ হয় না—ধীরে ধীরে সেই আমি তোমার যশ-মন্দিরের সোপান শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়াই—তোমার যশের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে তোমাকে—আমি ভক্তিভরে মুগ্ধচিত্তে প্রণাম করি—প্রণাম করি।

খনা ॥ পিতা ! প্রভু !

অদূরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ও আরতি বাদ্য শোনা গেল।

বরাহ ॥ সন্ধ্যার আরতি ! সন্ধ্যা !

যেন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত।

ঐ আকাশে ক'টি তারা খনা ?

খনা ॥ কে ব'ল্‌তে পারে ঐ আকাশে কয়টি তারা ?

বরাহ ॥ আমি পারি নি—আমি পারি নি, কিন্তু উত্তর আমার চাই—ই চাই। বল।

খনা ॥ গণনা না করে কি করে বলা যায় ?

বরাহ ॥ গণনা কর—গণনা কর—

খনা ॥ গণনা আমি আর করব না পিতা।

বরাহ ॥ (খনার হাত চাপিয়া ধরিয়া) গণনা তোমাকে ক'রতেই হবে।

খনা ॥ শোন মা। সম্রাটের প্রশ্ন আকাশে কয়টি তারা। এই সন্ধ্যায় যদি আমি তার উত্তর দিতে পারি, নবরত্ন সভায় স্থান হবে, না দিতে পারলে নব-রত্ন সভা হ'তে বহিষ্কৃত হব। আমি মৃত্যু বরণ ক'রতে পারি কিন্তু পরাজয়ের অপযশ কিছুতেই—কিছুতেই সহ্য করতে পারব না আমি। সন্ধ্যা আগত! আমি অপরাগ! তুমি আমাকে উত্তর বলে দেবে—সেই উত্তর আমি সম্রাট সকাশে নিজস্ব উত্তর বলে প্রচার করে আমার আসনে আমার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখব। উপায় নাই মা! এ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই! কি তুমি এখনও নীরব ? আমার অপমান, আমার অসম্মানই কি তবে তুমি কামনা ক'রছ, খনা ?

খনা ॥ না, না, আমি গণনা ক'রব, আমি গণনা ক'রব !

বরাহ ॥ তুমি আমায় বাঁচালে মা, বাঁচালে। [উভয়ের প্রস্থান]

বিক্রমাদিত্য ও বিভাবসুর প্রবেশ।

বিভা ॥ সম্রাট দেখলেন ত, শুনলেন তো সব ?

বিক্র ॥ আর আমার দ্বিধা নাই মন্ত্রী ! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সমাবেশ-কল্পেই আমার নবরত্ন সভা। সেই সভায় আজ থেকে—সরে এস, ঐ ওঁরা আসছেন। [উভয়েয প্রস্থানোদ্যত।]

ছুটিয়া বরাহের প্রবেশ, পশ্চাতে খনা।

বরাহ ॥ কে শুন্‌তে চাও আকাশে ক'টি তারা। একি! সম্রাট! শুনতে চান আকাশে ক'টি তারা ?

বিক্র ॥ শুন্‌তে চাই কিন্তু খনা দেবীর মুখে !

বরাহ ॥ কেন ! সম্রাট, আমি এখনও বর্তমান, নবরত্নের জ্যোতিষ-রত্ন আমি, আপনার নিজ হস্তে দত্ত এই সম্মানের অসম্মান ক'রতেই কি আপনি আজ বদ্ধপরিকর ?

বিক্র ॥ হ্যাঁ—সম্মানের প্রকৃত অধিকারীকে ভূষিত ক'রবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। প্রকৃত ঘটনা আমরা অবগত। আপনি পদচ্যুত। আপনি নব-রত্নের অলংকার উন্মোচন করে খনা দেবীকে ভূষিত করুন। দেবী আসুন—

খনা ॥ কোথায় ?

বিক্র ॥ নবরত্ন সভায়—

খনা ॥ বধূর স্থান সভায় নয়, স্বামীর ঘরে, শ্বশুরের ভিটায়।

বরাহ ॥ নাও মা—এ রাজার দান।

খনা ॥ রাজার দান আমি উপেক্ষা ক'রতে পেরেছি কিন্তু দেবতার দান—আপনার দান আমি উপেক্ষা ক'রতে পারি না—আমি মিনতি ক'রছি পিতা ও অলঙ্কার আমায় পরতে আদেশ ক'রবেন না—আপনার আশীর্বাদে যে অলঙ্কার আমি পরেছি—হাতের এই শাঁখা—সিঁথের এই সিন্দূর যেন এই অলঙ্কার আমার অক্ষয় হয়।

বরাহ-চরণে প্রণতা হইল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরাহের বাসভবন

বহিঃপ্রাঙ্গণ

বরাহ ও মিহির।

বরাহ ॥ বিবেচনা করে দেখ মিহির, বার্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন পুত্র-পুত্র-বধূ। পুত্রের সেবা এবং পুত্র-বধূর শুশ্রূষা পাচ্ছি এবং পাব আশা করেই এ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও বাঁচতে লোভ হয়! পরম জ্ঞানবতী বধূমাতা এ কথা বুঝেও আমাদের পরিত্যাগ করে পিত্রালয়ে সিংহলে যেতে চান কোন্ প্রাণে ?

মিহির ॥ পিতামাতাকে দেখেই আবার সে ফিরে আসবে। পিতামাতার সে একমাত্র সন্তান। আমার কথাও বিবেচনা করুন। পুত্র না হ'লেও আমি তাঁদের পুত্রাধিক ছিলাম। আমাদের উভয়কেই একসঙ্গে হারিয়ে তাঁদের মনের অবস্থা আপনার কল্পনা করা কঠিন নয় পিতা !

বরাহ ॥ হ্যাঁ, কিন্তু তবু—

মিহির ॥ পিতামাতার বিরহে আপনার বধূমাতার কি অবস্থা হয়েছে স্বচক্ষে দেখেছেন পিতা ? আপনি অনুমতি করুন আমরা সিংহলে গিয়ে তাঁদের একটিবার দেখে আসি!

বরাহ ॥ আমরা ?

মিহির ॥ আমি এবং খনা।

বরাহ ॥ তুমি ?

মিহির ॥ হ্যাঁ, আমি আর খনা।

বরাহ ॥ অসম্ভব—অসম্ভব। তোমাকে স্বহস্তে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। বহু পুন্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি। যে ভুল একবার করেছিলাম, দ্বিতীয়বার সে ভুল ক'রতে সাহস নাই। না মিহির, আমি তোমাকে যেতে দিতে পার্‌ব না।

মিহির ॥ শুনুন পিতা—

বরাহ ॥ না, না, আমাকে বিরক্ত করো না মিহির। সম্রাট আমাকে স্মরণ করেছেন। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না। আমি রাজসভায় চললাম।

মিহির ॥ কিন্তু খনা—

বরাহ ॥ (ফিরিয়া) তবে শোন মিহির, তোমার বিচ্ছেদ যদি বা সইতে পারি, তার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে দুঃসহ। তুমি আমার পুত্র····কিন্তু সে আমার মা লক্ষ্মী!

মিহির ॥ আপনি শুধু নিজের দুঃসহ অবস্থাই কল্পনা করছেন। কিন্তু তার দুঃসহ ব্যথা স্বচক্ষে দেখেও আপনার মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হচ্ছে না। স্বার্থপরতায় আপনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর হবেন না। আমি আপনাকে মিনতি করছি পিতা—

বরাহ ॥ (ভাবাবেগ দমন করিয়া) বেশ, তোমরা যেতে পার। (ক্ষণিক নিস্তব্ধতা) যাও—(রুদ্ধ আবেগ দমনে অক্ষম হইলেন) এস, আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও। সে—তুমি—তোমরা দু'জনেই, দু'জনেই—

[চলিয়া গেলেন। অন্তপুর হইতে বিরহ-ব্যাকুলা খনার প্রবেশ।]

খনা ॥ পিতা কি বলে গেলেন, মিহির ?

মিহির ॥ (নীরব)

খনা ॥ অনুমতি দিয়েছেন ?

মিহির ॥ (নীরব)

খনা ॥ দেন নি ?

মিহির ॥ দিয়েছেন।

খনা ॥ তবে এস, আজই আমরা যাত্রা করি। কাল রাত্রে সেই দুঃস্বপ্ন দেখা অবধি আমি আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধ'রতে পারছিনা। এস আমরা প্রস্তুত হই—

মিহির ॥ আমি যেতে পারব না খনা,—

খনা ॥ তার অর্থ ?

মিহির ॥ অর্থ অতি সহজ। তুমি যাবে—সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষী, অভিভাবক দেব।

খনা ॥ তুমি যাবে না?

মিহির ॥ না—

খনা ॥ পিতা অনুমতি দেন নি?

মিহির ॥ দিয়েছেন।

খনা ॥ তবে?

মিহির ॥ দিয়েছেন ব'লেই যেতে পারব না। না দিলে হয়ত অবাধ্য হয়েই যেতাম।

খনা ॥ অনুমতি পেয়েও তুমি যাবে না?

মিহির ॥ তুমি যাও।

খনা ॥ আমি যাব? একা? তোমাকে রেখে?

মিহির। আমি নিরুপায়। আমি যেতে পারব না। তুমি যেতে পার। যদি যাও, বল, আমি তার আয়োজন করি।

খনা ॥ (নীরব রহিল)।

মিহির ॥ তুমি যাবে না?

খনা ॥ (নীরবে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল)

মিহির ॥ তুমি যাবে না?

খনা ॥ না।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত-অশ্রু রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

মিহির ॥ আমি নিরুপায়! আমি নিরুপায়! পিতা যদি অনুমতি না দিতেন, আমি অবাধ্য হ'য়েই যেতাম—কিন্তু, না—আমি নিরুপায়! আমি নিরুপায়!

খনা ॥ নিরুপায় নয়, নিষ্ঠুর। নইলে পিতার অনুমতি পেয়েও—

মিহির ॥ সে অনুমতির অর্থ পুত্র-বধূ বোঝে না, বোঝে পুত্র। [প্রস্থান]

খনা এই বাক্যবাণে আহত হইল এবং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খনা ॥ ও কে? কে আসছে? তিলক?

নেপথ্যে তিলক। ওহে, এই কি জ্যোতিষার্ণব বরাহের গৃহ?

খনা ॥ (চরম ব্যাকুলতায়) তিলক! তিলক!

নেপথ্যে তিলক ॥ দেবী! [তিলকের প্রবেশ]

খনা ॥ তিলক!

তিলক ॥ দেবী! দেবী!

খনা ॥ কিন্তু তুমি এখানে তিলক!

তিলক ॥ যদি বল্‌তে পার্‌তাম তুমিই বা কেন এখানে দেবী? ব'ল্‌তাম কিন্তু চিরকালের ভৃত্য আমি, আমি তা বল্‌ব না। বরং বল্‌ছি, যেখানে তুমি, সেখানেই আমার স্থান।

সামরিক প্রথায় খনাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

খনা ॥ (আপন মনে) না—না—কি মনে ক'রবেন তাঁরা—না—না—তুমি ভুলে যাচ্ছ তিলক! তোমাদের সে রাজকন্যা মরে গেছে। আজ আমি সংসারের বধূ—অমন ভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় লজ্জা দিও না—তুমি বরং—

তিলক ॥ কিন্তু দেবী, আমি তো একা নই, সমগ্র সিংহল ছুটে আসছে। এখনি এসে পড়ল বলে! কী সমারোহে তারা আসছে!

খনা ॥ আসছে—সমগ্র সিংহল,…আমার বাবা? না—না, এ সব কি? এ কি অন্যায়? আমি বধূ। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর একমুষ্টি আতপ তণ্ডুলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এ কি অত্যাচার! না তিলক, তুমি—তুমি—তুমি এখান থেকে বরং চলেই যাও—হ্যাঁ তোমাকে ও ভাবে আমি সইতে পারছি না। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর এখানে এসে তোমাকে এ ভাবে দেখেন, এ আমি ইচ্ছা করি না—ইচ্ছা করিনা তিলক! ফিরে যাও তুমি—ফিরে গিয়ে যারা আসছে, তাদের বল, তারা ও ভাবে আমার এখানে এলে আমি আত্মহত্যা—হ্যাঁ, আমি আত্মহত্যা ক'রব।

তিলক ॥ দেবী—তিনি—

খনা ॥ ছুটে যাও… ছুটে গিয়ে আমার বাবাকে বল, তিনি আসুন—

তিলক ॥ দেবী—তিনি—

খনা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনি আসুন। শোভাযাত্রা করে নয়, গরীব-মেয়ের পর্ণ-কুটীরে যেমন আসে—

তিলক ॥ কিন্তু—

খনা ॥ আমার অবাধ্য হ'চ্ছ তিলক—যাও। [তিলকের প্রস্থান]

তিলকের প্রস্থান অন্য দিক দিয়া মিহিরের প্রবেশ।

খনা ॥ (তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে) সিংহলে আর বোধ হয় না গেলেও চ'ল্‌বে মিহির!

মিহির ॥ হ্যাঁ, সবই শুনেছি রাজকন্যা! সবই শুনলাম—গরীবদের মর্মে আঘাত না লাগে সেজন্য তোমার মহানুভবতার যে অন্ত নাই—তা দেখে শুধু এই কথাই আজ আবার আমার মনে হচ্ছে যে আমাকে পতিত্বে বরণ করে তোমার কি ক্ষতিই না হয়েছে!

খনা ॥ মিহির! মিহির!

মিহির ॥ আজ বোধ হয় মর্মে-মর্মে বুঝছ খনা, মহাকালের চতুষ্পাঠীতে

সেই গোধূলি লগ্নে কি ভুলই তুমি করেছিলে যে আজ তোমার সংসারে দেহ-রক্ষীর ঠাঁই নাই—একটা শোভা যাত্রার ঠাঁই নাই!

খনা ॥ মিহির! মিহির! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। অনর্থক—অনর্থক তুমি আমায় আঘাত করছ! তুমি কি জান না—জান না আমায়? আমি সব সইতে পারি—শুধু সইতে পারি না—তোমার অনাদর—তোমার উপেক্ষা——তোমার তিরস্কার—তোমার আঘাত।

ছুটিয়া কামন্দকের প্রবেশ।

কামন্দক ॥ সর্বনাশ—সর্বনাশ—মহা সর্বনাশ!

মিহির ॥ কি সর্বনাশ?

কামন্দক ॥ সম্রাট প্রভুকে প্রকাশ্য-রাজসভায় বিষম অপমান করেছেন।

খনা ॥ সে কি?

কামন্দক ॥ কারণ আপনি খনা দেবী!

মিহির ॥ সে কি?

কামন্দক ॥ ওঁর গণনা—ওঁর বচন। আপনারা কি আর অছেন? খনার বচনে যে দেশ ছেয়ে গেছে! মা সরস্বতী আর আপনাদের জ্যোতিষ গ্রন্থের পাতায় বাস করছেন না। আশ্রয় নিয়েছেন ওঁর ঐ জিহ্বায়—

মিহির ॥ তুমি বল—তুমি বল কামন্দক—পিতার সংবাদ বল—

কামন্দক ॥ পিতার কথাই বল্‌ছি। নবরত্ন সভায় সম্রাট প্রভুর আসনে ওঁর স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রভুকে ঐ সভায় নিমন্ত্রণ করে সাধারণ আসনে তাঁর স্থান নির্দেশ ক'রেছেন।

মিহির ॥ কামন্দক!—

কামন্দক ॥ প্রভুর এই অপমান সভাশুদ্ধ লোক পরমানন্দে উপভোগ করছে। কি সে ব্যঙ্গ—কি সে বিদ্রূপ!

খনা ॥ সম্রাটের এ কি আচরণ?

কামন্দক ॥ আপনার মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে খনা দেবী—সম্রাট শুধু আপনার স্বর্ণ-মূর্ত্তি নবরত্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রভুকে বৃত্তি-চ্যুত করে আপনার বৃত্তি ধার্য্য করেছেন। অর্থাৎ দু' মুষ্টি অন্নের জন্য প্রভুকে আপনার মুখের পানেই—

মিহির ॥ কামন্দক—না—খনা—

খনা ॥ বল—

মিহির ॥ তুমি আমাদের কুগ্রহ—তোমারই জন্য···তোমাদেরই জন্য পিতার এই অপমান—পুনঃ পুনঃ এই অমর্য্যাদা—অবশেষে চরম এই লাঞ্ছনা!

খনা ॥ মিহির—

মিহির ॥ কুক্ষণে ভেলায় ভেসে সিংহলে কূল পেয়েছিলাম, কুক্ষণে তোমার

পিতামাতা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, কুক্ষণে তোমায়-আমায় জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলাম, কে জানত, কে জানত তখন, হে তুমিই হবে আবার জীবনের একমাত্র কুগ্রহ !

খনা ॥ মিহির—মিহির—

মিহির ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু আমার কুগ্রহ নও—আমার কুগ্রহ' পিতার কুগ্রহ—আমাদের সংসারের কুগ্রহ—কিন্তু কাকে তিরস্কার ক'রব খনা—এ আমার নিয়তি—তোমার নিয়তি—কোথায় পিতা ! এস কামন্দক— [প্রস্থান]

কাম ॥ কি করে যে ঐ মুখ আপনি এখনও দেখাচ্ছেন, ভেবে পাই না—বাপ্—মুখের কি কাল-বচন—আমি হ'লে অমন জিভ্ কেটে ফেলতাম।

[প্রস্থান]

খনা ॥ (মরণাহতে আহত লইয়া) ওঃ আমার বচন—আমার জিহ্বা—তাই হোক—তাই হোক—

দু' হাতে মুখ ঢাকিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান।

শশব্যস্তে বরাহ তৎপশ্চাৎ মিহির প্রবেশ করিলেন।

বরাহ ॥ কোথায় খনা ? কোথায় খনা ?

মিহির ॥ তোমায় তারা অপমান করেছে পিতা ! আমি জানতে চাই কি অপমান করেছে—

বরাহ ॥ অপমান ! অপমান ! মূর্খ তারা—আমায় অপমান ক'রতে চেয়েছিল ! ওদের আমি ব'লে এলাম—আজ এই স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে এই অপূর্ব-কাহিনীই বিশ্বময় বিঘোষিত হবে যে, বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন-সভায় বরাহ পণ্ডিতের আসন পূর্ণ করবার সাধ্য অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির হয় নি সে আসন পূর্ণ করেছিল বরাহ পণ্ডিতেরই কুললক্ষ্মী প্রাতঃস্মরণীয়া খনা দেবী ! শুধু কি তাই বলেছি। মিহির—গর্বভরে বলে এলাম, সম্রাট ! স্বর্ণমূর্তি কেন ? মা যখন স্বয়ং বর্তমান মাকে আন—আমার আসনে মহা-সমারোহে তাকে বরণ কর। তাতে শুধু নবরত্ন ধন্য হবে না—সমগ্র ভারতবর্ষ ধন্য হবে—জগতের ইতিহাসে আর্য্য-নারীর এই গৌরব-গাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। খনা মা'র অমরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অমর হয়ে থাকব··· মিহির··· আমি····এবং বিদ্যোৎসাহী সম্রাট তুমি ! স্বয়ং সম্রাট খনা মার জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্লেন—সভাভঙ্গ ক'রে শোভাযাত্রা করে তাঁরা আসছেন····মা'কে আমার নব-রত্ন সভায় বরণ ক'রে নিতে ! মা ! মা ! কোথায় তুমি—আমি স্বহস্তে আজ তোমায় সাজিয়ে দেব—মিহির ! তুমি খনা মা'কে নিয়ে এস।

মিহির ॥ আমি আনছি—আমি আনছি।

ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

বরাহ ॥ একি ! আপনারা ? [মিহিরের প্রস্থান]

তিলকের সহিত সিংহল রাজ্যের মন্ত্রিত্রয়ের নগ্নপদে প্রবেশ।
স্বর্ণথালায় রাজমুকুট।

প্রধান মন্ত্রী ॥ আমরা সিংহলের মন্ত্রীত্রয়। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন জ্যোতিষার্ণব।

বরাহ ॥ সিংহলরাজের কুশল ?

প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন। সম্রাজ্ঞীও সহ-মৃতা হয়েছেন। সিংহলের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনার বধূমাতা খনা দেবী —। সম্রাটের শেষ কামনানুযায়ী ...আমরা তাঁকে বরণ করে সিংহলে নিয়ে যেতে এসেছি....এই তাঁর রাজমুকুট !

বরাহ ॥ কিন্তু—কিন্তু ঐ মুকুট অপেক্ষা তাঁকে অধিকতর মহার্ঘ মুকুটে সম্মানিত করবার জন্য আসছেন বিশ্ব-বিশ্রুত সম্রাট বিক্রমাদিত্য ! ঐ দেখুন—

জয়বাদ্য। স-সভাসদ বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ। সঙ্গে স্বর্ণথালে জয়মুকুট

বরাহ ॥ সম্রাট জয়তু !

বিক্রমাদিত্য ॥ মা কই ? মা ?

বরাহ ॥ আজ আমার কি সৌভাগ্য। মা, মা—

একাকী মিহিরের প্রবেশ।

মা কই ? মা কই ?

মিহির ॥ সে আর আসবে না—

বরাহ ॥ আসবে না ! সে কি ! আমি যাই —

মিহির ॥ (তাহাকে বাধা দিয়া) না—

বরাহ ॥ কেন ?

মিহির ॥ সে আমায় বলেছিল, আমি সব সইতে পারি—শুধু সইতে হোক না যে তুমি আমায় ভালবাসবে না ! সব সইতে পারি—সইতে পারি না — তোমার অনাদর—তোমার উপেক্ষা—তোমার তিরস্কার—

বরাহ ॥ তুমি তাকে তিরস্কার—

মিহির ॥ হ্যাঁ আমি করেছিলাম—তবু—তবু—আজ আমি তাকে তিরস্কার করেছিলাম !

বরাহ ॥ মা বুঝি তাই অভিমান ক'রে বসে আছে ! হাঃ হাঃ হাঃ আমি গিয়ে নিয়ে আসছি—

মিহির ॥ (তাঁহাকে বাধা দিয়া) দাঁড়ান। কামন্দক এসে বললে, সম্রাট কর্তৃক তোমার লাঞ্ছনা—ক্রোধে আমি জ্ঞান হারিয়ে তাকে আমি —

বরাহ ॥ তাকে তুমি? তাকে তুমি?

মিহির ॥ (নিরুত্তর)।

বরাহ ॥ (চরম আশঙ্কায়) খনা! খনা!

মিহির ॥ কি বল্‌ব পিতা! (হঠাৎ কাঁদিয়া) সে নেই! সে নেই!

বরাহ ॥ নেই! তুমি বল্‌ছ কি মিহির? খনা!—খনা!

মিহির ॥ কাকে ডাক? কেন ডাকে? তাকে আমি—তাকে আমি হত্যা করেছি—অস্ত্র দিয়ে নয়—শুধু কথায়—শুধু ভর্ৎসনায়!

বরাহ ॥ অ্যাঁ!

ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

মিহির ॥ ঐ দেখ পিতা! অভিমানিনী আমার কর্তিত জিহবার রক্তসাগরে ছিন্নকমলের মতো—

খনার মৃতদেহ বুকে তুলিয়া লইয়া বরাহ ফিরিয়া আসিলেন।

বরাহ। মা—মা, দীনের কুটীরে লক্ষ্মীপূজা আয়োজন করেছে সিংহলে। সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছে ভারত। মা—মা—ভক্ত এসেছে দ্বারে তুই কথা ক'—কথা ক'—

সিংহলমুকুট ও ভারতমুকুট দুইটি শ্রদ্ধাভরে সোপান
প্রান্তে অর্ঘ্য দিল।

সমাপ্ত

রঘু ডাকাত

(ত্রয়াঙ্ক নাটক)

রঘু ডাকাত

শ্রদ্ধাস্পদ নট ও নাট্যকার

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর

শ্রীচরণকমলেষু

আবাল্য গুণমুগ্ধ

মন্মথ রায়

রঘু ডাকাত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[৭০৫ বঙ্গাব্দ। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড় রাজ্য মধ্যস্থ 'কেলে-ঘাই' নদীতীরে চন্দনপুর গ্রাম। নারায়ণগড়ে তখন শ্রীশ্রীনারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। রাজ্যে দস্যুদের প্রবল অত্যাচার দমনে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি নারায়ণগড়ে একটি পরিখাবেষ্টিত দুর্গ রচনা করিয়াছেন।

চন্দনপুরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বৃন্দাবন দাসের গৃহদেবতা গোপীমোহনের ঠাকুরঘর। প্রাঙ্গণ। এই ঠাকুরঘরটি সদর ও অন্দরের যোগস্থলে অবস্থিত।

ঊষা। প্রভাতী পাখীর কলরব। অপসৃয়মান অন্ধকারের মধ্যে ঊষাকীর্তনরত কৃষ্ণা ও অর্জুন বিপরীত দিক হইতে মণ্ডপে মিলিত হইল। অর্জুনের হাতেফুলের সাজি ও কৃষ্ণার হাতে পুজোপকরণে।

কৃষ্ণা বৃন্দাবনের একমাত্র কন্যা। ষোড়শী। অর্জুন বাড়ির রাখাল। কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।

ঊষা-কীর্তন সমাপ্তির মুখে প্রথমে মহামায়া ও তৎপর বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিলেন। মহামায়া বৃন্দাবনের কনিষ্ঠা ভগ্নী, বাল্য-বিধবা, নিঃসন্তান।

কৃষ্ণা ঠাকুরের সামনে কীর্তন গাহিতেছিল। অর্জুন ঠাকুর-ঘরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া করতাল বাজাইয়া কীর্তন গাহিতেছিল। কীর্তন শেষে বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। সোপান-প্রান্তে অর্জুনকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন।]

বৃন্দাবন॥ দেখ বাবা অর্জুন, ঊষা-কীর্তন কর, এ খুব ভালো কথা। ঊষা কীর্তন করতে তোমার কোন দিনই ভুল হয় না—গোপীমোহন তোমার মঙ্গল করবেন। কিন্তু বাবা—এই যে আমরা প্রণাম করি—

নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়, গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্বিহাতায়, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

গরুর হিতের জন্যই গোবিন্দকে আমরা ডাকি। সেই গরুকে তুমি কি করছ? অযত্ন করছ। পাপ হচ্ছে কি না বল?

[অর্জুন নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল]

বৃন্দাবন ॥ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না। যাও, গোয়াল-ঘরটা ছাপ কর। ওটা ত নরককুণ্ড করে রেখেছ। (মহামায়ার প্রতি) মহামায়া, এসো বোন, রাজবাড়ি যাবার জন্য গোছ-গাছ করতে হবে। (অর্জুনকে) আর দেখ, গরুগুলো ওপারের মাঠে নিয়ে চরিয়ো। দু'টো ঘাস খেয়ে বাঁচবে। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[বৃন্দাবন ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। মহামায়া বৃন্দাবনকে জানাইবার জন্য অর্জুনকে উঁচু কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিলেন]

মহামায়া ॥ আসছি দাদা। (অর্জুনকে) গরুগুলোর যা ছিরি হয়েছে— তা আর চোখে দেখা যায় না।

[বৃন্দাবন অদৃশ্য হইলে মহামায়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন]

মহামায়া ॥ তোর চেহারাও শুকিয়ে যাচ্ছে অর্জুন। কেন বলত?

অর্জুন ॥ (বিষণ্ণ হাসিতে) এবার থেকে ভালো করে ঘাস খেতে হবে। তুমি কিছু ভেবো না পিসিমা।

মহামায়া ॥ (হাসিয়া) মাঠে যাবার আগে দুধ খেয়ে যাস কিন্তু। তারপর যত পারিস—খাস।

[মহামায়া চলিয়া গেলেন। অর্জুন চলিয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণা হাততালি দিয়া অর্জুনকে থামিতে সঙ্কেত করিল। অর্জুন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা নামিয়া আসিয়া অর্জুনের পাশে দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ তোমার আবার কি হুকুম?

কৃষ্ণা ॥ জলপদ্ম দেবে বলেছিলে—কই দিলেনা তো?

অর্জুন ॥ উঃ, সকালবেলা থেকেই বকুনি খেয়ে খেয়ে গেলাম।

কৃষ্ণা ॥ বাঃ রে—এর নাম বকুনি হলো? জলপদ্ম তুমিই তো দেবে বলে-ছিলে। না দিলে বলব না?

অর্জুন ॥ জলপদ্ম! জলপদ্ম! স্থলপদ্ম দেখে জলপদ্মের কথা ভুলে যাই।

কৃষ্ণা ॥ বাঃ, খুব কথা বলতে শিখেছ তো?

অর্জুন ॥ তা হয়তো শিখেছি—কিন্তু বলতে পারছি কই। কত কথা মনে জমে রয়েছে। কিন্তু বলতে দিলে কে? না, যাই, গরু চরাবার সময় হলো।

কৃষ্ণা ॥ গরু ত ভারী চরাও। নদীর ধারে গরু ছেড়ে দিয়ে পাথরের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে শুধু বাঁশী বাজাও।

অর্জুন ॥ তুমি বুঝি দেখেছ?

কৃষ্ণা ॥ স্নানের ঘাটে যারা যায়—তারাই দেখে—তারাই বলে।

অর্জুন ॥ তুমি ত আর দেখো নি?

কৃষ্ণা ॥ আমাকে যে বাবা নদীতে স্নান করতে যেতে দেন না।

অর্জুন ॥ ভালোই করেন। জলপদ্মগুলোর পরমায়ু বাড়ছে।

কৃষ্ণা ॥ তাই নাকি? আমি এক্ষুনি যাব।

অর্জুন ॥ যেতে পার কিন্তু শেষে বল না যেন আমি ডেকে নিয়ে গেছি।

[কৃষ্ণা ইঙ্গিতে জানাইল যে কোন ভয় নাই]

কৃষ্ণা ॥ তুমি গরু নিয়ে চলে যাও—আমি পুজোর জল আনতে যাচ্ছি।

[অর্জুন চলিয়া গেল। কৃষ্ণা ঠাকুর-ঘর হইতে কলসী নিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নেপথ্য হইতে ত্রিলোচনের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

ত্রিলোচন ॥ না, না, বৃন্দাবন তুমি এসো দেখবে এসো—আমি ওকে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিচ্ছি।

[ত্রিলোচন অর্জুনকে টানিয়া লইয়া আসিলেন। পশ্চাতে বৃন্দাবন। ত্রিলোচন ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় রক্ষিত সাজি হইতে ফুল তুলিয়া ধরিলেন]

ত্রিলোচন ॥ (অর্জুনকে) এখনো বলবি—এ ফুল আমার গাছের নয়? (বৃন্দাবনকে) দেখলে বৃন্দাবন—নিজের চোখেই দেখলে ত? রঘু ডাকাতকে স্বপ্নে দেখে—মানত করেছিলুম—এই অতসী ফুলগুলো গোপীমোহনের পায়ে দেব। তা হতচ্ছাড়া ছোঁড়া কিনা রাত থাকতেই তুলে নিয়েছে!

বৃন্দবন ॥ অর্জুন!

অর্জুন ॥ আজ্ঞে, ও ফুল গোপীমোহনের পায়েই পড়েছে। যে কটা বেঁচেছে—ত্রিলোচন কর্তাকে আপনি দিন না এখন।

ত্রিলোচন ॥ তুই ঐ ফুল ছুঁয়েছিস—আর সেই ফুল আমি ঠাকুরের পায়ে দেব? (বৃন্দাবনকে) আজাত কুজাতের আস্পর্দ্ধাটা দেখছ বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন ॥ (অর্জুনকে) খবরদার! পরের গাছের ফুল ফের তুলেছ কি—আমি তোমাকে চাবকাব। কাজের কাজে মন নেই—যত সব অকাজ-কুকাজ। যাও—গরু নিয়ে মাঠে যাও। নিজে ত ফুলছ—এবার গরুগুলোর দিকে দয়া করে নজর দাও। আর শোন—গাছ তলায় শুয়ে বাশী না বাজিয়ে—গরুগুলো একটু চরিয়ো।

[অর্জুন নতমুখে চলিয়া গেল]

ত্রিলোচন ॥ পথের কুকুরকে মাথায় তুললে এই দশাই হয়। ভেবেছিল—হবে তোমার পুষ্যিপুত্তুর—রাখালি করবে তা'তো কোনদিন ভাবে নি।

বৃন্দাবন ॥ পুষ্যিপুত্র ছিল—যখন ছিল। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মাথায় করে রেখেছিলাম—দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছিলাম। কিন্তু গোপীমোহনের দয়ায় বড় বৌ যখন নিজেই পেটে সন্তান ধরলেন—তখন পথেকুড়নো ছেলেকে যে আবার পথেই ঠেলে দিইনি—এই ঢের।

ত্রিলোচন ॥ তা বটে। তুমি ত এখনো ভাত-কাপড় দিয়ে পুষছ। তবে তবে কিনা একটু চোখে চোখে রেখো দু'জনেরই বয়স হয়েছে কিনা। মানে —ঘি আর আগুন—বুঝলে ত? ও দূরে দূরে রাখাই ভালো।

[নৈবেদ্য হাতে নিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন ॥ এই যে বৃন্দাবনদা—নিজেই রয়েছেন। ভালোই হলো। গোপীমোহনের ভোগে আমার এই নৈবেদ্যটা দিও।

বৃন্দাবন ॥ সে কিহে গোবর্দ্ধন—হঠাৎ····

ত্রিলোচন ॥ এত ভক্তির ঘটা কেন হে?

গোবর্দ্ধন ॥ আর বল কেন? শোনোনি?

বৃন্দাবন ও ত্রিলোচন ॥ কি?

গোবর্দ্ধন ॥ রঘু ডাকাতের দল কাল আমাদের গা ঘেঁসে চলে গেছে।

বৃন্দাবন ॥ এ্যাঁ!

ত্রিলোচন ॥ বল কি গোবর্দ্ধন!

গোবর্দ্ধন ॥ হ্যাঁ পোড়া মশাল আমারই ধানের জমিতে ফেলে গেছে।

বৃন্দাবন ॥ গোবিন্দ বল! গোবিন্দ বল!

ত্রিলোচন ॥ আশে-পাশে কোথাও ডাকাতি হয়েছে বল।

গোবর্দ্ধন ॥ হয়নি আবার? চকদিঘীর মথুরা সাহার গদিতে চড়াও হয়ে যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে—মায় গৃহদেবতার গায়ের গহনা। তিনদিন আগে চিঠি দিয়েছিল ডাকাতি করবে—যা কথা তাই কাজ।

ত্রিলোচন ॥ অমনি একটা স্বপ্ন আমি দেখেছি বৃন্দাবন। কি হবে কে জানে। যাই ভাই বাড়ি যাই!

বৃন্দাবন ॥ আরে তোমার আমার কি ভাবনা। আমাদের কি আছে যে ডাকাতি করবে? যাদের দু'পয়সা আছে তারা ভেবে মরুক। ন্যাংটার আবার ডাকাতের ভয়!

ত্রিলোচন ॥ তা হ্যাঁ—তা বটে। তা যা বলেছ। কিন্তু ভাবি—এ রঘু ডাকাত কে কি কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না।

গোবর্দ্ধন ॥ আর শায়েস্তা করেছে। এত বাবা চোর নয়—এ হচ্ছে ডাকাত। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করে। কি সাহস! বুকের পাটাটা দেখতে হয়।

বৃন্দাবন ॥ না বাবা, ও আর দেখে কাজ নেই। গোবিন্দ বল! কিছু ভেবো না ভায়া—নারায়ণই রক্ষা করবেন।

গোবর্দ্ধন ॥ কই রক্ষা করছেন? এই রাজা নারায়ণবল্লভ। নারায়ণগড়ে এত বড় দুর্গ তৈরী করেছেন—সৈন্য সামন্তের সে কি জাঁক—কিন্তু বাবা রঘু ডাকাত—যা করবার করে যাচ্ছে। ধরতে গেলেই হাওয়া।

বৃন্দাবন ॥ ও আর বেশিদিন চলবে না। শুনলাম রাজা বলেছেন—আজ ভুবনমোহন প্রতিষ্ঠা করে ষোড়শোপচারে পুজো দিয়ে সৈন্য-সামান্ত নিয়ে রঘু ডাকাতকে ধরতে বেরুবেন। আজ নাকি রাজবাড়িতে বিরাট ব্যাপার—আমি যাচ্ছি যে। তোমরাও চল না হে, দেখে আসা যাক।

ত্রিলোচন ॥ না বৃন্দাবন আজ পারব না। উৎসব ত শুনছি—সাতদিন চলবে। যাব একদিন।

গোবর্দ্ধন ॥ হ্যাঁ তা বৈ কি। সুবিধামত একদিন গিয়ে দেখব এখন! গাঁ শুদ্ধ লোক একদিনে গাঁ ছেড়ে না যাওয়াই ভালো। কখন কি হয় বলা যায় না তো। তা কৃষ্ণাকে বলো—নৈবেদ্যটা যেন বৈকালীতে দেয়। এসো ত্রিলোচন।

[গোবর্দ্ধন ও ত্রিলোচন গোপীমোহনকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মহামায়া রাজবাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াদাঁড়াইয়াছে]

মহামায়া ॥ উঃ, এত গল্প তোমরা করতে পার দাদা। এখনও রওয়ানা হওয়া হলো না। সন্ধ্যার আগেই যে ফিরতে হবে—সেটা মনে আছে? আর সে মেয়ে কোথায় গেল তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তার আবার চুল বাঁধতে লাগবে ছ'মাস।

[জলভরা কলসী কাঁখে কৃষ্ণার প্রবেশ]

কৃষ্ণা ॥ কার কথা বলছ পিসিমা? আমার কথা। পুজোর জল আনতে গিয়েছিলাম।

বৃন্দাবন ॥ জল আনতে গিয়েছিলি? কোথায়? নদীতে?

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ বাবা আজ যে রাস-পূর্ণিমা।

বৃন্দাবন ॥ তা হোক। নদীর ঘাটে যেতে তোকে মানা করেছি না? চারিদিকে এত ভয়-ভীতি--তবু নদীর ঘাটে যাওয়া চাই। থাক তুই বাড়ি—এ মেয়েকে নিয়ে আমি রাজবাড়ি যাব না মহামায়া। আমি চাদরটা নিয়ে আসছি। [বৃন্দাবনের প্রস্থান]

কৃষ্ণা ॥ (কাঁদো কাঁদো সুরে) বেশ বাবা। পিসিমাকে নিয়ে যাব, কি এমন দোষ করেছি—আমাকে রেখে যাবে? অর্জুনদা ত ঘাটে ছিল পিসিমা। একা ত যাই নি।

মহামায়া ॥ কিন্তু এ হলো অনেক দূরের পথ। বাসন কিনতে হবে বলেই আমি যাচ্ছি। নইলে কি আর আমিই যেতুম।

কৃষ্ণা ॥ আমারও যে শাড়ি আর কাচের চুড়ি কিনতে হবে। নইলে কি আর যেতে চাই।

মহামায়া ॥ যাবি বৈ কি মা- তবে পথে রঘু ডাকাতের ভয় কি না। তাই তোর বাবা বারণ করছে।

কৃষ্ণা ॥ তোমার বুঝি রঘু ডাকাতের ভয় নেই ?

মহামায়া ॥ তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। আমরা যমের অরুচি রে--যমেরও অরুচি।

[চাদর স্কন্ধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বৃন্দাবনের প্রবেশ]

বৃন্দাবন ॥ কৃষ্ণা !

[কৃষ্ণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রাগের ভান করিল]

এই দেখ—পাগলি রাগ করেছে। আসল কথা কি মা—রঘু ডাকাতের লোক চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তোকে নিতে সাহস পাচ্ছি না। তোর জন্য ময়ূরপঙ্খী শাড়ী আনব—হ্যাঁ—হ্যাঁ--রাগ করিস না মা—বৈকালীতে ঐ নৈবেদ্যটা দিস্। অর্জুন ফিরে এলে বলবি—আজ যেন গরু চরাতে না যায়। কেষ্টা রইল—অর্জুন থাকবে—পাড়া-পড়শী ত আছেই। এস মহামায়া—এমনি দেবী হয়েছে—তার ওপর আবার গরুর গাড়ি—জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ! জয় গোবিন্দ।

[উভয়ে ঠাকুর প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদের প্রণাম করিল। তাহারা চলিয়া গেলে কৃষ্ণা কলসী কাঁখে লইয়া সোপান বাহিয়া ঠাকুরঘরে যাইবে—এমন সময় সন্তর্পণে অর্জুন আসিয়া দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা !

কৃষ্ণা ॥ মিথ্যেবাদীর সঙ্গে আমি কথা বলি না।

অর্জুন ॥ মিথ্যেবাদী আমি ?

কৃষ্ণা ॥ নয়তো কি ? খাঁ খাঁ করছে নদী। নদীতে জলপদ্ম ফুটেছে ?

অর্জুন ॥ (হাসিয়া) নদীতে কখনো জলপদ্ম ফোটে ? জলপদ্ম আমার সামনে।

কৃষ্ণা ॥ ফের মিথ্যে কথা ?

অর্জুন ॥ এই জল—এই পদ্ম। মিথ্যে কথা ?

[এই বলিয়া অর্জুন চলিয়া যাইতেছিল]

কৃষ্ণা ॥ দেখেছ! অর্জুনদা, শোন বলছি····

অর্জুন ॥ কি আর শুনব ? আমি মাঠে যাচ্ছি কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা ॥ না, আর মাঠে যাওয়া চলবে না। বাবা আর পিসিমা রাজবাড়ি গেছে—তুমি আমার পাহারা থাকবে।

অর্জুন ॥ রাজবাড়ি গেছেন মেলা দেখতে ? তুমি গেলে না কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ আমায় নিয়ে গেল না অর্জুনদা! পথে নাকি রঘু ডাকাতের ভয় আছে।

অর্জুন ॥ কিন্তু যাই বলো কৃষ্ণা—ও মেলায় আমি না গিয়ে পারব না। যা শুনছি—এত বড় মেলা এ মুল্লুকে কখনো হয়নি—হবে না। একেই ত

রাজবাড়ি—তায় আবার রাসের মেলা—তায় আবার ভুবনমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা। দেখনি—আজ রাত থাকতেই পথ দিয়ে পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে লোক ছুটেছে। আর যাবেই বা না কেন? ডাকাতের ভয়—ডাকাতের ভয়। রাজা অত বড় দুর্গ করেছেন শুনে ডাকাতের পিলে চমকে গেছে।

কৃষ্ণা ॥ বারে—তুমি সত্যিই যাবে নাকি! বাবা যে বারণ করে গেলেন।

অর্জুন ॥ বারণ করে গেলেন বটে—কিন্তু নিজে তো গেলেন।

কৃষ্ণা ॥ তা'ত গেলেন।

অর্জুন ॥ তবে? যা পুতুল নাচ হবে শুনেছি—জন্মে কেউ কখনো দেখেনি। একটা ভেল্কী এসেছে শুনলাম। নিজের মাথা কেটে—নিজেই রক্ত খাচ্ছে একটা মানুষ এসেছে শুনলাম—তার লেজ গজিয়েছে। তুমি থাক—আমাকে যেতেই হবে।

কৃষ্ণা ॥ বা রে—তুমি গেলে আমি কি করে থাকব? বাবা ত আচ্ছা লোক—এই লোকের ভরসায় আমাকে রেখে গেছেন।

অর্জুন ॥ সে তিনি জানেন। তোমার যদি একা থাকতে ভয় করে—আমার সঙ্গে আসতে পার। এমন একটা জংলা পথ আমার জানা আছে- যে যাব ওদের আগে—ফিরবও ওদের আগে।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু মেলায় বাবা যদি আমাদের দেখে ফেলেন?

অর্জুন ॥ কি করে দেখবেন? আমরা দেখব—যাতে আমাদের দেখতে না পান। লোকে গিজ গিজ করছে—কে কোথায় আছে—কে দেখছে?

কৃষ্ণা ॥ হুঁ?

অর্জুন ॥ হুঁ।

কৃষ্ণা ॥ (ইঙ্গিতে) চল।

অর্জুন ॥ (ইঙ্গিতে) চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নারায়ণগড় রাজপ্রাসাদ। একে রাস-পূর্ণিমা, তদুপরি অদ্য শ্রীশ্রীভুবন-মোহনের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব। সমারোহের অন্ত নাই। রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মেলা বসিয়াছে। অন্তরালে বিবিধ উৎসবের আভাস পাওয়া যাইতেছে। মেলায় প্রবেশ পথের একাংশ। লোকজনের ভিড়েও যাতায়াত। নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছে:

'জয় শ্রীভুবনমোহনের জয়।' মাঝে মাঝে রাজার জয়ধ্বনিও শোনা যাইতেছে: জয় শ্রীনারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দন পালের জয়।'

একটি পরিবার মেলা দেখিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের গ্রামের অপর একটি পরিবার মেলা দেখিতে আসিল। পথে উভয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইল]

প্রথম ব্যাক্তি ॥ কিহে সিধু, এত শীগ্‌গির ফিরছ যে ?

সিদ্ধেশ্বর ॥ না ফিরে উপায় আছে! যা মেলা বসেছে। এ বাবা দেখতে গেলে আজ রাত দুপুর হবে। দিনকাল যা পড়েছে—সন্ধ্যের আগে বাড়ি না ফিরে ত কোন উপায় নেই রসময় খুড়ো।

রসময় ॥ তা ভালোই করেছ। আমরা আজ ফিরব না ঠিক করে এসেছি। শুনেছি—রাজা নাকি খুব বড় ধর্মশালা করেছেন।

সিদ্ধেশ্বর ॥ তা করেছেন। আর মন্দিরও যা হয়েছে দেখবার মত। আর ভুবনমোহন দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না খুড়ো।

রসময় ॥ তোমার কাকীমা বলছেন—তেরাত্রি মন্দিরে থেকে ভুবনমোহনের প্রসাদ নিয়ে তবে বাড়ি ফিরবেন।

সিদ্ধেশ্বর ॥ তা এ বুদ্ধিটা মন্দ কর নি খুড়ো। এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে ঘরের চালও বাঁচবে—ধর্মকর্মও হবে। মানে রথ দেখা হবে—কলা বেচাও চলবে।

ছোট ছেলে ॥ আমি কলা খাব বাবা।

রসময় ॥ খালি খাব খাব·

[একটি লোক ভেঁপু বাজাইয়া যাইতেছিল]

ছোট ছেলে ॥ আমি ভেঁপু নেব বাবা।

কাকীমা ॥ (সিদ্ধেশ্বরকে) ঝঁ্যাটা উঠেছে বাবা ?

সিদ্ধেশ্বর ॥ ঝঁ্যাটাও উঠেছে—খুব উঠেছে।

রসময় ॥ ঐ—ঝঁ্যাটা কেনা এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোট ছেলে ॥ আমি ঝঁ্যাটা খাব বাবা।

কাকীমা ॥ তুই ঝঁ্যাটা খাবি কেন রে ?

রসময় ॥ তোর বাবা খাবে। চল।

[দুই দল দুই দিকে চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় গাহিতে গাহিতে একদল সঙের প্রবেশ। 'সঙে'র দলের প্রত্যেকের মুখে নানা ধরণের আজব মুখোস। এই দলের পিছনে পিছনে কৌতূহলী জনতার প্রবেশ। তাহার মধ্যে কৃষ্ণা ও অর্জুনকে দেখা গেল। তাহাদের হাতেও মুখোস।

এই জনতার মধ্যে বৃন্দাবন ও মহামায়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের কাঁধে ময়ূরপঙ্খী শাড়ী—মহামায়ার হাতে বাসন-পত্র।

কৃষ্ণা তাহাদের দেখিয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং অর্জুনকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিল। অর্জুন তৎপরতার সহিত মুখোস পরার ব্যবস্থা করিল। পরস্পর পরস্পরের মুখে

মুখোস পরাইয়া দিল। বৃন্দাবন ও মহামায়া ইহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু অর্জুন ও কৃষ্ণা মুখোস পরিহিত থাকায়—তাহাদের চিনিতে পারিলেন না। তন্ময় হইয়া গান শুনিতে শুনিতে 'সঙে'র পশ্চাতে পশ্চাতে সকলেই মেলার অপরাংশে চলিয়া গেলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

[ভুবনমোহনের মন্দিরাভ্যন্তর। মন্দিরের সেবকগণ ঝাড়গুলিতে আলো জ্বালিতেছে। একজন পূজারী ছুটিয়া প্রধান পুরোহিতকে সংবাদ দিল]

পূজারী ॥ নগর-কীর্তন শেষ করে মহারাজ দলবল নিয়ে এখানে আসছেন—আরতি দেখতে।

প্রধান পুরোহিত ॥ তাতো আসছেন। কিন্তু এদিকে যে বিপদ। চন্দ্রার অসুখ করেছে—আরতি করবে কে ?

পূজারী ॥ সর্বনাশ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন কাকে কোথায় পাব ? আমাদেরই কাউকে আরতি করতে হবে।

প্রধান পুরোহিত ॥ ভুবনমোহনের আরতি—বিশেষ করে আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে—কোন পূজারিণী করছে না দেখলে—রাজা কি মনে করবেন ? আমি খুঁজতে পাঠিয়েছি—যদি কোন মেয়েকে পাওয়া যায়।

নেপথ্য হইতে অগ্রসরমান কীর্তনের শব্দ শোনা গেল। লোকজন ক্রমশঃ মন্দিরে আসিতে লাগিল। দর্শকদের প্রথম দলেই ছিল কৃষ্ণা ও অর্জুন। তাহারা পুরোহিতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ (কৃষ্ণাকে) নাও, এখন চল।

কৃষ্ণা ॥ বারে ! আরতি দেখব না ?

প্রধান পুরোহিত ॥ আরতি দেখতে চাও মা ?

[কৃষ্ণা অর্জুনের মুখের দিকে তাকাইল]

অর্জুন ॥ (প্রধান পুরোহিতকে) কখন হবে ?

প্রধান পুরোহিত ॥ আরতি করবার মেয়ে পেলেই হবে। আরতি করতে জানে এমন একটি সুলক্ষণা মেয়ে খুঁজছি।

অর্জুন ॥ তা—এতো জানে। বাড়িতে রোজই আরতি করে।

প্রধান পুরোহিত ॥ (কৃষ্ণাকে) করবে মা তুমি আরতি ?

[কৃষ্ণা সম্মতির অপেক্ষায় অর্জুনের দিকে তাকাইল]

অর্জুন ॥ তা করবে। ওত এই সবই চায়। কিন্তু আমি মৃদঙ্গ আনিনি।

প্রধান পুরোহিত ॥ সে ভাবতে হবে না—(পূজারীকে তুমি এদের নিয়ে যাও।

[পূজারী তাহাদের সঙ্গে নিয়া গর্ভগৃহে চলিয়া গেল। কীর্তন করিতে করিতে কীর্তনদলের প্রবেশ। পুরোভাগে রাজা শ্রীচন্দন পাল। প্রধান পুরোহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা সুখাসনে বসিলেন। জনতার কতক আসন গ্রহণ করিল কতক দাঁড়াইয়া রহিল। কীর্তন চলিতে লাগিল।

কীর্তন শেষ হইতেই আরতির জন্য কৃষ্ণা প্রবেশ করিয়াই বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিল।

দর্শকদলের মধ্যে বৃন্দাবন ও মহামায়া ছিলেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়াই উভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]।

মহামায়া ॥ এ কি—কৃষ্ণা না?

বৃন্দাবন ॥ সে কি! না, না! ··হ্যাঁ—তাইতো। কিন্তু—তাকে যে··· তবে কি···হ্যাঁ—ওই ত অর্জুনও রয়েছে। আমি চাবকাবো আমি চাবকাবো।

জনৈক ব্যক্তি ॥ কে—মশাই চাবকাবেন?

[পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটির প্রতি বৃন্দ বন তাকাইয়া বলিলেন]

বৃন্দাবন ॥ দেখুন ত মশাই

পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি ॥ থামুন মশাই—কী পাগলামি করছেন। দেখছেন না—রাজা বসে আছেন।

[সেই ব্যক্তি বৃন্দাবনকে টানিয়া বসাইয়া দিল। মহামায়াও বসিলেন। কৃষ্ণা আরতি নৃত্য আরম্ভ করিল। বাদকদের মধ্যে অর্জুন যথারীতি মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল। সকলে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ দেখিতে লাগিলেন। নৃত্য শেষে মহারাজা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণার কাছে গিয়া বলিলেন]

নারায়ণবল্লভ ॥ তোমার আরতিতে ভুবনমোহনের ঐ পাষাণ বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো। কে তুমি মা?

কৃষ্ণা ॥ আমি কৃষ্ণা।

[বৃন্দাবন রাজার সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন]

মহারাজ ॥ আমার মেয়ে মহারাজ।

মহারাজ ॥ (বৃন্দাবনকে) তোমার কন্যা অতি সুলক্ষণা। ভুবনমোহন তোমাদের মঙ্গল করুন।

[এই বলিয়া রাজা মন্দিরে উঠিয়া গেলেন]

বৃন্দাবন ॥ (কৃষ্ণাকে) চল একবার বাড়ী—তারপর।

[বৃন্দাবন কৃষ্ণাকে টানিয়া মহামায়ার কাছে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। জনতা তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

প্রথম ব্যক্তি ॥ (বৃন্দাবনকে) খুব ভাগ্যবান লোক আপনি। আপনার নাম কি মশাই?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আরে মশাই—কি রকম লোক আপনি? রাজার কাছে একটা চাকরী চেয়ে নিতে পারলেন না?

তৃতীয় ব্যক্তি ॥ এ মেয়ে রাজরাণী হবে। বল্লাম—দেখো।

প্রথম ব্যক্তি ॥ মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কি মশাই? আমার শালার ছেলেটি এক কথায় যাকে বলে রত্ন।

বৃন্দাবন ॥ মশাই পথ ছাড়ুন—বাড়ি ফিরতে হবে অনেক দূরের পথ।

[নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব ॥ কি হে বৃন্দাবন।

[বৃন্দাবন যেন সাপ দেখিতে পাইলেন—ঠিক
সেইভাবে চমকিয়া উঠিলেন]

বৃন্দাবন ॥ এই যে নায়েব মশাই—

[বৃন্দাবন ঘটা করিয়া নায়েবকে নমস্কার করিল এবং
কৃষ্ণাকে দিয়া প্রণাম করিল]

নায়েব ॥ থাক্, থাক্। তোমার মেয়েটিও বেশ বৃন্দাবন। রাজাকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তা বেশ—বেশ আমি তোমাদের ওখানে কালই যাচ্ছি। তিন সনের খাজনা বাকী—মনে আছে তো? টাকাটা জোগাড় করে রেখো।

বৃন্দাবন ॥ দোহাই হুজুর। গরীবকে মারবেন না।

নায়েব ॥ আচ্ছা, আচ্ছা—সে দেখা যাবে।

[নায়েব চলিয়া গেলেন]

বৃন্দাবন ॥ মেলায় এসে খুব লাভ হলো। নাও এখন চল।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু অর্জুনদা⋯

বৃন্দাবন ॥ নিকুচি করেছি অর্জুনের। চল—

[বৃন্দাবন হেঁচকা টানে কৃষ্ণাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণার হাত হইতে একটি ফুল পড়িয়া গেল। বৃন্দাবন ও মহামায়া কৃষ্ণাকে নিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। অদূরে দণ্ডায়মান নায়েব আসিয়া ফুলটি তুলিয়া লইলেন এবং আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন]

নায়েব ॥ খাঁটি ফুল—খাসা ফুল!

নায়েব সতৃষ্ণ নয়নে প্রস্থানরত বৃন্দাবনের দিকে তাকাইয়া
রহিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া পড়িল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বৃন্দাবনের ঠাকুরঘর। উষা। পূর্ব্ববৎ উষা-কীর্তন ঠাকুর প্রণামান্তে বৃন্দাবন নীচে নামিয়া দণ্ডায়মান অর্জুনকে বলিলেন]

বৃন্দাবন ॥ তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি অর্জুন—আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি আর মেলামেশা করতে পারবে না। দু'জনে এক একসঙ্গে মানুষ হয়েছ—তবু তুমি এ বাড়ির কেউ নও। তোমার বাপ মা—কে তাও জানি না—পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। কৃষ্ণার এখন বয়স হয়েছে, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে—যার তার সঙ্গে তার মেলা মেশা আর চলবে না। এসো মহামায়া···

[উভয়ে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা উপরোক্ত কথোপকথন শুনিতেছিল। অর্জুন যাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণা করতালির সংকেত করিয়া তাহাকে দাঁড় করাইল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

কৃষ্ণা ॥ অর্জুনদা ···

অর্জুন ॥ এর পরেও আমায় ডাকছ কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ (ম্লান কণ্ঠে) আর ডাকব না। কিন্তু মনে মনে ডাকব। আমার সে ডাক—তোমার কানে পেঁাছবে না জানি—কিন্তু মনেও কি পেঁাছবে না ?

[উদ্গত অশ্রুতে কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। এমন সময় বাহিরে বরকন্দাজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

বরকন্দাজ ॥ মোহন্ত মশাই বাড়িতে আছেন ?

[কৃষ্ণা চোখের জল মুছিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া গেল]

অর্জুন ॥ (উচ্চকণ্ঠে) দেখছি।

[সে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল]

বরকন্দাজ ॥ সেই কখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছি, বাড়ির লোক কি সব মরেছে ? নায়েব মশাই এসেছেন যে।

[বৃন্দাবন ও মহামায়া অন্দর হইতে এখানে প্রবেশ করিয়া বরকন্দাজের কথাগুলি শুনিলেন]

বৃন্দাবন ॥ (ভীতকণ্ঠে) নায়েব ···

মহামায়া ॥ আরে নায়েব—তাতে হয়েছে কি। বাইরে গিয়ে খাতির করে বসাও।

বৃন্দাবন ॥ খাজনা বাকী তিন সনের।

মহামায়া ॥ তাতেই বা কি! বাঘও নয়—ভাল্লুকও নয়—গিলে খাবে না যাও—বুঝিয়ে বলো—সময় পাবে।

বৃন্দাবন ॥ অতগুলো লাঠি—অর্জুনটা কোথায়····

বরকন্দাজ ॥ (নেপথ্যে) দরজা ভাঙ্গব নাকি!

বৃন্দাবন ॥ (উচ্চকণ্ঠে) আমি ঘুমিয়েছিলাম কিনা—আসছি।

[দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ হইল মহামায়া চলিয়া গেলে বৃন্দাবন দরজা খুলিয়া সসম্মানে নায়েবকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিলেন]

আসুন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক—বসতে আজ্ঞা হোক।

নায়েব ॥ এই বুঝি তোমার ঠাকুরঘর?

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ হুজুর।

নায়েব ॥ তা পুজো টুজো করতে কাউকে ত দেখছি না।

[নায়েব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন]

বৃন্দাবন ॥ ঊষা কীর্তন ত হুজুর এই কিছু আগে শেষ হলো!

নায়েব ॥ এই দেখ—খাঁটি যা ভেবেছিলাম—তাই হলো! আসতে দেরী হয়ে গেল। তা আরতি টারতি হবে তো? আচ্ছা, সে হবে খ'ন। এবার খাঁটি কথা বলতে এসেছি শোন।

বৃন্দাবন ॥ বলুন হুজুর।

নায়েব ॥ তিন সন খাজনা বাকী—চাকলাদারের হুকুম—বকেয়া খাজনা না দিলে খাঁটি তোমার গরু বাছুর নিলাম করে খাজনা আদায় হবে।

বৃন্দাবন ॥ দোহাই হুজুর—ফসলটা ঘরে উঠুক—আর তিনটা মাস সময় দিন।

[অর্জুন কল্কিতে ফুঁ দিতেছিল। হুঁকাটি বৃন্দাবনের হাতে দিল]

হুজুর তামাক ইচ্ছে করুন।

[বৃন্দাবন নায়েবের সম্মুখে হুঁকাটি ধরিলেন]

নায়েব ॥ শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না হে বৃন্দাবন—আমার বাবা খাঁটি কথা।

[এই বলিয়া নায়েব হুঁকা হাতে নিয়া টানিতে লাগিলেন। অর্জুন সদরের পথে চলিয়া গেল]

নায়েব ॥ মহাবীর সিং—দেখত আমার পানের ডিবেটা বুঝি গাড়ীতে আছে।

বৃন্দাবন ॥ (ব্যস্তভাবে) না, না—সে কি হুজুর? আঃ—সেই কখন পান দিতে বলেছি। অর্জুন অর্জুন ·· এই দেখ····ব্যাটা ভেগেছে। আমি আনছি হুজুর····

ম-২৭৩

[কৃষ্ণা তাম্বূলাধারে পান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

(কৃষ্ণাকে) এত দেরী কেন ? হুজুরকে দে।

[কৃষ্ণা নায়েবের আসনের কাছে পান রাখিতে গেল। নায়েব হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণার নিকট হইতে তাম্বূলাধার গ্রহণ করিলেন এবং একটি পান মুখে ফেলিয়া চর্বণ করিতে লাগিলেন]

নায়েব ॥ (কৃষ্ণাকে) একেবারে যাকে বলে খাঁটি পান। নাম ?

[কৃষ্ণা ইতস্তত করিতে লাগিল]

বৃন্দাবন ॥ বল—বল। নাম বলতে দোষ কি ?

কৃষ্ণা ॥ (নতমুখে) কৃষ্ণা।

নায়েব ॥ কৃষ্ণা নামটা একটু কটমটে হে বৃন্দাবন। ফুল টুলের নামই মেয়েদের খাঁটি নাম।

[মন্দির-প্রাঙ্গণে কৃষ্ণার পরিত্যক্ত ফুল কান হইতে বাহির করিয়া আবার কানে গুঁজিয়া রাখিয়া নায়েব বলিলেন]

এই যেমন—খাঁটি ফুল। (কৃষ্ণাকে) আচ্ছা—তুমি এস।

[কৃষ্ণা অন্দরে চলিয়া গেল]

কথায় বলে ঃ

পান যদি সাজে ভালো
রান্না তার আরো ভালো।

কি বল হে বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন ॥ আজ্ঞে হুজুর—তা যা বলেছেন। মা-মরা মেয়ে—ছোটবেলা থেকেই রান্না-বান্না, পুজো আর্চা ঘর গেরস্থালির সব কাজ ওর হাতে। তা পারেও বেশ।

নায়েব ॥ তা শোন বৃন্দাবন—একটা খাঁটি কথা বলতে চাই। মানে বুঝলে কিনা বৃন্দাবন মোহান্ত—আমরাও বৈষ্ণব····

বৃন্দাবন ॥ হুজুরের দয়া····হুজুরের বুঝি ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার কি সে ভাগ্য হবে ?

নায়েব ॥ মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে ; কিন্তু খাঁটি কথা—ছেলে আমার নেই।

বৃন্দাবন ॥ তবে ···

নায়েব ॥ খাঁটি কথা—আমার হচ্ছে সব ক'টিই মেয়ে—মা-মরা মেয়ে। তাদের মানুষ করবার জন্যে—ভাবছিলাম কিনা—তোমার মেয়েকে যদি ঘরে নিতে পারি।

বৃন্দাবন ॥ মানে····হুজুর নিজেই ?

নায়েব ॥ এই খাঁটি ধরেছ।

বৃন্দাবন ॥ অ……সে কিন্তু…তা মন্দ কি …হ্যাঁ—তা হবে না কেন …তা এ ভাগ্যই বা কম কি ! কিন্তু খরচপত্র …হুজুর তো সব অবস্থাই জানেন—দেখছেনই তো তিন সনের খাজনা বাকী….

নায়েব ॥ সে ভাবতে হবে না। খাঁটি কথা হলো গিয়ে তুমি দিন ঠিক কর। আমি এবার উঠি।

[বৃন্দাবন নায়েবকে সদর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন। অন্দর হইতে মহামায়া ও কৃষ্ণা সব শুনিতেছিল। বৃন্দাবন ও নায়েবের প্রস্থানের পরই তাহারা প্রবেশ করিলেন]

মহামায়া ॥ বাহাত্তুরে বুড়ো ·· তার আবার বিয়ে করবার সখ ! আর তোর বাবারও ভীমরতি হয়েছে—একবার 'না' বললে না ?

কৃষ্ণা ॥ তুমি কিচ্ছু ভেবো না পিসিমা—আসুক না বিয়ে করতে—আমি ওকে বাবা বলে ডাকব।

[খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কৃষ্ণা অন্দরের দিকে ছুটিয়া পলাইল। বৃন্দাবনের প্রবেশ]

মহামায়া ॥ আচ্ছা দাদা —তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? ঘাটের মড়ার সঙ্গে এমন সোনার প্রতিমার বিয়ে দেবে ?

বৃন্দাবন ॥ দেখো—আমরা গরীব। বড়লোকের দৌরাত্ম্য সইবার জন্যই গরীবের জন্ম। কি করতে পারি বোন—আজ যদি বেঁকে বসতাম—ভিটেমাটি উৎসন্ন করে দিত। এই বুড়ো বয়সে কোথায় দাঁড়াতাম আমি—কোথায় থাকতিস্ তোরা। আর কোথায় রাখতুম আমার গোপীমোহনকে !

মহামায়া ॥ তা যা হয় হোক—তাই বলে….

বৃন্দাবন ॥ দেখ মহামায়া—তোরা মেয়েমানুষ, এ সব কিছু বুঝিস না। আর উপায় নেই। এ হতেই হবে। তা বয়সই না হয় একটু বেশি —তা বাপ হওয়ার ত বয়স যায় নি। আর সত্যি কথা—খাবার পরবার ভাবনা নেই · এমন পাত্র আমি পাবই বা কোথা ? না, না—তুই আর বাগ্‌ড়া দিস্ না। ও নায়েব নয়—কেউটে সাপ ! কথায়ও খাঁটি—কাজেও খাঁটি। হুকুম করে গেছে—আজই বিয়ের তারিখ ঠিক করে জানাতে হবে। ঐ মহাবীর সিংকে পাহারায় রেখে গেছে। যাই, আমি দিন দেখে আসি।

[নায়েবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নায়েব ॥ (নেপথ্যে) মোহন্ত—মোহন্ত —ও মোহন্ত—

বৃন্দাবন ॥ ও বাবা—এ যে নায়েব আবার এসেছে !

মহামায়া ॥ মরণ আর কি !

[মহামায়া চলিয়া গেলেন। হন্তদন্ত হইয়া নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব ॥ বৃন্দাবন —দেখছি কি ! যাকে বলে খাঁটি বিপদ। স্বয়ং

চাক্‌লাদার এসে পড়েছেন—তোমার বাড়িতে। এসেই বলেছেন—ওহে নায়েব আমি এ বাড়ির পুজো দেখব—আরতি দেখব (নীচু গলায়)—খাঁটি কথা বেটা তোমার মেয়েকে দেখতে চায়। খুব সাবধান—আমার সঙ্গে কিন্তু খাঁটি কথা হয়ে গেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? কোথায় বসাবে এখন দেখ ? যত্ন আত্তি না হলে—খাঁটি তুমিও গেছ—আমিও গেছি।

[নায়েব বেদীর ধুলা ঝাড়িতে লাগিলেন। চাক্‌লাদারের কণ্ঠ শোনা গেল]

চাকলাদার ॥ (নেপথ্যে) কই হে হলধর—কোথায় ডুব মারলে ?

নায়েব ॥ (ত্রস্তকণ্ঠে) চাক্‌লাদার....

[নায়েব ও বৃন্দাবন সদরের কাছে গিয়া চাক্‌লাদারকে অভ্যর্থনা করিলেন]

আসুন—আসুন হুজুর।

[রক্ষীসহ চাক্‌লাদার প্রবেশ করিলেন]

বসুন হুজুর।

চাক্‌লাদার ॥ কে বৃন্দাবন ?

[চাক্‌লাদারকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নায়েব বৃন্দাবনকে সম্মুখে আগাইয়া দিলেন]

বৃন্দাবন ॥ হুজুর।

নায়েব ॥ হুজুর কি হে ? বল—হুজুরের হুজুর।

বৃন্দাবন ॥ হুজুরের হুজুর।

[বৃন্দাবন চাক্‌লাদারকে আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিলেন]

চাক্‌লাদার ॥ রাজবাড়িতে শুনলাম—তোমার মেয়ে নাকি খুব....আচ্ছা থাক সে কথা। পথে নায়েবের সঙ্গে দেখা হতেই নায়েব বললে—তোমার মেয়ের সঙ্গে নাকি তার বিয়ে। শুনে আমি ভাবলাম—নায়েবের যদি বিয়ের বয়স থাকে, আমারও আছে। বংশ রক্ষা হয়নি, বিয়ে একটা দরকার বটে।

নায়েব ॥ দোহাই হুজুরের হুজুর।

চাক্‌লাদার ॥ যাও—বাহিরে গিয়ে বস। (রক্ষীকে) দরজাটা বন্ধ করে দাও। একটা গোপনীয় কথা আছে।

[নায়েবকে বাহিরে যাইতেই হইল। রক্ষী দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

বুঝলে কিনা বৃন্দাবন, যাহা বাহান্ন, তাহা তেপান্ন। চাক্‌লাদার থাকতেও আর নায়েব টায়েব কেন ?

বৃন্দাবন ॥ হুজুরের হুজুর—আমি আর কি বলব। হুজুরের জন্ম হুকুম দিতে—আমার জন্ম হুকুম তামিল করতে। জয় গোবিন্দ ! জয় গোবিন্দ !

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

[ফৌজদারের বিলাস কক্ষ। আরাম শয্যায় মদ্য পানরত অবস্থায় অর্ধশায়িত ফৌজদার। সামনে নর্তকীদল নৃত্যগীতরত। মাঝে মাঝে উল্লাসের আতিশয্যে ফৌজদার বাহবা দিতেছেন। গানের শেষে প্রতিহারীর প্রবেশ। প্রতিহারী ফৌজদারকে অভিবাদন করিল]

প্রতিহারী ॥ চন্দনপুরের নায়েব দেখা করতে এসেছেন হুজুর।

ফৌজদার ॥ তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[অভিবাদন করিয়া প্রতিহারীর প্রস্থান]

ফৌজদার ॥ (নর্তকীদের প্রতি) তোমরা যাও।

[অভিবাদন করিয়া নর্তকীদের প্রস্থান। ফৌজদার পানপাত্রে মদ ঢালিয়া চুমুক দিলেন। চন্দনপুরের নায়েব প্রবেশ করিয়া ফৌজদারকে নত হইয়া নমস্কার করিলেন। ফৌজদার ঢুলু ঢুলু চোখে নায়েবের দিকে তাকাইলেন]

তুমি চন্দপুরের নায়েব হলধর সরকার ?

নায়েব ॥ হুজুর বাপ মা—

ফৌজদার ॥ তুমি ভেট্ পাঠিয়েছ ?

নায়েব ॥ খাঁটি কথা বলতে কি—হুজুর পরগণার ফৌজদার—বাপ মা। ভেট্ বললে লজ্জা পাব। আমি খাঁটি পুজোই পাঠিয়েছি।

ফৌজদার ॥ বাঃ বেশ। তা আর্জিটা কি শুনি ?

নায়েব ॥ হুজুর বাপ মা। খাঁটি কথা ভয়ে বলব—না নির্ভয়ে বলব ?

ফৌজদার ॥ দুই বোতল খাঁটি মদ যখন খাইয়েছ তখন—নির্ভয়েই বলবে বৈ কি ?

নায়েব ॥ হুজুর—খাঁটি কথা বলতে লজ্জা নেই—এই অধম সন্তানের বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

ফৌজদার ॥ সে ত খাঁটি মান্ধাতার আমলে। তা এখন কি ?

নায়েব ॥ হ্যাঁ হুজুর—মান্ধাতার আমলের। তিনি ত স্বর্গারোহণ করেছেন।

ফৌজদার ॥ বেঁচেছেন।

নায়েব ॥ তা বেঁচেছেন। কিন্তু আমাকে মেরে গেছেন। একেবারে খাঁটি পাঁচটি কন্যা সন্তান রেখে। এখন তাদের মানুষ করে কে ?

ফৌজদার ॥ তাই আর একটির পাণি-পীড়ন করা স্থির করেছ বুঝি ?

নায়েব ॥ হুজুর খাঁটি ধরেছেন। কিন্তু হুজুর, তাতে বাদ সাধছেন—আমাদের চাকলাদার মশাই। বলেন—নায়েবীটা যদি বজায় রাখতে চাও—তোমার ক'নেটি আমায় দাও....

ফৌজদার ॥ তোমার বয়স কত ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে—হুজুর খাঁটি বাহান্নই হবে।

ফৌজদার ॥ আর চাকলাদারের ?

নায়েব ॥ এই ধরুন—তেপান্ন।

ফৌজদার ॥ যাহা বাহান্ন—তাহা তেপান্ন—তাই তোমাদের এ বয়সেও বিয়ে থা চলছে ? লোকে মেয়ে দিচ্চে !

নায়েব ॥ আমার সঙ্গে খাঁটি কথা হয়ে গেছে হুজুর।

ফৌজদার ॥ এই ভাগ্যবান বাপটি কে হে ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হুজুরের প্রজা চন্দনপুরের বৃন্দাবন মোহান্ত।

ফৌজদার ॥ হুঁ। তা মেয়েটি কাণা খোঁড়া নয় ত ?

নায়েব ॥ হুজুর বাপ-মা—মিথ্যে বলব না—মেয়েটি যেন খাঁটি ডানা-কাটা পরী।

ফৌজদার ॥ আর তোমরা সেই মেয়েকে খাঁটি বিয়ে করবে ? হারামজাদা—শুয়োরের বাচ্চা...

[ফৌজদার পায়ের চটী জুতা দ্বারা নায়েবকে মারিতে উদ্যত হইলেন। নায়েব ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন]

নায়েব ॥ হুজুর খাঁটি কথা বলেছেন—একশ বার স্বীকার করছি—আমি হারামজাদা—শুয়োর কা বাচ্চা · হুজুর বাপ মা, আমায় মাপ করুন।

ফৌজদার ॥ আচ্ছা যাও কাছারীতে গিয়ে বস। খাঁটি যে হুকুম দেবার—আমি দিচ্ছি। (নায়েবের প্রস্থান)

---

* তৃতীয় দৃশ্য *

[বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের প্রাঙ্গণ। ত্রিলোচন ও বৃন্দাবন]

ত্রিলোচন ॥ কি হে বৃন্দাবন—যা শুনলাম তা হলে তা সত্যি ? শেষে নায়েবও নয়—চাকলাদারই জামাই হচ্ছে ?

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ ভাই—গোপীমোহনের দয়া—নইলে আমার কি সাধ্য।

তোমরা দশজনে করে কর্মে দেবে ভাই। বাবাজীর খুব তাড়া—(চাপা গলায়) আজ আশীর্বাদ করতে আসছেন। বিয়ের দিন ঠিক করতে পুরুতের কাছে যাচ্ছি।

ত্রিলোচন ॥ আমি বলছিলাম কি—পুরুতের কাছে না গিয়ে—কবরেজের কাছে যাও। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বৃন্দাবন ॥ মাথা খারাপ হয়েছে—আমার? জানি ত্রিলোচন—তোমাদের চোখ টাটাবে। লোকের ভাল ত দেখতে পার না—তা মর—জ্বলে পুড়ে মর।

ছুটিয়া গোবর্ধনের প্রবেশ

গোবর্ধন ॥ আরে তোমরা করছ কি? চাক্‌লাদার এসেছেন যে—আসুন হুজুর—আসুন।

[রক্ষীসহ চাক্‌লাদারের প্রবেশ]

ত্রিলোচন ॥ জয়—চাক্‌লাদার প্রভুর জয়। আজ শুধু বৃন্দাবনের সৌভাগ্য নয়—আমাদের গোটা গাঁয়ের সৌভাগ্য!

বৃন্দাবন ॥ মেয়েটার যে এতবড় সৌভাগ্য হবে—তা'ত ভাবতেই পারি নি হুজুরের হুজুর!

চাক্‌লাদার ॥ কথায় বলেঃ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। তা আমারই বা সৌভাগ্য কম কিসে?

বৃন্দাবন ॥ দয়া করে বসুন—হুজুরের হুজুর।

চাক্‌লাদার ॥ এ লোকগুলো কে?

বৃন্দাবন ॥ এরা গাঁয়েরই সব লোকজন। এতকাল নায়েব হুজুরই দেখেছে—হুজুরের হুজুরকে তো আর দেখেনি? তাই দেখতে এসেছে, তা ত্রিলোচন তুমি যাও হে পুরুতকে ডেকে আন।

ত্রিলোচন ॥ তা যাব বৈ কি। যাচ্ছি।

বৃন্দাবন ॥ পুরুতকে ডাকতে গিয়ে আবার যেন কবরেজের কাছে যেও না? (চাক্‌লাদারের প্রতি) ও চোখটাটানি ব্যারামে ভুগছে হুজুরের হুজুর।

[ত্রিলোচন বৃন্দাবনের প্রতি অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন]

চাক্‌লাদার ॥ কথা-বার্তা যখন পাকা হয়ে গেছে তখন হুজুরের হুজুর বলে লজ্জা দিও না বৃন্দাবন। এখন তুমি হলে গুরুজন, আর আমি হব বাবাজীবন।

[চাক্‌লাদার ঠাকুর প্রণাম করিতে গেলেন]

বৃন্দাবন ॥ হেঃ হেঃ হেঃ। বাবাজী ঠিকই বলেছেন।

[নেপথ্যে নায়েবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নায়েব ॥ (নেপথ্যে) মোহান্ত বাড়ি আছ—মোহান্ত ?

বৃন্দাবন ॥ দেখ ত গোবর্ধন—সময় নেই—অসময় নেই—কোন বেটা আবার হাঁকাহাঁকি করছে।

(গোবর্ধন সদর দরজা খুলিতেই দেখা গেল—নায়েব স্বয়ং উপস্থিত। পশ্চাতে পাইক-বরকন্দাজ)

বৃন্দাবন ॥ কে ? নায়েব। আমি বড় ব্যস্ত আছি। এখন আমার সময় টময় নেই।

নায়েব ॥ তাই নাকি ! বড় গরম দেখছি যে !

(চাকলাদার সোপান পথে নামিতেছিলেন)

চাকলাদার ॥ ওটা কে হে ?

নায়েব ॥ হুজুর—দণ্ডবৎ হই।

(নায়েব আভূমিতে নত হইয়া নমস্কার করিলেন)

বৃন্দাবন ॥ (চাকলাদারকে) দেখ ত বাবাজী দুদণ্ড কথা কইব—তার কি ঝামেলা !

চাকলাদার ॥ বটেই তো। সময় নেই—অসময় নেই—পাইকবরকন্দাজ নিয়ে হাজির হয়েছ—ব্যাপার কি ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হুজুর—খাঁটি ফৌজদারের পরোয়ানা আছে।

চাকলাদার ॥ ফৌজদারের পরোয়ানা আছে ! কৈ দেখি ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হুজুর- বৃন্দাবনের নামে।

নায়েবের হাত হইতে পরোয়ানা লইয়া চাকলাদার তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন)

চাকলাদার ॥ ওরে বাবা—

বৃন্দাবন ॥ কি বাবাজী ?

চাকলাদার ॥ আর বাবাজী। বাবাজীর বাবা আসছেন।

বৃন্দাবন ॥ কোথায় ?

চাকলাদার ॥ তোমার বাড়ি।

বৃন্দাবন ॥ কবে ?

চাকলাদার ॥ আসছে ৭ই ফাল্গুন।

বৃন্দাবন ॥ কেন ?

চাকলাদার ॥ বিয়ে করতে।

বৃন্দাবন ॥ কাকে ?

চাক্‌লাদার ॥ তোমার খুকীকে।

বৃন্দাবন ॥ সে কি! কে?

নায়েব ॥ আমাদের বাবার বাবা—এ পরগণার ফৌজদার—স্বয়ং খাঁটি যম। পত্রপাঠ তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। এই হুকুম।

বৃন্দাবন ॥ তোমরা বলছ কি হে। বস—বস বস। জয় গোপীমোহন! কৃষ্ণা—কি কপাল নিয়ে তুই এসেছিলি! জয় গোপীমোহন—জয় গোপীমোহন। ওদের বলে আসছি।

[বৃন্দাবন উল্লসিত চিত্তে অন্দরে চলিয়া গেলেন]

চাক্‌লাদার ॥ (নায়েবকে) ব্যাপারটা তবে তোমারই কীর্তি! কিন্তু মনে রেখো নায়েব—এক মাঘে শীত যায় না।

নায়েব ॥ আমায় কেন মিছিমিছি অপরাধী করেছেন হুজুর। আমি হুজুরদের হুকুমের চাকর।

চাক্‌লাদার ॥ দেখ নায়েব—বাজে কথা রাখ। নায়েবী করে চুল পাকিয়ে তবে চাক্‌লাদার হয়েছি....ওসব শয়তানি আমি বুঝি। তোমার ঐ দাঁতের পাটি আমি ভেঙ্গে দেব।

[চাক্‌লাদার রাগতভাবে বাহির হইয়া গেলেন। চাকলাদারেররক্ষী তাঁহাকে অনুসরণ করিল]

নায়েব ॥ হুজুর শুনুন—শুনুন।

[নায়েব তাহার লোকজন সহ চাক্‌লাদারকে অনুসরণ করিল। বিপরীত দিক হইতে বৃন্দাবনের প্রবেশ। তাহার পশ্চাতে মহামায়া]

বৃন্দাবন ॥ এই যে সব ভেগেছে। হেঃ হেঃ হেঃ... ভাগবে না—এ বাবা স্বয়ং ফৌজদার।

মহামায়া ॥ ফৌজদার—তা এর বয়স বুঝি আশী!

বৃন্দাবন ॥ কি যে বলিস্‌ মহামায়া। কোন আক্কেল-পচ্ছন্দ যদি তোদের থাকে। ফৌজদারের বয়স আশী?

মহামায়া ॥ তবে কত?

বৃন্দাবন ॥ ফৌজদার মানে—গোটা পরগণার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দরকার হলে লড়াই করবে কামান চালাবে—তার বয়স কখনো আশী হয়! রঘু ডাকাতের কথাশুনেছিস্‌ ত? তাকে যদি কেউ কাবু করতে পারে—করবে এই ফৌজদার। তবেই গায়ের জোরটা বোঝ—চেহারাটা কথা ভাব। না, না—তুই গোপীমোহনকে আজ ভালো করে ভোগ রেঁধে দে। ফৌজদার জামাই হবে—এখন থেকে ঐ ত্রিলোচন—ঐ গোবর্ধন—সবার আমি হাতে মাথা কাটব। দেখছিস ক—শাঁখ বাজা—উলু দে—যাই আমাকে আবার এখুনি ফৌজদারের কুঠিতে রওয়ানা হতে হবে।

মহামায়া ॥ যাবে এই রাত্রে? আকাশের অবস্থা ত সুবিধে নয় দাদা। ঝড় উঠতে পারে।

বৃন্দাবন ॥ উঠুক ঝড়। ফৌজদারের হুকুম। এ ঝড়ের বাবা। তোরা সব সাবধানে থাকবি। জয় বাবা গোপীমোহন! রাজা কর বাবা।

[বৃন্দাবন বাহিরে চলিয়া গেলেন। শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে অন্দর হইতে কৃষ্ণার প্রবেশ]

মহামায়া ॥ আয়—আয় মা। নিজেই শাঁখ বাজাচ্ছিস্। তা বাজাবি বৈ কি। রাজরাণী হচ্ছিস্।

কৃষ্ণা ॥ (উলু দিয়া) আমি—না তুমি?

মহামায়া ॥ আমি?

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ—আমি যে শুনে এলাম।

মহামায়া ॥ কি শুনলি?

কৃষ্ণা ॥ স্বর্গ থেকে পিসেমশাই নেমে এসেছেন ফৌজদার। তোমায় বিয়ে করে স্বর্গে তুলবেন।

মহামায়া ॥ মরণ আর কি!

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ—ফৌজদার এলেই বলব—পিসেমশাই এসেছেন—আসুন, আসুন।

মহামায়া ॥ মুখ-পুড়ী—আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়ছে। পুজোর ভার আজ তোর—আমি ভোগ রাঁধতে চল্লাম।

[মহামায়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণা সন্ধ্যারতির আয়োজনে ব্যস্ত ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিল। শাঁখ বাজাইতে লাগিল। অর্জুন আসিয়া কাঁসর বাজাইতে লাগিল। ঝড় উঠিবে, তার আভাস পাওয়া গেল—যখন আরতিরতা কৃষ্ণার হাতে পঞ্চপ্রদীপ দমকা হাওয়ায় নিভিয়া গেল]

কৃষ্ণা ॥ (ভয়ার্তকণ্ঠে) অর্জুনদা, প্রদীপ নিভে গেল। জেলে দিয়ে যাও অর্জুনদা।

[অর্জুন ঠাকুরঘরে উঠিয়া গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। ঠাকুরকে প্রদীপ দেখাইয়া কৃষ্ণা ঠাকুর প্রণাম করিল]

অর্জুন ॥ আজ তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। এসো।

[তাহারা নামিয়া আসিয়া মণ্ডপ-বেদীর উপর বসিল]

কৃষ্ণা ॥ শুনেছ ফৌজদারের সঙ্গে আমার বিয়ে! বাবাকে তলব করে নিয়ে গেছে।

অর্জুন ॥ শুনেছি।

কৃষ্ণা ॥ এই ঠাকুরঘরে ছোটবেলায় দুজনে বর-কনে সেজে কত পুতুল খেলা

খেলেছি—আজ সব মিথ্যা হয়ে যাবে ?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ—সে সব ছেলেখেলা —আজ বুঝছি।

কৃষ্ণা ॥ না, অর্জুনদা। ঠাকুর যেমন আমাদের সত্য—তেমনি সত্য আমাদের খেলা। আমরা—আমাদের সেই সত্য রক্ষা করব, অর্জুনদা।

অর্জুন ॥ কিন্তু...

কৃষ্ণা ॥ (বিস্মিত কণ্ঠে) কিন্তু ! এক অর্জুনকে জানি—সুভদ্রাকে তিনি হরণ করেছিলেন। আর এক অর্জুনকে দেখছি—তার কৃষ্ণাকে একজন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—আর সে পাথর হয়ে বসে আছে।

অর্জুন ॥ হরণ তোমাকে আমিও করতে পারি কৃষ্ণা। কিন্তু একটা কথা — তোমার বাবা আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন। ছেলে বলে একদিন পরম স্নেহে বুকে তুলেও নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণা ॥ নিয়েছিলেন। তারপর জন্মালাম আমি। শুরু হল সর্বনাশের খেলা। মা গেলেন মারা। আমায় পেয়ে বাবা তোমায় দিলেন দূরে ঠেলে। মাকে হারালাম। তোমায়ও হারাবো ?

অর্জুন ॥ ঠাকুর যখন সত্য—আমরা কেউ কাউকে হারাব না।

কৃষ্ণা ॥ তবে আমায় নিয়ে চল।

অর্জুন ॥ কোথায় ?

কৃষ্ণা ॥ সে তুমি জানো। এস—এই ঝড়ের রাতে বেরিয়ে পড়ি। যেদিক দু চোখ যায়—আমরা চলে যাব। ওঠ অর্জুনদা, ফৌজদারের হাতে আমি ধরা দিতে পারব না—পারব না।

অর্জুন ॥ যিনি আমায় পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছেন—তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমি পালাব ? না, না, সে আমি পারব না—পারব না কৃষ্ণা।

[দরজায় করাঘাত। নেপথ্যে বৃন্দাবন হাঁকিলেন]

বৃন্দাবন ॥ কে আছিস্—দরজা খোল্।

[কৃষ্ণা ঠাকুরঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। অর্জুন দরজা খুলিয়া দিল। বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন]

বৃন্দাবন ॥ এই যে অর্জুন—এরা সব কোথায় ? যা ঝড় উঠেছে—দেখে পথ থেকেই ফিরে এলাম। গরুগুলো গোয়ালে তুলেছ তো ?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ—তা তুলেছি।

বৃন্দাবন ॥ তা গরু রাখালী আর তোমাকে করতে হবে না। কৃষ্ণার বিয়ে হচ্ছে ফৌজদারের সঙ্গে। আরে তুমি তো একটা মস্ত সেপায় হয়ে যাবে। চাই কি—একদিন কামান দাগবে।

[কৃষ্ণা ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আসিতেছিল। এই কথা শুনিয়া বলিল]

কৃষ্ণা ॥ কামান দাগবে। তবেই হয়েছে! ওর হাত দুটো কেটে নিচ্ছে শুনলেও —ও হাত জোড় করেই থাকবে—রুখবে না।

[কৃষ্ণা দ্রুতপদে অন্দরে চলিয়া গেল]

বৃন্দাবন ॥ (অর্জুনকে) কই না আমার ত তা মনে হয় না। কি হে—তুমি এত ভীরু ?

অর্জুন ॥ আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে।

বৃন্দাবন ॥ সে কি ? তুমি আবার কি বলবে ? কাপড় তোমার ছিঁড়ে গেছে এই তো ? মহামায়া তোমার একটা পোষাকের কথা বলেছে —তা আমি একটা কিনে দেব। আর ফৌজদার যদি চাকরী নাই দেয়—নাই বা দিল। কৃষ্ণা চলে গেছে—তুমিই আমার ছেলে হয়ে থাকবে—ছেলে মানে বুড়ো বয়সে হাতের লাঠি।

[মেঘ গর্জন]

আঃ, ঝড়ও আর দিন পেল না। যাও —ঘরে যাও।

[বৃন্দাবন অন্দরে যাইতেছিলেন]

অর্জুন ॥ না, না—আপনি শুনুন।

বৃন্দাবন ॥ আঃ—কি ?

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা আর আমি—

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ—কৃষ্ণা আর তুমি ?

অর্জুন ॥ আমার কথা থাক্। কিন্তু ফৌজদারের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে হতে পারে না বাবা।

বৃন্দাবন ॥ তবে কা'র সঙ্গে হবে . তোমার সঙ্গে ?

অর্জুন ॥ কৃষ্ণার তাই কামনা —আর আমারও তাই প্রার্থনা।

[বৃন্দাবন রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিলেন। কৃষ্ণা বৃন্দাবনের অলক্ষ্যে মণ্ডপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

বৃন্দাবন ॥ পথের কুকুর —এতদূর তোর সাহস। বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে—এখুনি বেরো····

অর্জুন ॥ বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে ফৌজদারের সংগে কৃষ্ণার বিয়ে আমি হতে দেব না।

বৃন্দাবন ॥ দূর হ'—দূর হ' আমার বাড়ি থেকে।

[বৃন্দাবন ক্ষেপিয়া গিয়া অর্জুনের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে মারিতে লাগিলেন]

কৃষ্ণা ॥ বাবা—বাবা—

[কৃষ্ণা আগাইয়া আসিল]

বৃন্দাবন ॥ রাস্তার কুকুর—রাস্তায় যা।

[বৃন্দাবন অর্জুনকে সক্রোধে লাথি মারিতে মারিতে সদর দরজার কাছে গিয়া পদাঘাতে ঠেলিয়া দিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘনঘন বজ্র নির্ঘোষে ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। কৃষ্ণা অর্জুনের উপর এই অমানুষিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি কথাও কহিতে পারিল না। কৃষ্ণা মণ্ডপের থাম ধরিয়া পাষাণবৎ বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা নামিতেছে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[নদীতীরস্থ শ্মশান। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য এখনো শেষ হয় নাই। শ্মশান-ঘরের বারান্দায় বসিয়া ভৈরব প্রলয়ের গান গাহিতেছে। একটি শবদেহ নদীতীরে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। ভৈরবের গানের মধ্যে দেখা গেল—অর্জুন প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া এককোণে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। ভৈরব অর্জুনকে দেখিতে পাইয়াছেন। গান শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন]

ভৈরব ॥ কে ওখানে?

অর্জুন ॥ পথের কুকুর। এ ছাড়া আর আমার কোন পরিচয় আজ নেই।

ভৈরব ॥ সামনে এসো।

অর্জুন ॥ সামনে আসবার কোন উপায় নেই। পরণের কাপড় ছিন্নভিন্ন—লজ্জা ঢাকবার জন্যে একখানা কাপড় প্রভু আমায় দয়া করে দিন।

ভৈরব ॥ শ্মশানে একটা শবদেহ দেখছ? ঝড়বৃষ্টির জন্য দাহ করতে না পেরে ফেলে গেছে।

অর্জুন ॥ হ্যাঁ প্রভু রয়েছে।

ভৈরব ॥ শবাবরণ—ঐ নতুন কাপড় পরিধান করে আমার সামনে এসো।

(ভৈরবের গান)

[গানের মধ্যে অর্জুন হামাগুড়ি দিয়া শবাবরণ টানিয়া লইয়া অন্তরালে চলিয়া গেল। গান শেষে নববস্ত্র পরিহিত অর্জুন ভৈরবের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ তুমি আমায় নব জন্ম দিলে বাবা।

[অর্জুন ভৈরবকে প্রণাম করিল]

ভৈরব ॥ ওঠ—বেটা—ওঠ। আর কি? রাজ বস্ত্র তুই পরেছিস—তুইও একদিন রাজা হবি। আজ রাজা—কাল ফকির। কাল ফকির—আজ রাজা। কি খেলাই খেলছিস বেটী। হাঃ হাঃ হাঃ........

[অট্টহাসিতে শ্মশান প্রকম্পিত করিয়া ভৈরবের প্রস্থান]

অর্জুন ॥ প্রভু....প্রভু....প্রভু....

[অর্জুন ভৈরবের পশ্চাদানুসরণ করিল। নিস্তব্ধতা। ঝড় বৃষ্টি ক্রমশঃ কমিয়া আসিস। বিপরীত দিক হইতে দস্যু চতুষ্টয়ের প্রবেশ]

পিনাক ॥ কই এখানে ত কেউ নেই!

ত্রিশূল ॥ তবে অট্টহাসি শুনলাম কার?

কৃপাণ ॥ একটু দেখে শুনে পা বাড়ানোই ভালো।

বিষাণ ॥ আমিও তাই বলি। কে ভেবেছিল রঘু ডাকাত মরে যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

পিনাক ॥ সে আমি জানতাম। সিদ্ধপুরুষ মারা গেলে এমন হয়েই থাকে। চন্ডী ডাকাত যখন মরেছিল—ভূমিকম্প হয়েছিল। এ বাবা রঘু ডাকাত মরেছে—প্রলয় হয়নি—এই ঢের।

ত্রিশূল ॥ দেখ পিনাক—আমি তোদের আবার বলছি—রঘু সর্দার মারা গেছেন—এ কথা কেউ আর মুখে আনবি নে।

কৃপাণ ॥ এ তোমার বেশি বাড়াবাড়ি ত্রিশূল। সর্দার মারা গেলেন—আর আমরা সে কথা বলে একটু দুঃখ করতে পারব না?

ত্রিশূল ॥ না, সর্দার মারা গেছেন—এ যেন কাক পক্ষীতেও না জানতে পারে। সর্দার নিজেই বলে গেছেন—আমি মরলে তোরা যাকে সর্দার করবি—তারও নাম রাখবি রঘু ডাকাত। মানে—লোকে জানবে রঘু ডাকাতের মৃত্যু নেই!

বিষাণ ॥ তা'ত বুঝলাম। কিন্তু সর্দার কে হবে ভাই—তা এখুনি ঠিক করে ফেল!

কৃপাণ ॥ কেন—এত তাড়া কেন?

বিষাণ ॥ শবদাহ করতে হবে না? মুখে আগুন দেবে কে?

ত্রিশূল ॥ তা হলে আগে সর্দারই ঠিক হোক।

কৃপাণ ॥ আমাদের ভেতর যে সবচেয়ে সাহসী সেই হবে সর্দার।

[এমন সময় নেপথ্য হইতে অর্জুন বিকট অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল]

ত্রিশূল ॥ ওরে বাবা....

সে ভয়ে পিছাইয়া গেল। অপরাপর দস্যুরাও হিমসিম খাইয়া সকলে এক কোণে আসিয়া জড় হইল]

পিনাক ॥ দেখেছিস্?

বিষাণ ॥ কি ?

পিনাক ॥ নতুন কাপড় দিয়ে শবদেহ ঢাকা ছিল। সেই কাপড় !

সকলে ॥ তাইতো !

[সহসা অর্জুনের আত্মপ্রকাশ]

অর্জুন ॥ সাহসী ! এরাই আবার রঘু ডাকাতের চেলা। এদের আবার একজন হবে সর্দার ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[সকলে স্তব্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে তাকাইয়া রহিল]

(আদেশ-সূচক স্বরে) মশাল জ্বালো।

[সকলে সভয়ে আদেশ পালন করিল]

ত্রিশূল ॥ তুমি কে প্রভু ?

অর্জুন ॥ রঘু ডাকাতের কাপড় পরিয়ে কালভৈরব আমার আশীর্বাদ করছেন। আমি হব দ্বিতীয় রঘু ডাকাত—আমি তার শূন্য স্থান পূর্ণ করব।

[ডাকাতরা মশাল জ্বালিয়াছে। একে একে অর্জুনের সামনে আসিয়া নতজানু হইয়া বলিতে লাগিল]

ত্রিশূল ॥ প্রভু—আমি ত্রিশূল। আজ থেকে তুমিই আমাদের সর্দার। নাম তোমার যাই হোক—তুমিই আমাদের রঘু সর্দার।

পিনাক ॥ প্রভু—আমি পিনাক। আজ থেকে তুমিই আমাদের নতুন সর্দার।

বিষাণ ॥ প্রভু—আমি বিষাণ। আমাদের জীবন মরণ সবই তোমার পায়ে।

কৃপাণ ॥ প্রভু—আমি কৃপাণ। কৃতদাসকে আশীর্বাদ কর।

অর্জুন ॥ সর্দারের শবদেহ স্পর্শ করে আমিও শপথ করছি··· সর্দারের কীর্তি রাখব—মানুষের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আমি অমানুষ হবো। এসো—আমরা সর্দারের শবদেহ সৎকার করি।

সকলে ॥ রঘু সর্দার কি—জয়।
রঘু সর্দার কি জয়।
রঘু সর্দার কি—জয়।

[যবনিকা নামিল]

।। তৃতীয় অঙ্ক ।।

প্রথম দৃশ্য

[বৃন্দাবনের বাড়ির ঠাকুরঘর। অপরাহ্ণ। বাহিরে মণ্ডপে নহবত বাজিতেছে। কৃষ্ণা বসিয়া পান সাজিতেছে। কয়েকটি মেয়ে পিঁড়ি ও ঘটে আলপনা দিতেছে। একজন মহিলা বিবাহের মঙ্গল-ডালা সাজাইতেছেন। অপর কয়েকটি বধূ আসিয়া দাঁড়াইল]

পিসিমা ।। এস বোন—এস। বস।

প্রথম মহিলা ।। না দিদি—কৃষ্ণার বিয়ে দেখা আমাদের ভাগ্যে আর হ'ল না।

পিসিমা ।। সে কি? কেন?

প্রথম মহিলা ।। আমরা চলে যাচ্ছি। তাই ঠাকুর প্রণাম করতে এসেছি।

পিসিমা ।। সে কি? হঠাৎ চলে যাবে কেন? কোথায় যাবে?

প্রথম মহিলা ।। কাল রাত্রে রঘু ডাকাত পাশের গাঁয়ে হামলা দিয়ে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শোনোনি বুঝি?

দ্বিতীয় মহিলা ।। এবার অত্যাচার আরও বেড়েছে। মেয়েদের বে-ইজ্জত করে গয়না কেড়ে নিয়েছে।

তৃতীয় মহিলা ।। মেয়ে তো মেয়ে—বিগ্রহের গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে—বিগ্রহ ভেঙে চুরমার করেছে!

মহামায়া ।। কি সর্বনাশ। এ ত কখনো শুনিনি। মেয়েটার বিয়ে এখন ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে বাঁচি!

প্রথম মহিলা ।। লোকজন দেশ ছেড়ে পালানো শুরু করেছে। দেশ অরাজক হয়েছে দেখে কর্তা আমাদের তাঁর মামার বাড়ি পার করছেন।

দ্বিতীয় মহিলা ।। নারায়ণগড়ের রাজা হেন করবেন—তেন করবেন—কত শুনলাম। তা করেছেন তো খুব। এ মগের মুলুককে বাস করবে কে? চলি দিদি—

[মহিলা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন]

প্রথম মহিলা ।। রাজরাণী হচ্ছিস্ কৃষ্ণা—আমাদের মনে থাকবে তো?

দ্বিতীয় মহিলা ।। সুখী হও—স্বামী সোহাগিনী হও। চল দিদি আর দেরী নয়।

তৃতীয় মহিলা ॥ বেঁচে থাকি ত ছেলের অন্নপ্রাশন খেতে আসব।

[অন্দরের পথে মহিলারা চলিয়া গেলেন। সদরের দরজা দিয়া হন্তদন্ত হইয়া বৃন্দাবনের প্রবেশ]

বৃন্দাবন ॥ মহামায়া কোথায় গেলে ?

মহামায়া ॥ আসছি দাদা।

বৃন্দাবন ॥ আরে ও সব রেখে দাও। বিয়ে টিয়ে মাথায় উঠেছে।

মহামায়া ॥ কি হয়েছে দাদা ?

বৃন্দাবন ॥ টাকাকড়ি—গয়নাপত্র—যেখানে যা আছে শীগ্‌গীর বেঁধে নাও। বাসনপত্র যা দু'চার খানা পার—সঙ্গে নাও।

মহামায়া ॥ সে কি—কোথায় যাবে ?

বৃন্দাবন ॥ যমের বাড়ি।

মহামায়া ॥ শুভদিনে কি সব অলক্ষুণে কথা বলেছ।

বৃন্দাবন ॥ বলছি কি আর সাধে। এই দেখ চিঠি।

মহামায়া ॥ কিসের চিঠি ? কার চিঠি ? লাল কেন ?

বৃন্দাবন ॥ রঘু ডাকাতের চিঠি। রঘু ডাকাত লাল চিঠি পাঠিয়েই ডাকাতি করে। শুনেছি নিজের রক্ত দিয়ে লেখে।

মহামায়া ॥ কি লিখেছে ?

বৃন্দাবন ॥ লিখেছে—আজ রাতেই আমার বাড়িতে ডাকাতি করবে।

মহামায়া ॥ তা তোমার ভয় কি ? বিয়ে করতে আসছে স্বয়ং ফৌজদার। তার সঙ্গে কি আর সৈন্য সামন্ত থাকবে না। রঘু ডাকাতকে তাড়িয়ে দেবে।

বৃন্দাবন ॥ তা বটে—তা বটে। আচ্ছা, তবে বিয়ের আয়োজন যেমন করছিলি কর! দেখি কপালে কি আছে। গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল।

[বৃন্দাবন বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। মেয়েরা মহামায়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

প্রথম মেয়ে ॥ আমরা বাড়ি চল্লাম পিসিমা।

মহামায়া ॥ তা যাও মা—বাড়িই যাও।

[সকলে বিষণ্ণ চিত্তে চলিয়া গেল]

কৃষ্ণা ॥ পিসিমা, কি হবে পিসিমা ?

মহামায়া ॥ তোকে একটা জিনিষ দিচ্ছি।

[মহামায়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ত্বরিৎপদে কি লইয়া আসিলেন]

মহামায়া এই নে।

কৃষ্ণা ॥ কি পিসিমা ?

ম-২৮৯

মহামায়া ॥ একটা আংটি। যখনই শুনবি—বাড়িতে ডাকাত পড়েছে—আংটিটা হাতে পরবি।

কৃষ্ণা ॥ এই আংটিতে বুঝি ডাকাত বশ হয় পিসিমা? পিসেমশাইকে বুঝি এই আংটিতে বশ করেছিলে—না?

মহামায়া ॥ ঠাট্টা নয় কৃষ্ণা। মেয়েদের সব চেয়ে বড় জিনিষ—ইজ্জত। যখন দেখবি—ইজ্জত আর থাকে না—তখন এই আংটি চুষবি—বিষের আংটি।

কৃষ্ণা ॥ পিসিমা!

মহামায়া ॥ হ্যাঁ মা—কখন কি হয় বলা তো যায় না—বড় দুঃখেই তোকে আজ এ আংটি দিলাম।

কৃষ্ণা ॥ তুমি আমায় বাঁচালে—তুমি আমায় বাঁচালে পিসিমা। আমার কাছে রঘু ডাকাতও ডাকাত—ফৌজদারও ডাকাত।

মহামায়া ॥ ছিঃ মা—ও কথা বলতে নেই। ফৌজদার ডাকাত হবেন কেন—তিনি তোমার স্বামী, তোমার দেবতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিবাহ-আসর। সন্নিকটে নহবত বাজিতেছে। নায়েব ও চাকলাদার লোকজনকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছে। একদল লোক আসিয়া সংবাদ দিল—বর আসিয়াছে। নেপথ্যে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইল]

একদল লোক ॥ বর এসেছে। ফৌজদার এসেছে।

[চাকলাদার, নায়েব ও বৃন্দাবন বাহিরে চলিয়া গেলেন। একদল সশস্ত্র রক্ষী প্রবেশ করিল ফৌজদার মদ খাইয়া টলিতে টলিতে দেহ-রক্ষীর কাঁধে ভর দিয়া আসরে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন মদের গন্ধ এড়াইবার জন্য নাকে কাপড় দিয়া ফৌজদারকে অভ্যর্থনা করিয়া আসরে বসাইলেন। ফৌজদারের নিকট এই কোলাহল অসহ্য মনে হওয়ায় তিনি কানে হাত দিয়া ইঙ্গিতে তাহা জানাইলেন। চাকলাদার কোলাহল বাদ্য ইত্যাদি বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। কোলাহল বন্ধ হইল]

চাকলাদার ॥ থামাও—থামাও। মহা হুজুর গোলমাল পছন্দ করেন

ফৌজদার ॥ আমার শ্বশুর মশাই কই হে—তাকে তলব দাও।

নায়েব ॥ হুজুর—তিনি ত খাঁটি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ফৌজদার ॥ ও বাবা—এ যে একেবারে আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ো!

বুড়ো বাবা আর দেরী কেন ? মেয়েটা আনো।

বৃন্দাবন ॥ লগ্নের এখনো একটু দেরী আছে।

ফৌজদার ॥ চুলোয় যাক তোমার লগ্ন। বিয়ে করতে এসেছি এই তোমার সাত পুরুষের ভাগ্যি। কি বল চাকলাদার।

চাকলাদার ॥ তা ছাড়া আর কি। হুজুর যখনই বিয়ের আসনে বসবেন —তখনই লগ্ন।

বৃন্দাবন ॥ তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কি ভুল করেছি ··· (চাকলাদারকে) আমি মেয়ে নিয়ে আসছি। আপনি ততক্ষণে হুজুরকে এই চিঠিটা পড়ে শোনান।

[চাকলাদারের হাতে লাল-চিঠি দিয়া বৃন্দাবনের প্রস্থান]

ফৌজদার ॥ (মদ্য পান করিতে করিতে) ওহে এক পাত্র মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। নইলে বাবা প্রাণে প্রাণে মিলন হবে না।

চাকলাদার ॥ হুজুর শুনেছেন। রঘু ডাকাত চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসছে।

সকলে ॥ কি

ফৌজদার ॥ রঘু ডাকাত আসছে ?

সকলে ॥ হ্যাঁ হুজুর—রঘু ডাকাত !

নয়েব ॥ খাঁটি যম। হুজুর রক্ষা করুন।

সকলে ॥ রক্ষা করুন - রক্ষা করুন হুজুর।

চাকলাদার ॥ থামো--থামো। হুজুর কি বলছেন শোন। (ফৌজদারকে) হুজুর— ডাকাত আসছে কি হবে ?

ফৌজদার ॥ কাটো।

চাকলাদার ॥ কাটো। হুজুর হুকুম দিয়েছেন —কাটো।

[ভেরী ও দামামা বাজিতে লাগিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বৃন্দাবনের ঠাকুরঘর। কৃষ্ণা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন জানাইতেছে]

কৃষ্ণা ॥ গোপীমোহন—তোমার মনে এই ছিল। তোমারই সামনে বর কনে সেজে যে খেলা খেলেছি, সে কি শুধু খেলা ? তুমি যদি সত্য হও—সে কি তবে সত্য নয় ?

[বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে মহামায়া]

বৃন্দাবন ॥ উঃ—কী ভুল করেছি—আমি কি ভুল করেছি। কৃষ্ণা—মা আমার !

কৃষ্ণা ॥ যাই বাবা।

[কৃষ্ণা নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল]

বৃন্দাবন ॥ তোকে বলি দেবার জন্য নিতে এসেছি মা।

মহামায়া ॥ দাদা—কি হয়েছে দাদা ?

বৃন্দাবন ॥ হায়—হায়—কি করলাম।

মহামায়া ॥ এমন করছ কেন দাদা ?

বৃন্দাবন ॥ কেন করছি—দেখবি চল। আমার এই সোনার প্রতিমাকে হাত পা বেঁধে আমি জলে ফেলে দিচ্ছি। এক মাতাল—এক লম্পট। উঃ—আজ যদি আমার অর্জুন থাকত....

[অন্দরের পথে ছুটিয়া অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা ॥ (আবেগে বিস্ময়ে) অর্জুনদা...

বৃন্দাবন ॥ অর্জুন। আয় বাবা—আয়। আমার কৃষ্ণাকে বাঁচা। ধর্ম সাক্ষী—গোপীমোহনে সাক্ষী—তোর হাতে আমার কৃষ্ণাকে সঁপে দিলাম। আমায় ক্ষমা কর—ওকে গ্রহণ কর। তোরা চলে যা দূরে—এই অরাজক রাজ্যের বাইরে—বনের অন্ধকারে—কিংবা পাহাড়ের কোন গুহায় যেখানে ফৌজদার নেই স্বেচ্ছাচার নেই।

অর্জুন ॥ এস কৃষ্ণা।

বৃন্দাবন ॥ আশীর্বাদ কার সুখী হ। গোপীমোহনকে যদি না ভুলিস—ঊষা-কীর্তনে যদি প্রতিটি দিন সুরু করিস্—আমি বলছি—তোদের মিলনে কোনো বাধা আসবে না—জীবনে কোন দুঃখ থাকবে না।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু বাবা—তোমাদের কি হবে ? ফৌজদার তোমাদের কেটে ফেলবে !

অর্জুন ॥ ফৌজদার। হাঃ হাঃ ফৌজদার এতক্ষণে শেষ। রঘু ডাকাত এ বাড়িতে হানা দিয়েছে।

[সকলে আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

কৃষ্ণা ॥ (অর্জুনকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া) আমায় বাঁচাও অর্জুনদা—রঘু ডাকাতের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

[বাইরে তখন ফৌজদারের সৈনাদের সঙ্গে রঘু ডাকাতের লোকজনের লড়াই বাধিয়াছে। বন্দুকের শব্দ চীৎকার—কোলাহল আর্তনাদ এবং জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বৃন্দাবন কৃষ্ণা ও অর্জুনকে অন্দরের পথে সবলে ঠেলিয়া দিলেন। যবনিকা দ্রুত নামিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুবর্ণ রেখার তীরে পাহাড়ের পাদদেশে অর্জুনের প্রস্তর নির্মিত ঘর। বারান্দার একাংশ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শেষ রাত্রি। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চম্পক বৃক্ষের নীচে বেদী। অর্জুন ও কৃষ্ণার প্রবেশ]

অর্জুন ॥ ফুলু, দুলু— দেখবি আয় কে এসেছে। (কৃষ্ণাকে) এই আমার ঘর, এই তোমার বাড়ি।

কৃষ্ণা ॥ কি সুন্দর! ঐ সুবর্ণরেখা, ঐ পাহাড়, ঐ ধানের ক্ষেত — কি সুন্দর শোভা! ঘরটা কত বড়?

অর্জুন ॥ দেখে এসো।

[কৃষ্ণা ভিতরে প্রবেশ করিল! চোখ মুছিতে মুছিতে ফুলু ও দুলুর প্রবেশ]

অর্জুন ॥ (ফুলু ও দুলুকে) আমার বউ। কিন্তু ও জানে না যে আমরা ডাকাত। খবরদার—একথা যেন কখনো জানতে না পারে। আমি চাষবাস করে খাই — বুঝলি?

ফুলু ॥ তা বুঝেছি।

দুলু ॥ ভারী সুন্দর বহু আছে—ও আমাদের রাণী হবে।

[কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ]

কৃষ্ণা ॥ এত বড় ঘর—তুমি করেছ?

অর্জুন ॥ তুমি একদিন আসবে তাই করেছি।

কৃষ্ণা ॥ এরা কারা?

অর্জুন ॥ ফুলু আর দুলু। ঐ ওদের ঘর। ওদের বুড়ো বাপ মংলু সর্দার—আমায় বড় ভালোবাসে। কি— দেখছিস কি—আমার বহু আছে।

ফুলু ॥ বহুর কি নাম আছে?

অর্জুন ॥ (হাসিয়া) নাম তুই তার বলতে পারবিনে। তোর দাঁত ভেঙ্গে যাবে— কৃষ্ণা!

দুলু ॥ ও হামরা পারবে না। হামরা রাণী বলে ডাকব।

কৃষ্ণা ॥ তোমাদের নাম কি ভাই?

দুলু ॥ আমার নাম দুলু আছে—ওর নাম ফুলু আছে।

অর্জুন ॥ রাণী তো আছে বললি। রাণীর ভাণ্ডার তো খাঁ খাঁ করে না আছে চাল না আছে ডাল, আগ না আছে—

ফুলু ॥ হামাদের আছে—হামরা এখুনি আনবে।

[ফুলু ও দলের সাঁওতালী গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

অর্জুন ॥ কি গাইছে জান ?

কৃষ্ণা ॥ কি ?

অর্জুন ॥ বনের রাণী পাহাড়ের বুকে ধরা পড়েছে। লাজে চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উড়ে পালালো—নদী ছুটে পালাচ্ছে। সত্যিই না ?

কৃষ্ণা ॥ (সজলভাবে) হুঁ। এ দেখছি চাঁপা গাছ কিন্তু ফুল কই ?

অর্জুন ॥ তুমি এসেছ এবার ফুল ফুটবে।

[চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। ঊষার আভাষ প্রকাশ পাইল]

কৃষ্ণা ॥ দুঃখের রাত এতদিনে পোহালো! জীবনের নতুন ঊষা শুরু হলো ঐ দেখ·· ···

[ঊষার প্রকাশ]

কৃষ্ণা ॥ হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম
রাম রাম, হরে হরে।

অর্জুন ॥ তুমি গাও—আমি ঘোড়াটা বেঁধে আসছি।

[অর্জুনের প্রস্থান। কৃষ্ণা ঊষা-কীর্তন সমাপন করিল। অর্জুনের পুনঃ প্রবেশ। কাছে আসিলে কৃষ্ণা তাহাকে প্রণাম করিল]

অর্জুন ॥ এ কি ?

কৃষ্ণা ॥ তুমি আমার স্বামী—তুমিও আমার দেবতা।

অর্জুন ॥ দেবতা কি দানব—জানি না। এই মাত্র জানি--সত্যিই আজ তোমায় আমি পেলাম।

কৃষ্ণা ॥ গোপীমোহন আমাদের মিথ্যে নয়। তাঁর কৃপাতেই তোমার হাতে হলো আমার উদ্ধার—শুরু ফৌজদারদের হাত থেকে নয়—রঘু ডাকাতের গ্রাস থেকে।

অর্জুন ॥ রঘু ডাকাতের ?

কৃষ্ণা ॥ নয়ত কি ? তুমিই তো বললে—রঘু ডাকাত বাড়ীতে হানা দিয়েছিল।

অর্জুন ॥ তা বলেছিলাম— তা দিয়েছিল।

কৃষ্ণা ॥ খুব বেঁচে গেছি—তুমি না থাকলে ডাকাতের ভয়ে আমাকে বিষ খেতে হত ?

অর্জুন ॥ বিষ খেতে হত ?

কৃষ্ণা ॥ শয়তান। টাকার লোভে সে কি না করে—মেয়েদের বে-ইজ্জত, বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি—দেবতার মূর্তি ধ্বংস—সে সব করে—সে সব পারে।

অর্জুন ॥ যাক, গে। রঘু ডাকাতের ভয় এখানে তোমার নেই। পথে তো তোমায় বলেছি—ঘর বেঁধেছি লোকালয়ের বাইরে…

কৃষ্ণা ॥ তাই দেখছি। তবু ভাগ্য—এত দূরে থেকে তুমি ভোল নি। তাই না আমার খবর নিয়েছ। তবেই না আমি তোমায় পেলাম, আর আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু একটা মিনতি তোমায় করি…

অর্জুন ॥ কি কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ বাবা আর পিসিমা বেঁচে আছেন তো ? রঘু ডাকাত তাঁদের মেরে ফেলেনি তো ? আমার গোপীমোহনের অলঙ্কার সে রেখেছে কি ? গোপীমোহন কে মাটিতে ছুঁড়ে দেয়নি তো ? তুমি খবর নাও—খবর নাও…

অর্জুন ॥ (বিচলিত হইয়া) আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

[অর্জুন পলাইয়া বাঁচিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বের দৃশ্য-বর্ণিত পাহাড়ের অপর পার্শ্বে পাহাড়-গর্ভে ডাকাত দলের বিশাল গুহা। অর্জুনের অনুচরগণ পানোৎসবে মত্ত। লুণ্ঠিত জিনিষপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত।

গানের শেষে অর্জুনের প্রবেশ। দ্বার-রক্ষী দামামা নির্ঘোষে তাহার আগমন ঘোষণা করিল। চকিতে নৃত্য-গীত স্তব্ধ হইল। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রঘু সর্দারের জয়ধ্বনি করিয়া অভিবাদন করিল]

দস্যুদল ॥ রঘু সর্দার কি জয়।

ত্রিশূল ॥ এসো সর্দার—তুমি না আসাতে আমাদের বিজয়োৎসব জমছে না।

অর্জুন ॥ বিজয়োৎসব ! কিন্তু জয় কি পরাজয়—আমি বুঝছি না। আমার মনে কোন উৎসবের সাড়া পাচ্ছি না, ত্রিশূল।

পিনাক ॥ সে কি সর্দার ?

বিষাণ ॥ বিয়ে করে—ঘরে বৌ এনে—তুমি এত মন-মরা কেন সর্দার ?

অর্জুন ॥ চুপ। আমার বিয়ে সম্বন্ধে কোন আলোচনা তোমরা করবে না !

আর শোন—আমার স্ত্রী জানে না যে—আমি ডাকাত। জানলে সে ভয় পাবে—আমি তা চাই না। হ্যাঁ ভালো কথা তার বাবাকেও কি এনেছ ?

ত্রিশূল ॥ হুকুম ছিল—না এনে পারি ?

অর্জুন ॥ না আনলেও চলত। যাক্—এনে ভালোই করেছ। কোথায় তিনি ?

ত্রিশূল ॥ কয়েদ ঘরে।

অর্জুন ॥ আর তার বিধবা বোন।

কৃপাণ ॥ সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সে আমাদের চোখের সামনে বিষ খেয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

[অর্জুন অস্ফুটে আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

ত্রিশূল ॥ সর্দার কি তাতে দুঃখিত হলেন ?

অর্জুন ॥ দুঃখিত ? না। উৎসব হোক তোমাদের।

[অর্জুন কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। পুনরায় নৃত্য গীত সুরু হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহার অপরাংশ। কয়েদ-ঘর। বন্দী বৃন্দাবন পদচারণা করিতেছেন। অর্জুনের প্রবেশ। বৃন্দাবন অর্জুনকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। চাপা গলায় তাহাকে ডাকিলেন—]

বৃন্দাবন ॥ অর্জুন ? তুমি ? তুমিও এখানে ? তোমরাও তবে ধরা পড়েছ ? কৃষ্ণা কোথায় ?

অর্জুন ॥ আছে।

বৃন্দাবন ॥ কোথায় ?

অর্জুন ॥ রঘু ডাকাতের ঘরে।

বৃন্দাবন ॥ হা ভগবান ! গোপীমোহন তোমার মনে এই ছিল ! কৃষ্ণা—রঘু ডাকাতের ঘরে !

[অর্জুন চুপ করিয়া রহিল]

বৃন্দাবন ॥ মহামায়া বিষ খেয়ে মরেছে—বেঁচেছে। কৃষ্ণাও যদি খেত—বাঁচত। হে ভগবান—রঘু ডাকাতের পাপের ভরা এখনো কি পূর্ণ হয় নি, তার মাথায় কি কোনদিন বজ্রাঘাত হবে না।

অর্জুন ॥ বজ্রাঘাত চাইলে কি—বজ্রাঘাত হয় ? আমাকে একদিন আপনি

ঝড়ের রাতে লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দিয়েছিলেন—আমার মাথায় বাজ পড়লে সেদিন আপনি খুসী হতেন। ভগবানের কাছেও—তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজ পড়ল না।

বৃন্দাবন ॥ সে কথা তুলে আর আমায় লজ্জা দিও না অর্জুন। কি ভুলই করেছিলাম!

অর্জুন ॥ সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি আমি। যাক্ সে কথা। আপনি কি রঘু ডাকাতের মৃত্যু চান?

বৃন্দাবন ॥ চাই। কে না চায়। কিন্তু কে তাকে মারবে?

[অর্জুন বৃন্দাবনের দিকে ছুরি আগাইয়া দিল]

অর্জুন ॥ এই ছুরি নিন—আপনি তাকে বধ করতে পারবেন।

বৃন্দাবন ॥ কি করে?

অর্জুন ॥ বলছি। নিন—ছুরি?

বৃন্দাবন ॥ পারব? আমি তাকে বধ করতে পারব? দাও। কোথায় সে?

অর্জুন ॥ আপনার সামনে!

বৃন্দাবন ॥ তুমি? তুমি রঘু ডাকাত? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে অর্জুন—একথা বলছ আমায়. যে তোমায় শিশুকাল থেকে পালন করেছে। আর রঘু ডাকাতের কথা আমি আমার শিশুকাল থেকে শুনে আসছি।

অর্জুন ॥ তবেই বুঝুন রঘু ডাকাতের মৃত্যু নেই। এক রঘু ডাকাত মরে—আর এক রঘু ডাকাতের সৃষ্টি হয় মানুষের অত্যাচারে—অবিচারে। যুগে যুগে এই খেলাই খেলছে।

বৃন্দাবন ॥ তাই কি? না আমি বিশ্বাস করি না।

অর্জুন ॥ করেন না? তবে দেখুন।

[অর্জুন রজ্জু আকর্ষণ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশূল, বিষাণ, পিনাক ও কৃপাণ আসিয়া সর্দারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

ত্রিশূল ॥ সর্দার—হুকুম।

[অর্জুন তাহাদের ইঙ্গিতে সরিয়া যাইতে বলিল। অনুচরগণ অদৃশ্য হইল। বৃন্দাবন হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

অর্জুন ॥ গরু-রাখালকে আপনি ডাকাত করেছেন। স্নেহ দয়া মায়া মমতা কোন কিছুরই দাম আপনি দেন নি। আপনি শিখিয়েছিলেন—সংসারে টাকাই সব। আমি তাই শিখেছি। আমি আপনার সৃষ্টি—ধ্বংস করতে হয়—আপনি করুন। আমার এ জীবন অসহ্য।

[বৃন্দাবনের হাত হইতে ছুরি মাটিতে পড়িয়া গেল]

বৃন্দাবন ॥ আমি তোমাকে ধ্বংস করেছি অর্জুন—কৃষ্ণাকে যেদিন আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি জানি কৃষ্ণা কখনো ডাকাতের স্ত্রী হয়ে বাঁচবে না—আর এও জানি—সে মরলে—তুমিও বাঁচবে না।

অর্জুন ॥ সে এখন জানে না—আমি ডাকাত। আমি তাকে জানতে দিই নি—জানতে দেব না।

বৃন্দাবন ॥ আমি জানাব—আমি বলব।

অর্জুন ॥ সে আশা এ জীবনে পূরণ হবে না। কৃষ্ণার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।

[অর্জুন গর্বিত ভঙ্গীতে চলিয়া গেল। বৃন্দাবন স্তব্ধ হইয়া কয়েদ-ঘরে গরাদে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই মত্ত অবস্থায় কয়েদ-ঘরের রক্ষী পূর্বদৃশ্যে বর্ণিত নর্তকীর গানের একটি কলি গাহিতে গাহিতে পাহারা দিতে আসিল]

রক্ষী ॥ (জড়িত কণ্ঠে) কি নাচ কি গান—কি চেহারা—বেঁচে থাক বাবা রঘু ডাকাত—হাজার বছর বেঁচে থাক! (বৃন্দাবনকে) কি বুড়ো কি ভাবছ তোমাকে এত করে পাহারা দিচ্ছি—এখন আমায় একটু পাহারা দাও বাবা।

[রক্ষী শুইয়া পড়িল এবং গাহিতে লাগিল]

["ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল
আর এলো না।"]

[গাহিতে গাহিতে রক্ষী প্রায় অচেতন হইয়া পড়িল]

[বৃন্দাবন দেখিলেন—এই তাঁহার সুযোগ। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন—কেহ নাই। তারপর বৃন্দাবন মুহূর্তে গরাদের ফাঁকে হাত বাড়াইয়া রক্ষীর কোমর হইতে চাবি নিয়া গরাদের দরজা খুলিয়া সন্তর্পনে অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। রক্ষী তখনো জড়িত সুরে গাহিতেছে :

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল
আর এলো না]

চতুর্থ দৃশ্য

[পাষাণ ঘরের অভ্যন্তর। একটা প্রশস্ত পাথরের উপর ফুল-শয্যা রচনা করা হইয়াছে। ফুলু ও দুলু কৃষ্ণাকে ফুলসাজে সজ্জিত করিতেছে]

ফুলু ॥ মানুষটা এখনো এলো না।

কৃষ্ণা ॥ আসবে রে—আসবে। আমার বাপের বাড়ি—অ-নে-ক দূর। নদী পেরিয়ে—পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তবে যাবে—তবে আসবে! পিসিমা তাকে খাওয়াবে—বাবার সঙ্গে দু'টো কথা বলবে—তবে তো আসবে। দেখবি—এই

এলো বলে। না এসে পারে! আজ যে আমার ফুলশয্যা।

ফুলু ॥ মানুষটা খুব ভালো আছে।

দুলু ॥ হামার বাপ বলে—ও খুব বড় চাষী হবে। জমি কিনবে—গরু আনবে। হাল হবে—বলদ হবে।

ফুলু ॥ খোকা হবে—খুকু হবে।

কৃষ্ণা ॥ দূর!

[নেপথ্যে অর্জুনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

অর্জুন ॥ (নেপথ্যে) কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

দুলু ॥ উ এলো।

ফুলু ॥ এখন মনের কথা হবে—দুলু। চল—হামরা বাড়ি যাই!

[ফুলু ও দুলুর কক্ষান্তরে প্রস্থান। অর্জুনের প্রবেশ]

কৃষ্ণা ॥ কি খবর।

অর্জুন ॥ খুব—খুব ভাল খবর। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হোল। কি খুসি হলেন আমায় দেখে।

কৃষ্ণা ॥ আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন?

অর্জুন ॥ তোমার কথা? তোমার কথাই তো সারাক্ষণ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভয় পেয়েছিলে কি না—তুমি কেঁদেছিলে কি না—নতুন জায়গা তোমার কেমন লাগছে—ঘর কন্না করতে পারছ কি না—আমায় যত্ন-আত্তি করছ কিনা·

কৃষ্ণা ॥ এখানে আসতে চাইলেন·

অর্জুন ॥ আসবেন বৈকি, ঘর সংসার গুছিয়ে নাও—আমার কাজ-কর্মের সুবিধা হোক ·আনব বৈ কি। হ্যাঁ—আর পিসিমা—ভারী খুসী হলেন বুড়ি। বল্লেন, অর্জুন, কৃষ্ণাকে যত্ন করিস—ভালো সাড়ি গয়না দিস··

কৃষ্ণা ॥ পিসিমাকেও আনতে হবে। আর আমাদের গোপীমোহন -প্রণাম করে এসেছ তো?

অর্জুন ॥ গোপীমোহন নেই। রঘু ডাকাত ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে।

[কৃষ্ণা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

কৃষ্ণা ॥ গোপীমোহন নেই! তবে বাবা, পিসিমা···তাঁরা কি করে বাঁচলেন?

অর্জুন ॥ তাঁরা বেঁচেছেন। ফৌজদার ·তবে বোধ হয় ফৌজদারই তাঁদের বাঁচিয়েছে।

কৃষ্ণা ॥ ফৌজদার—রঘু ডাকাতকে মেরে ফেল্লে না কেন—কুকুর দিয়ে খাওয়ালে না কেন। বিগ্রহের গায়ে হাত দেয়—শয়তান।

[কৃষ্ণার চোখে মুখে রঘু ডাকাতের প্রতি গভীর ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল]

অর্জুন ॥ শয়তান- এতবড় শয়তান যে তার কথা মনে হতে নববধূ তার ফুলশয্যার কথাও ভুলে যায়।

[কৃষ্ণার মুখে ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল]

কৃষ্ণা ॥ বস।

[কৃষ্ণা তাহাকে ফুলশয্যায় বসাইল এবং পাষাণ-পাত্র হইতে জল লইয়া তাহার পদ ধৌত করিতে উদ্যত হইল]

অর্জুন ॥ একি—একি!

কৃষ্ণা ॥ ফুলশয্যার রাতে স্বামীর পা ধুয়ে দিতে হয়।

অর্জুন ॥ ও তাই নাকি। আজ দেখছি—আমি রাজা।

কৃষ্ণা ॥ (পা ধুয়ে দিতে দিতে) হ্যাঁ, রাজা—শুধু আমার—আর কারো নয়।

[কৃষ্ণা কেশপাশ খুলিয়া ফেলিয়া তাহা দিয়া অর্জুনের পা মুছাইয়া দিতে গেল]

অর্জুন ॥ একি—এ আবার কি?

কৃষ্ণা ॥ ফুলশয্যার রাতে—এই নিয়ম।

অর্জুন ॥ ও, তবে আমি রাজা নই, সম্রাট।

[কৃষ্ণা আসিয়া তাহার পাশে বসিল]

কৃষ্ণা ॥ আর আমি?

অর্জুন ॥ সাম্রাজ্ঞী!

কৃষ্ণা ॥ স্বপ্নের জীবন...

অর্জুন ॥ জীবনের স্বপ্ন ...

কৃষ্ণা ॥ আজ শুধু ইচ্ছে হচ্ছে—একটি প্রণামে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ি। তুমি আমায় দানবের হাত থেকে উদ্ধার করেছ। তুমি আমার কৃষ্ণ—তুমি আমার গোপীমোহন।

[অর্জুন চুপ করিয়া রহিল]

কৃষ্ণা ॥ কথা বলছ না যে।

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা—কিন্তু কি করে আমি তোমায় সুখী করব—আমি জানি না—ভেবে পাই না।

কৃষ্ণা ॥ তোমাকে পেয়েছি—এই তো আমার চরম সুখ। আমার কিসের অভাব? টাকা নেই—নাই বা থাকল? পাহাড়ের বুকে আমাদের বাসা—নদীতে জল—গাছের ফল—ক্ষেতের ধান—চারিদিকে এই সুন্দর শোভা—সব মিলে এ আমাদের কত বড় স্বর্গ—কতবড় দুর্গ রঘু ডাকাতের সাধ্য নেই—আমাদের সুখ কেড়ে নেয়।

অর্জুন ॥ উঃ কি গরম!

[অর্জুন উঠিয়া গিয়া গবাক্ষের পাশে দাঁড়াইল। কৃষ্ণা গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল]

কৃষ্ণা ॥ সুন্দর হাওয়া আসছে—কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে....

অর্জুন ॥ হ্যাঁ—সুন্দর।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের সুখ—আমাদের স্বপ্ন—আমাদের জীবন সব মিলে তৈরী হয়েছে আকাশের ঐ সোনার চাঁদ।

অর্জুন ॥ তুমি ঠিক বলেছ কৃষ্ণা। (হঠাৎ, শঙ্কিত কণ্ঠে) কৃষ্ণা, কৃষ্ণা—এ সুখ সইবে না। ঐ দেখ আমাদের চাঁদকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে কত বড় কালো মেঘ।

[বাহিরের দিকের পাষাণ দরজায় ঘন ঘন করাঘাত। কৃষ্ণা চমকাইয়া উঠিল]

কৃষ্ণা ॥ কে?

অর্জুন ॥ কে জানি—কে!

[বাহিরের দরজায় পুনরায় ঘন ঘন করাঘাত]

অর্জুন ॥ হয়ত—আচ্ছা দেখছি। তুমি পাশের কক্ষে যাও।

[অর্জুন একটি শিকল আকর্ষণ করিতেই পাশের কক্ষের বৃহৎ কবাট দুইটি ফাঁক হইয়া গেল। অর্জুনের নির্দেশানুযায়ী কৃষ্ণা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই অর্জুন শিকল ছাড়িয়া দিল। পাষাণ কবাটদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল। ঐখানে যে আর কোন দরজা আছে—তা বোঝা গেল না।]

[অর্জুন ছুটিয়া গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। ত্রিশূল কক্ষে প্রবেশ করিল]

অর্জুন ॥ ত্রিশূল—তুমি? কিন্তু এখানে কেন? আর এই এত রাত্রে?

ত্রিশূল ॥ জানি আমার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু না এসে পারলাম না সর্দার সর্বনাশ হয়েছে—বৃন্দাবন পালিয়েছে।

অর্জুন ॥ পা-লি-য়ে-ছে!

ত্রিশূল ॥ সর্দার আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে তবে আপনার কাছে এসেছি।

অর্জুন ॥ উৎসব—উৎসব—উৎসব। এমন উৎসবই তোমরা করেছ যে

আমার সারা জীবনই নিরুৎসব হয়ে যাবে।

ত্রিশূল ॥ সর্দার তাকে ধরবার জন্যে আমরা জীবন পণ করেছি।

অর্জুন ॥ তুমি যাও—আমি আসছি।

[ত্রিশূলের প্রস্থান। অর্জুন বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া শিকল ধরিয়া টান দিতে পূর্ববৎ ভিতরের দরজার কবাট ফাঁক হইল। কৃষ্ণা প্রবেশ করিল। অর্জুন শিকল ছাড়িয়া দিল। কবাটদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত হইল]

কৃষ্ণা ॥ কে?

অর্জুন ॥ একদল যাত্রী বিপদে পড়েছে—মানে পথ হারিয়েছে—তাদেরই এক জন।

কৃষ্ণা ॥ তা তুমি গেলে না।

অর্জুন ॥ তোমাকে একা ফেলে? তুমি ভয় পাবে না?

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু আমার ভয়ের চেয়ে তাদের বিপদ বেশী।

অর্জুন ॥ আমি যাচ্ছি। আর তুমি জেনো—এখানে তোমার কোন ভয় নেই।

[অর্জুন বাহিরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা দরজায় খিল আঁটিয়া দিল।
অঙ্গের ফুলসাজ খুলিতে খুলিতে কৃষ্ণা গাহিতে লাগিল]

[ভাবার্থ :—কাছে থেকে দূরে
তবু সে মধুর…]

[দরজায় করাঘাত হইল। কৃষ্ণা দরজার কাছে গেল]

কৃষ্ণা ॥ কে?

[নেপথ্য কণ্ঠস্বর—কৃষ্ণা।]

[কৃষ্ণা দরজা খুলিয়া দিতেই বৃন্দাবন প্রবেশ করিল। কৃষ্ণা আনন্দে
অভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

কৃষ্ণা ॥ বাবা!

[আনন্দাতিশয্যে পিতৃবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

বৃন্দাবন ॥ মা! মা আমার!

[কৃষ্ণার মস্তকে ও পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

কৃষ্ণা ॥ (আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া) কি আনন্দ! তুমি এসেছ!

বৃন্দাবন ॥ আনন্দ! আনন্দই বটে। আনন্দেই আছিস্ দেখছি!

কৃষ্ণা ॥ গোপীমোহনের দয়া—তোমার আশীর্বাদ—পিসিমার আশীর্বাদ। তুমি বস বাবা, এই তো এখুনি যে ও বেরিয়ে গেল। (হঠাৎ কি মনে পড়িল) তুমি কি পথ হারিয়ে ছিলে বাবা?

বৃন্দাবন ॥ না, পথ হারাইনি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তেও

যদি তুই যেতিস,—আমি পথ হারাতাম না মা।

কৃষ্ণা ॥ এত কষ্ট করে তুমি আমায় দেখতে এসেছ! এতখানি পথ। (তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া করিতে করিতে) তুমি বড্ড শুকিয়ে গেছ বাবা। আমায় ছেড়ে তোমার থাকতে কষ্ট, না? তোমাকে আমি শীগগির যেতে দেব না। আমরা তোমার ছেলে মেয়ে—মনের সুখে আমাদের সেবা নেবে। পিসিমাকেও আনিয়ে নেব। ছবির মত সুন্দর হবে—আমাদের এই ছোট্ট সংসার।

বৃন্দাবন ॥ তা যদি হ'ত! কিন্তু কি করে হবে?

কৃষ্ণা ॥ তুমি ভেবো না বাবা। হবে। হবে। ঐ গাঁয়ে তার ক্ষেতখামার। শুনলাম চাষ-বাসে খুব মন লোকের দুঃখ কষ্ট খুব বোঝে। কে বিপদে পড়েছে শুনে—এই তো ছুটে বেরিয়ে গেল। ধনরত্ন নাই বা থাক—সুখে আছি বাবা—পরম সুখে।

বৃন্দাবন ॥ চলি মা। যেতে হবে আমায়—অনেক দূরে—রাতের এই অন্ধকারে।

কৃষ্ণা ॥ (পরম বিস্ময়ে) সে কি বাবা! তুমি চলে যাবে! মানে?

বৃন্দাবন ॥ আমায় যেতেই হবে মা।

কৃষ্ণা ॥ সে কি করে হয়? তুমিই বল—কী করে তা হয়! এখুনি এসে—এখুনি চলে যাবে! কিছু তো মুখেও দাওনি বাবা। কোন কথাও তো হ'ল না। আর তার সঙ্গে দেখা না করেই বা কি করে যাবে বাবা।

বৃন্দাবন ॥ তার সঙ্গে দেখা করব না বলেই যাব মা।

কৃষ্ণা ॥ কেন—কেন দেখা করবে না বাবা?

বৃন্দাবন ॥ কৃষ্ণা!—

কৃষ্ণা ॥ বাবা!

বৃন্দাবন ॥ রঘু ডাকাত আমায় বন্দী করেছিল।

কৃষ্ণা ॥ এ্যাঁ!

[কৃষ্ণা আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

বৃন্দাবন ॥ কিন্তু আমি পালাতে পেরেছি। আর দেরী হলে আবার আমি ধরা পড়ব মা। আর আমি ধরা পড়লে—আমি যাব—তুই যাবি—সে যাবে। জানি—একদিন সবাই যাবে—তবু যে কদিন সব কিছু বাঁচে। সেই ভালো—সেই ভালো মা। আমি এসেছিলাম—এ কথা কাউকে বলো না মা——তাকেও না। তোমার—আমার—তার—সকলের মঙ্গলের জন্য এ তোমার পিতার শেষ অনুরোধ—শেষ আদেশ। আসি মা।

[বৃন্দাবন ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কৃষ্ণা দরজা বন্ধ করিয়া বিষ্ণু স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল]

(স্তোত্র)

দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং
সঙ্কটে মধুসূদনম্ ॥
কাননে নরসিংহঞ্চ
পাবকে জলশায়িনম্ ॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ
পর্বতে রঘুনন্দনম্ ॥

[বাহিরের দরজায় করাঘাত। কৃষ্ণা দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ দরজা খোল—দরজা খোল কৃষ্ণা।

[কৃষ্ণা দরজা খুলিয়া দিল। অর্জুন প্রবেশ করিল]

অর্জুন ॥ তাহলে তুমি ঘুমোওনি—শোবে এসো।

কৃষ্ণা ॥ কি হয়েছিল—এত দেরী হ'ল যে।

অর্জুন ॥ বল তো—কি হয়েছিল ?

কৃষ্ণা ॥ একদল যাত্রী—

অর্জুন ॥ হ্যাঁ সে তো আমি বলেই গিয়েছিলাম। তারপর বল দেখি—কি ?

কৃষ্ণা ॥ আচ্ছা রঘু ডাকাত কি তাদের কাউকে—

অর্জুন ॥ রঘু ডাকাত! রঘু ডাকাত! রাতদিন রঘু ডাকাত। রঘু ডাকাত তোমায় পেয়ে বসেছে।

[অর্জুন বিছানায় শুইয়া পড়িল]

অর্জুন ॥ যাত্রীদের নিরাপদে রেখে এসে ভারী ক্লান্ত আমি। আর কথা বলতে পারছি না কৃষ্ণা। তুমি একলা আছ বলে—সারা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি।

[কৃষ্ণা প্রদীপের কাছে গিয়া প্রদীপটি হাতে লইল]

কৃষ্ণা ॥ শুধু একটা কথা বলব। আজ আমি একলা উষাকীর্তন করেছি। শুধু আজ কেন, আজ কতদিন দুজন একসঙ্গে উষাকীর্তন করিনি। শুভরাত্রি পোহালে কাল কিন্তু উষাকীর্তন করব—দু'জনে।

অর্জুন ॥ ও কীর্তন টির্তন আর আমার আসে না। যা করবার তুমি করো। আমি ঘুমালাম।

[ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া কৃষ্ণা শুইতে গেল। ক্ষণকাল পর অদূরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। অর্জুন সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণাকে ঘুমন্ত দেখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল কি ভাবিল। ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। তারপর দেখা গেল—কৃষ্ণাও দরজা খুলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[গুহাভ্যন্তর। অর্জুনের অনুচরগণ অর্জুনের প্রতীক্ষা করিতেছে। অর্জুন আসিতেই তাহারা তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। সকলের অলক্ষ্যে কৃষ্ণা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটি স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিল]

অর্জুন ॥ অসময়ে ঘণ্টাধ্বনি কেন ?

বিষাণ ॥ বৃন্দাবনকে দেখেছি সর্দার।

অর্জুন ॥ কোথায় ?

বিষাণ ॥ নারায়ণগড়ের পথে—দেখলাম ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

পিনাক ॥ সে ঘোড়া সাঁওতালদের।

অর্জুন ॥ তুমি তার পিছনে ধাওয়া করলে না কেন ?

বিষাণ ॥ আমি ছিলাম ফকিরের বেশে। ঘোড়া আমার ছিল না সর্দার।

ত্রিশূল ॥ বৃন্দাবন ছুটেছে নারায়ণগড়ে। সে তবে রাজার কাছে যাচ্ছে।

অর্জুন ॥ তবু রক্ষা! আমার ভয় ছিল—সে আশেপাশেই থাকবে তার মেয়ের সন্ধানে। মেয়ের সঙ্গে বাপের দেখা হলেই আমার সুখ-স্বর্গ নিমেষে চুরমার হ'ত।

ত্রিশূল ॥ কিন্তু এ যে কতবড় বিপদ—তা বলবার নয়। আমাদের যে যে গুহার সন্ধান কেউ কখনো পায়নি—সেই গুহার সন্ধান রাজাকে দেবে বৃন্দাবন।

কৃপান ॥ সর্বনাশ।

পিনাক ॥ সর্দার—এখন উপায় ?

অর্জুন ॥ রাজসৈন্য এ গুহা ধ্বংস করতে আসবার আগেই—রাজাকে আমি হত্যা করব। রাজ্য অরাজক হলে—গুহা রক্ষা পাবে—দল রক্ষা পাবে—তখন বৃন্দাবনকে—না, তাকে হত্যা করতে পারব না—সে আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা। কিন্তু গুহার সন্ধান যাতে আর কেও কখনো না পায়—তাই তার কণ্ঠরোধ করব—চিরতরে তাকে অন্ধকূপে বন্দী করে।

[স্তম্ভের আড়াল হইতে কৃষ্ণা আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

অর্জুন ॥ কে ?

[শব্দানুসরণ করিয়া ত্রিশূল ব্যাঘ্রের মত ছুটিয়া গেল এবং স্তম্ভের অন্তরাল হইতে কৃষ্ণাকে টানিয়া বাহির করিল। অর্জুন তাহাকে দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কৃষ্ণা অর্জুনের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, চলিতে গিয়া দেখে তাহার সম্মুখে উদ্যত অসি হস্তে তাহার পথরোধ করিয়া ত্রিশূল দাঁড়াইয়া আছে]

ম-৩০৫

কৃষ্ণা ॥ পথ ছাড়ো····

ত্রিশূল ॥ (অর্জুনের প্রতি) সর্দার !

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা, কৃষ্ণা—দাঁড়াও····

কৃষ্ণা ॥ (ত্রিশূলের প্রতি) তোমাদের পায়ে পড়ি—আমার পথ ছাড়ো
(কৃষ্ণাকে থামাবার জন্য অর্জুন আগাইয়া আসিল)

অর্জুন ॥ কৃষ্ণা····(কৃষ্ণা সরিয়া গেল ।)

কৃষ্ণা ॥ আমাকে ছুঁয়ো না ।

অর্জুন ॥ আমি জানতাম—আমি জানতাম··কিন্তু আজ যে আমি ঘৃণ্য ডাকাত—সে শুধু তোমাকে পাইনি বলে—তোমাকে পাব বলে····

কৃষ্ণা ॥ ভুল । অর্জুনদা আমায় পেয়েছিল—কিন্তু রঘু ডাকাত আমায় হারালো ।

[কৃষ্ণা গমনোদ্যত হইল]

অর্জুন ॥ না, না,—তোমাকে আমি হারাতে পারব না ।

[অর্জুন কৃষ্ণাকে ধরিতে গেল]

কৃষ্ণা ॥ সরে দাঁড়াও—তুমি মূর্তিমান নরক ! কি পাপ তুমি না করেছ ! শুধু মানুষকেই তুমি পীড়ন করনি—তুমি বিগ্রহ ভেঙ্গেছ—ধর্মকে পায়ে দলেছ····

অর্জুন ॥ হ্যাঁ—দলেছি । মানুষ হয়েও তোমাকে পাইনি—তাই অমানুষ হয়েছি । তোমাকে আমি হারাতে পারব না—তোমাকে যেতে দেব না ।

[অর্জুন মরিয়া হইয়া কৃষ্ণার হাত ধরিতে উদ্যত হইল । কৃষ্ণা আসন্ন বিপদ বুঝিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহার বিষের আংটি চুম্বন করিল । সঙ্গে সঙ্গে বিষ-ক্রিয়া সুরু হইল । কৃষ্ণা মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হইল । সে ঢলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অর্জুন তাহার দেহভার গ্রহণ করিল ।]

অর্জুন ॥ এ কি কৃষ্ণা—এ কি করলে ?

কৃষ্ণা ॥ রঘু ডাকাতের ভয়ে মেয়েদের হাতে থাকে বিষের আংটি । আমি সেই বিষ খেয়েছি । (অর্জুন আর্তনাদ করিয়া উঠিল) ঊষা-কীর্তন করেই আমাদের প্রথম মিলন হয়েছিল । আজ মরবার আগে আমার শেষ অনুরোধ—ডাকাতি কর—যত পাপই কর—শুধু প্রতিদিন ঊষা-কীর্তন করে আমায় মনে রাখবে । ঊষা-কীর্তনেই হয়েছিল আমাদের ইহকালের মিলন—ঊষা-কীর্তনেই হবে আমাদের পরকালের মিলন ।

অর্জুন ॥ আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি তোমার কথা রাখব । ঊষা-কীর্তন আমি কখনো ভুলব না—প্রতিদিন করব—তুমি আমায় ছেড়ে যেও না কৃষ্ণা—যেও না ।

কৃষ্ণা ॥ (মুমূর্ষু কণ্ঠে) পরকালে আবার আমরা মিলব—প্রতিজ্ঞা তুমি ভুলো না—ঊষা-কীর্তন ভুলে আমায় তুমি ভুলো না । ঐ ঊষার আলো ফুটে উঠেছে—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।'

[কৃষ্ণনাম কণ্ঠে কৃষ্ণার শেষ নিশ্বাস পড়িল]

অর্জুন ॥ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

[ঊষার আলোতে এই দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল। ধীরে পট নামিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নারায়ণগড়। ভুবনমোহনের মন্দির। সেখানেও এই ঊষায় ঊষা-কীর্তন হইতেছে। বৃন্দাবন সোপান-প্রান্তে দাঁড়াইয়া পুরোহিতদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এই ঊষা-কীর্তনই গাহিতেছেন। শ্রীশ্রীনারায়ণবল্লব শ্রীচন্দন পাল তিনিও এই ঊষা-কীর্তনে যোগ দিতে আসিলেন। যুক্তকরে বৃন্দাবনের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঊষা-কীর্তন শেষ হইল]

বৃন্দাবন ॥ ভুবনমোহন—পতিতপাবন—দয়া কর প্রভু—দয়া কর। কত পতিতকে তুমি উদ্ধার করেছ—কত পাপীকে ত্রাণ করেছ—রঘু ডাকাতকেও তুমি কৃপা করে উদ্ধার কর—দয়া কর—দয়া কর।

নারায়ণবল্লভ ॥ রঘু ডাকাতকে উদ্ধার কর! যে রঘু ডাকাতকে রাজ্যের প্রতিটি লোক অহরহ অভিশাপ দিচ্ছে—রাজ্যের প্রতিটি নরনারী যার অত্যাচারে দগ্ধ হচ্ছে—তার মঙ্গল চাইছ—কে তুমি ?

বৃন্দাবন ॥ আমি! আমি! কে আমি ?

নারায়ণবল্লভ ॥ আমি বুঝেছি—কে তুমি। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোকই এই নরাধমের জন্য করুণা ভিক্ষা করতে পারে—সে তার পিতা।

বৃন্দাবন ॥ তুমি মিথ্যা বলনি রাজা। আমি তাকে ত্রিশুকাল থেকে পিতার স্নেহেই পালন করেছি। আমাব বুকের ধন চোখের মণি আমার কন্যাকে আমি তারই হাতে সম্প্রদান করেছি।

নারায়ণবল্লভ ॥ উত্তম করেছ। তাই না আজ তার সন্ধান পেলাম। ভুবন-মোহনের অসীম দয়া—এইবার—তাকে ধরতে পারব। দুর্বৃত্তকে বধ করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

বৃন্দাবন ॥ বধ করবে—তাকে বধ করবে! না, না, রাজা—তুমি দেশের পিতা। সন্তান যত দোষই করুক - অধমই হোক—সে ক্ষমার্হ। তাকে ক্ষমা কর—দয়া কর রাজা!

নারায়ণবল্লভ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সহস্র সহস্র নরনারীকে যে পশুর মত বধ করেছে—কত সুখের—কত সুখের সংসার যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে—তাকে ক্ষমা করব আমি ? তার একমাত্র শাস্তি—প্রাণদণ্ড। বল—বল সে - কোথায় ?

বৃন্দাবন ॥ বলব—আমি বলব। তার প্রাণভিক্ষা পেলে মহারাজ আমি বলব।

নারায়ণবল্লভ ॥ প্রাণভিক্ষা না পেলে তুমি বলবে না? বলতে আমি তোমায় বাধ্য করব। আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—সে কোথায়?

বৃন্দাবন ॥ পিতা হ'য় কোন প্রাণে আমি আমার কন্যাকে বিধবা করব মহারাজ? না, না,—আমার প্রাণ গেলেও আমি তা পারব না।

নারায়ণবল্লভ ॥ কে আছ? একে বন্দী কর।

[রক্ষী ছুটিয়া আসিয়া বৃন্দাবনকে শৃঙ্খলিত করিল]

নারায়ণবল্লভ ॥ রাজ্যময় ঘোষণা কর—রঘু ডাকাতের শ্বশুর বন্দী—সপ্তাহ মধ্যে রঘু ডাকাত আত্মসমর্পণ না করলে সপ্তাহ অন্তে—তার শ্বশুরকে সর্বসমক্ষে জীবন্ত অগ্নিদাহ করা হবে। সে দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে—দলে দলে ছুটে আসবে—রঘু ডাকাতের অত্যাচারে জর্জরিত নারায়ণগড়ের অগণিত নরনারী—সেই অগ্নিদগ্ধ দেহে পদাঘাত করে—তারা তাদের প্রতিহিংসা-কামনা চরিতার্থ করবে।

সপ্তম দৃশ্য

[রাজপথ। জনতার মধ্যে ঘোষকের ঘোষণা]

ঘোষক ॥ ভুবনমোহনের পদাশ্রিত নারায়ণগড় অধীশ্বর শ্রীশ্রীনারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দনপালের ঘোষণা—"রঘু ডাকাতের শ্বশুর বন্দী। সপ্তাহ মধ্যে রঘু ডাকাত আত্মসমর্পণ না করলে—সপ্তাহ অন্তে—তার শ্বশুরকে সর্বসমক্ষে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হবে। আজ সপ্তাহের সপ্তম দিবস। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণতি করা হবে। সে দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে দলে দলে ছুটে আসবে—রঘু ডাকাতের অত্যাচারে জর্জরিত নারায়ণগড়ের অগণিত নরনারী—সেই অগ্নিদগ্ধ দেহে পদাঘাত করে তারা তাদের প্রতিহিংসা-কামনা চরিতার্থ করবে।"

[ঘোষক ঢ্যাঢরা দিতে দিতে চলিয়া গেল। জনতা তাহাকে অনুসরণ করিল। শুধু রহিয়া গেল পাঁচজন ছদ্মবেশী লোক। বলা বাহুল্য—তাহারা আর কেহ নহে, অর্জুন ও তাহার বিশ্বস্ত অনুচর চতুষ্টয়]

বিষাণ ॥ বৃন্দাবন আমাদের আড্ডার কথা রাজাকে বলতে অস্বীকার করাতেই আজ তার এই দণ্ড।

কৃপাণ ॥ যে আমাদের পরম শত্রু হবে ভেবেছিলাম সে হয়েছে পরম বন্ধু।

অর্জুন ॥ ঘৃণাকে চাপা দিয়ে—শেষে তার স্নেহই জয়ী হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাঁচাতে গিয়ে সে এমনি করে মরবে?

পিনাক ॥ সে হবে আমাদের চরম অপমান।

ত্রিশূল ॥ এতবড় পরাজয়, এতবড় অপমান আমরা মেনে নেবো সর্দার ?

অর্জুন ॥ আজ যদি কৃষ্ণা বেঁচে থাকত—পিতাকে বাঁচাতে সে ছুটে গিয়ে রাজার পায়ে পড়ত। কৃষ্ণা আজ নেই—তার কাজ আমি করব—বৃন্দাবনকে আমি মুক্ত করব—কিন্তু রাজার পায়ে পড়ে নয়—তাকে হত্যা করে। আজ রাত্রে হয় পরম জয়—নতুবা চরম পরাজয়। জীবন-পণ করে জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায় এস···

অষ্টম দৃশ্য

[রাজার শয়ন কক্ষ। শেষ রাত্রি। বাহির্দ্বারে সশস্ত্র প্রহরীদের ভারী পদক্ষেপ শোনা যাইতেছে। রাজা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজার পদপ্রান্তে ভূমিতলে পরিচর্য্যাকারিণী কিঙ্করী বসিয়া ঘুমাইতেছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে অর্জুনের প্রবেশ। গবাক্ষের বাহিরে অপেক্ষারত ত্রিশূলের মুখ দেখা গেল।

অর্জুন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষের অভ্যন্তর ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার শাণিত ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিল। সে রাজার দিকে অগ্রসর হইল। রাজাকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া ধার পরীক্ষা করিল। সে রাজার দিকে অগ্রসর হইল। রাজাকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একটি সিন্দুক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইল। অলৌকিক কৌশলে সে সিন্দুক খুলিয়া মণি মাণিক্য তাহার পেটিকায় পূর্ণ করিল তারপর এক হস্তে ছুরিকা লইয়া সে রাজার দিকে অগ্রসর হইল। রাজা ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছেন দেখিয়া অর্জুন মুহূর্তের জন্য সন্ত্রস্ত ভাবে দুই পা পিছাইয়া গেল। রাজার জাগিবার কোন লক্ষণ নাই বুঝিয়া সে পুনরায় শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজাকে বধ করিবার জন্য দৃঢ় হস্তে সে তাহার শাণিত ছুরিকা উদ্যত করিল।

তখন উষা। পাখীর কাকলির সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ভুবনমোহন মন্দিরে উষা-কীর্তন সুরু হইল।

অর্জুনের হাত কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণার অন্তিম বাণী আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল ঃ

[কৃষ্ণা ।। "ডাকাতি কর—যত পাপই কর—শুধু প্রতিদিন উষা-কীর্তন করে—আমায় মনে রাখবে। উষা-কীর্তনেই হয়েছিল আমাদের ইহকালের মিলন—উষা-কীর্তনেই হবে—আমাদের পরকালের মিলন।

অর্জুন।। আমি প্রতিজ্ঞা করচি—আমি তোমার কথা রাখব। উষা-কীর্তন আমি কখনো ভুলব না—প্রতিদিন করব। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না কৃষ্ণা—যেও না।]

অর্জুন ॥ উষা কীর্তন ! উষা-কীর্তন !

ত্রিশূল ॥ উষা-কীর্তন তুমি করো না সর্দার, ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে—আমরা মারা পড়ব।

[অর্জুনের হাত হইতে মণি-মাণিক্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অপর হস্ত হইতে তাহার ছুরিকা পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে নতজানু হইয়া অর্জুন উষা-কীর্তন সুরু করিল]

অর্জুন ॥ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।"

[অর্জুনের উষা-কীর্তন কালে কিঙ্করী জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে বিমূঢ়া হইয়া গেল। রাজাও জাগিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। বাহিরের প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অর্জুনকে বর্শাবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। রাজা অঙ্গুলি সঙ্কেত প্রহরীকে নিবৃত্ত করিলেন। উষা-কীর্তন শেষ হইল]

নারায়ণবল্লভ ॥ ভুবনমোহন মন্দিরে উষা-কীর্তন করছে পুরোহিত। কিন্তু এখানে উষা-কীর্তন করছে····কে তুমি ?

[অর্জুন উঠিয়া দাঁড়াইল]

অর্জুন ॥ আমি রঘু ডাকাত।

নারায়ণবল্লভ ॥ রঘু ডাকাত ? তোমাকে ধরবার জন্যই কি আমার এত আয়োজন ?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ—

নারায়ণবল্লভ ॥ তুমি ডাকাত ?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ।

নারায়ণবল্লভ ॥ তুমি কেমন ডাকত—যে আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা করলে না ? তুমি কেমন ডাকাত—দুর্লভ মণিমাণিক্য বিসর্জন দিয়ে—আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র শাণিত ছুরিকা ভূতলে নিক্ষেপ করে কৃষ্ণের বন্দনা করছ ? না, না, তুমি ডাকাত নও, তুমি ভক্ত। বহু সাধক দেখেছি—কিন্তু কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে জীবন যাবে– একথা জেনেও নাম কীর্তন করেছে এমন সাধক দেখলাম এই প্রথম। কে বলে তুমি ডাকাত ? তুমি ভক্তোত্তম এস সকলে নতজানু হয়ে এই মহাসাধকের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

[রাজা নতজানু হইলেন। দেখাদেখি অন্য সকলে নতজানু হইলেন]

অর্জুন ॥ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—তোমার কৃষ্ণনাম আমার কণ্ঠে দিয়ে এমনি করেই তুমি আমায় উদ্ধার করলে !

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥

[এই বন্দনায় রাজা এবং অন্য সকলে যোগ দিল। ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল]

য ব নি কা

দিগ্বিজয়

উৎসর্গ

চিরজয়ী পালাকার

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি,

করকমলেষু

গুণানুরক্ত শুভার্থী

মন্মথ রায়

পরিচিতি

—পুরুষ—

মহম্মদ শাহ .... দিল্লীর বাদশাহ।

জাওয়েদ খাঁ .... ঐ খোজা প্রহরী প্রধান ; পরে লাহোর দুর্গাধিপতি।

শাদাত খাঁ .... অযোধ্যার সুবাদার।

মীর মহম্মদ আমিন .... দিল্লীর হারেম মুন্সী

নিজাম উল্ মুলক্ .... হায়দ্রাবাদের নিজাম।

শাহ তমাস্ .... পারস্যের শাহ।

ইব্রাহিম খাঁ .... ঐ প্রধান ওমরাহ।

জাহান্দর খাঁ .... ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।

নাদির কুলী খাঁ .... ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ; পরে পারস্যের শাহ।

আমদশাহ আবদালী .... আফগান সেনাপতি।

বাজীরাও .... পেশোয়া।

ভৃত্য, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

উধমবাই .... দিল্লীর বেগম।

গুলবাহার .... ইব্রাহিমের কন্যা।

কোহিনুর .... আফগানিস্থানের বাঈজী।

মস্তানী .... বাজীরাও-এর মহিষী

দিগ্বিজয়

প্রথম দৃশ্য

পারস্যের রাজসভা

গীতকণ্ঠে সভাগায়কের প্রবেশ ও গীত।

সভাগায়ক ॥—

গীত

ইরাণ আমার সোনার ইরাণ দুনিয়ার সেরা দেশ।
সূর্যের মত কিরণোজ্জ্বল কীর্তির নাহি শেষ ॥
কত না কবির ললিত বীণার
উঠিয়াছে হেথা সুরঝঙ্কার,
আকাশে বাতাসে আজিও ভাসিছে তাহারই মধুর রেশ ॥
[গীতান্তে প্রস্থান।]

গায়কের গানের মাঝখানে প্রধান ওমরাহ ইব্রাহিম ও
সৈন্যাধ্যক্ষ জাহান্দার খাঁর প্রবেশ।

ইব্রা। দেখো জাহান্দর, এই সব গান শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

জাহান্দার ॥ এ আপনি কি বলছেন ওমরাহ ইব্রাহিম? জাতীয় সংগীত শুনলে আপনার পিত্তি জ্বলে যায়?

ইব্রা ॥ পারস্যের অতীত গৌরব আর কত শুনব? পিতৃপুরুষদের কীর্তি ভাঙিয়ে আর কতকাল চলবে জাহান্দার খাঁ? পারস্য আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি বুঝতে এখনও তোমার বাকী আছে? রোজই শুনতে পাই, খাস্ পারস্যের ভেতরই এখানে লুঠতরাজ ওখানে ডাকাতি! বুঝতে পারছি?

জাহান্দার ॥ তা আমাকে বলছেন কেন? আপনি ওমরাহসম্রাটকে বলুন। সেইসঙ্গে এ একটাও সম্রাটকে শুনিয়ে দেবেন, সৈন্যবাহিনী নিয়মত বেতনও পাচ্ছে না আজকাল।

ইব্রা ॥ চুপ, কে যেন আসছে। আরে, এযে শাদাত খাঁ দেখছি। এই যে এসো ভাই এসো। সেলাম আলায়কুম।

মীর আমিন সহ শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত ॥ ও আলায়কুম সেলাম।

ইব্রা ॥ ইনি হচ্ছেন সম্রাটের সৈন্যধ্যক্ষ জাহান্দার খাঁ—জবর আদমী! একটা বাঘ পুষেছে, তার দুধ খায়।

জাহান্দার ॥ সেলাম আলায়কুম।

শাদাত ॥ ও আলায়কুম সেলাম। আর এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে মীর মহম্মদ আমীন।

ইব্রা ॥ তা বলব কি, যেমনি মামা—তেমনি ভাগ্নে। [শাদাতকে] তুমি না দোস্ত, একবার শিকার করতে গিয়ে ভাল্লুক দেখে মড়ার মত পড়েছিলে? ভাল্লুকটা তোমাকে মড়া ভেবে—ঘেন্নায় চলে গেল।

শাদাত ॥ মনে আছে দেখছি!

ইব্রা ॥ মনে থাকবে না? ভাল্লুক-বিজয়ী বীর—সেই থেকে রাজদরবারে তোমার কত খাতির। তা তোমার ভাগ্নেও কম যাচ্ছে না। [আমীনকে] সেবার শিকারে গিয়ে তুমি যেন কি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিলে?

আমীন ॥ কই, মনে পড়ছে না তো?

ইব্রা ॥ আরে, মনে পড়ছে না কি? এক ঢিলে দুটো চড়াই পাখী মেরে আমাদের সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলে না? ছেলেমানুষ, এত ভুলে যাও তোমরা? আর যাই ভোলো, কিন্তু এই মামাটিকে যেন ভুলো না। তা হ্যাঁ হে, দিল্লীর রাজদরবারে তুমি নাকি এখন মস্ত লোক! ওখানে কত মাইনে পাও হে?

শাদাত ॥ আঃ—ইব্রাহিম, তুমি বড় বাচাল। ওসব কথা কি এখানে—

ইব্রা ॥ ও—তাওতো বটে। হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমার বাড়িতে ভোজ খেতে খেতে ওসব কথা শুনব। দিল্লীর মোগলাই খানা-টানা কিছু খাওয়াবে তো? হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি এখানে থাকতে থাকতেই আমার কন্যা গুলবাহারের সঙ্গে মীর মহম্মদ আমীনের বিয়েটা হয়ে যাক্ না?

শাদাত ॥ মীর আমীনের এখনই আবার বিয়ে কি? দিল্লীর দরবারে ওর একটা ভাল চাকরীর চেষ্টা করছি। সেটা হোক—তারপর ভাবা যাবে।

আমীন ॥ আমিও ওঁকে তাই বলেছি মামা। আপনি বরং ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি ততক্ষণ বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি। [প্রস্থান]

শাদাত ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরে কথা হবে। এখন বলো দেখি, সম্রাট বহাল তবিয়তে আছেন তো? দিল্লীর বাদশার জরুরী কাজে এখানে এসেছি। খোস্ মেজাজ পাব তো?

ইব্রা ॥ নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। খোস্ মেজাজ মানেই—আমাদের বাদশাহ। যাচ্ছেতাই খোস্ মেজাজ। আচ্ছা ভাই, দিল্লীতে মদ আর মেয়েমানুষ নাকি খুব সস্তা? দিল্লী কা লাড্ডু শুনি যো ভি খায়া,—ও ভি পস্তায়া, যো ভি নেহি খায়া—ও ভি পাস্তায়া? ব্যাপারটা কি বলো তো?

জাহান্দার ॥ আচ্ছা জনাব, আপনি কোহিনূরটা দেখেছেন তো ? দুনিয়ার সেরা হীরা ! সূর্যের মত নাকি চিক্‌মিক্‌ করে ?

ইব্রা ॥ ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা দোস্ত, এই যে শুনি ময়ূরসিংহাসন—কি চীজ সেটা বলো তো শুনি ? বাদশাহ কি ময়ূরের উপর বসে থাকেন—ওড়েন ? বলো না দোস্ত ?

শাদাত। বলছি-বলছি, তোমাদের সব প্রশ্ন শেষ হোক, তবে তো বলব।

জাহান্দার ॥ না, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা দুই দোস্ত কথা বলুন আমি দেখি সম্রাট এখনও আসছেন না কেন ? [প্রস্থান।]

শাদাত ॥ হ্যাঁ—তাই দেখুন, আমিও ব্যাস্ত হয়ে পড়েছি। তারপর দোস্ত, তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে ?

ইব্রা ॥ ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমাদের আর একটা প্রশ্ন আছে।

শাদাত ॥ বলো। শেষ করো।

ইব্রা ॥ এ আজব দেশ ভারতবর্ষে, কি নাকি একটা আজব ফল আছে ? খেলে. বুড়ো নাকি ছোঁড়া হয়ে যায়, বুড়ি হয় ছুঁড়ি ? আর ছোঁড়াছুঁড়ি যখন খায় তখন সব এমন রসিয়ে যায় যে, একেবারে সব রসাতল ব্যাপার ? কি যেন সে ফলের নামটা ? রহিম না রাম—

শাদাত ॥ আরে, আম—আম।

ইব্রা ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ আম। এনেছ নাকি কয়েক ঝুড়ি ?

শাদাত ॥ আমের সময় এ নয়, ওটা গ্রীষ্মকালের ফল। তবে ওর আস্বাদটা কেমন, তা এই পারস্যে বসেই তার কিছুটা আঁচ করতে পারো।

ইব্রা ॥ বলো কি হে, তাজ্জব ব্যাপার ! আম রয়েছে ভারতবর্ষে, আর তার স্বাদ মিলবে এই পারস্যে ?

শাদাত ॥ হ্যাঁ মিলবে, ঠাট্টা করছি না। বাইরে গিয়ে তুমি একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক ধর ; তার দাড়িতে বেশ খানিকটা তেঁতুল আর গুড় ভালো করে মাখিয়ে নাও। তারপর—

ইব্রা ॥ তারপর ?

শাদাত ॥ তারপর তার ঐ লম্বা দাড়িটা মুখে নিয়ে চোষো।

ইব্রা ॥ বলো কি হে ?

শাদাত ॥ হ্যাঁ, সত্যি বলছি—আমের স্বাদটা ঠিকই পাবে। কিছু মিষ্টি —কিছু টক্‌। আর জানবে আঁশ আছে, ঐ দাড়ির মত আঁশ।

[নেপথ্যে নকীব। বা-আদাব্‌বা—মোলায়েজা—হোসিয়ার।]
শাহেনশাহ শাহতমাসে সুলতানে নামদারে তস্‌রিফরমা
হোতে হ্যায়। (তূর্যধ্বনি হইল)]

শাহতমাসের প্রবেশ।

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই, সব যা হয়েছে—যাচ্ছেতাই।

ইরা ॥ যা বলেছেন জাঁহাপনা, যাচ্ছেতাই।

শাহ ॥ কি যাচ্ছেতাই ?

ইরা। সত্যিই তো! কি যাচ্ছেতাই ?

শাহ ॥ তুমি।

ইরা ॥ হ্যাঁ আমি। আমি ছাড়া আর কে ?

শাহ ॥ [শাদাতকে দেখিয়া] এ লোকটা কে ?

ইরা ॥ তাইতো, এ লোকটা কে ?

শাদাত ॥ [কুর্ণিশ করিতে করিতে] সম্রাট, গোলামকে চিনতে পারছেন না ? এক সময়ে এই রাজদরবারে এক আমীর ছিলাম আমি।

শাহ ॥ এখন মারা গেছ ? যাচ্ছেতাই।

শাদাত ॥ না-না হুজুর, মারা যাইনি। হুজুরেরই অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলাম ভারতবর্ষে। হুজুরেরই মেহেরবানীতে দিল্লীর রাজদরবারে এখন ওখানকার বাদশাহের খাস্ মুনসী আমি।

ইরা ॥ যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই।

শাহ ॥ চোপরাও! এটা যাচ্ছেতাই নয়—কত বড় কেরামতি! কেয়াবৎ—কেয়াবৎ

ইরা ॥ কেয়াবৎ—কেয়াবৎ।

শাহ। যাচ্ছেতাই চলে যাও এখান থেকে।

ইরা ॥ চলে যাচ্ছি এখান থেকে, চলে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

শাহ ॥ কিন্তু পালাবে না।

ইরা ॥ না হুজুর, আমি গুটি গুটি যাচ্ছি, পালাচ্ছি না। [প্রস্থান]

শাহ ॥ বলো শাদাত খাঁ, দিল্লীর খবর বলো।

শাদাত ॥ দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহ মহামান্য শাহকে শতকোটি আদাব জানিয়েছেন।

শাহা ॥ ফিরে গিয়ে তুমি ও তাঁকে আমার লক্ষকোটি আদাব জানাবে। কিন্তু যে কথাটা আমি সবার আগে জানতে চাই শাদাত খাঁ।

শাদাত ॥ বলুন হুজুর ?

শাহ ॥ ভারত দেশটা পারস্যের হাতে আসছে কবে ? তুমি চমকে উঠলে যে! চমকাবার তো কিছু নেই। আজ কত শত বছর ধরে পারস্যের ভাষা, পারস্যের সভ্যতা দিল্লীর রাজদরবারে চালু হয়ে গেছে। পারসীক স্থাপত্যের, পারসীক চিত্রকলার খুবই কদর ভারতে। বহু পারসীক রাজকর্মচারী ভারতের

স্থানে চাকরী করেছে—এখনও করছে। আমি জানি তারা খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। নামও করেছে। এই ধরো যেমন ঔরংজেবের আমলে মীরজুমলা। কি ক্ষমতাটাই না সে পেয়েছিল।

শদাত ॥ জাঁহাপনা, এদিকে দাসের দৃষ্টি আছে। অন্তর্ঘাতী বিপ্লবে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কিন্তু তবু বলব, এখনও আপনার সময় আসেনি। আমি লক্ষ্য রাখব, যথাসময়ে যোগাযোগও করব। হয়ে যাবে, তবে এখনও একটু দেরী আছে। মোগলসম্রাট ভাঙছেন, কিন্তু মচকাচ্ছেন না ; বরং চোখ রাঙাচ্ছেন আপনার উপর।

শাহ ॥ বটে! কি বলে সেই বেত্‌মিজ্‌ ?

শাদাত ॥ আপনার উপর তার একটা উদ্ভট দাবী আছে। আর তারই দৌত্য ভার দিয়ে আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। কারণ তিনি জানেন, আমি আপনার শুধু পরিচিতই নয়—আপনার অনুগৃহীতও বটে।

শাহ ॥ দাবীটা কি শুনি ?

শাদাত ॥ আজ থেকে ১৭৯ বৎসর আগে মোগল সম্রাট হুমায়ুন অদৃষ্টের পরিহাসে দিল্লীর সিংহাসন হারিয়ে জীবন রক্ষার জন্য সপরিবারে পালিয়ে আসেন এই পারস্যে। তদানীন্তন সম্রাট—

শাহ ॥ শাহ তমাসে,—তাঁর নামেই আমার নাম। আমি জানি সপরিবারে হুমায়ুনকে তিনি আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় দেন না, বিপন্ন হুমায়ুনের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এক পারসীক সৈন্যবাহিনী তাঁকে দান করেন।

শাদাত ॥ সেই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই হুমায়ুন তাঁর হৃতরাজ্য ক্রমে ক্রমে পুনরুদ্ধার করে দিল্লীর সিংহাসনও অধিকার করেন। ১৭৯ বৎসর পরে সেই হুমায়ুনেরই বংশধর বর্তমান সম্রাট মহম্মদশাহ অর্থাভাবে বিব্রত হয়ে এখন এক অদ্ভুত দাবী পেশ করেছেন আপনার কাছে।

শাহ। কি দাবী ?

শাদাত ॥ হুমায়ুন নাকি অশ্রয়দাতা পারস্য সম্রাটের কাছে, এক কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল পারস্যসম্রাট যথাসময়ে ঐ ধনরত্ন হুমায়ুনকে প্রত্যর্পণ করবেন। হুমায়ুন ও তাঁর বংশধররা বারংবার তাগিদ দিয়ে ঐ কোটি টাকা ফেরৎ পাননি এখনও। সেই টাকা এখন আপনার কাছে ফেরৎ চান ঐ মহম্মদশাহ।

শাহ ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ! ১৭৯ বৎসর পরে—হাঃ-হাঃ-হাঃ

শাদাত ॥ আমি জানতাম জাঁহাপনা, আপনার এই অট্টহাস্যই ঐ উদ্ভট দাবীর যোগ্য উত্তর।

শাহ ॥ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ শাদাত খাঁ। এইবার আমার দাবীটা তোমার প্রভুকে গিয়ে জানাও।

শাদাত ॥ বলুন জাঁহাপনা ?

শাহ ॥ হুমায়ুন আমার পিতৃপুরুষের কাছে সৈন্য সাহায্য পেয়েছিলেন কয়েকটা সর্তে। তার মধ্যে একটা সর্ত ছিল, কান্দাহার তিনি পারস্য সম্রাটকে দেবেন। বারবার দাবী করেও আমরা তা পাইনি। আমার দাবী আমি সেই কান্দাহার চাই। একি আমার অন্যায় দাবী শাদাত খাঁ ?

শাদাত ॥ জাঁহাপনা ! ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব ?

শাহ ॥ নির্ভয়েই বলো।

শাদাত ॥ ১৭৯ বৎসর পর এ দাবী ! মহম্মদশাহ্ শুনে আপনার মত অট্টহাস্য না করেন।

শাহ ॥ কেয়াবৎ-কেয়াবৎ ! তোমার উপর আমি খুশি হলাম শাদাত খাঁ। যাক, তবু আমার দাবীটা তুমি তাঁকে জানিয়ো। ন্যায্য দাবী ছেড়ে দেওয়া কোনদিনই উচিত নয় ? কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আসল কথা হয়ে রইলো— তুমি আমাকে যথাসময়ে খোস্ খবরটা দেবে। হুমায়ুন একদল পারসীক সৈন্য নিয়েই ভারত জয় করতে পেরেছিলেন আর আমি নিয়ে যাব তিন দল সৈন্যবাহিনী।

শাদাত ॥ একটা কথা বলব জাঁহাপনা ?

শাহ ॥ বলো—বলো ?

শাদাত ॥ পথে ঘাটে দুষ্ট লোকে বলাবলি কচ্ছে, আপনার সৈন্যরা নাকি বেতন না পেয়ে চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে।

শাহ ॥ ওসব দুষ্ট লোকের রটনা। খাঁটি কথা হচ্ছে একটি সৈন্যও চাকরী ছাড়েনি। তবে হ্যাঁ, তাদের বেতনটা নিজেরা আদায় করে নিচ্ছে প্রজাদের ঘর থেকে। আরে, প্রজার ঘরেই তো রাজার ভাণ্ডার। সৈন্যরা বরং এখন মহাখুশি। গোটা দেশ জুড়ে সবাই এখন সৈন্যই হতে চাইছে।

শাদাত ॥ বুঝেছি জাঁহাপনা !

শাহ ॥ বুঝেছ ! কি বুঝেছ ? কিচ্ছু বোঝনি। আমি গেছি। পারস্যের তিনভাগের এক ভাগ এখনও আফগানরা দখল করে রেখেছে। আবার শুনেছি তারা যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় করছে। আক্রমণ করলে যে দু'ভাগ হাতে আছে তাও যাবে। রাজকোষে অর্থ নেই, সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই, তাদের রয়েছে শুধু লুণ্ঠনের লালসা। শাদাত—শাদাত ! আমি তাদের চোখের সামনে ধরতে চাই ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ছবি। তাই আমি চাই তোমারই সাহায্য। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে যে মুহূর্তে তুমি আমাকে জানাবে জমি তৈরী, চলে আসুন—আমি সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ব ভারতবর্ষে। কি ভাবে কোন্ পথে আক্রমণ করব, তার ছকটি তুমি আমাকে পাঠাবে। আমি সেই প্রতিক্ষায় রইলাম শাদাত।

হঠাৎ নেপথ্যে একটি চিৎকার হইল—'পালাল, পালাল,
ধর—ধর, ইত্যাদি। সহসা নাদির খাঁ নামক একজন
যুবক জোর করিয়া দরবারে ঢুকিয়া পড়িল।
তাহাকে বাধা দিতে দিতে প্রবেশ করিল
মীর আমিন ও ইব্রাহিম।

নাদির ॥ জাঁহাপনা, রক্ষা করুন।

শাহ। যাচ্ছেতাই। কে এই বেতমিজ্ ?

নাদির ॥ আমি আপনার ওমরাহ এই ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ওঁরই বিরুদ্ধে জাঁহাপনার কাছে আমার গুরুতর অভিযোগ আছে।

ইব্রা ॥ নাঃ, দেখছি হতভাগার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এই মীর আমিন ওকে জাপটে ধরেছিল—তাই রক্ষে! নইলে কি করে বসতো কে জানে। ওর পাগলামিতে আতঙ্ক হয়ে আমার বাড়িতে ওকে আর ঢুকতে দিই না। এখন দেখছি সুযোগ পেয়ে আমার নাম ভাঙিয়ে সরাসরি এই রাজদরবারে ঢুকে পড়েছে। হুজুর, রক্ষী দিয়ে এখনই ওকে বেঁধে ফেলা দরকার। বদ্ধ পাগল তো, কখন কি করে বসে কে জানে।

নাদির ॥ না না জাঁহাপনা। আমার মত সুস্থ প্রকৃতিস্থ লোক দুনিয়ায় খুব কমই আছে। এই দেখুন আমার সবল বাহু! [হঠাৎ পোশাকের ভিতর হইতে একখানি শাণিত তরবারি বাহির করিয়া] এই দেখুন আমার অস্ত্র! চক্ষের নিমিষে আমি এখানে যাকে খুশি তাকেই বধ করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে এ অস্ত্র হুজুরের পদতলে আমি রাখছি—শুধু হুজুরের কাছে সুবিচারের আশায়। [অস্ত্রত্যাগ।]

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই। কি তোমার অভিযোগ ?

নাদির ॥ আমার এই চাচা—জাঁহাপনার ওমরাহ ইব্রাহিম খাঁ, আমার পিতৃসম্পত্তি ছলে ও কৌশলে আত্মসাৎ করেছেন। একরকম অনাহারে থাকতে হচ্ছে আমাকে। কত কাকুতি-মিনতি করেছি, পরিবর্তে ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। মহামান্য কাজীর কাছে বিচার চেয়েছি—ওঁরই কথায় তিনিও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন মস্তিষ্ক বিকৃতির অপবাদ দিয়ে।

শাহ ॥ কি আশ্চর্য! আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

ইব্রা ॥ জয়-জয়, খোদাতালার জয়—জাঁহাপানার জয়।

নাদির ॥ আমি বিকৃত মস্তিষ্ক—উন্মাদ!

আমিন ॥ তুমি এক শয়তান!

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই। শয়তান বলে ঠিক মনে হচ্ছে না, সে চেহারাও নয় তবে হ্যাঁ, তুমি বিকৃত মস্তিষ্ক নওতো কি ? সম্পত্তিতে যদি সত্যসত্যই তোমার

ম-৩২১

অধিকার থাকে—আর মনে প্রাণে তা বিশ্বাস কর, তবে ঐ সবল বাহু দুটি দিয়ে ঐ শাণিত অস্ত্রে তুমি তোমার সম্পত্তি আদায় করে নাওনি কেন ?

নাদির ॥ মহামান্য শাহের আইনটা কি তাই ? বিচারের ভার কি তবে আমি নিজেই নিতে পারি ?

শাহ ॥ না-না, তবে তো যাচ্ছেতাই হতো। কি বলো হে ইব্রাহিম ?

ইব্রা ॥ বটেই তো—বটেই তো।

শাহ ॥ [নাদিরকে] এরপরেও যদি আমি তোমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলি, তবে লোকে আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলবে না ! যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ইব্রাহিম, এ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, সেটা স্বীকার করছ তো ?

ইব্রা ॥ তা করছি ! কিন্তু তাই বলে আমার সম্পত্তিতে ওর কোনো অধিকার আছে আমি স্বীকার করি না।

শাহ ॥ কেন ?

ইব্রা ॥ ওর বাপের সম্পত্তি—ওর বাপের দেনাতেই শেষ হয়ে গেছে। বাপ যখন মারা যায় ও ছিল ছেলেমানুষ, তাই এসব কিছু জানে না। এতকাল ভাত কাপড় দিয়ে ঐ হতভাগাকে মানুষ করে দেখছি—ভস্মে ঘি ঢেলেছি। ওর মাথাটাই খারাপ।

শাহ ॥ ভস্মে ঘি ঢেলেছ ? তবে তো তোমার মাথাও খারাপ হে ! যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই। ওহে পাগলা, তোমার নাম কি ? না, সেটাও ভুলে গেছ ?

নাদির ॥ আমার নাম নাদির কুলী খাঁ।

শাহ ॥ বাঃ—নামটা তো বেশ। সব আদালত পেরিয়ে যখন আমার আদালতে এসেছ, তখন বাদশাহী বিচারই হোক। খুব সোজা বিচার। ফরিয়াদী আর আসামী দুজনেই তলোয়ার ধর—দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক।

[ইব্রাহিম তলোয়ার বাহির করিল। নাদির তলোয়ার দ্বারা ইব্রাহিমের তলোয়ারে আঘাত করিল, ইব্রাহিমের তরবারি হস্তচ্যুত হইল। এবং নাদির ইব্রাহিমকে আঘাতে উদ্যত হইল]

ইব্রা ॥ [ভয়ে] সম্রাট,—

নাদির ॥ থাক সম্রাট, আমি আমার অভিযোগ—আমার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। পিতৃব্য বলে নয়—গুলবাহারের পিতা বলে।

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই, তা গুলবাহারটি আবার কে ?

আমিন ॥ গুলবাহার হলো আপনার ওমরাহ এই ইব্রাহিম খাঁর একমাত্র রূপসী কন্যা। [সেলাম করিয়া প্রস্থান]

শাহ॥ শোভানাল্লা ! ঝোলা থেকে বিড়ালটা এতক্ষণে বেরিয়ে পড়লো ! ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ শাদাত খাঁ ?

শাদাত ॥ জলের মত বুঝতে পারছি। আসল ব্যাপারটা প্রণয়ঘটিত। প্রণয় মানেই প্রলাপ, প্রলাপ মানেই পাগল। মাথা খারাপ হবেই।

শাহ ॥ না—হয়নি, অন্ততঃ এর মাথা খারাপ হয়নি। যাও যুবক—বিকৃত মস্তিষ্ক তুমি নও। তবে হ্যাঁ, তুমি প্রেমিক। জেনো প্রেমের পথ কোনদিন মসৃণ নয়। শুধু প্রেমিক নও—তুমি বীরও বটে। শুধু বীরও নও তুমি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। ইব্রাহিম, যত সহজে একে ফাঁকি দেবে ভেবেছিল, তত সহজ নয়। একটা মিটমাট্ করে ফেল। নইলে এর বিচার একদিন আমাকেই করতে হবে। মনে রেখো তোমার অপরাধও কম নয়। বুঝেছ?

ইব্রা ॥ বুঝেছি জাঁহাপনা!

শাহ ॥ কিন্তু আমি বুঝছি না এমন এক সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুমি তোমার কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত কেন?

ইব্রা ॥ জাঁহাপনা, নাদির কপর্দকহীন নিঃস্ব। আপনার কোনো ওমরাহের জামাতা হবার মত আভিজাত্য ওর কিছু নেই। আমি জাঁহাপনার সামনে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই কপর্দকহীন নিঃস্ব যদি এক বছরের মধ্যে লক্ষপতি হতে পারে—বৎসারান্তে আমি ওর হাতেই আমার কন্যা গুলবাহারকে সম্প্রদান করব। [প্রস্থান]

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই—মানে, চমৎকার। তবে আর কি যুবক—লেগে পড়। আমার বিশ্বাস তোমার যা যোগ্যতা আছে, তাতে তুমি এ সর্ত অনায়াসেই পালন করতে পারবে। আমি বলছি এক বছরের মধ্যেই তুমি লক্ষপতি হবেই হবে। এসো শাদাত। [শাদাত সহ প্রস্থান।]

নাদির ॥ এক বৎসরের মধ্যে আমাকে হতে হবে লক্ষপতি, নতুবা গুলবাহারের আশা ত্যাগ করতে হবে। এই যদি বিচার হয়—এই যদি বিধান হয়, তবে আমি বৎসর কালের মধ্যেই হব লক্ষপতি। খোদা আমাকে ক্ষমা করো—ক্ষমা করো। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পারস্যের রাজধানীতে ইব্রাহিম খাঁর আবাস।

দূরে নহবৎ বাজিতেছে। একজন অন্ধ ভিক্ষুক গান গাহিতেছে। একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের পটভূমিকা।

ভিক্ষুক।—

গীত

মন আমার—
সুখের পরে দুঃখ আসে, দুখের পরে সুখ।
খোদাতালার এই বিধানে নেইরে ভুলচুক ॥
হেথায় শুধু কান্না-হাসির মেলা,
জীবন ভরা আলো-ছায়ার খেলা,
আজকে যে জন রাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষুক ॥

গীতান্তে সৈন্যাধ্যক্ষ জাহান্দার ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ [ভিখারীর নিকট যাইয়া, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া] সত্যি সত্যি ভিখারী না আর কিছু?

ইব্রা ॥ না না জাহান্দার, এ বহুদিন থেকেই ভিক্ষা করে। তুমি যা ভাবছ তা নয়।

জাহান্দার। কিছুই বলা যায় না জনাব। আচ্ছা যা। [ভিখারীকে ধাক্কা দিল]

ভিক্ষুক।—

পূর্ব গীতাংশ

মন আমার—
আল্লা যদি নেক নজরে চায়
ভিখারীও লক্ষ টাকা পায়,
খোদার ভেল্কী মানুষেরে বানায় আহাম্মুখ ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।]

জাহান্দার ॥ চলুন, দেখি আপনার বাড়ির আর কোথায় সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন করতে হবে। কোথায় আপনার মেয়ের বিয়েতে আনন্দ করব, তা না এখন ডাকাত ধরো।

ইব্রা ॥ আর সে ডাকাতও যে সে ডাকাত নয়। এই শুভদিনে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে এমন হুজ্জৎ হবে, এ কখনও ভাবিনি। আগে জানলে আমি নিজেই বিয়ে করতাম না।

জাহান্দার ॥ আমি কি করব বলুন—বাদশার হুকুম।

ইব্রা ॥ বাদশাহ তো হুকুম দিয়েই খালাস। এখন আমার বাড়িতে এত সব সৈন্য শাস্ত্রী দেখলে, লোক ভাববে বিয়ে নয়—লড়াই হচ্ছে। কেউ কি আর কচুকাটা হতে নেমতন্নে আসবে? হায়-হায়-হায়! আমার এত পোলাও—এত কালিয়া—এত কোর্মা—এত কাবাব কাকে খাওয়াব বলো তো?

জাহান্দার ॥ কাউকে না পান—ডাকাতদেরই খাইয়ে দেবেন। [প্রস্থান।]

ইব্রা ॥ ওরাই কি আর খাবে ? তবে আমাদের গলা কাটবে কে ? এখন দেখছি খাবার বাঁচাতে গেলে গলা যায়, আর গলা বাঁচাতে গেলে খাবার যায়। হায়-হায়-হায়, মেয়ের বিয়ে এখন আর আমি ভাবছি না। ভাবছি আমি কেন বিয়ে করেছিলাম।

গুলবাহারের প্রবেশ।

গুল ॥ বাপজান—বাপজান—

ইব্রা ॥ একি ! গুলবাহার, এখনও তুই বিয়ের সাজ-পোশাক পরিসনি কেন মা ? চল্-চল্ মা ভেতরে চল্। তোর পিসিরা সব এসেছে. ওরাই সব তোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে। না, বাপ হওয়ার যে কি ঝকমারী, তা বুঝছি। এমন ক্ষেমাঘেন্না করে আমাকে উদ্ধার করে।

গুল। এ বিয়ে আজ থাক. আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও বাপজান।

ইব্রা ॥ এই সেরেছে—সময় দেব কি করে ? সময় যে তর্ তর্ করে ছুটে চলেছে। না—না, সময় টময় আর নেই। চল্ই চল্।

গুল ॥ আমি তোমার পায়ে পড়ছি বাপজান।

ইব্রা ॥ ও সেই হতভাগা নাদের ছোঁড়াটাকে তুই আজও ভুলতে পারলি না ? পথের কুকুরটাকে লায়েক হতে পারে। একটা বছর সময় দিয়েছিলাম। সেই বছরটা পূর্ণ হচ্ছে আজ। আজ যদি তোকে আমার মনোমত পাত্রের হাতে তুলে দিই দোষটা আমার কোথায় ?

গুল ॥ বিয়েটা অন্ততঃ আজকের দিনের জন্য বন্ধ রাখো বাপজান।

ইব্রা ॥ বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর আর কি তা হয় মা ? তীর একবার ছুঁড়লে, সে তীর কি আর ফিরিয়ে আনা যায় ?

গুল ॥ এমন তো হতে পারে আজ যেকোনো সময় সে এখানে এসে পড়তে পারে। যাবার সময় সে আমাকে বলে গিয়েছিল এক বছরের মধ্যে সে আসবেই আসবে। আজ যদি সে না আসে কাল তুমি আমার বিয়ে দিও বাপজান।

ইব্রা ॥ গোটা বছর চলে গেল. এলো না—আর আসবে আজ। তবে শোন গুলবাহার ! ওসব আশা তুই ছেড়ে দে। আমি তার খবর পেয়েছি রে—খবর পেয়েছি। সে কি আর মানুষ আছে. সে এখন ডাকাত। দুর্দান্ত ডাকাত। ডাকাতের সর্দার।

গুল ॥ বলো কি বাপজান ? না-না এ হতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না।

ইব্রা ॥ বিশ্বাস করিস্ না ? তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাদশাহ স্বয়ং তাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিয়েছেন। তার গ্রেপ্তারের জন্য গোটা রাজ্যে হুলিয়া জারি হয়ে গেছে।

গুল ॥ কই, একথা তো আমাকে আগে কখনও বলোনি বাপজান ?

ইরা ॥ আগে বলব কি ? আমিই কি জানতাম ? সে তো শুনলাম আজ স্বয়ং বাদশার কাছে, তাকে তোর বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে।

গুল ॥ কি শুনলে ?

ইরা ॥ শুনলাম নাদিরই ঐ দুর্দান্ত ডাকাত কুলি খাঁ। সে আজ এই এক-বছরের মধ্যে ডাকাতি করে করে দেশের লোকগুলোকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বাদশা নিজে আজ আমাকে বললেন, ওকে ধরতে পারলেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। আমি বাপ হয়ে—তুই মেয়ে, তোর কাছে মিথ্যে বলব না মা !

গুল ॥ কিন্তু বাপজান ! হোক ডাকাত, তবু তুমি আমি যখন দুজনেই তাকে সেদিন কথা দিয়েছি, লক্ষপতি হয়ে সে যদি একবছরের মধ্যে ফিরে আসে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। এটা কি মিথ্যা ?

ইরা ॥ তাই বা এলো কই ? সেই একবছরই না পূর্ণ হচ্ছে আজ।

গুল ॥ কিন্তু পূর্ণ হতে রাতটা এখনও বাকী আছে বাপজান। আর তুমি কিনা তার আগেই বিয়ে দিচ্ছ আমার। না না, এ হয় না —এ হতে পারে না।

ইরা ॥ হয় না হতে পারে না ! অমন একজন আমীর ওমরাহের হাতে তোকে দিতে পারছি, এ কত বড় সৌভাগ্য বল দেখি। হিন্দুস্থানে বাদশাহী দরবার যে নাকি আমাদের এই ইরাণের জাঁকজমককে হারিয়ে দেয়। এ সুযোগ কি আমি ছাড়তে পারি ?

ফকিরবেশী নাদিরের প্রবেশ।

নাদির ॥ [কৃত্রিম স্বরে] বিয়ের সানাই বাজছে। আমার গুরুর আদেশ, বিয়ে দেখলেই কনেকে করবে আশীর্বাদ।

ইরা ॥ ঐ যাঃ ! বাদশা আসবার সময় হয়ে গেল যে। আর দেরী নয় মা। যা মা যা, চট করে বিয়ের সাজটা পরে নে। [প্রস্থান]

নাদির [স্বাভাবিক কণ্ঠে] গুলবাহার ! আমি এসেছি। আমি আমার কথা রেখেছি। একটি বছর উত্তীর্ণ হতে আমি দিইনি। আর এও জানাচ্ছি, গেল রাত্রেই খোরাসানে এক জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করে শেষপর্যন্ত লক্ষ টাকাই আমি রোজগার করেছি। হ্যাঁ, আজ সত্যি সত্যিই আমি লক্ষপতি।

গুল। নাদির—নাদির, তুমি ডাকাত।

নাদির ॥ তোমারই জন্য আজ আমি ডাকাত গুলবাহার। আর এর জন্য দায়ী আমি নই—তোমার পিতা। লক্ষপতি না হলে তিনি তোমাকে আমার হাতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর পণ !

গুল ॥ তুমি পালাও—এখনি পালাও নাদির। বাদশাহ হুকুম দিয়েছেন তোমাকে ধরতে পারলে ঝোলানো হবে ফাঁসিকাঠে। আমার এই সর্বনাশ তুমি করো না নাদির।

ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ।

ইব্রা ॥ এ আবার কোন্ ফকিরসাহেব? যা দিন পড়েছে আজ সবাই ফকির। কিন্তু এমন অসময়ে কেন? আর এখানেই বা কেন? আপনাকে তো আমি চিনি না ফকিরসাহেব। তা এসেছেন—বসুন। বাদশাহ এসে গেছেন। তাঁর আবার তর্ সইছে না। বর কনেকে আশীর্বাদ করে তিনি এখনি ফিরে যাবেন বলছেন। তুই যে কি করলি—গুলবাহার! এখনও পর্যন্ত বিয়ের পোশাকটা তোর গায়ে উঠলো না। আঃ, বিয়েটা তবে হবে কার?

নেপথ্যে শাহ। যাচ্ছেতাই।

ইব্রা। এই যে বাদশা এসে গেছেন!

সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবৃত শাহতমাসের প্রবেশ।

শাহ ॥ যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই। কই হে ইব্রাহিম, তোমার মেয়েকে আনো। কি নাম যেন! ও—হ্যাঁ গুলবাহার! নাঃ—বেশ সুলক্ষণা কন্যা দেখছি। তা বরটিও যাচ্ছেতাই—মানে, বেশ। তাকে আশীর্বাদ করে বলে এলাম নববধূ সঙ্গে নিয়ে দিল্লী রাজদরবারে যাচ্ছ বড় চাকরী পেয়ে—তা যাও। দিল্লীর রাজদরবারে এই পারস্য সুন্দরীকে তোমার পত্নীরূপে পরিচয় দিতে মাথা হেঁট হবে না। তা নয় তো কি? ছ্যা—ছ্যা ওদের দেশে আবার সুন্দরী আছে নাকি? যাচ্ছেতাই। একমাত্র সুন্দরী ছিল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। তা সেও তো এই পারস্যেরই মেয়ে! কই গুলবাহার! এসো-এসো, আমার আর সময় নেই। গুরুতর রাজকার্য অপেক্ষা করছে। আসবার সময় খবর পেয়ে এসেছি, দুর্দান্ত দস্যু সেই কুলী খাঁ—এই ফকিরসাহেবটি কে? আমি যখন আশীর্বাদ করতে এসেছি, তখন আমিই করব, অন্য লোক কেন এখানে?

ইব্রা ॥ যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই—আমিও ওকে চিনিনা জাঁহাপনা! [ফকিরকে] তা এসেছেন ভালো, এখন আপনি সরে যান। দেখছেন না স্বয়ং বাদশা—

[হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইব্রাহিম যখন কথা বলিতেছিল, শাহ তখন তাঁর দেহরক্ষীর কানে কানে কি বলিলেন। দেহরক্ষীটি হঠাৎ বন্দুক লইয়া ফকিরের সামনে গিয়া তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া তাক্ করিলে নাদির প্রস্থানোদ্যত হইল]

শাহ ॥ হাত তোলো নাদির কুলী খাঁ! তুমি সকলের চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারো, কিন্তু আমার চক্ষুকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। তোমাকে আমি প্রথম যেদিন দেখি, তোমার মুখমণ্ডল আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। লক্ষ্য করেছিলাম তোমার ভ্রূযুগলের মধ্যে একটি ঘনকৃষ্ণ তিল বর্তমান। তুমি দস্যু দলপতি হয়ে, আমার প্রজাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেছ এই একটি

বছর। তোমাকে ধরার সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমার খুব আশা ছিল, এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তোমার প্রিয়তমার বিবাহ হচ্ছে এ সংবাদ পেয়ে তুমি বিবাহবাসরে হানা দেবেই দেবে। আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

নাদির ॥ জাঁহাপনা।

শাহ ॥ আমি তোমাকে বলেছিলাম, প্রেমের পথ মসৃণ নয়। কিন্তু আজ দেখছি সেপথ ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। অগণিত নরহত্যা, নিরীহ প্রজার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। এগিয়ে এসো গুলবাহার! আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব।

গুল ॥ আমি পারব না জাঁহাপনা—আমি পারব না।

শাহ ॥ তোমার এই উত্তর আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয় গুলবাহার। আমি জানি, তুমি ঐ হতভাগ্য নাদিরের প্রেমমুগ্ধ। সে প্রেম কতটা গভীর—বেশ, আমি তার পরীক্ষাও নিচ্ছি। গুলবাহার! নাদির কুলী খাঁ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু আমি তার মৃত্যুদণ্ড মার্জনা করার কথা দিচ্ছি, যদি তুমি এই মুহূর্তে এগিয়ে এসে খাঁন মহম্মদ আমীনের ভাবী বধূরূপে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ইরা ॥ সম্রাট মহানুভব। গুলবাহার, সম্রাটের আশীর্বাদ গ্রহণ করে সবদিকে রক্ষা কর। একুলও থাক- ওকুলও থাক। আমি সংবাদটা ভেতরে জানিয়ে আসি জাঁহাপনা। [প্রস্থান]

[একটি নাটকীয় মুহূর্ত। শাহতমাসের ইংগিতে রক্ষীর প্রস্থান।
দেখা গেল গুলবাহার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সম্রাটের
নিকট আসিল। সম্রাট গুলবাহারকে একছড়া
হীরকের হার দিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

গুল। নাদির তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ! তোমার ঐ মূল্যবান জীবন রক্ষা করতে, আজ আমিই তোমাকে ত্যাগ করলাম। জানিনা এতে তুমি কি ভাববে। কিন্তু এবার আমার অনুরোধ তুমি ত্যাগ করো না ঐ ঘৃণ্য ডাকাতি।

শাহ। [নাদিরকে] হ্যাঁ, ত্যাগ কর এ ঘৃণ্য ডাকাতি। আর গ্রহণ কর দেশের শত্রু বিতাড়নের ভার। দেশের এক তৃতীয়াংশে দুর্দান্ত-আফগানরা দখল করে বসে আছে। তাদের বিতাড়ন করতে আমি পারিনি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তোমার অপূর্ব সংগঠন শক্তিতে, অপরাজেয় নেতৃত্বে তুমি তা পারবে। পারস্যের অপহৃত স্বাধীনতা তুমি পুনরুদ্ধার করো নাদির। বিপন্ন সম্রাটের এই পরম কামনাটি পূর্ণ কর বীর!

নাদির। জাঁহাপনা, আপনাকেও আমি প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন হয়েছিলাম মুগ্ধ—আর আজ হচ্ছি অভিভূত। সম্রাট! [নতজানু হইয়া] আমি

আপনার দাসত্ব গ্রহণ করলাম। দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য এ জীবন আজ থেকে উৎসর্গ করছি। আর এই একবছর ধরে যে উদ্দেশ্যে আমি লক্ষ্য মুদ্রা সংগ্রহ করেছি, সে উদ্দেশ্য যখন সফল হলো না, তখন আমি তা বিলিয়ে দিতে চাই আমার পারস্যের দরিদ্র ভায়েদের মধ্যে।

শাহ ॥ খোদাতালার জয় হোক। আমার রাজবংশের মহিমান্বিত এই তরবারি তোমায় অর্পণ করছি। আজ থেকে তুমি পারস্যের প্রধান সেনানায়ক। [স্বীয় তরবারি প্রদান]

নাদির ॥ [নতজানু নাদির সশ্রদ্ধভাবে তরবারি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। এবং সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিল।]

শাহ ॥ অগ্রসর হও বীর! স্বদেশ থেকে বিদেশী শত্রু বিতাড়না করো। বিতাড়িত শত্রুকে অনুসরণ করে ধাবিত হও আফগানিস্থানে। জয় করো আফগানিস্থান। [প্রস্থান]

নাদির ॥ হ্যাঁ, জয় করব আফগানিস্থান! আর তারপর - তারপর -- [গুল-বাহারের দিকে তাকাইয়া] আমার অভিযান হবে ভারতবর্ষ! গুলবাহার, দেখা আবার আমাদের হবে--ঐ ভারতবর্ষে! [প্রস্থান]

গুল ॥ হয়তো দেখা হবে কিন্তু সেদিন তোমাকে দেখতে চাই ঘৃণ্য দস্যুরূপে নয়, দিগ্বিজয়ী পারস্যবীরের বেশে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর দেওয়ানি খাস

অদূরে প্রভাতী নমাজের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

জাওয়েদের প্রবেশ।

জাওয়েদ ॥ শুনেছি, শাহানশা আকবরের কথা। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে সুখে থাক্—শান্তিতে থাক্—আনন্দে থাক্। সম্রাট মহম্মদশাহকে দেখেও সেই কথাই মনে হয়। কিন্তু তিনি যেমন সরল তেমন উদার, আবার তেমনিই বিলাসী। রাজঅন্তঃপুর সারারাত জেগে থাকে নর্তকীর নূপুর নিক্কণে আর সুরার মত্ত প্রবাহে। সম্রাজ্ঞী উধমবাই, সেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই বিলাসিতার সুযোগ নিয়েই বিশ্বাসঘাতকেরা সাপের মত চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

পানোন্মত্ত সম্রাজ্ঞী উধমবাইয়ের প্রবেশ।

উধম ॥ কেন! আমি কি আমার মহলে আসিনি।

জাওয়েদ ॥ না-না, এযে দিল্লীর দেওয়ানি খাস? খোদা, রক্ষা কর।

উধম ॥ ধর্-ধর্—আমার হাত ধর্।

জাওয়েদ। আঃ—লোকে দেখবে যে! খোদা, আমায় রক্ষা কর।

উধম ॥ ও, ভোর হয়ে গেছে বুঝি? হ্যাঁ—তাইতো। সূর্যটা এত সকালে উঠে গেল? আমি বাদশাকে বলব, ওকে কোতল কর। হ্যাঁরে বাদশাটা কোথায় রে?

জাওয়েদ ॥ কখন উঠেছেন এই দেওয়ানি খাসে আসবার সময়ও হয়ে গেছে। খোদা, রক্ষা কর।

উধম ॥ না-না, তবে তো এখনই সরে পড়তে হয়। তুই আমার হাতটা ভাল করে ধর্ না।

জাওয়েদ ॥ আঃ—কি যা তা বলছেন? কেউ শুনলে আমার গর্দান যাবে। এত করে বলি খোজা প্রহরী থেকে আমাকে উজীর নাজির করে দাও, তবেই একটু সাহস হয়। তা খোজা প্রহরী করে রেখেছ। রাতের বেলায় হাত ধরে টানাটানি করলে, হায় খোদা; একি আমার সইবে? নির্ঘাৎ গর্দান যাবে!

উধম ॥ কেন যাবে? কেন যাবে? বাদশা ঐ বাঁদী ছুঁড়িগুলোকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করে না সারা রাত? জানিস্ জাওয়েদ, বাদশার এখন সব চলে—সব চলে। আমার বাঁদীটা কোথায় গেল? কি যেন নাম?

জাওয়েদ ॥ গুলবাহার!

উধম ॥ হ্যাঁ গুলবাহার। ভাগ্যিস বাদশার চোখে এখনও পড়েনি—তাই রক্ষে, নইলে—

জাওয়েদ ॥ ঐ বাঁদীই হয়ে যাবে বেগম। খোদা রক্ষা কর। আসুন, আর দেরী করলে গর্দান যাবে।

উধম ॥ [সুরে] ‘ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল, আর এলো না।’

[স্খলিত পদে প্রস্থান]

নেপথ্যে নকীব ॥ আবুল মুজাফর সুরাজুদ্দীন মহম্মদশাহ বাদশাহী গাজী—নামদারে বাহারোবার—[তুর্যধ্বনি]

ব্যস্তভাবে মহম্মদশাহের প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ এই জাওয়েদ! দেওয়ানি খাসের সামনে নতজানু হয়ে হাতজোড় করে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে—ওরা কারা?

জাওয়েদ ॥ জাঁহাপনা! দাসের গোস্তাকী মাপ হয়। এইমাত্র খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ওরা সব হিন্দোলের অধিবাসী।

মহম্মদ। হিন্দোল! সেটা আবার কোথায়?

জাওয়েদ। খোদার মর্জি! আগ্রা থেকে তা প্রায় পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে।

মহম্মদ। হিন্দোল—হিন্দোল—হিন্দোল! মনে পড়েছে। বুঝেছি। তা ওরা এখানে কেন? একেবারে দেওয়ানি খাসের চত্বরে।

জাওয়েদ। জাঁহাপনার হুকুমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মহম্মদ। মানে?

জাওয়েদ। হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ানি খাসে লালপাথর দিয়ে হুজুর যে নতুন মসজিদটা তৈরি করেছেন, সেই অদ্ভুত মসজিদ যাতে প্রজারা দেখতে পায়, তার অনুমতি হুজুরই দিয়েছেন।

মহম্মদ। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি চাই লোকে দেখুক—দেখুক আমার কীর্তি। এতদিন শুধু আমার কুকীর্তিই ওরা দেখে এসেছে, এবার ওরা আমার সুকীর্তিগুলোও দেখুক। এই শোন, ভারী মজা হবে, একটা কাজ করবি?

জাওয়েদ। বলুন হুজুর?

মহম্মদ। তুই ওদের কাছে চলে যা। মনে হচ্ছে, হাতজোড় করে ওরা আমাকে কিছু বলতে চায়। ওদের মধ্যে থেকে একজন প্রতিনিধিকে আমার কাছে নিয়ে আয়। ওদের মনের কথা আমি জানতে চাই। কিন্তু তা জানব আমি ছদ্মবেশে—সম্রাটের পরিচয় না দিয়ে। প্রজাদের মনের কথা জানা আজ বড় বেশি দরকার হয়ে পড়েছে। সম্রাটের কাছে ভয়ে ওরা যেসব কথা বলতে পারে না, সেসব কথা আজ আমি শুনব ওদের মুখ থেকে আমি নিজে—এক দরবেশের বেশে। আমি দরবেশ সাজতে যাচ্ছি। আর তুই প্রতিনিধিটাকে এখানে নিয়ে আয়। আর হ্যাঁ—ভালো কথা, এখানে এ সময়ে যেন আর কেউ না আসে। [প্রস্থান]

জাওয়েদ। [হাততালি দিল]

রক্ষীর প্রবেশ।

জাওয়েদ। [যেন সে নিজেই সম্রাট] এখানে এ সময়ে যেন আর কেউ না আসে। বুঝেছ উজবুক?

রক্ষী। [মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে]

জাওয়েদ। খোদা, রক্ষা কর। [প্রস্থান]

উধমবাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। [অনুচ্চস্বরে] 'ফাঁক দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল, আর এলো না।

রক্ষী। [হতাশাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ]

উধম। সম্রাট কোথায় গেলেন? ও, জানিস্ না? তা বলতে কি হয়? ও—হ্যাঁ, তোদের তো আবার জিভ নেই। তা ভালোই। তোদের জিভ নেই বলেই আমাদের রক্ষা।

দরবেশ বেশে মহম্মদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। ওমা, এ আবার কে?

মহম্মদ। [রক্ষীকে] যাও। [রক্ষীর প্রস্থান]

উধম। আরে বাদশা যে! ব্যাপার কি জাঁহাপনা? রাজপোশাক ছেড়ে হঠাৎ দরবেশ? হজে যাচ্ছেন নাকি? কাকে নিয়ে? কোনো তাপসীর প্রেমে পড়েছেন নাকি?

মহম্মদ। সম্রাজ্ঞী উধমবাই! ছিলে রাজপথে বাঈজী, হয়েছে মোগল সম্রাজ্ঞী! তাই সরাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অনেক নাচ নেচেছ, দেখিয়েছ অনেক খেলা। আজ আমাকে একটু খেলতে দাও। ভয় নেই, এ কোনো প্রণয়-খেলা নয়, এ হচ্ছে জীবন-মরণের খেলা। এর উপর নির্ভর করছে আমার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব তোমাদের ভবিষ্যৎ। এখান থেকে এখন চলে যাও। যাও বলছি।

উধম॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি [সুরে] ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল'

[প্রস্থান]

মহম্মদ॥ "পার্থিব বিষয়ে মনে আছে যে বন্ধন,
কিছু কিছু করি ক্রমে করহ মোচন,
নতুবা সহসা মৃত্যু এই সূত্র ধরি,
অজ্ঞাতে লইবে প্রাণ আকর্ষণ করি।"

জাওয়েদ সহ একজন চাষা মুসলমানের প্রবেশ।

জাওয়েদ॥ আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন এখানেই আপনারা সম্রাটের দেখা পাবেন।

মহম্মদ॥ হুজুর, আমিও তো সেই মতলবে এসেছি। হজে যাবার আগে রাজদর্শন করে যেতে হয়।

জাওয়েদ॥ জনাব! সবই সম্রাটের মর্জি? আমি আর কি বলব। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখুন॥ সবই খোজার মর্জি। সবুরে মেওয়া ফলে। আদাব—আদাব। [প্রস্থান।]

মহম্মদ॥ তোমরা কোথাকার লোক?

প্রতিনিধি॥ আমরা?

ছিনু হিন্দোলে, পথের মানুষ আমরা আজ
মারাঠা দস্যু বাজীরাও, সেথায় হেনেছে বাজ;

মহম্মদ ॥ বাজীরাও তোমাদের মাথায় বাজ হানলে, আর তোমরা পালিয়ে এলে ?

প্রতিনিধি ।—

পূর্ব গীতাংশ

আমাদের নয়—দেশ বাদশার ;
আমাদের কাছে সে তো কারাগার,
বন্দী হিন্দু, মুসলিম, শিখ,—সব সমাজ ॥

মহম্মদ ॥ কিন্তু তিনি তোমাদের জিজিয়া কর তুলে দিয়েছেন, উপাসনার জন্যে ওই লাল মসজিদ তৈরি করিয়েছেন ।

প্রতিনিধি ।—

পূর্ব গীতাংশ

গরীবের মুখে দিতে দুটি ভাত,
কাণাকড়ি তাঁর নেই খয়রাৎ,
স্ফূর্তির বেলা নারী ও সুরায়, দিল দরাজ ॥

[গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত]

মহম্মদ ॥ দাঁড়াও ! [দরবেশের পোশাকের অন্তরাল হইতে বহু মূল্যবান একটি রত্নমালা বাহির করিয়া] আমি দরবেশ । এক সময় বাদশা আমাকে এই বহুমূল্য রত্নহার পরিয়ে দিয়েছিলেন । আমি দরবেশ লোক, হারটা আমার বেমানান । জহুরীর দোকানে বিক্রী করে যা পাবে, তাতে তোমরা আজ যারা এখানে এসেছ— সকলে সমান ভাগ করে নিও । তোমাদের অভাব ঘুচবে ।

প্রতিনিধি । একি,—

মহম্মদ । না-না, সংকোচন কর না—নাও । [হার প্রদান]

প্রতিনিধি ॥ জহুরী যদি বলে এ হার আমরা কোথায় পেলাম ? যদি বলে চোরাই মাল ? তবে তো গর্দান যাবে !

মহম্মদ ॥ না-না, সে ভয় কর না । আমি সারাদিন এই রাজপ্রাসাদেই আছি ! কেউ যদি তেমন কথা বলে, আমার কথা বলে—তাদের নিয়ে এসো এখানে ।

[আভূমি নত হইয়া কুর্নিশ করিয়া প্রতিনিধির প্রস্থান ।

সঙ্গে সঙ্গে জাওয়েদ খাঁর পুনঃ প্রবেশ ।

মহম্মদ ॥ এই জাওয়েদ ! তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখলি ?

জাওয়েদ ॥ খোদার মর্জি ! গোলামের কাজই তাই হুজুর !

মহম্মদ ॥ [দরবেশের পোশাকটা খুলিয়া] বেশ। হ্যাঁরে, আর কে দেখা করতে এসেছে ? নিয়ে আয়। আরে --সকাল থেকে ক' পাত্র খেয়েছি আজ ?

জাওয়েদ ॥ পাঁচ পাত্র।

মহম্মদ ॥ মোটে পাঁচ পাত্র ! ওরে, অমন করে আমাকে উপোসী রেখেছিস্ কেন চল্ পানশালায় চল্।

জাওয়েদ ॥ জাঁহাপনা ! মহামান্য নিজাম উল্-মুল্ক বাহাদুর অনেকক্ষণ বসে আছেন।

মহম্মদ ॥ চিন্‌কিলিচ্ খাঁন ! যেমন নাম—তেমান কাম। নিজাম্—উল্—মুল্ক—আস্ত একটি উল্লুক ! বুড়ো শয়তান তবে এসেছে। যাক, এখনও তবে বিদ্রোহ করেন নি ! নিয়ে আয়।

নিজামের প্রবেশ।

নিজাম ॥ নিয়ে আসতে হবে না, আমি নিজেই এসে গেলাম। এমনি করে রাজকার্য চলে না বৎস ! আমি তোমার আহ্বানে হায়দ্রাবাদ থেকে ছুটে এলাম, আর তুমি কিনা একটা বাজে লোকের সঙ্গে—

মহম্মদ ॥ বাজে লোক নয় জনাব—প্রজা। ওরা রাজকর দেয় বলে, আমাদের এই রাজগি ! আমারও—আপনারও।

নিজাম ॥ রক্ষণাবেক্ষণ করছি আমরা, রাজকর দেবে না তো কি ? আমাকে কেন ডেকে এনেছ বৎস ?

মহম্মদ ॥ সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ। চারিদিকে শত্রু। বিদ্রোহ সর্বত্র ধূমায়িত। সবচেয়ে বড় বিপদ রাজকোষে অর্থাভাব।

নিজাম ॥ কতবার বললাম, মহামান্য আলমগীর—ঔরংজেব—যাঁর পায়ের নখের যোগ্যও তোমরা কেউ নও। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসিয়ে রাজকোষের অর্থ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তুমিও তাই কর। তা শুনছ কই ?

মহম্মদ ॥ নতুন কথা—আপনাকে অনেকবার আমি বলেছি জনাব ! ঔরংজেব আমার আদর্শ নন, আমার আদর্শ মহানুভব আকবর। জিজিয়া কর আমি আর বসাতে দেব না। ওকথা থাক, আপাততঃ আমাকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিন। বাংলা থেকে হোক—

নিজাম ॥ বাংলা—বিহার—উড়িষ্যা আর তোমার বশ্যতা স্বীকার করছে না।

মহম্মদ ॥ তবে অযোধ্যা ?

নিজাম ॥ সেখানে তোমাদের পেয়ারের শাদাত খাঁন এ সুবার সর্বস্ব হয়ে বসে আছেন। কঠিন চীজ্। মুখ খুবই মিষ্টি, কিন্তু তলে তলে ছুরি শানাচ্ছে।

মহম্মদ ॥ তবে শেষ ভরসা আপনি। দাক্ষিণাত্যের ছয় ছয়টি সুবা দখল করে বসে আছেন। দয়া করে আপনি কিছু ছাড়ুন।

নিজাম ॥ ও—তবে দেখছি তুমি কোনো খবরই রাখো না বৎস! নেহাৎ আলমগীরের আমলে, সম্রাটের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলাম, তাই তোমাদের মায়া ছাড়তে পারছি না। নইলে আমার যা অবস্থা, এক এক সময় মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মক্কায় চলে যাই। সেই পার্বত্য মূষিক বাজীরাও! শয়তান সারা দেশে হানায় হানায় আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে।

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ, করেছিল, কিন্তু আর তো করছে না? কু-লোকে কি বলছে জানেন?

নিজাম ॥ কি?

মহম্মদ ॥ আপনি তরে সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করেছেন। যাকে বলে অনাক্রমণ চুক্তি। আপনিও তাকে আক্রমণ করবেন না, সেও আপনাকে আক্রমণ করবে না। জাওয়েদ খাঁ, আমার ওষুধ।

জাওয়েদ ॥ [সম্রাটকে মদ দিল।] খোদারই মর্জি!

নিজাম ॥ [মুখ ফিরাইয়া রহিল।]

মহম্মদ ॥ [মদ্যপান করিয়া] এই গুপ্তচুক্তির আসল উদ্দেশ্য বাজীরাও নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসতে পারবে। আর আপনিও থাকবেন বহাল তবিয়তে—নিরাপদে দাক্ষিণাত্যে। নয় কি?

নিজাম ॥ মিথ্যা কথা বৎস। এসব শত্রুর রটনা। তোমাকে বুদ্ধিভ্রংশ করতে শত্রুর চাতুরী। আজ তিনপুরুষ তোমাদের কাছে চাকরী করছি। শেষে তুমি আমাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপবাদ দিচ্ছ? না, এ সংসারে আমার না থাকাই ভাল। মক্কায় চলে যাওয়াই এখন আমার উচিত কর্ম। আমাকে বিদায় দাও বৎস।

মহম্মদ ॥ ভণ্ডামী—ভণ্ডামী। জাওয়েদ খাঁ, আমার ওষুধ!

জাওয়েদ! [আর একপাত্র সুরা দিল] খোদা, রক্ষা কর।

[প্রস্থান]

মহম্মদ ॥ [নিজামের সামনেই প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করিতে করিতে] আজ তিন বৎসর বাজীরাও আপনার সুবায় কোনো হানা দেয়নি, একথা সত্য?

নিজাম ॥ সাহস পায়নি বৎস।

মহম্মদ ॥ কিন্তু এই তিন বৎসর সমানে এসে হানা দিচ্ছে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই সেদিন আগ্রার সন্নিকটে হিন্দোলও করেছে দখল। একথা সত্য নয়?

নিজাম ॥ সুদূর দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসে আমি তাকে বাধা দিতে পারি না বৎস। এজন্যে আমাকে ভর্ৎসনা না করে, দোষারোপ কর উত্তরাঞ্চলের সেনা-

নায়ককে। তুমি ভেব না বৎস, আমি মক্কায় যাবার আগে বাজীরাওয়ের পতন ঘটিয়ে যাব। দুর্ধর্ষ এই বাজীরাও—তার শক্তির সন্ধানও রাখা দরকার, তার দুর্বলতার সন্ধানও তেমনি রাখা আবশ্যক। আর সেই দুর্বলতার সন্ধান আমি পেয়েছি। যাবার আগে সেটাও তোমাকে বলে যাচ্ছি।

মহম্মদ ॥ দুর্বলতা! বাজীরাওয়ের দুর্বলতা?

নিজাম ॥ হ্যাঁ বৎস। বাজীরাওয়ের দুর্বলতা! রূপবতী নারীর উপর তার আসক্তি অতীব প্রবল। বুন্দেলখণ্ডের নৃপতি ছত্রশাল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কি করে জানো? মস্তানী নামে এক পরাসুন্দরী মুসলমান বাঈজীকে উপঢৌকন দিয়ে। সমস্ত মারাঠা সমাজ বাজীরাওয়ের এই বিধর্মী আচরণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু বাজীরাও ঐ নারীকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছে না। বাজীরাওয়ের চরিত্রের এই দুর্বল সুড়ঙ্গ পথে, যদি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারো তোমরা, তাতেই হবে বাজীমাৎ।

মহম্মদ ॥ চমৎকার! চমৎকার! কথাটা আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু এটা যে একটা পথ; তা তো তলিয়ে দেখিনি। আচ্ছা আপনি আমাকে ভাবতে দিন দাক্ষিণাত্যে ফেরার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। জানেন। জনাব, নিজেকে বড় অসহায় অনুভব করছি। কে যে শত্রু—কে যে মিত্র, বুঝতে পারছি না। সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে।

নিজাম ॥ সে আর বলতে বৎস! সম্রাজ্ঞী উধম বাইয়ের সঙ্গে আমার এই সব কথাই হচ্ছিল।

মহম্মদ ॥ সহসা উত্তেজিত হইয়া। যেখানে যত কথাই হোক, সব কিছু ছাপিয়ে এখন একটি কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক আপনিও। শুনুন-শুনুন জনাব, আপনি এখুনি পালিয়ে আমার হাতের বাইরে চলে যান। কারণ—কারণ, আমার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নেই। যে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল আদর করে আমাকে দিল্লীর মসনদে বসিয়েছিল, ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ বাধাতে আমি তাদের দু'জনকেই সাবাড় করেছি: একজনকে করিয়েছি হত্যা, অন্যজনকে বন্দী!

[ইত্যবসরে নিজাম একরূপ পলাইয়া গেলেন]

মহম্মদ ॥ হাঃ হাঃ-হাঃ! বুড়ো শয়তান পালিয়েছে। আমি তো ডুবতে বসেছি, কিন্তু সব বিশ্বাসঘাতকদের শেষ করে, তবেই শেষ করবো এই সেরা বিশ্বাসঘাতককে।

উধম বাঈয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম ॥ বাদশা-বাদশা—

মহম্মদ ॥ তুমি আবার কি মনে করে?

উধম ॥ নিজাম কি বলে গেলেন? বাজীরাওকে শায়েস্তা করতে পারবেন?

মহম্মদ ॥ না। বলে গেলেন, যদি কেউ শায়েস্তা করতে পারে, সে পারবে তুমি! রাজপুতানার সেরা বাঈজী তুমি।

উধম ॥ [লাস্যে] হুঁ!

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ।

উধম ॥ আচ্ছা তোমার কি মনে হয়—মস্তানী আমার চেয়েও সুন্দরী ?

মহম্মদ ॥ তা যদি হয়, তবে তাকে আমার চাই-ই চাই। দরকার হলে বাজীরাওকে দিল্লীর সিংহাসনও ছেড়ে দেব।

উধম ॥ বেশ তো। বাজীরাওকে নেমন্তন্ন কর দিল্লীতে। সে যদি তোমার চেয়েও লোভনীয় হয়, তবে আমিও চাই তাকে।

মহম্মদ ॥ এই আমার সম্রাজ্ঞী—এই আমার সাম্রাজ্য—আর এমনি সম্রাট আমি। [প্রস্থান]

উধম ॥ গেল—গেল—আমার—সব গেল। কে আছিস, সম্রাটকে ধর্—সম্রাটকে ধর্। [প্রস্থান]

মীর মহম্মদ আমিন অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিছনে তাঁহার স্ত্রী গুলবাহারও অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল।

গুল ॥ ব্যাপার কি হারেম মুন্সী সাহেব ?

আমিন ॥ যাক, খবরটা তবে পেয়েছিলে গুলবাহার।

গুল ॥ খবর পেয়েছিলাম বলেই তো দেখা করতে এসেছি। কিন্তু যা বলবার—তা চট্‌পট্ সারো।

আমিন ॥ ভারী বিপদ—ভারী বিপদ। এমন বিপদে আর কখনও পড়িনি গুলবাহার!

গুল ॥ বলো কি! কি বিপদ ?

আমিন। অযোধ্যা থেকে এসে সাদাত মামা বাদশার সঙ্গে দেখা করে গেছেন, জানো তো ?

গুল ॥ তাতে আর বিপদটা কি হলো ? তুমি তাঁর পেয়ারের ভাগে! বাদশার কাছে তোমার নামে সুপারিশই করে গেছেন নিশ্চয়ই। আমি তো আশা করছি, হারেম-মুন্সীর কাজের চেয়ে ভাল কাজ রাজদরবারে পাবে।

আমিন ॥ না না, এখন দেখছি আমার হারেম-মুন্সীর কাজই ভালো ছিল।

গুল ॥ ও—হারেম-মুন্সীর কাজে বুঝি মধু আছে, না ? না-না, এ কাজ তোমাকে ছাড়তেই হবে। পেতেই হবে কোন বড় কাজ। আমি বুঝি ঘর সংসার করব না ? চিরকালই ঐ হতচ্ছাড়ি উধম বাইয়ের পদসেবা করে কাটাব ? আজ

ম-৩৩৭

পাঁচবছর তোমার সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে, পাঁচটা রাতও আমি তোমার সঙ্গে কাটাতে পারিনি।

আমিন॥ তা বটে। শাদাত মামাকেও আমি তা বলেছিলাম, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়ে গেল।

গুল॥ কেন?

আমিন॥ মামার তো বাদশার উপর খুবই প্রভাব। বাদশাকে বলে তিনি আমাকে রাজদূত করে পারস্যে পাঠাচ্ছেন। রাজসরকার থেকে হুকুম বেরিয়ে গেছে আমাকে আজ কালই রওনা হতে হবে পারস্যে।

গুল॥ বলো কি—রাজদূত! এতো আনন্দের কথা। তাও আবার যাচ্ছ পারস্যে—নিজের জন্মভূমিতে! আমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো?

আমিন॥ না-না, তবে তো ভালই হতো। কিন্তু তা হলো কই? বেগম উধম বাই নাকি তোমাকে ছাড়তে রাজী নন্।

গুল॥ তাই নাকি? দেখো, আমি ওর কাছে আজ একটু কান্নাকাটি করে দেখব। কিন্তু তাতে ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না আমাকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়তে চায় না। যত সব অকীর্তি-কুকীর্তি করছেন, সেও আমারই সামনে করছেন।

আমিন॥ কান্নাকাটির আর সময় পাবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ, আমাকে রওনা হতে হচ্ছে আজই। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি গুল-বাহার।

গুল॥ কি এত জরুরী কাজ?

আমিন॥ পারস্যের শাহের কাছে ভারতের সেই আজগুবি দাবী। কোন-কালে বাদশা হুমায়ুন নাকি কোটি টাকা গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন পারস্যের শাহের কাছে। কিন্তু যা বুঝছি, আসল দৌত্য আমাকে করতে হবে আমার মামার! মামা একটা গোপনীয় পত্র দিচ্ছেন, পারস্যের শাহের হাতে দিতে।

গুল॥ তোমার মামাটিকে তো আমি চিনি। আবার কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

আমিন॥ হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তোমাকে না বলে পারছি না। শোনো, পারস্যের শাহকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আমার মামা। চলে আসুন, একবার দিল্লী বেড়িয়ে যান। মানেটা বুঝলে তো?

গুল। খুব বুঝছি। পারস্যের শাহ ভারত জয় করলে, তোমার মামাই হয়তো দিল্লীর বাদশাহ হয়ে বসবেন!

আমিন॥ হ্যাঁ। এই ভাগ্নেটি হবে তাঁর উজীর। আর তুমি হবে আমার মাথার মণি গুলবাহার বেগম।

গুল॥ এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা—এত বড় পাপ তোমরা করতে বসেছ?

তোমরা এই মহম্মদ শাহের নুন খাচ্ছো? তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

আমিন ॥ কোথায়? পারস্যে? নাদিরকুলী খাঁর দেশে?

গুল ॥ না-না, সেখানে না। সেখানেও তো তুমি যাচ্ছ বিশ্বাসঘাতকতা করতে—নিদারুণ পাপ করতে। না-না, সেখানে না। আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো—নিয়ে চলো কোনো পাহাড়ে-পর্বতে, কি কোনো গ্রামে। ভিক্ষা করে খেতে হয় সে-ও খাব আমরা। এইসব কদর্যতা, এইসব ষড়যন্ত্র, এই সব বীভৎসতা থেকে এসো আমরা মুক্ত হই—পালাই। ওগো, আমায় নিয়ে চলো—নিয়ে চলো।

আমিন ॥ কি সব বাজে বকছো? আমি যাব আর আসব। আর যে ক'দিন আমি এখানে থাকব না, সে কদিন তোমাকে স্বর্গসুখে রেখে যাবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।

গুল ॥ আমি আর ঐ উধম বেগমকে সইতে পারছি না।

আমিন ॥ সইতে হবেও না। [দূরে সম্রাটকে দেখিয়া] এই যে, এই যে, স্বয়ং বাদশা এসে গেছেন।

মত্ত অবস্থায় মহম্মদ শাহ ও তৎপশ্চাৎ জাওয়েদের প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ কই হে জাওয়েদ, আমার মস্তানী কই?

জাও ॥ বলছি জাঁহাপনা, মস্তানী নয়। তবে হ্যাঁ দেখতে পারেন। দেখুন! ঐ তো! কি হারেম-মুন্সী, চুপ করে আছেন কেন? যা করবার করুন। আমাকে আবার বেগমসাহেবা তলব করেছেন। খোদা, সবই তোমারই মর্জি খোদা রক্ষা কর। [জাওয়েদের প্রস্থান।

মহম্মদ ॥ হারেম-মুন্সী! ও-হো হো, তুমি সেই লোকটা না? বারহান মুলক শাদাত খাঁর ভাগ্নে? তুমি না কোথায় দূতে হয়ে যাচ্ছ? তা যেখানেই যাও, দু' একটা সুন্দরী মেয়ে-টেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসো। দিল্লীটা কেমন যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। [গুলবাহারকে দেখিয়া] ওখানে একটা ফুলের গাছ দেখছি না!

আমিন ॥ হ্যা জাঁহাপনা, পারস্য থেকে এনেছি। আপনারই জন্যে আবার যাচ্ছ—আবার আনব।

মহম্মদ। পারস্য! তবে তো দেখতেই হবে। তা দেখছি—তুমি এসো।

আমিন ॥ [প্রস্থানোদ্যত]

গুল ॥ [আমিনের হাত ধরিয়া] না, তা যেতে পারে না। তুমি না আমার স্বামী! এই কি স্বামীর আচরণ?

আমিন ॥ আঃ—গুলবাহার! উনি দুনিয়ার মালিক দিল্লীর বাদশা। ওঁরই কাছে আমি তোমাকে রেখে যাচ্ছি। জাঁহাপনা, অনুমতি করুন আমি তবে এখন আসি।

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ এসো, ইনাম তুমি পাবে।

আমিন ॥ [সেলাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

গুল ॥ [ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া দৃপ্তভঙ্গীতে] খবরদার, তুমি যাবে, না। আর যদি যাও, আমাকেও নিয়ে যাও।

মহম্মদ ॥ ওরে বাবা, নেশা তো কেটে গেল। জানো—আমি কে?

গুল ॥ জানি।

মহম্মদ ॥ তা জেনেও তুমি আমার উপর চোখ রাঙিয়ে আছ সুন্দরী? আমার জীবনে এমনটি তো কখনও দেখিনি! কোনো মেয়ে যে এ সুযোগ—এ লোভ, এমন করে ত্যাগ করতে পারে, আমার জীবনে এও দেখছি আজ এই প্রথম।

গুল ॥ জাঁহাপনা! আমি সামান্যা রমণী—আমি—

মহম্মদ। না—না, তুমি সামান্যা রমণী নও—তুমি সামান্যা রমণী নও। তুমি কে আমি বলছি। হ্যাঁ আমাকে বলতে দাও—মুক্তকণ্ঠে বলতে দাও। তুমি—তুমি জননী, জননী! [প্রস্থান।]

আমিন ॥ কি দুঃসাহস! কি মুর্খতা! আমি পারস্য থেকে ফিরে আসি, তারপর এই মূঢ়তার শাস্তি আমি তোমাকে দেব। [প্রস্থান।]

গুল ॥ হ্যাঁ দিও। আর তা হবে আমার পরম সম্মান—শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

পারস্য রাজপ্রাসাদ

[নেপথ্যে নকীব নাদির শাহর আগমনবার্তা ঘোষণা করিল "বা—আদাববা—মোলায়েজা—হোসিয়ার। শাহেনশাহ্ নাদির শাহ্ সুলতানে নামদারে তস্‌রিফরমা হোতে হ্যায়"—তুর্যধ্বনি]

জাহান্দার ও সম্রাট নাদির শাহের প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ [সিংহাসনে উপবিষ্ট নাদির শাহকে কুর্ণিশ করিল]

নাদির ॥ দিল্লী থেকে কে নাকি রাজদূত এসেছে সেনাপতি?

জাহান্দার ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা। সম্রাট শাহতমাসের মৃত্যুর পরে, পারস্যের সিংহাসনে আপনার অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজদূতের এই শুভাগমন। নিশ্চয়ই তিনি কোন শুভ-সংবাদ বহন করে এনেছেন সম্রাট।

নাদির ॥ শুভ কিম্বা অশুভ—কে জানে ? ডাকো তাকে।

জাহান্দার ॥ [চিৎকার করিয়া নেপথ্যের দিকে] কে আছ, ভারতের রাজদূত!

মীর মহম্মদ আমিনের প্রবেশ।

আমিন ॥ পারস্য সম্রাটের জয় হোক। [কুর্ণিশ করিল]

নাদির ॥ [আমিনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] মীর মহম্মদ আমিন! কি সৌভাগ্য! সব কুশল তো ?

আমিন ॥ জী জাঁহাপনা! দিল্লীর বাদশার একটা দাবী পেশ করতে এই অধমকে আসতে হয়েছে।

নাদির ॥ [হাসিয়া] দুশো বছর আগে সম্রাট হুমায়ুন বাদশা পারস্যে পালিয়ে এসে, তখনকার শাহতমাসের কাছে কোটি টাকার ধনরত্ন গচ্ছিত রেখেছিলেন। সেইটা ফেরৎ পাবার দাবী তো ?

আমিন ॥ জী-হুজুর।

নাদির ॥ সেটা ফেরৎ দেওয়া উচিত—দেওয়াও হবে।

আমিন ॥ জাঁহাপনার জয় হোক।

নাদির ॥ কিন্তু তা ফেরৎ পেতে হলে আপনার প্রভুকে এখুনি স্বর্গে যেতে হবে। শাহতমাস স্বর্গেই রয়েছেন যে!

আমিন ॥ এরূপ একটা উত্তর পাব, এ আমি জানতাম জাঁহাপনা। বেশ, একথা আমি গিয়ে তাঁকে নিবেদন করব।

নাদির ॥ হ্যাঁ, নিবেদন করবেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, হুমায়ুন বাদশার সেই প্রতিশ্রুতিটা।

আমিন ॥ জানি জাঁহাপনা, আমি সেটাও জানি। হুমায়ুন বাদশা পারস্যের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে যদি তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিল্লীর মসনদে আবার বসতে পারেন, তবে তিনি পারস্যের শাহকে উপহার দেবেন কান্দাহার। এই ছিল তাঁর প্রতিশ্রুতি।

নাদির ॥ সে প্রতিশ্রুতি কিন্তু তিনি রাখেননি। আমাদের এই দাবীর উত্তরে আপনার সম্রাট মহম্মদ শাহ যদি আমাকে স্বর্গে গিয়ে বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি তাতে প্রস্তুত নই। নিজের বাহুবলে কান্দাহার জয় করে দিল্লীতে হানা দিয়ে মহম্মদ শাহকে দায়মুক্ত করে দিয়ে আসা আমার পক্ষে ঢের বেশি সহজ হবে মীর মহম্মদ আমিন!

জাহান্দার ॥ শোভানাল্লা! জাঁহাপনা আমাদের মনের কথাটাই ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

আমিন ॥ এইবার জাঁহাপনাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি অর্পণ করলেই আমার দৌত্যকর্ম শেষ হয়।

নাদির ॥ চিঠি! কার চিঠি ?

আমিন ॥ দিল্লী দরবারের মাননীয় সদস্য অযোধ্যার শাসনকর্তা, মহামান্য

শাদাত খাঁ চিঠিটি লিখেছেন শাহতমাসকে। তিনি যখন স্বর্গত, তখন চিঠিটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত আপনাকেই দেওয়া সঙ্গত মনে করছি আমি। [পত্র প্রদান]

নাদির ॥ [পত্রপাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।] উত্তম! সত্যই সুসংবাদ। জাহান্দার, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। পরে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করে যাবে।

জাহান্দার ॥ জী আজ্ঞে খোদাবন্দ! [প্রস্থান

নাদির ॥ মহামান্য শাদাত খাঁকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ জানাবেন। তাঁকে বলবেন, যথাসম্ভব শীঘ্র আমি তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভারত অভিযানে যাব, এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। আপনি ভারতে ফিরে যাবার পূর্বে আমার স্বহস্তে লিখিত উত্তর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আপনাকে আমার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে।

আমিন ॥ করুন জাঁহাপনা!

নাদির ॥ ব্যক্তিগত প্রশ্ন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন! এই ধরুন, আপনারা সব কেমন আছেন? মানে, সবাই মনের সুখে আছেন কি? মানে, দিল্লী বেশ ভাল লাগছে তো?

আমিন ॥ না তা মন্দ কি? দিল্লীর জাঁকজমক, জৌলুস, এখানকার চেয়ে কিছু কম নয়।

নাদির ॥ সে আমি জানি—সে আমি জানি। কথাটা ঠিক তা নয়। কথাটা যে কি আমি তা বলতে পারছি না। আচ্ছা থাক, আপনি আসুন। যাবার আগে আমার চিঠিটা নিয়ে যাবেন।

আমিন ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা! আর গুলবাহারকেও আপনার কুশল সংবাদ জানাব। [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

নাদির ॥ চাচা ইব্রাহিমের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে।

আমিন ॥ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে, আমি এসেই শুনেছি। তাঁর আত্মীয়-স্বজনও একথা আমাকে বলেছেন। গুলবাহারকেও আমি একথা গিয়েই জানাব।

নাদির ॥ গুলবাহার—হ্যাঁ, গুলবাহার! দিল্লীর রাজপরিবারের সবাই তাকে দেখেছি কি? তারিফ করছে হয়তো খুব। পারস্যের মেয়েদের ওখানে খুব কদর। কি বলেন জনাব?

আমিন ॥ না—তা—হ্যাঁ—

নাদির ॥ জানি, আমি জানি। কেন যেন সওয়াশো বছর আগের দিল্লী হারেমের একটা কেচ্ছা আমার আজ মনে হচ্ছে।

আমিন ॥ আপনি পারস্যসুন্দরী মিহিরউন্নিসার কথা ভাবছেন কি?

নাদির ॥ চতুর! আপনি চতুর জনাব! ঠিক ধরেছেন। দিল্লীর বাদশাজাদা জাহাঙ্গীর ঐ পারস্য-সুন্দরী মিহিরউন্নিসার প্রেমে পড়েন।

আমিন ॥ কিন্তু পিতা আকবর বাদশার তাতে অমত। তিনি করলেন কি, বর্ধমানের জায়গীদার শের আফগান উপাধিধারী আলী কুলী খাঁর সঙ্গে মিহির-উন্নিসার বিয়ে দিয়ে, জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি থেকে পারস্য-সুন্দরীকে দূরে সরিয়ে দেন।

নাদির ॥ কিন্তু জাহাঙ্গীরের মন থেকে সরাতে পারলেন কি? আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশা হয়েই শের আফগানকে হত্যা করিয়ে—[মীর-আমিনের চোখে চোখে তাকাইয়া রহিলেন।]

আমিন ॥ [সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ নামাইয়া বলিলেন] হুঁ!

নাদির ॥ তারপর যেন কি? তারপর যেন কি?

আমিন ॥ মিহিরউন্নিসাকে বাদশা আনিয়ে নিলেন নিজের অন্তঃপুরে।

নাদির ॥ বিধাতার বিধানকে ব্যর্থ করে জাহাঙ্গীর তাঁর প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয়িনীকে বিবাহ করে উপাধি দিলেন—নূরজাহান, জগতের আলো নূরজাহান! কেমন, ঠিকই শুনেছি—না?

আমিন ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা!

নাদির ॥ এ কেচ্ছা গুলবাহারকে হয়তো?

আমিন ॥ কে না শুনেছে—কে না জানে!

নাদির ॥ হুঁ! আপনি কবে চলে যাচ্ছেন?

আমিন ॥ আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রয়েছি জাঁহাপনা।

নাদির ॥ পত্র আমি আপনাকে আজই দিচ্ছি। আপনার শীগ্‌গীর চলে যাওয়াই উচিত। ভারত-অভিযানে আমার বিলম্ব সইছে না। আচ্ছা, বিদায়।

আমিন ॥ বিদায়! [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।]

নাদির ॥ উঃ—আমি এতই দুর্বল! এত দুর্বল!

[দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

জাহান্দারের পুনঃ প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ জাঁহাপনা!

নাদির ॥ বলো?

জাহান্দার ॥ প্রজাপুঞ্জ জাঁহাপনার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে ব্যাকুল। পারস্যের সুনাম, পারস্যের সমৃদ্ধি, পারস্যের শক্তি—সবই ডুবে গিয়েছিল। জাঁহাপনার শৌর্যে-বীর্যে পারস্য আবার তার হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। দস্যু আফ্‌গানরা পারস্যের পবিত্র মাটি দখল করে পারস্যবাসীর মুখে যে কালিমা লেপন করে দিয়েছিল, তা মুছে ফেলেছেন আপনি আফগান-বিজয়ী বীররূপে, স্বদেশের পবিত্রতা রূপে জাঁহাপনা অমর হয়ে থাকবেন।

নাদির ॥ জাহান্দার খাঁ, আমি কাজের মানুষ, চাই কাজ। শোচনায় অধঃপতন থেকে পারসীকদের আমি টেনে তুলতে চাই। বলো জাহান্দার, এখন আমার কি কর্তব্য ?

জাহান্দার ॥ যে আফগানেরা এতদিন আমাদের দেশের অত বড় একটা অংশ অধিকার করে রেখেছিল, তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত—পরের দেশ আক্রমণ বা অধিকার করা কতদূরে অন্যায়।

নাদির ॥ না জাহান্দার খাঁ! কেউ যদি দুর্বল হয়, সবল তাদের গ্রাস করবেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মশক্তি অর্জন। শোন জাহান্দার, আমার দেশের প্রত্যেকটি সুস্থদেহী নাগরিককে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এখনই। দুর্ধর্ষ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করাই হবে আমার প্রথম কাজ। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব দেশ-দেশান্তরে। দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে রয়েছে অগাধ ধনসম্পদ! কোনো কোনো দেশে রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য! যেমন আজকের এই পারস্য।

জাহান্দার ॥ তবে জাঁহাপনা, প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ুন ঐ ভারতে। ভারত এখন অন্তর্বিপ্লবে অতীষ্ঠ—কিন্তু ধনসম্পদ তার অবর্ণনীয়। জগৎবিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন—সেও ঐ ভারতে। তা ছাড়া—

নাদির ॥ তা ছাড়া ?

জাহান্দার ॥ ওখানে রয়েছে—ওখানে রয়েছে—

নাদির ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আছে—ওখানে অমৃত আছে। যে অমৃত আমি পেয়েও হারিয়েছি—না না, এসব আমি কি বলছি। জাহান্দার ভারত নয়—ভারত নয়, আফগানিস্থান!

জাহান্দার ॥ স্বদেশ থেকে বিদেশী আফগানদের বিতাড়িত করে—তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন জাঁহাপনা, যে ওরা আর থেকেও নেই।

নাদির ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও। চাটুবাক্য সাবধানে প্রয়োগ করবে। পারস্য থেকে বিদেশী আফগানদের আমি বিতাড়িত করতে পেরেছি—একথা সত্য নয়।

জাহান্দার ॥ সে কি কথা জাঁহাপনা ? আমরা নিশ্চিত জানি, এ দেশ থেকে প্রতিটি আফগান বিতাড়িত। যদি কোনো আফগান থেকে থাকে, তবে সে নিহত এবং কবরস্থ!

নাদির ॥ না-না-না। একটি আফগান এখনও বর্তমান। আমারই প্রশ্রয়ে এখনও সে জীবিত। আমি তাকে—আমি তাকে· চাই একাকী। কে আছ ? গুপ্তকক্ষ থেকে তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

জাহান্দার ॥ তবে কি—তবে কি আমি এখান থেকে—

নাদির ॥ [মাথা নাড়াইয়া] হুঁ!

জাহান্দার ॥ [সেলাম করিয়া প্রস্থান।]

শৃঙ্খলিতা এক তরুণী আফগান বাঈজী
কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনুর ॥ [ধীরে ধীরে সম্রাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শৃঙ্খলিতা হওয়ায় কুর্ণিশ করিল না, করার ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না।]

নাদির ॥ পুরো একদিন ঠাণ্ডা গরমে থেকে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে রূপসী!

কোহিনুর ॥ মোটেই না জাঁহাপনা! মাথা আমার আরও গরম হয়েছে এই ভেবে—জাঁহাপনার মতলবটা কি? আফগানদের হয় আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, নয় কবর দিয়েছেন। এক আমাকেই শুধু কারাগারে পুষে রেখেছেন কেন?

নাদির ॥ অনুমান করতে পারছ কিছু?

কোহিনুর ॥ জাঁহাপনা, বাঈজীর নাচ দেখতে হয়তো ভালবাসেন।

নাদির ॥ তা হয়তো বাসি। তুমি এত সুন্দরী, আর তাছাড়া যুদ্ধক্লান্ত আফগান সেনাপতির মনোরঞ্জনের জন্য যখন তুমি রণক্ষেত্রেও সযত্নে রক্ষিতা, তখন এ কথাটা বুঝতে আমার বিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি—তুমি তোমার দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকী!

কোহিনুর ॥ জাঁহাপনাও হয়তো নিজের মনোরঞ্জনের জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

নাদির ॥ কিন্তু তুমি শত্রুকন্যা! শত্রুকন্যাকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া তোমারই ছলনায় আমার সৈন্যরা কর্তব্য কার্য থেকে হয়েছে বিরত। আফগান সেনাপতিকে বধ করতে যে মুহূর্তে আমার সেনানীর অসি হয়েছে উদ্যত, সেই মুহূর্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান তুমি নিজের বক্ষ আবরণ উন্মোচন করে তার দৃষ্টিকে করেছ মোহিত—উদ্যত অসিকে আমি—তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

কোহিনুর ॥ তা করতে চান করুন জাঁহাপনা! কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই আফগান শিবিরে উদ্যত অসি হস্তে ছুটে এসে আপনি হঠাৎ আমাকে যে দৃষ্টিতে প্রথম দেখেছিলেন, কিন্তু আমি দেখিনি কোনো ঘৃণা। দেখেছিলাম এক অপরূপ মুগ্ধ-বিস্ময়!

নাদির ॥ শয়তানি,—

কোহিনুর ॥ আজ হয়তো আমাকে আপনার তাইই মনে হচ্ছে। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এত বড় ভক্ত আমার আর কেউ নেই।

নাদির ॥ মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়, সেকথা সত্য। আর আমার ঐ সাময়িক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে পলায়ন করতে পেরেছিল তোমার সেই রক্ষক—দুরাত্মা

আফগান সেনাপতি। উঃ, কি শোচনীয় পরাজয় আমার! তোমাকে আমি—তোমাকে এখনি হত্যা করব। [অসি নিষ্কাসন]

কোহিনুর ॥ [অবিচলিত কণ্ঠে মৃদু হাস্যে] আর তা সম্ভব নয় জাঁহাপনা! হত্যাই যদি করতেন, তবে সেই মুহূর্তেই করতেন। তা যখন পারেননি, তখন আর আপনি তা পারবেন না।

নাদির ॥ স্তব্ধ হও শয়তানী! সেদিন সেটা ছিল আমার সাময়িক দুর্বলতা। সে দুর্বলতা আমি জয় করেছি। আজ আমি দুর্নিবার। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও শয়তানী!

কোহিনুর ॥ আমি প্রস্তুত! কিন্তু এই মৃত্যু মুহূর্তে আমি বলব, জাঁহাপনা অদ্বিতীয় কোন বীর নন। তিনি নিরস্ত্রা এক নারীকে জীবিত রাখতে সাহসী নন—তিনি ভীতু। সামান্যা নর্তকীর ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। লোকে জানে তিনি এত শক্তিধর—কিন্তু আমি জেনে গেলাম তিনি কত দুর্বল।

নাদির ॥ [উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে দুই একবার তাকাইলেন। পরে সহজভাবে] জীবনে তুমি কাউকে ভালবেসেছ নারী?

কোহিনুর ॥ না। ভালবাসতে পারি, এমন লোক আমার জীবনে আসেনি এখনও সম্রাট।

নাদির ॥ মেয়েদের ভালবাসা কিসে আসে—বলতে পারো নারী? কি চায় নারী? কি দেখে মুগ্ধ হয় নারী? রূপ, ঐশ্বর্য না বলবীর্য? আমি জানতে চাই। কারণ, একটি মেয়েকে আমি পাইনি। কেন পেলাম না আমি বুঝতে চাই। তুমি আমাকে বলবে?

কোহি ॥ সেটা যদি শুনতে চান—বুঝতে চান জাঁহাপনা, তবে অমাকে—

নাদির ॥ না, বধ করা চলে না। তুমি থাকছো, আমার কাছেই থাকছো! তোমার নাম?

কোহি ॥ কোহিনুর!

নাদির ॥ [চমকিত হইয়া] কোহিনুর! তোমার নাম কোহিনুর! ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দুনিয়ার সেরা বিস্ময়—কোহিনুর?

কোহি ॥ হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই আমার পিতা আমার নাম রেখেছিলেন কোহিনুর।

নাদির ॥ কিন্তু শুনেছি কোহিনুর এক অভিশপ্ত রত্ন! এক হাতে কখনও থাকেনি।

কোহি ॥ আমিও থাকিনি জাঁহাপনা!

নাদির ॥ বেশ, তোমাকে কাছে রেখে কথাটার সত্য মিথ্যা আমি যাচাই করে দেখব।

কোহি ॥ কৃতার্থ হলাম জাঁহাপনা। কিন্তু এখন বিশ্রাম আপনার প্রয়োজন।

নাদির ॥ বিশ্রাম আমার নেই। আমাকে দিগ্বিজয়ে বার হতে হবে, এখুনি উল্কার মত ছুটতে হবে। শেষ লক্ষ্য—ভারতবর্ষ

কোহি ॥ সেখানেও আমি—কোহিনুর—কোহিনুর! কোহিনুর গর্বেই গর্বিত ঐ ভারতবর্ষ।

নাদির ॥ হ্যাঁ, ভারতবর্ষ! আমাকে ভুলতে দিও না ঐ ভারতবর্ষ!

[কোহিনুরকে লইয়া নাদিরের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

দেওয়ানি খাস—শেষ রাত্র

[অদূরে নহবৎ বাজিতেছে. নেপথ্যে একটি কামানের আওয়াজ]

জায়ওদে ও মদ্যপানে অচেতন মহম্মদ শাহের প্রবেশ।

জাও ॥ খোদা, রক্ষা কর।

মহম্মদ ॥ এই জাওয়েদ, এসব কি হচ্ছে?

জাও ॥ জাঁহাপনা, সাংঘাতিক বিপদ। নইলে এই শেষ রাত্রে আপনাকে আপনার কক্ষ থেকে টেনে আনতাম না। আপনার প্রাণরক্ষা হওয়াই দায়। এ প্রাসাদ ছেড়ে এখুনি আপনাকে পালাতে হবে।

মহম্মদ ॥ চোপরাও কুত্তা। কাকে কি বলছিস? এতদূর তোর সাহস? তুই কিনা আমাকে পালাতে বলছিস্? আমি সম্রাট মহম্মদশাহ। আমি পালাব? ওরে কুত্তা!

জাও ॥ এ কুত্তা ঠিকই বলেছে সম্রাট! শাদাত খাঁ, বাজীরাওকে হারিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দিল্লী আজ রাতে যখন বিজয়োৎসব করতে মদে চুর হয়েছিল, সৈন্যসামন্ত সবাই যখন মদে ডুবেছিল, সেই ফাঁকে বাজীরাও সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিল্লীর উপর।

মহম্মদ ॥ ওরে হারামজাদা! শাদাত খাঁ, সেই নেংটি ইঁদুরটাকে চম্বলের ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সে তো এখান থেকে দশদিনের পথ।

জাও ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা! খোদার কি মর্জি, সেই দশদিনের পথ বাজীরাও দুদিনে পার হয়ে আজ রাতের অন্ধকারে দিল্লীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে।

মহম্মদ ॥ তুই বলছিস্ কি হতভাগা! শাদাত খাঁ কোথায়?

জাও ॥ সেকথা আর কি বলব জাঁহাপনা। তারই যখন বিজোয়োৎসব—তিনি তো মদে ভাসছেন।

মহম্মদ ॥ আমার পুত্রকন্যা—বেগম, তারা সব কোথায় রে ?

জাও ॥ ঐতো বললাম জাহাপনা, বিজোয়োৎসবে সব সাঁতার কাটছে।

জাও ॥ খোদার মর্জিতে দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র আমি।

শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত ॥ জাঁহাপনা ! শীগ্‌গীর তৈরি হয়ে নিন। এখনই আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে আমার অযোধ্যায়।

মহম্মদ ॥ শাদাত খাঁ ! উল্লুক ! তুমি না বাজীরাওকে চম্বলের ওপারে হটিয়ে দিয়ে এপারে বিজোয়োৎসব করতে এসেছিলে।

শাদাত ॥ সেটা মিথ্যা নয় জাঁহাপনা কিন্তু এটাও সত্য, দশদিনের পথ দুদিনে পার হয়ে, বাজীরাও অতর্কিতে দিল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল্লী প্রায় দখল করে ফেলেছে বললেই হয়। এখন প্রাণরক্ষাই দায়। কিছু ধনরত্ন আর দু' একজন যাদের সঙ্গে নিতে চান, এই নিয়ে এখনিই গুপ্তপথে বাইরে ছুটতে হবে—যেতে হবে অযোধ্যায়। জাওয়েদ খাঁ, তুমি সম্রাটকে এখনিই নিয়ে যাও, যা বললাম কর।

মহম্মদ ॥ কিন্তু শোনো—কিন্তু শোনো—

শাদাত ॥ আঃ—কথার সময় নেই জাঁহাপনা ! যদি বাঁচতে চান—জাওয়েদ খাঁ ! [মহম্মদ শাহকে ধরিয়া লইয়া জাওয়েদের প্রস্থান]

শাদাত ॥ কই হ্যায়, মীর মহম্মদ !

মীর আমিনের প্রবেশ।

শাদাত ॥ পালাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছ ?

আমিন ॥ এই অল্পসময়ে যতটা সম্ভব করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পাচ্ছি না। বাজীরাও গোটা দিল্লী ঘিরে ফেলেছে।

শাদাত ॥ গুপ্তপথ দিয়ে যেতে হবে ছদ্মবেশে। আমি তার ব্যবস্থা করেছি। তুমি আর গুলবাহার—তোমরাও প্রস্তুত হও। যাবে আমার সঙ্গে।

আমিন ॥ গুলবাহার যেতে চাইছে না।

সাদাত ॥ যাব না বললেই হলো ? শোনো আমিন, কথার সময় নেই। আমাদের আশা-ভরসা এখন সব কিছু নাদির শাহ। আর নাদির শাহকে হাতে রাখতে হলে—হাতে রাখতে হবে গুলবাহার। [উভয়ের প্রস্থান]

মহম্মদ ও জাওয়েদের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ এই উল্লুক, আবার আমাকে এখানে আনলি কেন ?

জাও ॥ সম্রাট, খোদার কি মর্জি দেখুন, কাউকে আর পালাতে হবে না।

মহম্মদ ॥ তুই বলছিস্ কি জাওয়েদ, পালাতে হবে না ?

জাও ॥ না সম্রাট, পালাতে হবে না।

মহম্মদ ॥ বাজীরাওয়ের হাতে কচুকাটা হতে হবে এখানেই।

জাও ॥ না সম্রাট! কচুকাটা হতে হবে না কাউকে, বহাল তবিয়তেই থাকবে সবাই।

মহম্মদ ॥ তুই বলছিস্ কি জাওয়েদ? নেশা-টেসা করেছিস্ নাকি?

জাও ॥ বান্দার গোস্তাফি মাফ্ হয় জনাব। এই রাজপ্রাসাদে বান্দাই একমাত্র লোক, যে নেশা করে না। তা যদি করতো—মহামান্য সম্রাট! তোমার পাশে অটল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তোমার ঐ অমূল্য জীবন রক্ষা করবে কে? এ হলো সবই খোদার মর্জি।

মহম্মদ ॥ ওরে, তা আমি জানি, আমি জানি। তাই, এক তোকেই—একমাত্র তোকেই এত বিশ্বাস করি। বল্ জাওয়েদ বল্ কি বল্‌বি বল্?

জাও ॥ তবে শুনুন জনাব, বাজীরাও দিল্লী দখল করেছে, একথা একরূপ বলাই চলে। এমন বীরত্ব—এমন বুদ্ধি—এমন সাহস, আমি আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি সম্রাট! আর সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য তাঁর মত এমন অদ্ভুত মন—অদ্ভুত উদারতাও আর কোথাও কখনও দেখিনি। খোদার যে কি মর্জি, তা খোদাই জানেন।

মহম্মদ ॥ চোপরাও গোলাম! রাতদিন তোর মুখে খোদার নাম শুনতে শুনতে আমি কি শেষে ফকির হয়ে যাব না কি? খবরদার, আমার সামনে খোদার নাম মুখে আনবি নে। আমার এত পাপ—আমার চারিদিকে এত পাপ——; জানিস্ জাওয়েদ, খোদার নাম শুনলেই আমি চমকে উঠি—ভয় পাই! খুলে বল্, বাজীরাওয়ের সম্বন্ধে ব্যাপারটা কি?

জাও ॥ বাজীরাও দূতের হাতে একটা গোপনীয় পত্র পাঠিয়েছে আপনাকে।

মহম্মদ ॥ কি লিখেছে সেই বুড়বক্?

জাও ॥ বুড়বক্ কি হজরৎ—চিঠিটা শুনে বলুন।

মহম্মদ ॥ পড়্।

জাও ॥ [চিঠি পাঠ] 'মহামান্য সম্রাট মহম্মদ শাহ! শাদাত খাঁ আপনার কাছে বড়াই করে বলেছে, আমাকে নাকি খতম্ করেছে। তার কথা বিশ্বাস করে আপনি দিল্লীতে বিজোয়াৎসব করছেন। আপনার কাছে শুধু একটা প্রমাণ রেখে যাচ্ছি, আমাকে খতম্ করা অত সহজ নয়। এই প্রমাণটা দিল্লীতে আপনাকে দিয়ে আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই প্রভাতেই ছুটে চলে যাচ্ছি আমার দুর্ভেদ্য গুহায়। যাবার আগে আর একবার বলে যাচ্ছি, আপনি আমার দাবীগুলো আবার ভেবে দেখবেন। যে দূতের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তাকে আমার দোসর বলেই জানবেন। তার মারফতে আপনার উত্তর চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান করে দিচ্ছি, তার যদি কোনো অমর্যাদা বা অবমাননা হয়, কিম্বা হয় কোনো অত্যাচার, তবে আমার হাতে আপনাদের

কারও রক্ষা নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সুমতি হোক।

ইতি—

বাজীরাও'।

মহম্মদ ॥ কোথায় সেই দূত? আমি তাকে এখুনি দেখতে চাই।

জাও ॥ আপনার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম।

মত্ত-অবস্থায় উধম বাইয়ের প্রবেশ।

উধম ॥ [সম্রাটকে] কি গো, বাজীরাও নাকি এসে পড়েছে? না এসে পারে—আমি নেমন্তন্ন করেছি। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উধম বাই—

জাও ॥ সম্রাজ্ঞী একটা কথা ঠিকই বলেছেন। যে দূত এসেছেন, তাঁকে দেখতে কিন্তু অবিকল বাজীরাওয়েরই মতো হুবহু বাজীরাও! আমার তো প্রথমে ভুলই হয়েছিল। ঐযে এসে গেছেন—

মারাঠা দূতের প্রবেশ।

[সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে কুর্ণিশ করিয়া] প্রভু বাজীরাওয়ের বার্তা আপনারা অবগত?

মহম্মদ ॥ অবগত। শুধু অবগত নই, বিস্মিতও। সেই মারাঠা মুষিক—মানে, সেই মারাঠা রাজা—এত মহানুভব?

উধম ॥ মহানুভব! আমি বলব নিষ্ঠুর—নির্দয়। আমি সম্রাজ্ঞী উধম বাই—নেমন্তন্ন করলাম তাকে, নিজ না এসে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক গোলাম!

দূত ॥ কথার বিশেষ সময় নেই। আমি এখান থেকে ফিরে গেলে, আপনাদের দিল্লী হবে মুক্ত। কাজেই বুঝতে পারছেন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সম্রাট, আমি প্রথমে আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই, কিন্তু—গোপনে!

মহম্মদ ॥ জাওয়েদ!

জাও ॥ আমি বাইরে অপেক্ষা করছি জাঁহাপনা! [জাওয়েদের প্রস্থান]

মহম্মদ। [কর্কশকণ্ঠে] উধম বাই!

উধম ॥ আমার প্রাণ বলছে তুমি—তুমিই বাজীরাও। ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেও না রাজা! পালিয়ে গেলে বলে রাখছি—ঠকবে, ঠকবে, ঠকবে। [প্রস্থান]

দূত ॥ যদি আমি বাজীরাওই হতাম, তবে এই মুহূর্তে আমার আসন হতো ঐ ময়ূরসিংহাসনে। কে আমি এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে জানতে পারেন, যদি আমাকে বন্দী করেন, অথবা বধ করেন। মহামান্য বাজীরাওয়ের দর্শন যদি সত্য সত্যই চান, এরচেয়ে সহজ পথ আর কিছু নেই।

মহম্মদ ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।

দূত ॥ সম্রাট, আমার প্রভু অধীরভাবে আমার অপেক্ষায় আছেন।

মহম্মদ ॥ আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে দূত।

দূত ॥ বলুন জাঁহাপনা।

মহম্মদ ॥ বাজীরাও যেখানে হেলায় দিল্লীর মসনদ দখল করতে পারেন, তখন না করে এই উদারতা কেন—কেন দূত?

দূত ॥ তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত এক বৈদেশিক অভিযান আসন্ন। দুর্দান্ত চেঙ্গিস্ খাঁর মত ভারত-অভিযানে ছুটে আসছে আর এক চেঙ্গিস খাঁ। নাম তার পারস্যাধিপতি সম্রাট নাদির শাহ! ভারতকে সেই দুর্দৈব থেকে রক্ষা করতে হলে, ভারতবাসী সমস্ত নরনারীর—সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ মিলিত প্রতিরোধ একান্ত আবশ্যক। হিন্দু-মুসলমানের একতা আজ সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়।

মহম্মদ ॥ নাদির শাহ—নাদির শাহ! নাদির শাহ আমাকে এক দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করেছে, আমি যেন আমার সাম্রাজ্যে তার আক্রমণে বিধ্বস্ত আফগানদের আশ্রয় না দিই। কিন্তু নাদির শাহ যে ভারত আক্রমণ করতে আসছে, একথা তো শুনিনি। বাজীরাও এ সংবাদ পেলেন কোথায়? না না, অবিশ্বাস্য এ সংবাদ।

দূত ॥ তবে শুনুন সম্রাট! শাদাত খাঁর সঙ্গে বাজীরাওয়ের যখন সম্মুখ-যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন শাদাত খাঁর শিবির লুণ্ঠন করতে পেরেছিলেন বাজীরাও একদিন। লুণ্ঠনকালে সেই শিবিরে শাদাত খাঁর যেসব মূল্যবান দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তারই মধ্যে ছিল অতি মূল্যবান এই পত্রখানা। [দূত একটি পত্র বাহির করিয়া সম্রাটের হস্তে দিল]

মহম্মদ ॥ [পত্র পাঠ না করিয়াই] কে লিখেছে?

দূত ॥ স্বয়ং নাদির শাহ।

মহম্মদ ॥ কাকে লিখছে?

দূত ॥ আপনার পরম বিশ্বস্ত রাজপ্রতিনিধি—অযোধ্যার শাসনকর্তা শাদাত খাঁকে।

মহম্মদ ॥ কি লিখছে?

দূত ॥ আপনি স্বয়ং পড়ে দেখলেই বুঝবেন কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! নাদির শাহ পারসীক, শাদাত খাঁও পারসীক।

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটা কথা আছে জলের চেয়ে রক্ত অনেক ঘন! রক্তের টান—রক্তের টান!

দূত ॥ হ্যাঁ সম্রাট, রক্তের টান! ওরা সব বিদেশী! ভারতের মাটির সঙ্গে ওদের নেই কোন যোগাযোগ। অথচ, এই সব বিদেশীর হাতে আপনি তুলে দিয়েছেন ভারত শাসনের অধিকার। এ দেশের উপর ওদের নেই কোন মায়া—কোন মমতা। ওরা জানে শুধু শোষণ আর লুণ্ঠন। আমার প্রভু বাজী-রাওয়ের অনুরোধ ঐসব বিদেশীদের তাড়িয়ে দিন—দূর করুন। দেশের

শাসনভার তুলে দিন সেইসব হিন্দু মুসলমানদের হাতে, যারা ভারতের সন্তান। হোক সে হিন্দু—কিম্বা মুসলমান। আর তা যদি পারেন, তবে দেখবেন প্রতিটি ভারতবাসী প্রতিহিত করছে বিদেশী আক্রমণ, তাদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। লক্ষকোটি ভারতবাসীর মিলিত হুঙ্কারে শঙ্কিত হয়ে, পলায়ন করবে বিদেশী বর্বর নাদির শাহ।

মহম্মদ ॥ শাদাত খাঁ! শেষে শাদাত খাঁও হলো বিশ্বাসঘাতক। দূত, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। শাদাত খাঁ একটু চালিয়াৎ; কিন্তু তার বিশ্বস্ততার অনেক প্রমাণও আমি পেয়েছি। [পত্র দূতের দিকে নিক্ষেপ করিয়া] ও পত্র জাল!

দূত ॥ বেশ, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন জাঁহাপনা! কিন্তু একদিন বুঝবেন কি বিষধর সাপ আপনি ঘরে পুষেছেন। আমার বক্তব্য শেষ জাঁহাপনা।

মহম্মদ ॥ কিন্তু আমার বক্তব্য যে এখনও শেষ হয়নি দূত।

দূত ॥ বলুন জাঁহাপনা?

মহম্মদ ॥ মহামান্য বাজীরাওয়ের এ উদারতার মর্যাদা আমি রাখব দূত। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করতে আমি সম্মত হইনি দূত—আমার চরম অর্থক্লেশ সত্ত্বেও। হিন্দু-মুসলমান প্রজার প্রতি আমার সমদৃষ্টি থাকবে. এ আশ্বাস আমি তোমার প্রভুকে দিচ্ছি। নাদির শাহ যদি সত্য সত্যই কোনদিন ভারত আক্রমণ করে, সেদিন যেন আমি তোমার প্রভুর সাহায্য পাই। আমার এ কামনা তাঁকে জানাবে।

দূত ॥ অবশ্যই জানাব। কিন্তু আপনিও জানবেন সম্রাট, আপনার উপর আমার প্রভুর আচরণ নির্ভর করবে—ভারত শাসনে বিদেশী শাসকদের আপনি বিতাড়ন করেন কিনা, তারই উপর।

মহম্মদ ॥ আমি ভাববো দূত। তোমার প্রভুর এই সাবধান বাণী সম্বন্ধে অবশ্যই আমি চিন্তা করব। যে সন্দেহের বিষ তুমি আমার মনে আজ ঢুকিয়ে দিলে, তাতে আমি পাগল না হয়ে যাই—পাগল না হয়ে যাই।

[মহম্মদ শাহের প্রস্থান]

দূত ॥ হতভাগ্য সম্রাট মহম্মদশাহ, আমি জানি তোমার কোন সত্যিকারের বন্ধু নেই। তোমার চারপাশে অসংখ্য বেইমান, অসংখ্য নিমকহারাম। হে বিশ্বনাথ, যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, তুমি সেই পুণ্য দিয়ে এই আত্মভোলা সরল সম্রাটকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

উধম বাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম ॥ রক্ষা! কে রক্ষা করবে তোমায়? তুমি সবার চোখে ধুলো দিতে পার, কিন্তু বেগম উধম বাইয়ের চোখে—

দূত ॥ ধূলো দিতে পারবে না বাজীরাও ! আপনি ভুল করছেন সম্রাজ্ঞী ! আমি আবার বলছি, বাজীরাও আমি নই—আমি মহামান্য বাজীরাওয়ের নগণ্য দূত।

উধম ॥ আমাকে তুমি ভোলাবার চেষ্টা কর না বাজীরাও। কথা শোনো—কথা রাখো। মস্তানী যত সুন্দরীই হোক—পুরোনো হয়নি কি এখনও ?

দূত ॥ আপনি আমাকে বিপদে ফেলেছেন সম্রাজ্ঞী। আমি নগণ্য দাস—

উধম ॥ আমি জানি তুমি দাস, এক জনের দাস—মস্তানীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [চটুল দৃষ্টিতে হাস্য]

দূত ॥ দয়া করে আমাকে বিদায় দিন।

উধম ॥ বিদায়ের কথা কি বলছ ? বরং বলো, বাঈজী মস্তানীর প্রেম কি পুরোনো হয়নি এখনও ?

দূত ॥ বাঈজী কিন্তু আপনিও ছিলেন।

উধম ॥ হ্যাঁ মানছি—বাঈজীই ছিলাম। কিন্তু এখন তো আর বাঈজী নই—সম্রাজ্ঞী, ময়ূর সিংহাসনে বসি। শোনো, খুব গোপনে একটা কথা বলছি তোমায়। মুসলমানী মস্তানীকে নিয়ে তোমার কি বিপদ হয়েছে, আমি তা জানি। মারাঠীরা থুথু দেয় তোমার নাম শুনে। তুমি অত বড় বীর বলে, ক্ষমাঘেন্না করে রাজা করে রেখেছে।

দূত ॥ আমার যেতে যত বিলম্ব হচ্ছে, দিল্লীর বিপদ তত ঘনিয়ে আসছে। আমাকে বিদায় দিন—সম্রাজ্ঞী। দিল্লীর ধ্বংস এমনি করে ডেকে আনবেন না।

উধম ॥ কিন্তু আমার আসল কথাটাই যে বলা হলো না।

দূত ॥ বলুন, কি বলবেন বলুন ?

উধম ॥ কথাগুলো আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে পারতেই হবে। কারণ, এ আমার মনের কথা—প্রাণের কথা।

দূত ॥ আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

উধম ॥ না, আমার কথা না শুনে তোমাকে যেতে দেব না, শোন। [বাজী রাওকে ধরিয়া] আমি রাজপুতানি, তুমি মারাঠী ! আমরা দুজনেই হিন্দু ! মুসলমানরা বিদেশী। বিদেশ থেকে এসে রাজত্ব করছে ওরা। দিল্লী ছেড়ে আজ তুমি যেও না। দখল কর দিল্লী, দখল কর সিংহাসন—ময়ূর সিংহাসন ! হিন্দুরাজ হোক হিন্দুস্থানে ! আর তার বেগম হোক—হিন্দু উধম বাই। জানবে, এ রাজ্যের যত কর্মচারী সব আমার হাতে। সব বশ করে রেখেছি আমি।

দূত ॥ হাত ছাড়ো নারী। তুমি মূর্তিমতী পাপ ! দিল্লী আজ সাক্ষাৎ নরক ! নিজের রুধির পান করে উল্লসিত। উদ্‌ভ্রান্তা যে নারী—সেই ছিন্নমস্তা তুমি। [প্রস্থানোদ্যত]

উধম ॥ বাজীরাও—বাজীরাও—

বাজীরাও ॥ তোমাকে নমস্কার [নমস্কার ও প্রস্থান।

উধম ॥ বটে ; দিল্লীর মসনদ হেলায় হারালে। হিন্দু হয়ে হিন্দুস্থানের এত বড় শত্রু আমি দেখিনি—দেখিনি বাজীরাও। মদ-মদ-মদ—

মদ্যপান করিতে করিতে মহম্মদ ও তৎপশ্চাতে
ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ মদ চাইছ ? এই নাও প্রেয়সী! ইব্রাহিম—[ইব্রাহিম মদ্যপাত্র লইয়া কাছে আসিল] ইব্রাহিম, এমন বিপদে পারস্যের শাহ আর তার বেগম মদ্যপান করেছে কি ?

ইব্রা ॥ জাঁহাপনা, ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব।

মহম্মদ ॥ নির্ভয়ে বলো, নির্ভয়ে বলো। তুমি পারস্য বিশারদ !

ইব্রা ॥ আপনি যথার্থই বলেছেন সম্রাট ! মদ্যপানই করেন, তবে কাছাকাছি বসে—গলাগলি ধরে।

মহম্মদ ॥ এ্যাঁ !

ইব্রা ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা ! মানে, কোন বিপদেই তাঁরা বিচলিত হন না।

[সম্রাট সম্রাজ্ঞীর কাছাকাছি যাইয়া আসনে
উপবেশন করিলেন।]

ইব্রা ॥ [পানপাত্র আগাইয়া দিল]

উধম ॥ শুনলে ? কথাটা মনে রেখো।

[সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মদ্যপান]

মহম্মদ ॥ ঐ মস্তানী—মস্তানি বাজীরাওয়ের কত বড় শক্তি। ওকে একবার দেখতেই হবে।

উধম ॥ বাজীরাও—বাজীরাও ! তুমি কেমন সম্রাট ! ঐ নেংটি ইঁদুরটাকে ধরে আনতে পারছ না ?

মহম্মদ ॥ [আসন হইতে উঠিয়া] ধরতেই হবে ঐ লোকটাকে। খুবই উদার—কিন্তু, তার চাইতেও শতগুণ চতুর ! ওকে ধরে আনতে আমি কেন চাই জানো ? বলছি—বলছি, আমার প্রাণের কথা বলছি। আমি বুঝেছি এই হিন্দুস্থানে আজ এক মাত্র ঐ লোকটাই আছে, যে হিন্দু মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখছে। গড়ে তুলতে চাইছে হিন্দু মুসলমানের মিলনে এমন একটা দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি, যা বৈদেশিক যে কোনো আক্রমণ রুখতে পারে—হটিয়ে দিতে পারে।

উধম ॥ [কাছে আসিয়া] আমি মাতাল হতে পারি, কিন্তু জেনো আমি সজ্ঞানেই বলছি তোমার একথা সত্য—তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বাজীরাওকে বলেছিলাম দিল্লীর সিংহাসনে বসে হিন্দুস্থানকে হিন্দুর রাজ্য কর। আমার কথা

সে শুনল না, আমাকে অবজ্ঞা করে চলে গেল। ওকে ধরো—ওকে বাঁধো, ওকে শক্ত করে ধরো—ওকে বাঁধো—ওকে আনো। [প্রস্থান।]

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ, ওকে ধরব—ওকে বাঁধব—ওকে আনব। ইব্রাহিম, আমার আদেশ দিয়ে এইমুহূর্তে একখানা পত্র লেখ। নিজাম চিনাকিলিচ খাঁকে। তিনি যেন বাজীরাওকে বন্দী করে আমাকে উপঢৌকন দেন।

ইব্রা ॥ জী আজ্ঞে সম্রাট!

মহম্মদ ॥ তবে লোহার শিকল দিয়ে নয়, সোনার শিকল পরিয়ে প্রীতির বাঁধন দিয়ে।

ইব্রা ॥ তাই লিখব সম্রাট—তাই লিখব। আর খোদার কাছে প্রার্থনা করি, সেই প্রীতির বন্ধন যেন কোনদিন বিচ্ছিন্ন না হয়—বিচ্ছিন্ন না হয়।

[প্রস্থান।]

মহম্মদ ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ। পাগলা গারদ—পাগলা গারদ! লোকে জানে না, তাই একে বলে বাদশাহী। দুধকলা দিয়ে আমি সব সাপ পুষেছি, শাদাত খাঁ—শেষে শাদাত খাঁও আমায় না বলে পালিয়ে গেল! বাজীরাওয়ের কথাই কি ঠিক? নাদির শাহের সঙ্গে শাদাত খাঁ ষড়যন্ত্র করছে! আমি তবে কাকে বিশ্বাস করব—কাকে বিশ্বাস করব।

জাওয়েদ খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

জাও ॥ ঐ বাজীরাওকেই বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা! তাঁকে যে বিশ্বাস করা চলে, তিনি তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। ময়ূর সিংহাসনটা হাতে পেয়েও তিনি নেননি! আপনার সিংহাসন আপনাকেই দিয়ে গেছেন।

মহম্মদ ॥ তুই ঠিক বলেছিস জাওয়েদ, আমি বাজীরাওকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু আরও একজন বিশ্বাসী লোক আমার চাই। লাহোর দুর্গ জয় করলে, তবে নাদির শাহ দিল্লীতে হানা দিতে পারবে! লাহোর দুর্গের ভার রয়েছে কামবক্সের হাতে। কিন্তু কামবক্স শাদাত খাঁর দোস্ত! আর একটা সাপ! সাপ—সাপ—আমার চতুর্দিকে অসংখ্য এই গুরুদায়িত্বের সাপ! তারা সবাই আমাকে ছোবল মারবার জন্য—জাওয়েদ, তোকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলে না, তাই তোকে আমি ছাড়িনি। কিন্তু আজ তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া] তোকে আমি আজ থেকে লাহোরের দুর্গাধিপতি করছি। [পাঞ্জা দিলেন]

জাও ॥ [নতজানু হইয়া অভিভূমনত সেলাম করিয়া পাঞ্জা লইয়া] —জনাব—জাঁহাপনা—

মহম্মদ ॥ ওরে জাওয়েদ, ভাগ্যটা খারাপ আমার, তাই সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে তোর মত বিশ্বাসী—তোর মত বীর যোদ্ধাকে—আমি হারিয়ে ফেললাম। [প্রস্থান।]

জাও ॥ আমাকে হারাবে তুমি সেদিন, যেদিন আমি আমার জীবন হারাব। হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর, আমাকে শক্তি দাও যেন এই গুরুদায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করে, আমার অন্নদাতা প্রভুর অন্নের ঋণ কিছুটা শোধ করিতে পারি।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ভূপাল। পেশোয়া বাজীরাওয়ের শিবির

গীতকণ্ঠে মস্তানির প্রবেশ।

ফুলের কলি এবার তোমার নয়ন মেলো।
ফাল্গুনে আজ ভোমর আসার লগন হলো ॥
মনের বনের তরুশাখে,
কোথায় যেন কোকিল ডাকে,
গন্ধ কহে এবার বুকের—
বুকের আগল খোলো ॥

গানের মধ্যে নিজামের প্রবেশ।

নিজাম ॥ ঋণ শোধ—অত্যাচারির হাত থেকে উদ্ধার করে বাজীরাও যে উচ্চ আসনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবন দিয়েও যেন তার মর্যাদা আমি রাখতে পারি মস্তানি! আজ বুঝছি বাজীরাওয়ের মত দুর্ধর্ষ বীর—বাজীরাওয়ের মত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, কেন তোমার প্রেমমুগ্ধ? সঙ্গীতে—রূপমাধুর্যে, সত্যই তুমি অতুলনীয়া।

মস্তানি ॥ আমি সামান্যা নারী। আপনি যে মুগ্ধ হয়েছেন—সেটা আপনারই মহানুভবতা। আপনার মত মহামান্য অতিথিকে যদি কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পেরে থাকি, তাহলে আমি সত্যিই ধন্য।

নিজাম ॥ আমার মনে আজ কেন গর্ব হচ্ছে জানো মস্তানি? কারণ তুমি মুসলমান। কিন্তু গর্বের চেয়েও বেশি হচ্ছে ক্ষোভ। কারণ—কারণ বলব?

মস্তানি ॥ বলুন মহামান্য নিজাম। এতো আপনাদের গুপ্তবৈঠক। এখানে মহামান্য পেশোয়া ছাড়া আর কেউ নেই।

নিজাম। বলছিলাম কি—বাজীরাও তো শিবপূজা করছেন?

মস্তানি ॥ হ্যাঁ জনাব! কিন্তু আপনার গর্বটা কি তা তো বললেন, ক্ষোভটা কি তা তো বললেন না?

নিজাম ॥ বলছি, বলছি, মস্তানি! মুসলমানি হয়েও তুমি হিন্দুর ক্রীতদাসী।

মস্তানি ॥ এ্যাঁ!

নিজাম ॥ হ্যাঁ। তাও যদি বা বুঝতাম তোমাকে পত্নীর সম্মান দেওয়া হয়েছে। কই, তাও তো নয়? তুমি বাজীরাওয়ের রক্ষিতা—বাজীরাওয়ের ক্রীতদাসী!

মস্তানি ॥ মিথ্যা নয় জনাব। কিন্তু উপায় কি? কোন মুসলমান কি আজ আমাকে পত্নীত্বের সম্মান দিতে পারে?

নিজাম ॥ তুমি বলছ কি মস্তানি? কোন মুসলমান তোমাকে পত্নীত্বের সম্মান দিতে পারবে না?

মস্তানি ॥ [হাসিয়া] কি করে পারবে? পারেন, আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এখান থেকে? আপনারা তো কেবলই হারছেন।

নিজাম ॥ হারছি। ও, সে বুঝি তুমি জানো না? বাজীরাওয়ের সঙ্গে আমার আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া আছে যে, আমরা কেউ কাউকে আক্রমণ করবো না।

মস্তানি ॥ কিন্তু, তবু তো আপনি তাঁকে আক্রমণ করলেন?

নিজাম ॥ সে করতে হলো বাদশাহ মহম্মদ শাহের আদেশে। তিনি বললেন বাজীরাও দিল্লীর সিংহাসন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে গেছে, নাদির শাহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে এই ভয়ে। তা কোথায় নাদিরশাহ! বাজীরাও আবার এলো বলে তার আগেই বাজীরাওকে খতম্ করতে হবে, তাই না আমার এই যুদ্ধে! বন্ধু বাজীরাওয়ের সঙ্গে আমার এ যুদ্ধ—লোক দেখানো যুদ্ধ!

মস্তানি ॥ হাসিয়া] মানে, যাতে সাপও না মরে—আর লাঠিও না ভাঙ্গে —এই তো!

নিজাম ॥ বাঃ চমৎকার! কি বুদ্ধিমতী তুমি? নইলে, যদি সত্য সত্যই আমার লড়াই করতে মন থাকতো, তবে ভূপালের এই যুদ্ধে আমি হারি? মালোয়া আর নর্মদা—চম্বলের মধ্যবর্তী মূলবান অঞ্চলটা বাজীরাওকে ছেড়ে দিয়ে আজ সন্ধি করি? বাজীরাওয়ের সৈন্যের তিনগুণ আমার সৈন্য।

মস্তানি ॥ তিনগুণ সৈন্য নিয়েও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে তো? তবেই বাজীরাওয়ের শক্তিটা বুঝুন।

নিজাম ॥ তুমি ধরেছ ঠিকই। সৈন্য-টৈন্য কিছু নয়—ঐ মাথাটা-মাথাটা। ঐ একটা মাথা যদি আজ সরিয়ে দিতে পারো, হিন্দুস্থান চিরকালের জন্য হয়ে যাবে মুসলমানস্থান। মস্তানি, দিনান্তে তুমি একটিবারও তো আল্লার নাম স্মরণ কর? সেই আল্লার দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, হিন্দুস্থানকে আল্লার রাজ্য কর। এ এক তুমিই পার মস্তানি—তুমিই পার।

মস্তানি ॥ কি করে?

নিজাম ॥ [একটা মোড়ক বাহির করিয়া] অন্তত একটি বিষের বড়ি এতে। সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তীব্র বিষক্রিয়ায় শুরু হয়ে যায় হৃদ্‌রোগ। আর এ থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই মস্তানি।

মস্তানি ॥ দিন।

নিজাম ॥ [মস্তানির হাতে মোড়ক দিল।] আল্লার জয় হোক। আমার এই অমূল্য অঙ্গুরীয়, তোমার অগ্রীম পুরস্কার মস্তানি।

[নেপথ্যে পাহাড়ীয়া রাখাল বালকের গীত শোনা গেল]

নেপথ্যে রাখাল।—

গীত

কালিদহের জল গো
কালো হয়ে গেল কিসে?

নিজাম ॥ কে গায়?

মস্তানি ॥ ছেলেটা এখানকার একজন রাখল। গলাটা ভারী মিষ্টি! আয়-আয়, ওঁকে গান শোনা। [প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে রাখাল বালকের প্রবেশ।

রাখাল।— গীত

কালিদহের জল গো কালো হয়ে গেল কিসে?
বড় ভয়ানক ও সে কালির নাগের বিষে ॥
যত ধেনু সেথা চরে
সেই জল খেয়ে মরে,
রাখালেরা ভেবে সারা, পায় নাকো তারা দিশে ॥
কানু ঝাপ দিয়ে জলে,
প্রলয় নাচের ছলে,
মারে সেই কাল সাপে, পায়ের তলায় পিশে ॥
[গীতান্তে প্রস্থান।]

গীতমধ্যে বাজীরাও শিবপূজা সারিয়া
প্রবেশ করিলেন।

বাজী ॥ নিজাম বাহাদুর, আশা করি, মস্তানি আপনার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখেনি?

নিজাম ॥ একটি রমণীরত্ন···একটি রমণীরত্ন ! এমনটি আমি কখনও দেখিনি। আজ বুঝছি তোমার শক্তির উৎস ঐ মস্তানি।

বাজী ॥ আপনি মিথ্যা বলেননি নিজামবাহাদুর। এই সংগ্রামী জীবনের সকল দুঃখ—সকল কষ্ট, এক মুহূর্তে দূরে হয়, যে মুহূর্তে ওর মুখখানি দেখি। যাক, সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়ে গেছে। আবার আপনি ও আমি পরস্পর মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আপনাকে আমার এখন শুধু একটি মাত্র কথাই বলবার আছে।

নিজাম ॥ বলুন বন্ধু !

বাজী ॥ নাদিরশাহকে আপনারা অবহেলা করছেন। ঐ শত্রুর আসন্ন অভিযান যে হিন্দুস্থানের চরম বিপদ—একথা আপনারা কিছুতেই অনুধাবন করছেন না।

নিজাম ॥ আমি কিছুটা অনুধাবন করলেও, সম্রাট মহম্মদশাহ বিষয়টাকে কোন গুরুত্ব দেন না তিনি বলেন নাদির শাহের আর কোন কাজ নেই, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তিনি আসবেন ভারতে—সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে।

বাজী ॥ মত্ত মাতালই এই রকম কথা ভাবতে পারে। কিন্তু, বিষয়টার সম্পর্কে আপনার আবার ভাবা উচিত।

একটি রেকাবীতে দুই গ্লাসে সরবত লইয়া মস্তানির
পুনঃ প্রবেশ।

বাজী ॥ এই যে রমণীরত্ন ! না না, আমার কথা নয়, ওঁর। আমার অতো ভাষাজ্ঞান নেই। সরবতটা মিষ্টি হলে, বড় জোর বলব মধু।

নিজাম ॥ [মস্তানি ও নিজামের দৃষ্টি বিনিময়] মধু তো নিশ্চয়ই। ঐ সুন্দর হাতে যা পরিবেশন হবে সে মধুর চেয়েও বেশী, যাকে বলে অমৃত।

বাজী ॥ হ্যাঁ—অমৃত। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিল। আর উঠেছিল বিষ ! এখন দেখছি নাদিরশাহ আমাদের অমৃতের ভাগ কেড়ে নিতে আসছে, যেমন সেকালে এসেছিল দৈত্যেরা। নিজামবাহাদুর, বিদেশীর হাতে ভারতের এই অমৃতভাণ্ড চলে যাবে ? একযোগে কি আমরা ঐ বিদেশী-আক্রমণ রুখব না ?

[মস্তানী নিজাম ও বাজীরাওয়ের হাতে সরবত দিল]

নিজাম ॥ তা যদি বলেন, আমরা—মুসলমানরাও একদিন বিদেশ থেকেই এ দেশে এসেছিলাম বাজীরাও।

বাজী ॥ ও, নাদিরশাহ মুসলমান বলে, আপনারা মুসলমানরা খাত গুটিয়ে বসে থাকবেন ? থাকুন।

[বাজীরাও সরবত পান করিল। নিজাম তাহা দেখিলেন।
নিজাম মস্তানির দিকে তাকাইলেন।]

মস্তানি ॥ [নিজামকে] খান্।

নিজাম ॥ তুমি যখন খেতে বলছ—খাচ্ছি। [সরবত পান]

বাজী ॥ আপনারা তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন ? হিন্দুস্থানের মাটিতে জন্ম নিয়ে, হিন্দুস্থানে লালিত পালিত হয়ে—হিন্দুস্থানেরই বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেন ? তার শাস্তি কি জানেন ? বিষপানে মৃত্যু।

নিজাম ॥ সেকি !

বাজী ॥ হ্যাঁ—বিষপানে মৃত্যু। যে সরবত খেলেন তাতে আছে সেই বিষ যে বিষ আপনি মস্তানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমাকে দিতে।

নিজাম ॥ সর্বনাশ ! শয়তানি, সে বিষ তবে তুই আমাকে দিয়েছিস্ ? [থুথু করিয়া সরবত বাহির করিবার চেষ্টা।]

বাজী ॥ হ্যাঁ, সে বিষ আপনাকে দিয়েছে মস্তানি। শুধু একটি কথাই প্রকাশ করতে যে, ভারতের সব মুসলমানরাই বিশ্বাসঘাতক নয়। [মস্তানিকে টানিয়া লইল।]

নিজাম ॥ শয়তানি—শয়তানি ! এ তুই আমার কি করলি ? এ তুই আমার কি সর্বনাশ করলি ?

মস্তানি ॥ [হাসিয়া] ভয় নেই জনাব, বিষের বাড়িটা আমি কাউকে দিইনি। ওকেও না—আপনাকেও না। আপনার বড়ি আপনি ফিরিয়ে নিন।

বাজী ॥ কিন্তু আর মুহূর্তকাল আপনি থাকবেন না। এখনই পালিয়ে না গেলে আমি যে কি করে বসব—আমি নিজেই জানি না।

নিজাম ॥ না—না ; আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

মস্তানি ॥ দাঁড়ান—দাঁড়ান জনাব ! আপনার এই বহুমূল্য আংটিটা আমার কোন আঙ্গুলেই লাগছে না ওটা নিয়ে যান। [আংটিটি মস্তানি নিজামের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া মারিল]

বাজী ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখ মস্তানি দেখ, নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে কেমন লেজ তুলে পালাচ্ছে দেখ। এরাই হোল মহম্মদ শাহের ডান হাত-বাঁ হাত। সম্রাট মহম্মদ শাহ, আমি চেষ্টা করলে কি হবে ? কালসাপে যাকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে—তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারও নেই—কারও নেই। এস মস্তানি। [উভয়ের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

লাহোর দুর্গের সম্মুখভাগ। দূরে 'আল্লা-আল্লা হো' চিৎকার ও কামান গর্জন।

যুদ্ধরত অবস্থায় জাহান্দার খাঁ ও আমেদশাহ আবদালীর প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ এখনও বলছি আফ্‌গান, দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহের বশ্যতা স্বীকার কর। সেদিন আফগানিস্থানের রণক্ষেত্রে, তোমার দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকীর ছলনা আর কৌশলে—জীবন নিয়ে তুমি পালাবার সুযোগ পেয়েছিলে। অবশেষে পুনরায় দেখা হলো তোমার সঙ্গে ভারতের এই লাহোর দুর্গের সম্মুখ-ভাগে। আজ আর তোমার পরিত্রাণ নেই আমেদশাহ আবদালী।

আমেদশাহ ॥ হ্যাঁ ॥ সেদিন নারীর নির্লজ্জ কৃপায় রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছি সত্য। কিন্তু আমি সৈনিক—আমি যোদ্ধা। আজ আমার জীবন রক্ষা করবে আমার আশ্রয়দাতা বন্ধু লাহোর দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর দেওয়া এই উদ্যত অসি।

জাহান্দার ॥ বন্ধু! লাহোর দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ তোমার আশ্রয়দাতা —বন্ধু!

আমেদ ॥ হ্যাঁ বন্ধু! সুদিনের বন্ধু অনেককেই পেয়েছি, কিন্তু দুর্দিনের এমন বন্ধু বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই।

জাহান্দার ॥ তোমার সেই বন্ধুর কবর রচনা হবে আজ—দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সেনাপতি জাহান্দার খাঁর অসির আঘাতে!

আমেদ ॥ দিগ্বিজয়ী! কে দিগ্বিজয়ী? সম্রাট নাদিরশাহ? তার প্রমাণ এখনও অসমাপ্ত।

জাহান্দার ॥ অসমাপ্ত!

আমেদ ॥ হ্যাঁ অসমাপ্ত। কারণ, এখনও জীবিত রয়েছে দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর বন্ধু এই আফ্‌গান আমেদশাহ আবদালী!

জাহান্দার ॥ উধম। তবে সেই অসমাপ্ত করতে প্রথমেই জীবন্ত বন্দী হোক আফ্‌গান আমেদশাহ আবদালী। [উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান]

নেপথ্যে জাওয়েদ ॥ সৈন্যগণ! প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ কর না। এগিয়ে চলো—আক্রমণ কর—বৈদেশিক শত্রুর কাছে মাথানত কর না। দেশের

জন্য তোমাদের ঐ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, শহীদ হবার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত কর না। এগিয়ে চলো – এগিয়ে চলো।

দূর হইতে জাহান্দার বলিতে বলিতে
প্রবেশ করিল।

জাহান্দার ॥ এগিয়ে চলো —এগিয়ে চলো—সৈন্যগণ, ছত্রভঙ্গ লাহোরের সৈনিকদল। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়। শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে হত্যা কর। যেমন করেই হোক লাহোর দুর্গ জয় করা চাই-ই।

জাওয়েদ খাঁর প্রবেশ।

জাও ॥ সে আশা তোমার সুদূর পরাহত। কারণ, এখনও জীবিত রয়েছে লাহোর দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ।

জাহান্দার ॥ আমি তোমাকে শেষবার বলছি, তুমি আমার দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কর।

জাও ॥ কেন ? প্রাণের ভয়ে ? রাতের অন্ধকারে গোপনে যে নিরীহ নরনারীর রক্তে রাঙা করে দেয় সুষুপ্ত ধরণী, সেই চৌর্যবৃত্তিধারী এক নরঘাতকের কাছে ? না—না, তা হবে না। দেহের একবিন্দু থাকতে, লাহোর দুর্গ অধিকার করতে পারবে না।

জাহান্দার ॥ তোমার সেই আকাশকুসুম কল্পনার এই মুহূর্তেই হোক চির সমাধি। [উভয়ের যুদ্ধ ও জাহান্দারের হাত হইতে হঠাৎ অস্ত্র পড়িয়া গেল।]

জাও ॥ প্রস্তুত হও জাহান্দার খাঁ।

জাও ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! কি হলো দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সেনাপতি জাহান্দার খাঁ : কোথায় গেল তোমার সদম্ভ হুঙ্কার ?

জাহান্দার ॥ ওঃ—অসহ্য ! তুমি আমাকে হত্যা কর জাওয়েদ খাঁ !

জাও ॥ হত্যা—না না, আমি সৈনিক। নিরস্ত্রকে হত্যা করা কোনো সৈনিকের উচিত নয় ! জাহান্দার, এই নাও তোমার অস্ত্র। [নিক্ষেপিত অস্ত্র জাহান্দারকে দিল।]

জাহান্দার ॥ জাওয়েদ খাঁ !

জাও ॥ না-না, কোন কথা নয়, অস্ত্র ধর সেনাপতি জাহান্দার খাঁ।

জাহান্দার ॥ বেশ, তবে তাই হোক। [উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

১৩৭৮ ডিসেম্বর

লাহোর নাদিরশাহের শিবির

নাদিরশাহ ও জাহান্দার খাঁর প্রবেশ

নাদির ॥ জাহান্দার, আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন কেন বলো তো সেনাপতি ?

জাহান্দার ॥ লাহোর জয় করে—আপনার ভারত জয়ের সূচনা হয়েছে বলে।

নাদির ॥ না সেনাপতি। আজকের দিনটিকে স্মরণীয় দিন মনে করেছি শুধু এইজন্য—আমার পূর্ববর্তী দিগ্বিজয়ীরা—বলো সেনাপতি, আমার পূর্ববর্তী দিগ্বিজয়ী আর কে ছিলেন ?

জাহান্দার ॥ দুর্দান্ত চেঙ্গিসখাঁন !

নাদির ॥ হ্যাঁ, চেঙ্গিসখাঁন ! কিন্তু তারও আগে আর এক দিগ্বিজয়ী ছিলেন।

জাহান্দার ॥ তৈমুরলঙ্গ !

নাদির ॥ হ্যাঁ তৈমুরলঙ্গ ; কিন্তু জাহান্দার খাঁ, তারও আগে এদের চেয়েও বড় দিগ্বিজয়ী আর একজন ছিলেন।

জাহান্দার ॥ সম্রাট কি সেই গ্রীক বীর সেকেন্দার শাহের কথা বলেছেন ?

নাদির ॥ তোমার অনুমান যথার্থ জাহান্দার খাঁ। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার—আলেকজাণ্ডার সেকেন্দার শাহ ! কিন্তু এই তিন দিগ্বিজয়ী বীরের যে বিবরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দেখছি নয় মাসের মধ্যে কান্দাহার—গজনী—কাবুল আর লাহোরে ঝটিকা অভিযান এদের কারোই ছিল না। নিঃসন্দেহে ওদের চেয়ে আমি অনেক দ্রুত—অনেক ক্ষিপ্র।

জাহান্দার ॥ সন্দেহ নেই সম্রাট।

নাদির ॥ আর সেইজন্যই আমার কাছে লাহোর জয়ের এই প্রভাতটি সারাজীবন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেনাপতি, সৈন্যবাহিনীকে এ সপ্তাহ বিশ্রামের সুযোগ দাও। কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। এই এক সপ্তাহে আমি আমার দিল্লী অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করি।

জাহান্দার ॥ দিগ্বিজয়ী সম্রাট, সৈন্যবাহিনীর আজ সবচেয়ে বড় আনন্দ যে, তারা এত বড় দিগ্বিজয়ীর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার গৌরব অর্জন করেছে। অপরাজেয় নাদিরশাহের সৈনিক—এই পরিচয়—আজ বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। [প্রস্থান]

নাদির ॥ [আকাশের দিকে তাকাইয়া।] কই, আসমানের চাঁদটি কোথায়? কি আশ্চর্য, দিনের বেলায় চাঁদ খুঁজছি?

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহি ॥ সম্রাট সুপ্রভাত। আসমানের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছেন?

নাদির ॥ চাঁদ খুঁজছিলাম কোহিনূর! শেষ রাত্রেও দেখেছিলাম, কিন্তু আর দেখছি না।

কোহি ॥ হারিয়ে গেল?

নাদির ॥ হারিয়ে যায়নি—পালিয়ে আছে। রাতের নক্ষত্র দিনের বেলা দেখা যায় না বলেই, কি বলবে নক্ষত্র নেই?

কোহি ॥ [হাসিয়া] না, তা বলব না। সম্রাট, আজ প্রত্যূষে কোন্ এক ভিক্ষুকের কি গান শুনে আপনি সেই ভিক্ষুককে আপনার সামনে আনতে হুকুম দিয়েছিলেন।

নাদির হ্যাঁ। সে এসেছে? কোথায় সে?

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক।— **গীত**

ও মালিক—

মালিক আমার আজকে দিনের ক্ষুধার অন্ন দাও।
ভবিষ্যতের ভাবনা আমার সবই তুমি নাও ॥
তোমার হাতেই মরণ-বাঁচন,
সুখের হাসি দুখের কাঁদন,
তোমার হাতেই জীবন-ঘুড়ির সুতোর লাটাইটাও ॥
গোঁত্তা খাই বা সোজা উড়ি,
সবই তোমার বাহাদুরী,
পাছে ভুলি সেই কথাটি তাইতো তুমি টান লাগাও ॥

ভিক্ষুক ॥ খোদাতালার জয় হোক। দুমুঠো ভিক্ষে দাও মা।

নাদির ॥ দু'মুঠো ভিক্ষের কথা কি বলছ! কোহিনূর—

কোহি ॥ [নিজের গলা হতে কণ্ঠহার খুলিয়া দিবার উপক্রম]

ভিক্ষুক ॥ না-না, এ রত্নহার দিয়ে আমি কি করব, আমি চাই দু'মুঠো চাল।

নাদির ॥ ওরে বেয়াকুফ, ঐ রত্নহার দিয়ে তুমি তোমার সারাজীবনের খোরাক কিনতে পারবে।

ভিক্ষুক ॥ না-না, আজকের পেটের ভাত হয়, এই ভিক্ষাই আমি চাই। তার বেশি আর কিছু তো আমি চাই না। আর দিলেও নেব না।

কোহি ॥ কেন বলো তো ?

ভিক্ষুক ॥ তোমরা সব ভিন্ দেশের লোক। এ দেশের ভিখারিরা যেদিনের যতটুকু দরকার—তাই শুধু ভিক্ষা নেয়। তার বেশি তো নিতে নেই।

কোহি ॥ কেন নেই ?

ভিক্ষুক ॥ তা নিলে খোদার অমর্যাদা হয়—হয় না কি ? আমি তো জানি, খোদা আমার ভরণ-পোষণ করবেনই। আজকে যেটুকু দরকার—সেটুকু আজ দেবেন। কালকে যেটুকু দরকার—সেটুকু কাল দেবেন। খোদার উপর বিশ্বাসটা হারালেই না আমি কালকের ভিক্ষা আজ নেব। না—আমি তা নেব না।

নাদির ॥ আমি কে তুমি তা জানো ?

ভিক্ষুক ॥ হ্যাঁ হুজুর। শুনেছি আপনি কোন্ বাদশাহ। আপনার চেয়ে বড় বাদশাহ এখন আর কেউ নেই। আমি তা শুনেছি হুজুর।

কোহি ॥ হ্যাঁ, ইঁনিই দিগ্বিজয়ী বাদশাহ নাদির শাহ। উনি যদি তোমাকে একটা রাজ্য দেন, তুমি তা নেবে না ?

ভিক্ষুক ॥ না। ওসব অশান্তি আমি চাই না। আমি দুবেলা দু'মুঠো ভাত চাই, পরনে চাই একখানা কাপড়, মাথার উপর একটু ছাউনি। একটা কুঁড়ে ঘর হলেও চলে, গাছতলাতেও চলে, না হলেও ক্ষতি নেই। মাথার উপর আকাশটা তো রয়েছে।

নাদির ॥ এ দেশের ভিক্ষুকরা কি এই রকম ?

ভিক্ষুক ॥ শুধু ভিক্ষুকরা নয়, এদেশের সব মানুষই এইরকম। আমরা আছি আর আছেন খোদা। সবই খোদার ইচ্ছা ! সেই গানই তো গাইলাম।

কোহি ॥ তোমার গানের ভাষাটা আমরা বুঝিনি। গলাটা ভাল লেগেছিল, তাই—

নাদির ॥ [সহসা উত্তেজিত হইয়া] আমার বন্দুক—আমার বন্দুক। আমি একে গুলি করে মারব।

কোহি ॥ না না সম্রাট !

নাদির ॥ তুমি বুঝছ না কোহিনূর ! এইসব আদর্শ এ দেশের মানুষকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে। আর এইসব আদর্শ জনসাধারণকে যোগাচ্ছে কারা জানো ? এ দেশের ফকির-মৌলবিরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা, যারা উচ্চশ্রেণীর অভিজাতকুলের প্রসাদপুষ্ট হয়ে জনসাধারণকে—গোটা দেশকে ত্যাগ আর অহিংসার এমনি সব মহান আদর্শের আফিং খাইয়ে, দেশের নরনারীকে করছে দৈব শক্তিতে বিশ্বাসী আর অদৃষ্ট-নির্ভর। গোটা জাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে নির্বীর্য আর নপুংসক। শাসকের অত্যাচারে তারা কথা বলে না, অত্যাচারীর উৎপীড়নে এদের ঘুম ভাঙ্গে না। অভিজাতকুলের শোষণ আর লুণ্ঠন এরা নির্বিবাদে মাথা পেতে নিয়ে বলে—এ আমার অদৃষ্ট, আল্লাতালার ইচ্ছা, আমি এই আদর্শের নিপাত চাই। আমি ওকে গুলি করে মারব।

ভিক্ষুক ॥ মারে খোদা রাখে কে—রাখে খোদা মারে কে ?

নাদির ॥ দেখছ—দেখছ কোহিনুর ?

ভিক্ষুক ॥ মারতে হয় মারো বাবা, খোদার হয়তো এই ইচ্ছা।

রক্ষীর প্রবেশ।

[রক্ষী আসিয়া নাদিরের হাতে বন্দুক দিয়া দূরে দাঁড়াইল]

নাদির ॥ [বন্দুক লইয়া মারিতে উদ্যত] হ্যাঁ, মর।

কোহি ॥ সম্রাট ! আমি আপনার পায়ে পড়ছি সম্রাট ! বিজয়উৎসবের এই পুণ্য প্রভাতটি এমনি করে রক্তরঞ্জিত করবেন না।

নাদির ॥ [হঠাৎ কি ভাবিয়া রক্ষীকে বন্দুক ফেরৎ দিয়া] যাও, বেঁচে গেলে। দূরে হও।

ভিক্ষুক ॥ হচ্ছি বাবা ! রাখে খোদা মারে কে, মারে খোদা রাখে কে।

[পূর্ব গীতাংশ—"গোঁত্তা খাই"...ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে রক্ষীসহ প্রস্থান।]

কোহি ॥ হাসিও পায়—দুঃখও হয়। যাক, এইবার আমাদের বিজয়োৎসব। আসুন সম্রাট ! [হাত ধরিতে উদ্যত]

নাদির ॥ দাঁড়াও। এই বিজয়োৎসবে আমি তোমাকে এক অমূল্য রত্ন উপহার দিচ্ছি। সে উপহার পেয়ে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে—কি অভিশাপ দেবে, আমি জানি না। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে দিচ্ছি। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর। [প্রস্থান]

কোহি ॥ ধন্যবাদ দেব—কি অভিশাপ দেব ! কি সে উপহার ?

শৃঙ্খলিত আমেদশাহ আবদালীর প্রবেশ।

কোহি ॥ একি ! আবদালী—আমেদশাহ আবদালী ! আফগান সেনাপতি ! শেষে তুমিও হয়েছ বন্দী !

আমেদ ॥ নাদিরশাহী সৈন্যের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তোমার নির্লজ্জ কৃপায় রক্ষা পেয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে এতদিন। অবশেষে আশ্রয় মিলেছিল ভারতের এই লাহোর দুর্গে। কিন্তু সেই দুর্গেরও পতন হয়েছে কাল। দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর সঙ্গে আমিও হয়েছি বন্দী।

কোহি ॥ নিয়তির মত দুর্বার নাদিরশাহ। কিন্তু আজ তোমাকে কি করে রক্ষা করব আবদালী ?

আমেদ ॥ রক্ষা করতে আমিও তোমাকে বলছি না কোহিনুর। আমার জীবনের প্রাণবন্যা ছিলে তুমি ! রণক্ষেত্রেও আমি তোমাকে সঙ্গে না রেখে চলতে পারতাম না। পত্নীর চেয়েও প্রিয়া—উপপত্নী ! আমার সেই উপপত্নী

ছিলে তুমি। সেই তুমি আজ নাদিরশাহের উপপত্নী! এ দৃশ্য দেখে আমার একমাত্র কাম্য মৃত্যু।

কোহি ॥ রণশাস্ত্রে পণ্ডিত আমেদশাহ আবদালী একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন।

আমেদ ॥ কি?

কোহি ॥ উপপত্নীরা চিরদিনই উপপত্নী! আজ এর—কাল ওর। নিষ্ঠা আশা করতে পার তুমি তোমার পত্নীর কাছে--উপপত্নীর কাছে নয় বন্ধু! আমাদের বন্ধন—প্রেমের বন্ধন—ধর্মের নয়।

আমেদ ॥ স্তব্ধ হও শয়তানী। বারবিলাসিনী হলেও তুমি আফগান রমণী! তোমার মাতৃভূমির পরম শত্রু যে, তার অঙ্কবিলাসিনী হতে তোমার লজ্জা হলো না নারী? ধিক্ তোমাকে।

কোহি ॥ ধিক্ তোমাকেও। নির্লজ্জা হয়ে—বিবস্ত্রা হয়ে—অত্যাচারী সৈন্যদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছিলাম যে মহৎ উদ্দেশ্যে—সংগ্রাম ত্যাগ করে সংগ্রামী জীবন ধুলোয় ফেলে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে তোমার এতটুকু লজ্জা করেনি নির্লজ্জ কাপুরুষ?

নাদিরের পুনঃ প্রবেশ।

নাদির ॥ আফগানদের প্রেমালাপ কি হয় এত তীব্র—এত তীক্ষ্ণ—এত তিক্ত!

কোহি ও আমেদ ॥ [মাথা নত করিল]

নাদির ॥ কি জানি। শোনো আবদালী, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। যে নারী তার প্রণয়াস্পদের জীবনরক্ষার জন্য সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা হতে পারে, তার সেই অসাধারণ প্রেমকে আমি অমর্যাদা করব না কখনও। তোমার প্রণয়িণী আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়—আমার নম বিলাসিনী! [প্রস্থানোদ্যত]

আমেদ ॥ সম্রাট!

নাদির ॥ একটা কথা জেনো আবদালী, নাদিরশাহ কারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না।

আমেদ ॥ [অভিভূত কণ্ঠে] সম্রাট!

নাদির ॥ আজ আমার জীবনে এই পরম সত্যটিরই উপলব্ধি হয়েছে যে, আমরা কেউ পারসীক নই—মুসলমান নই—দুনিয়ার শুধু একটা জাতিই আছে তার নাম মানুষ! এই মানুষের সংগ্রাম—অমানুষের বিরুদ্ধে।

আমেদ ॥ জাঁহাপনা, আমি এক নির্যাতিত কৃষক সন্তান ছিলাম।

নাদির ॥ আমিও ছিলাম নির্যাতিত সাধারণ মানুষ!

আমেদ ॥ [নতজানু হয়ে] দিগ্বিজয়ী নাদির, আমরা সমগোত্র সমশ্রেণী! তাই আমাকে তোমার সৈনিক হবার মহাসম্মানটি দাও। তোমার ঐ পরম

সত্যে আমার জীবন আজ উদ্ভাসিত। আজ আমি এক নূতন মানুষ! দয়া করে তোমার পতাকা বহন করতে দাও আমাকে। তোমার অস্ত্র তুলে দাও আমার হাতে। হে রণগুরু, আমাকে পুনর্জন্ম দাও।

নাদির ॥ কোহিনুর, তুমি আমার নর্মবিলাসিনী আনন্দদায়িনী! আর আবদালী আজ থেকে তুমি হও আমার দক্ষিণ হস্ত—অবিরাম সহচর। [আবদালীকে তুলিয়া একপাশে ও অপরপাশে কোহিনুরকে লইয়া] তোমাদের সাহায্যে শুরু হোক আমার ভারত অভিযান। কোহিনুর, আবদালীকে নিয়ে গিয়ে তুমি নিজ হাতে ওর শৃঙ্খল উন্মোচন করে দাও। দীক্ষা দাও ওকে আমার নব ধর্মে।

কোহি ॥ সম্রাট, বজ্রের মধ্যে লুকানো থাকে যে বিদ্যুই—তুমি সেই বিদ্যুৎ! তোমার জয় হোক। [প্রস্থান]

আমেদ ॥ শুনেছিলাম, নাদির শাহ দুর্দান্ত দস্যু! কিন্তু সে দস্যু কত বড় মহামানব তা জানলাম আজ। [প্রস্থান]

নাদির ॥ দস্যু হলেও আজ আমি মানুষ!

জাহান্দার খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ সম্রাট, আমি জাহান্দার খাঁ!

নাদির ॥ কি সেনাপতি জাহান্দার খাঁ?

জাহান্দার ॥ বন্দী লাহোর দুর্গাধিপতি।

নাদির ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এনেছ! কই?

জাহান্দার নেপথ্যের দিকে ইঙ্গিত করিল, শৃঙ্খলিত
বন্দী জাওয়েদ খাঁর প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ বন্দী, তোমার সামনে মহামান্য দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহ। নতজানু হও!

জাও ॥ নতজানু আমি হই একমাত্র দিল্লীশ্বরের সামনে আর জগদীশ্বরের উদ্দেশে। কোন দস্যুর সামনে নতজানু হওয়ার জন্য জন্ম আমার নয়।

জাহান্দার ॥ দস্যু! মহামান্য দিগ্বিজয়ী সম্রাট হলেন দস্যু! সম্রাট, আদেশ দিন এইমুহূর্তে ওর অসংযত জিহ্বাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি।

জাও ॥ ওসব ভয়ে ভীত আমি নই বর্বর! দস্যু হস্তে যে মুহূর্তে আমি বন্দী হয়েছি সেই মুহূর্তে আমি জানি এ লাঞ্ছনা আমার প্রাপ্য। আমি ছিলাম দিল্লীর বাদশার খোজা প্রহরী-প্রধান জাওয়েদ খাঁ! এইসব অত্যাচার অনেক করেছি, অনেক দেখেছি। আর এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি রয়েছি।

নাদির ॥ মৃত্যুভয়ে যখন তুমি ভীত নও—তুমি বীর! তোমার সঙ্গে

আলাপ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। রাজ্যের পর রাজ্য আমি জয় করে এসেছি। আর তা করেছি প্রকাশ্যে—সম্মুখযুদ্ধে। তবুও আমি দস্যু ?

জাও ॥ দস্যু নও তো কি ? নিশীথে যখন ধরণী থাকে সুষুপ্ত অতর্কিতে হানা দেয় দস্যু। ধ্বংস করে একটি পল্লী! অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করে গৃহের পর গৃহ। নিরীহ নরনারীকে হত্যা করে লুণ্ঠন করে তাদের ধনসম্পদ। শ্মশান হয়ে যায় এক একটি পল্লী, হাহাকারে ভরে যায় আকাশ-বাতাস। তুমিও তাই করেছ পারস্য সম্রাট! প্রভেদ শুধু এই দস্যুরা ধ্বংস করে এক একটি পল্লী, আর তুমি ধ্বংস কর এক একটি নগরী—এক একটি জনপদ—এক একটি রাজ্য—এক একটি দেশ।

নাদির ॥ কিন্তু তা করছি—প্রকাশ্যে, যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর তোমরা ? যে লুণ্ঠন আমি করেছি প্রকাশ্যে—সম্মুখযুদ্ধে, তারচেয়ে বহু গুণ লুণ্ঠন করেছ তোমরা—অভিজাত উচ্চবংশীয় শাসক সম্প্রদায়েরা যুগ যুগ ধরে, প্রকাশ্যে নয়—গোপনে। সম্মুখযুদ্ধে নয়—ছলে, বলে, কৌশলে! আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তোমার গুপ্ত ধনাগারটি কোথায় ? যে ধনাগারে সঞ্চিত রয়েছে নিরীহ প্রজার শোষিত ধনসম্পদ! যদি এখনও বলো, শাস্তি হবে লঘু। উত্তর দাও—দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ ?

জাও ॥ কোন উত্তর আমি দেব না শয়তান। আমি জানি ধনাভাবে তোমার সৈন্যদের বেতন দিতে পারছ না। গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দিয়ে, তোমাকে আর জয়যুক্ত হতে আমি দেব না শয়তান।

নাদির ॥ দেবে না ?

জাও ॥ না।

নাদির ॥ দেবে না ?

জাও ॥ না।

নাদির ॥ দেবে না ?

জাও ॥ না—না!

[নাদির ক্রমশঃ জাওয়েদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহার তরবারি জাওয়েদের বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন।]

জাহান্দার ॥ [বিস্ময়ে] সম্রাট!!

নাদির ॥ [পৈশাচিক অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জাহান্দার ॥ [ভয়ে] সম্রাট!

নাদির ॥ তুমি এখানে কেন ? যাও—দূর হও।

[জাহান্দার ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল।]

নাদির ॥ লোকটা মরে গেল!

[নাদির চারিদিক তাকাইয়া দেখিলেন কেহ আছে কিনা ? যখন দেখিলেন কেহ নাই, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

ম-৩৬৯

তিনি ধীরে ধীরে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইলেন।
এবং মৃতদেহটির একেবারে সম্মুখে যাইয়া হঠাৎ
নতজানু হইলেন।]

নাদির ॥ [আবেগকম্পিত কণ্ঠে] তুমি বীর—তুমি সাহসী! তোমাকে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

[সেলাম জানাইয়া, নাদির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং চকিতে দূরে
চকিতে দূরে চলিয়া আসিলেন।]

নাদির ॥ [চিৎকার করিয়া] কে আছ? এই মৃতদেহটা আমার শিবির থেকে সরিয়ে যাও। আমি সইতে পারছি না—আমি সইতে পারছি না।

[প্রস্থান]

[নাদিরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একটি বিচিত্র সুর বাজিল।
সেই সুরে জাওয়েদের প্রাণসঞ্চার হইল। আস্তে
আস্তে উঠিবার চেষ্টা।]

জাও ॥ উঃ—কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

একজন পারসীক রক্ষীর প্রবেশ।

জাও ॥ কে তুমি ভাই? আমাকে একবার টেনে নিয়ে যেতে পার ঐ মসজিদে। খোদার কাছে শুধু শেষ নিঃশ্বাসে একটা কথা বলতে—নাদিরশাহ, বীরের মর্যাদা দিতে জানে। তার এই মনোভাবের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই খোদা। [রক্ষীসহ জাওয়েদ প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

কর্নাল—নাদিরশাহের শিবির। প্রভাতকাল।

আমেদ শাহ আবদালী ও কোহিনূরের হাসিতে
হাসিতে প্রবেশ।

আমেদ ॥ আনন্দ যে আর ধরে না দেখছি?

কোহি ॥ তোমারই কি কিছু কম আনন্দ আজ? আচ্ছা দিল্লীর এত বড় বাদশাহী সৈন্যবাহিনী, এমন করে পরাজয় বরণ করতে পারে কেউ কি তা ভাবতে পেরেছিল? শোনো, আমার সবচেয়ে কি ভয় ছিল জানো? মহম্মদশাহের

হস্তীবাহিনী! কেবলই ভয় হচ্ছিল ওরা বুঝি সব লণ্ডভণ্ড করে একেবারে ভূমিকম্প করে বসে! কিন্তু অবাক কাণ্ড—ঐ হাতীগুলোই সবার আগে ছুটে পালালো। ব্যাপার কি বল তো আবদালী?

আমেদ॥ ও, তা বুঝি জানো না? হাতীগুলো আসতেই আমাদের সৈন্যরা সব চিৎকার করে গান ধরলে—"হাতী তোর পায়ের তলায় কেন কুলের বিচি।" হাঃ-হাঃ? কোহিনুর ও আবদালী হাসিতে লাগিল।

নাদিরশাহ হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

নাদির॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

কোহি॥ হাসছেন যে সম্রাট?

নাদির॥ [হাসিতে হাসিতে] সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে স্বয়ং দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহ আমার শিবিরে। কি ভীরু লোকটা! কখন আসবেন বলেছেন আবদালী?

আমেদ॥ আজ সকালেহ আসবেন সম্রাট।

নাদির॥ বেশ—বেশ, কিন্তু তার আগে বন্দী শাদাত খাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তাকে নিয়ে এসো আবদালী।

আমেদ॥ যথা আজ্ঞে সম্রাট। [প্রস্থান]

নাদির॥ সম্রাট মহম্মদশাহকে সাদর অভ্যর্থনা ও সমাদর করা সঙ্গত হবে। কি বলো কোহিনুর?

কোহি॥ এক সম্রাটের কাছে আর এক সম্রাটের এই আশা অসঙ্গত নয় জাঁহাপনা।

নাদির॥ বটে! তবে এই অভ্যর্থনার ভার রইলো তোমারই উপর। ভারত সম্রাট মহম্মদশাহ নকল কোহিনুরটি দেখেছেন, এবার আসল কোহিনুর দেখুন।

আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ॥ যুদ্ধ বন্দী বারহান মুল্‌ক্‌ শাদাত খাঁন।

নাদির॥ সম্রাট মহম্মদ শাহকে অভিনন্দিত করতে প্রস্তুত হও কোহিনুর।

কোহি॥ আদেশ পালিত হবে সম্রাট। কিন্তু একটা কথা জানবেন, যত দেশেই নন্দিত করুক নদী, তার নিজের লক্ষ্য হলো সাগর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

নাদির॥ মহম্মদশাহের আর কোন সংবাদ পেয়েছ আবদালী?

আমেদ॥ পেয়েছি সম্রাট। তিনি এই শিবিরে আসবার জন্য হস্তীপৃষ্ঠে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে আছেন নিজাম উল্‌-মুল্‌ক চিনকিলিচ্‌ খাঁ।

নাদির॥ কিন্তু সাক্ষাৎ হবে আমার ঔষধ সেবনের পর।

আমেদ॥ মহম্মদশাহকে তবে কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে?

নাদির ॥ হ্যাঁ হবে। ইচ্ছা করেই এই অসৌজন্যটুকু আমি তাঁর সঙ্গে করব। অর্থাৎ—

আমেদ ॥ আপনি সন্ধির জন্য লালায়িত নন, এইটুকু বোঝাতে চান তাঁকে।

নাদির ॥ খুশি হলাম। পাঠিয়ে দাও, তোমার সেই বার্‌হান্‌ মুল্‌ক শাদাত খাঁকে।

আমেদ ॥ তাঁর সঙ্গে তার এক ভাগ্নে আছে সম্রাট।

নাদির ॥ কে সে?

আমেদ ॥ নাম বল্‌ছিল মীর আমিন খাঁ!

নাদির ॥ মীর আমিন খাঁ—মীর আমিন খাঁ! ও-হো হো, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ! এই লোকটির সঙ্গে আমি পরে দেখা করব। তাকে অপেক্ষা করতে বলো। সে যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না। দেবে না তাকে যেতে।

আমেদ ॥ আগে মামা—তারপর ভাগ্নে! তাই হবে সম্রাট! [প্রস্থান]

বন্দী শাদাত খাঁর প্রবেশ। তার মুখমণ্ডলের
ক্ষতস্থান বন্ধনের পটি বাঁধা।

শাদাত ॥ সেলাম আলায়কুম জাঁহাপনা!

নাদির ॥ ও-আলায়কুম সেলাম। আমাদের যুদ্ধ জয়ে আপনার অসামান্য সাহায্যের জন্য অপরিসীম ধন্যবাদ। আশা করি আপনি সত্য সত্যই আহত হন নি? ঐ ক্ষত-বন্ধনীটি খুলে ফেলে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন জনাব।

শাদাত ॥ না জাঁহাপনা—ওটা থাক। মহম্মদ শাহ আসছেন, তাই এটার প্রয়োজন আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সম্রাট! আমি আহত নই—সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ কি জানেন সম্রাট?

নাদির ॥ কি?

শাদাত ॥ আমার আনন্দ আমিই আপনাকে ভারত জয় করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

নাদির ॥ আর আমার আনন্দ সে আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করেছি। এবং আরও আনন্দ আপনি আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতেও কার্পণ্য করেন নি। আহত হয়েছেন এই ছলনায়, আপনি আপনার বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পলায়নে প্রণোদিত করেন! যার ফলে আমার জয়লাভ হয় যেমন দ্রুত তেমনি সহজ। আমি আপনার ঋণ কখনও ভুলব না।

শাদাত ॥ জাঁহাপনা, আপনি সত্যই মহানুভব। আর আমিও ধন্য।

নাদির ॥ এইবার আমি একটি পরামর্শ চাই শাদাত খাঁ! দিল্লীর বাদশাহী সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয় নি—এখনও অটুট! আপনার সৈন্যবাহিনীর অপ্রত্যাশিত পলায়নেই মহম্মদশাহের বিরাট সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এবং তার ফলেই সম্রাট হয়ে পড়েন ভীত। শ্বেতপতাকা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন

আপনি কি মনে করেন, আমার সন্ধি করা উচিত ?

শাদাত ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা।

নাদির ॥ কেন বলুন তো ?

শাদাত ॥ দিগ্বিজয়ী নাদির শাহের ভারত অভিযানের সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই হয়ে পড়েছে বিচলিত। মহম্মদশাহের শত্রুপক্ষ রাজপুত মারাঠা-জাঠ-রোহিলা, সবাই পরস্পরের শত্রুতা ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে, এক যোগে আপনার মহড়া নিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নাদির ॥ সে সংবাদ আমিও পেয়েছি। সমগ্র ভারতের সঙ্গে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দিল্লীর রাজকোষে যুগ যুগ ধরে গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করে সঞ্চিত হয়েছে যে অফুরন্ত ধনসম্পদ, আমি তা লুণ্ঠন করতে চাই। আমার দরিদ্র দেশবাসীদের আপনি বলুন শাদাত খাঁ, দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের গ্রাস হতে মুক্ত হতে, তাকে সসম্মানে বিদায় দিতে দিল্লীর মহম্মদশাহ কি পরিমাণ অর্থ দিতে সক্ষম ? তার কাছে সেই অর্থই হবে আমার সন্ধির সর্ত।

শাদাত ॥ জাঁহাপনা! আপনার দাবী হোক বিশ কোটি টাকা। যদি তিনি না দিতে পারেন—আদায় করে দেব আমি। এ প্রতিশ্রুতিও আজ আমি আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কথাটি কার্যকালে মনে রাখবেন, আজ শুধু আমার এই প্রার্থনা সম্রাট।

নাদির ॥ বিশকোটি টাকা—বিশকোটি টাকা! পাওয়া যাবে! পাওয়া যেতে পারে! আপনি তার জামিন থাকছেন ?

শাদাত ॥ থাকছি জাঁহাপনা। শুধু এ বান্দাকে মনে রাখবেন মনে রাখবেন।

নাদির ॥ দিল্লী জয় আপনারই বিশ্বাসঘাতকতায় সম্ভব হয়েছে, এ আমি মনে রাখব না—এ আমি মনে রাখব না!

আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ ॥ সাম্রট, মহম্মদ শাহ সমাগত।

নাদির ॥ ঔষধ সেবন আর দরকার হবে না। ঔষধ ইনিই আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন। চলো, সন্ধির সর্তটা এখুনিই গিয়ে আলোচনা করি। [প্রস্থানোদ্যত]

শাদাত ॥ আমিও আসব তো জাঁহাপনা ?

নাদির ॥ না, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আপনি আমার তুরুপের তাস্, আগে মারব না। মনে রাখবেন আপনি আহত এবং বন্দী। [প্রস্থানোদ্যত]

শাদাত ॥ আমি ভুলব না, এখন আপনি মনে রাখলেই বাঁচি।

নাদির ॥ আপনার ঐ ক্ষতবন্ধনী—বিশ্বাসঘাতকতার এত বড় একটা জয়স্তম্ভ! আমি কি তা ভুলতে পারি ?

[আবদালী সহ নাদিরের প্রস্থান ।]

শাদাত ॥ ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তো ! আমে দুধে মিশে যাবে, আঁটি যাবে গড়াগড়ি !

নিজামকে লইয়া আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ ।

শাদাত ॥ কে ?

আমেদ ॥ নিজাম উল্ মুল্‌ক চিন্‌কিলিচ্ খাঁ ! বারহান্ মুল্‌ক শাদাত খাঁ ! আপনারা অপেক্ষা করুন । সন্ধির সর্ত আলোচনা করে মহামান্য নাদির শাহ দিল্লীশ্বরকে নিয়ে এখুনিই এখানেই আনন্দোৎসবে আসছেন । [প্রস্থান]

নিজাম ॥ [তীব্র দৃষ্টিতে শাদাতের দিকে তাকাইয়া] বিশ্বাসঘাতক !

শাদাত ॥ কে বিশ্বাসঘাতক ?

নিজাম ॥ তুমি । পূর্ব থেকেই নাদিরশাহের সঙ্গে তোমার ষড়যন্ত্র ছিল ।

শাদাত ॥ ভাবছেন, বাজীরাওয়ের সঙ্গে আপনার ষড়যন্ত্র ছিল ? না না, নিজাম উল্ মুল্‌ক— দুনিয়ায় সবাই আপনার মত নয় ।

নিজাম ॥ দেখলাম, তোমার সেই ভাগ্নেটাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ! ও কেচ্ছাটাও আমি শুনেছি । মতলব করেছ ওকে আজ কোরবানি দিয়ে—

শাদাত ॥ থামুন ! আমি আজ বন্দী—হাতে অসিটা নেই । তাই উত্তর দিতে পারছি না ।

নিজাম ॥ মিথ্যা চেঁচামেচি করে আর শত্রু হাসিও না । বাঘের গুহায় এসে পড়েছি । ফিরতে পারব কিনা তাও জানি না । বোকা বাদশাটাকে নিয়ে বাঘটা না জানি কি খেলাই খেলছে ।

মহম্মদ শাহ ও নাদির শাহের পিছনে
আমেদ শাহের প্রবেশ ।

নাদির ॥ আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন—খোরাকী রাহা খরচ, সেও তো বিশাল । সে তুলনায় যে কুড়ি কোটি টাকা আমি দাবী করেছি--

মহম্মদ ॥ ন্যায্য দাবী—ন্যায্য দাবী !

নাদির ॥ তবে আর কি, টাকাটা আমায় দিন ।

মহম্মদ ॥ বিশকোটি টাকা ! আমাকে বিক্রী করলেও পাবেন না আপনি ।

নাদির ॥ কেন, আপনার কোহিনুর রয়েছে—ময়ূর সিংহাসন রয়েছে ! হীরা মণি মাণিক্যে আপনার রাজকোষ পরিপূর্ণ । তাছাড়া আপনার রাজপ্রতিনিধি সামন্তরা এক একটি ধনকুবের । বিশ কোটি টাকা—আমি কি খুব বেশি চেয়েছি ? কি বলেন শাদাত খাঁ ?

শাদাত ॥ না—তা—হ্যাঁ—

মহম্মদ ॥ [শাদাতকে দেখিয়া] এই দেখো, কেমন আছ জিজ্ঞাসা করা হয়নি ? নিজে জখম্ হয়ে বন্দী হলে, আমাদেরও জখম্ করলে ! আহা হা, মাথাটায় অমন চোট পেয়েছ ? দেখি—দেখি—[একটানে শাদাতের ক্ষতবন্ধনী খুলিয়া] উঃ—কি সাংঘাতিক !

শাদাত ॥ আঃ !

মহম্মদ ॥ খুব ব্যথা—না ? মাথা ব্যাথার দাওয়াই কি জানো ? গলাটা কেটে ফেলা। ফেলি ?

নাদির ॥ সম্রাটের পরিহাসটা একটু মারাত্মক হয়ে পড়ছে। [শাদাতকে] আপনি চিকিৎসা শিবিরে গিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিন। নিয়ে যাও আবদালী।

আমেদ ॥ আসুন, প্রলেপের খুব ভাল ব্যবস্থাই আছে।

[শাদাতকে লইয়া প্রস্থান।]

মহম্মদ ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ! [নিজামকে] আপনারও এমনি অনেক ক্ষত সারাদেহে। গোটা পোশাকটাই আপনার ক্ষতবন্ধনী !

নিজাম ॥ জীবন-সংগ্রামে এসব ক্ষত অপরিহার্য।

মহম্মদ ॥ বেশ তো, চিকিৎসা-শিবিরে গিয়ে আপনিও প্রলেপ নিন। কারণ সব দগ্‌দগে ঘা তো !

নিজাম ॥ [রাগতভাবে] হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

মহম্মদশাহ ও নাদির ॥ হাঃ হাঃ-হাঃ হাঃ !

মহম্মদ ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] এই সমস্ত লোকই হচ্ছে আমার ডানহাত —বামহাত। এদের নিয়ে আমি করব লড়াই। দিল্লীর মসনদে আপনি বসে পড়ুন, আমাকে ছুটি দিন।

নাদির ॥ সে মতলব আমার নেই। বিশকোটি টাকা আমার হাতে দিয়ে, বহাল তবিয়তে আপনি রাজত্ব করুন। আমি জানি প্রজার উপর আপনার দরদ আছে। আপনার শত্রু—আপনার সামন্ত আর সেনাপতিরা। তারাই শোষণ করছে আপনাকে—আপনার প্রজাকে। তাই জানাই যে বিশকোটি টাকা আমাকে দিয়ে, এ পাপ আপনি বিদায় করুন। তারপর প্রজাদের হাত করুন। তাদের সাহায্যে উৎখাত করুন ঐ সব ঘরশত্রু শয়তানদের।

মহম্মদ ॥ কি সব বলছেন ! আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—মাথা ঘুরছে। আমাকে আর ধরে রেখেছেন কেন ? যখন জিতেছেন—যা চাইবেন দিতেই হবে। আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

নাদির ॥ ছেড়ে দেব কি বন্ধু, আমিও যে সঙ্গে যাব।

মহম্মদ ॥ সঙ্গে যাবে ?

নাদির ॥ হ্যাঁ টাকাটা আদায় না করা পর্যন্ত বসে বসে দিল্লীকা লাড্ডু খাব। এই যা, আপনাকে একটু আদর আপ্যায়নই করা হয়নি এখনও।

[নাদির হাততালি দিল, যন্ত্রসংগীত বাজিয়া উঠিল। নৃত্যরতা 'কোহিনূর' মহম্মদশাহকে অভিনন্দন জানাইল, পানপাত্র ইত্যাদি মহম্মদশাহের সামনে রাখিল। মহম্মদশাহ মদ্যপান করিতে করিতে মুগ্ধনেত্রে কোহিনূরকেও পান করিতে লাগিলেন। নাদিরশাহ অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

কোহিনূর।—

গীত

এসো সুন্দর অতিথি।
আজই এ জীবনে বুঝি
আসিল পূর্ণ চাঁদেরই তিথি॥
তব শুভ আগমনে, আনন্দ শিহরণে,
ফুলে ফুলে ভরা কুঞ্জবীথি॥
তোমারে লভিয়া হে প্রিয়তম।
আজই এ পরম ক্ষণে
সফল মানিনু জীবন মম।
কণ্ঠের সঙ্গীতে নৃত্যের ভঙ্গীতে
লহ লহ প্রিয় প্রাণের প্রীতি॥

মহম্মদ॥ [নৃত্যগীত শেষে] তুমি সুন্দর—সন্দেহ নেই। তোমার নাম?

কোহি॥ [কুর্নিশ করিয়া] কোহিনূর!

মহম্মদ॥ কোহিনূর—কোহিনূর! বন্ধু—কোথায় তুমি?

[নাদিরশাহ মহম্মদশাহের সম্মুখে আসিল।]

নাদির॥ এই যে বন্ধু।

মহম্মদ॥ এই কোহিনূরটি আমায় দাও, আমার কোহিনূরটি তুমি নাও।

নাদির॥ কোহিনূর বীরভোগ্যা! লড়াই করে কেড়ে নিতে হয়।

মহম্মদ॥ ওরে বাবা, তবে থাক। দুঃখ কি জানো বন্ধু, ভারতে সব আছে —কিন্তু সুন্দরী মেয়ে সব পারস্যে। মেহেরুন্নিসাকে দেখিনি, কিন্তু আর এক মেহেরুন্নিসা ঐ পারস্য থেকেই এসেছে আমার হারেমে। তা বিপদ কি জানো? কেচ্ছাটা আমি শুনেছি। তার মন পড়ে আছে তোমার উপর। তোমার সেই গুলবাহার।

নাদির॥ গুলবাহার!

মহম্মদ॥ হ্যাঁ গুলবাহার। কেচ্ছাটা জানাজানি হওয়ায়, ভয়ে আর তার দিকে কেউ তাকায়নি। না—না, আমিও না। তোমারই পথ চেয়ে বসে আছে মেয়েটা।

নাদির ॥ না সম্রাট, তার বিবাহ হয়ে গেছে।

মহম্মদ ॥ আরে দোস্ত, মেহেরুন্নিসারও তো বিবাহ হয়েছিল শের্ আফ্-গানের সঙ্গে! শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সে তো জানো? নূরজাঁহান!

নাদির ॥ ওসব কথা থাক। কোহিনুর, সম্রাটকে নিয়ে চলো ভোজনাগারে।

কোহি ॥ আসুন সম্রাট! ভারত সম্রাটের হাত ধরেছি এ আমার কত বড় সৌভাগ্য! [কোহিনুর মহম্মদ শাহের হাত ধরিল।]

মহম্মদ ॥ [যাইতে যাইতে] চলো, যেখানে নিয়ে যাবে—যাচ্ছি। "প্রেমে মগ্ন যিনি; তার বিপদে কি ভয়, শিরারোগে কবন্ধের কিবা চিন্তা হয়।"

[কোহিনুর সহ মহম্মদের প্রস্থান।]

নাদির ॥ কে আছ—মীর মহম্মদ আমিন। চারিদিকে কি ঘন অন্ধকার! আকাশটা মেঘে গেছে ঢেকে! এ মেঘ কবে সরবে? কবে দেখতে পাব আমি তোমায়?

মীর আমিনের প্রবেশ।

নাদির ॥ [তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমিনের দিকে চাহিল]

আমিন ॥ [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল] —স-স-সম্রাট!

নাদির ॥ [ধীরে ধীরে আমিনের দিকে আগাইয়া সহজ শান্তভাবে] ভয় কি! কি বলছিলে তুমি; বলো।

আমিন ॥ সম্রাট মহানুভব। আমার শুধু একটা কথা বলবার ছিল জাঁহাপনা!

নাদির ॥ বলো-বলো, নির্ভয়ে বলো।

আমিন ॥ গুলবাহারকে, আমি তালাক দিয়েছি।

নাদির ॥ তালাক! তালাক!

আমিন ॥ হ্যাঁ সম্রাট।

নাদির ॥ তালাক দিয়েছ! ওখানে—ঐ অন্ধকারে হঠাৎ এত আলো কেন? প্রাণ ভয়ে তুমি কি তাকে তালাক দিয়েছ?

আমিন ॥ না সম্রাট, সে ভয়ে আমি তালাক দিইনি। কারণ, পারস্য রাজদরবারে আপনি আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, আপনি জাহাঙ্গীর নন—আপনি নাদির শাহ্!

নাদির ॥ তবে? সে এখন কোথায়?

আমিন ॥ আপনার দুয়ারে।

নাদির ॥ [হতভম্ব হইয়া] আমার দুয়ারে!!! যার জন্য—যার খোঁজে—

আমিন ॥ [চিৎকার করিয়া গুলবাহারের উদ্দেশে] গুলবাহার!

গুলবাহার ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া
দরজার নিকট দাঁড়াইল।

নাদির ॥ [ক্ষণকাল অপলক নেত্রে গুলবাহারের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে গুলবাহারের নিকট যাইয়া মীর মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল] তুমি একে সঙ্গে এনেছ কেন ?

আমিন ॥ তালাকটা সত্য কি মিথ্যা, আপনি ওর কাছেই যাচাই করে নেবেন সম্রাট।

নাদির ॥ হুঁ ! আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

আমিন ॥ বন্দেগী জাঁহাপনা ! বন্দেগী গুলবাহার ! [আমিনের প্রস্থান]

নাদির ॥ কি আশ্চর্য ! আকাশে তোমাকে খুঁজেছি—বাতাসে তোমাকে খুঁজেছি—খুঁজতে খুঁজতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এখানে এসে পড়েছি। সেই তুমি আজ নিজে—আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ ! এতদিন পর উদয় হয়েছ এক মেঘমুক্ত আকাশে—আমার আসমানের চাঁদ ?

গুল ॥ হ্যাঁ এসেছি। কিন্তু এ যেন এক কাঁচের দেওয়াল ! একপারে তুমি—একপারে আমি।

নাদির ॥ দেওয়াল ?

গুল ॥ হ্যাঁ দেওয়াল ! স্পষ্ট দেখছি, তোমার আমার মাঝে সহস্র সহস্র শবদেহ—অগণিত ধ্বংসস্তূপ—আকাশভেদী অনির্বাণ আর্তনাদ—দেশব্যাপী দস্যুতার বীভৎস সমারোহ ! তোমাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না নাদির। তোমার জীবন রক্ষা করতে যে ত্যাগ আমি করেছিলাম, তার প্রতিদান কি তুমি এই দিলে নাদির ?

নাদির ॥ তুমি তবে আমাকে ঘৃণা কর ?

গুল ॥ হ্যাঁ করি। ভালবাসি বলেই এ ঘৃণা আমি করছি। ভাল যদি না বাসতাম, তবে তুমি কি করছো—না করছো, কি এসে যেত আমার ?

নাদির ॥ হুঁ ! আমার প্রথম প্রেম তুমি। অথচ, তোমাকে আমি পেলাম না ! কেন পেলাম না সে কি আমি ভাবব না গুলবাহার ! ধনিকের ষড়যন্ত্র —নির্ধন এই প্রেমিকের অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন করলো, সে কি সয়ে যাব গুলবাহার ! শত শত নাদির—শত শত গুলবাহার, যে ধনবৈষম্যের আগুনে অহরহ দগ্ধ হচ্ছে, তাদের কি পরিত্রাণ নেই গুলবাহার ? সে পরিত্রাতা আমি। আমার নিষ্ফল প্রেমই আজ আমার শক্তি ! আমি কোনো দোষ করিনি—কোন অন্যায় করিনি—কোন পাপ করিনি গুলবাহার !

গুল ॥ তোমার ঐ প্রচণ্ড রূপ আমি সইতে পারছি না নাদির। তোমার দিকে চাইতেও পারছি না। আমি—আমি—চলে যাচ্ছি—চলে যাচ্ছি। কূলে এসে আমার তরী ডুবে গেল, আমি চলেই যাচ্ছি।

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ।]

নাদির ॥ যাও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু এও জেনে যাও গুলবাহার, আমার এই প্রচণ্ড শক্তি-সাধনা, যেদিন প্রচণ্ডতম হয়ে আকাশ স্পর্শ করবে—সেদিন আর তুমি আমায় ঘৃণা করতে পারবে না। [নাদির প্রস্থানোদ্যত ও হঠাৎ কি যেন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিলেন] কে—ওখানে ! কে—কে—ও ?

ইব্রাহিমের প্রবেশ ।

নাদির ॥ [ভয়ে ভয়ে পিছাইতে পিছাইতে] কে—কে ?

ইব্রা ॥ [সম্মুখে কিছু দূরত্বে দাঁড়াইয়া] আমি—আমি, ইব্রাহিম।

নাদির ॥ সেকি ! আমি কি খোয়াব দেখছি ?

ইব্রা ॥ না।

নাদির ॥ তবে কি তুমি কবর থেকে উঠে এসেছ ?

ইব্রা ॥ বলতে পার। কিন্তু কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে।

নাদির ॥ অবিশ্বাস্য।

ইব্রা ॥ না, অবিশ্বাস্য নয় নাদির। তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলাম আমি। গুলবাহারকে তোমার হাতে তুলে না দিয়ে, চরম অবিচার করেছিলাম আমি। সেই থেকে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই নাদির।

নাদির ॥ শান্তি আমারও নেই—আমারও নেই।

ইব্রা ॥ কিন্তু আমার সান্ত্বনা আছে। ঐ অন্যায়—ঐ অবিচার ! আমি তোমার উপর অবিচার করেছিলাম বলেই আজ তুমি নাদির—দিগ্বিজয়ী নাদির ! আমার বংশ আজ কত উজ্জ্বল। নাদির, বৎস, আমাকে ক্ষমা কর। হ্যাঁ নাদির, তুমি ক্ষমা না করলে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই।

নাদির ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার উপর আমার আর কোন ক্ষোভ নেই।

ইব্রা ॥ আর একটি অনুরোধ—আর একটি প্রার্থনা নাদির !

নাদির ॥ আদেশ করুন পিতৃব্য।

ইব্রা ॥ অভাগিনী গুলবাহারকে তুমি ক্ষমা কর। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। নিরাশ্রয়া আমার ঐ কন্যাকে তুমি বিবাহ কর—আশ্রয় দাও।

নাদির ॥ এ কামনা আমার ছিল পিতৃব্য, কিন্তু এ কামনা তার নেই। সে এসেছিল—কিন্তু ঘৃণাভরে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল।

ইব্রা ॥ আমি দেখেছি।

নাদির ॥ তা যদি দেখে থাকেন, আপনার অনুরোধ ফিরিয়ে নিন। শুধু

আশীর্বাদ করুন গুলবাহারের যেন মঙ্গল হয়। আপনাকে আর আমি সইতে পারছি না পিতৃব্য, আপনি এখনিই কবরস্থ হন।

ইরা॥ [ছুটিয়া নাদিরের কাছে আসিয়া] নাদির, আমি মৃত নই—জীবিত। তোমারই ভয়ে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটনা করে পালিয়ে এসেছিলাম দিল্লীর রাজপ্রাসাদে। গুলবাহারের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে—তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আর মেয়েটার একটা গতি হয় কিনা দেখতে। সবই হলো—হলো না শুধু অভাগিনী মেয়েটার কোনো গতি। [প্রস্থান]

নাদির॥ উপায় নেই। শত গুলবাহারের অশ্রু—আদর্শভ্রষ্ট করতে পারবে না আমাকে। যাদের প্রচুর আছে তারা যখন স্বেচ্ছায় দেবেনা তখন আমার দরিদ্র দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমি তা ছিনিয়ে নেব। আমার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ লুণ্ঠন চলবে—চলবে— [প্রস্থান]

———

দশম দৃশ্য

দিল্লীর চাঁদনীচকের একাংশ

ছদ্মবেশে নিজামের প্রবেশ।

নিজাম॥ এই উপযুক্ত অবসর, দিই খবরটা ছড়িয়ে।

ছদ্মবেশে আমিনের প্রবেশ।

নিজাম॥ কে তুমি! ও—তুমি মীর আমিন!

আমিন॥ হ্যাঁ। দেখছেন—দেখছেন জনাব, ইরানীদের অত্যাচারটা?

নিজাম॥ এরজন্য দায়ী তোমারই মামা সাদাত খাঁ। কি বিশ্বাসঘাতকাটাই না করলে। নাদিরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আহত হবার ভান করে—নিজে দিলে ধরা, অত বড় সৈন্যবাহিনীকে বানচাল করে দিলে। তারই ফলে আমাদের সন্ধির শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দিতে হলো, বিনাযুদ্ধে পরাজয় হলো আমাদের।

আমিন॥ শুধু পরাজয়? আবার নাদিরশাহকে দিল্লীর দেওয়ানীখাসে এনে তোয়াজ করা হচ্ছে। মসজিদে মসজিদে তার নামে 'কুত্‌বা' পড়া হচ্ছে। আলমগীর বাদশার আমলের লোক আপনি। আপনি এসব কি করে সইছেন নিজামবাহাদুর?

নিজাম॥ সইছি না। যে লড়াইটা তোমার মামার জন্য হয়নি, সে লড়াইটা এখন যাতে হয় তারই চেষ্টায় আছি।

আমীন ॥ আর লড়াই ! নাদিরশাহকে লোকে যা ভয় করছে, তাতে লড়াই আর কে করবে ?

নিজাম ॥ সেটা সত্য বলেই, একটা মিথ্যা রটনা করতে হয়েছে মীর আমীন । রটনা করা হয়েছে কাল রাত্রে নাদিরশাহের মৃত্যু হয়েছে । কথাটা রাষ্ট্র হতেই দিল্লীবাসিরা এখন সাহস পাচ্ছে । মোগল সৈন্যরাও এক জোট হয়ে লড়াই করতে ক্ষেপে উঠেছে । চাঁদনীচকে এখনও খবরটা পেঁছয়নি দেখছি ।

আমিন ॥ না পেঁছে থাকে আসুন না খবরটা ছড়িয়ে দিই । [চিৎকার করিয়া] শোনো ভাইসব, বড়ই সুখের বিষয়—

নিজাম ॥ আঃ, বলো দুঃখের বিষয় ।

আমিন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড়ই দুঃখের বিষয়, দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের এন্তেকাল হয়েছে - মানে মারা গেছে ।

[এই কথা বলিতে বলিতে উভয়েরই প্রস্থান ।]

সঙ্গে সঙ্গে একজন পায়রা বিক্রেতাকে মারিতে মারিতে
একজন পারসীক সৈন্যের প্রবেশ ।

দিল্লীবাসী ॥ আমার চিড়িয়ার দাম দিন । চিড়িয়ার পায়ে চিঠি বেঁধে ইরানে পাঠিয়ে দিলেন, আমার চিড়িয়ার দাম দিন ।

পাঃ-সৈন্য ॥ দাম আবার কি ? ওটা সেলামী ।

দিল্লীবাসী ॥ সেলামী ! মানে ?

পাঃ-সৈন্য ॥ তাছাড়া আবার কি ? তোদের রাজা এখন কারা ? আমরা । ওই চিড়িয়ার পায়ে চিঠি বেঁধে আমি আমার বিবির কাছে ইরানে পাঠিয়ে দিয়েছি । চিঠি পেঁছিয়ে উত্তর এনে দিলে তবে না দাম ।

দিল্লীবাসী ॥ আমার চিড়িয়ার দাম দিন—আমার চিড়িয়ার দাম দিন ।

একজন মোঘল সৈনিকের প্রবেশ ।

মোঃ-সৈন্য ॥ এই, চিৎকার করছ কেন ? কি হয়েছে ?

দিল্লীবাসী ॥ দেখুন না, ইনি আমার চিড়িয়া নিয়েছেন, অথচ দাম দিচ্ছেন না ।

মোঃ-সৈন্য ॥ এই, এর চিড়িয়া নিয়েছিস্, দাম দে !

পাঃ-সৈন্য ॥ দাম—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

মোঃ-সৈন্য ॥ আরে শালা, হাসি তোর বার করছি । জানিস্, তোদের নাদিরশাহ মারা গেছে ।

পাঃ-সৈন্য ॥ কোন্ শালা এ কথা বলে ?

মোঃ-সৈন্য ॥ আমি শালা বলি, মারা গেছে কিনা দেখে আয় । এতক্ষণ বোধ হয় কবর দেওয়া হয়ে গেল ।

পাঃ-সৈন্য ॥ তবে রে শালা।

দিল্লীবাসী ॥ ওরে বাবা। [পলায়ন]

মোঃ-সৈন্য ॥ তবে রে হারামজাদা।

[উভয়ের তুমুল যুদ্ধ ও প্রস্থান।]

[নেপথ্যে—কাড়া-নাকড়া বাজিল]

জাহান্দার খাঁর প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ ভারত বিজেতা দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাট নাদিরশাহের মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা রটনা করে দিল্লীবাসীরা পারসীক সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মহামান্য নাদিরশাহ সৈন্যদের আদেশ দিয়েছেন —নির্বিচারে দিল্লীবাসীদের হত্যা কর।

[নেপথ্যে—'হত্যা কর—হত্যা কর—']

জাহান্দার ॥ দিল্লীর নাগরিকদের সমস্ত সৌধাবাস ধ্বংস কর।

[নেপথ্যে—কামানের আওয়াজ। 'আল্লা আল্লা হো এবং বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—' চিৎকার।]

জাহান্দার ॥ আগুন জ্বালো—পুড়িয়ে মারো - [দ্রুত প্রস্থান।]

[নেপথ্যে—'আগুন—আগুন—' কামানের আওয়াজ— আর্তনাদ ও 'আল্লা—ল্লা হো—']

লাল পোশাক পরিহিত চারজন পারসীক সৈনিক ও কোহিনূর তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

অগ্নিদাহের উৎসবে আজ মরণ দামামা বাজে।
তারই তালে তালে লেলিহান শিখা
আগুনের রঙে রাঙা আকাশ, আগুন আগুন
ঝঞ্ঝার বেগে বহে বাতাস, বাঁচাও বাঁচাও
ধরণী সেজেছে ছিন্নমস্তা মহাপ্রলয়ের সাজে ॥
দিকে দিকে ওঠে আর্তনাদ,
খোদাতালা আজ গণে প্রমাদ,
রক্তের ঢেউ সাগরের মত বয়ে যায় তার মাঝে ॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।]

[এই গানের মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজ ও 'আল্লা—আল্লা হো—বাঁচাও—বাঁচাও—আগুন—আগুন—ধ্বংস কর—' প্রভৃতি চিৎকার।]

———

শেষ দৃশ্য

দিল্লী—দেওয়ানি খাস।

দূর হইতে কামানের গর্জন ও আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল। নাদিরশাহ ও আমেদশাহ আবদালীর প্রবেশ।

নাদির ॥ ধ্বংস কর—ধ্বংস কর। দিল্লী নগরী দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলো। ধূলিসাৎ কর পাপের এই পর্বত। দুনিয়াকে বুঝিয়ে দাও নাদিরশাহ জীবিত কি মৃত।

আমেদ ॥ সম্রাটের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে। কিন্তু একটি আদেশ এখনও আমরা পাইনি জাঁহাপনা।

নাদির ॥ কি ?

আমেদ ॥ দিল্লীর এই সব অমূল্য রাজপ্রাসাদও কি ধ্বংস করা হবে সম্রাট ?

নাদির ॥ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা শেষ হয়েছে তোমাদের ?

আমেদ ॥ শেষ হয়েছে বলা চলে সম্রাট।

নাদির ॥ কি লুণ্ঠন করেছ এখানে ? কোহিনুর ?

আমেদ ॥ হ্যাঁ সম্রাট !

নাদির ॥ তোমার কোহিনুরের হাতে—ঐ কোহিনুর তুলে দাও আবদালী।

আমেদ ॥ সে দিতে হয় দেবেন আপনি সম্রাট। আমার কাজ ভাণ্ডারে জমা করা—আমি তা করেছি।

নাদির ॥ ময়ূরসিংহাসন ! দুই কোটি টাকা মূল্যের ময়ূরসিংহাসন !

আমেদ ॥ লুণ্ঠিত হয়েছে সম্রাট। তাছাড়া হীরা জহরৎ প্রভৃতি ধনরত্ন—আর স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন—মূল্যবান্ আসবাব পত্র, কিছুই বাদ দিইনি সম্রাট।

নাদির ॥ বেগমদের সব চোখ ঝলসানো গহনা ?

আমেদ ॥ বেগমদের গায়ে এখনও হাত দেওনা হয়নি সম্রাট।

নাদির ॥ দাও—দাও। এখানকার সব ধন—সব ঐশ্বর্য, দরিদ্রের শোষিত রক্তে রক্তাক্ত। এই রক্তাক্ত ঐশ্বর্য দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিলে, তবেই হবে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

আমেদ ॥ কিন্তু বেগমরা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করছে সম্রাট।

নাদির ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ, তাই নাকি? শুধু বেগমরা না তার সহচরীরাও ?

আমেদ ॥ সম্রাট বোধ হয়, সেই পারস্যসুন্দরী গুলবাহারের কথা—

নাদির ॥ না—না—না ; আমি জানি সে আসবে না। আসবার যদি হতো তাহলে যেদিন প্রথম আমি বিজয়গৌরবে এই রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করে-ছিলাম—সেই মুহূর্তেই সে আসতো।

আমেদ ॥ সম্রাট !

নাদির ॥ লুণ্ঠন কর—সব কিছু লুণ্ঠন কর। লুণ্ঠন শেষে এই পাপপুরী পরিত্যাগ করব। কিন্তু—

আমেদ ॥ জাঁহাপনা !

নাদির ॥ কিন্তু যুদ্ধের খেসারৎ বাবদ নগদ যে বিশকোটি টাকা আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন মহম্মদশাহ—যার জামিন ছিলেন শাদাত খাঁ—এখনও আমি তা সব পাইনি।

আমেদ ॥ জনাব,—

নাদির ॥ কোথায় লুকিয়ে আছেন তাঁরা? এখুনিই ডেকে পাঠাও তাঁদের।

আমেদ ॥ যে আজ্ঞে সম্রাট। [প্রস্থানোদ্যত]

নাদির ॥ শোনো আবদালী! আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই—এখানকার যা সত্য সত্য গৌরব সেই একদল লেখক—একদল রাজমিস্ত্রী—আর একদল সূত্রধর! যারা এদের বিলাসবৈভব রচনা করে দিয়েছে, কিন্তু ন্যায্য দক্ষিণা পায়নি কোনদিন।

আমেদ ॥ আদেশ প্রতিপালিত হবে সম্রাট। [প্রস্থান]

নাদির ॥ আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে।

[নেপথ্যে—'আগুন—আগুন']

নাদির ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ! সমগ্র দিল্লী নগরে আগুন জলছে—

[নেপথ্যে—'বাঁচাও—বাঁচাও']

নাদির ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ! আগুন জ্বলছে আমার বুকেও। কে—

জাহান্দারের প্রবেশ।

জাহান্দার ॥ আমি সম্রাট।

নাদির ॥ জাহান্দার, এ পর্যন্ত নিহত নরনারীর সংখ্যা কত ?

জাহান্দার ॥ অনুমান করি ত্রিশহাজার।

নাদির ॥ আমি তৃপ্ত নই জাহান্দার—আমি তৃপ্ত নই। প্রজার রক্তশোষক অন্ততঃ লক্ষ লোক এই দিল্লীর অধিবাসী। তাদের রক্তে রঞ্জিত হোক তোমাদের

আসি। আর শোন জাহান্দার, এই ত্রিশহাজার নরমুণ্ড একটির পর একটি সাজিয়ে তৈরি কর আর এক কুতুবমিনার। এই নরমুণ্ডের মিনারই হবে আমার দিল্লী ধ্বংসের বিজয়স্তম্ভ।

জাহান্দার ॥ সম্রাট!

নাদির ॥ যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

জাহান্দার ॥ জাঁহাপনা,—

নাদির ॥ তারপর লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিয়ে চলে এসো আমার কাছে। আমরা ফিরে যাব পারস্যে। আর যাবার আগে কামান দেগে উড়িয়ে দিতে হবে প্রবঞ্চিত মিস্ত্রি মজদুরের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া এইসব হর্ম্যরাজী—এইসব রাজপ্রাসাদ।

জাহান্দার ॥ যথা আজ্ঞা সম্রাট। [প্রস্থান]

নাদির ॥ কোতল কর, কোতল কর, ধ্বংস কর।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কামান গর্জন ও 'আল্লা আল্লা হো' চিৎকার ও 'বাঁচাও—বাঁচাও' চিৎকার।]

নাদির ॥ [সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায়] আমি দস্যু। আমি দেখতে চাই আমার মুখের উপর একথা কে বলে? আমি দেখতে চাই কে কত ঘৃণা আমাকে করতে পারে?

আমেদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ ॥ সম্রাট!

নাদির ॥ কি আবদালী? পারস্যে গিয়ে ভারত অভিযানের চিহ্নরূপে দরবারে রাখব শুধু ময়ূরাসিংহাসন আর কোহিনূর। বাকি ধনরত্ন বিলিয়ে দেব পারস্যের দরিদ্র দেশবাসীর মধ্যে।

আমেদ ॥ বেগমদের অলঙ্কার লুণ্ঠন করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে ফিরে এলাম।

নাদির ॥ স্তম্ভিত হয়ে ফিরে এলে—আমার সেনানি হয়ে! তুমি! কেন?

আমেদ ॥ সম্রাট! প্রতিটি বেগমের হাতে—প্রতিটি সহচরীর হাতে এক একটি বিষপাত্র। তাদের অঙ্গস্পর্শ করতে গেলেই ঐ বিষপানে তারা মৃত্যুবরণ করবে।

নাদির ॥ অপদার্থ—সব অপদার্থ—

[নেপথ্যে মহম্মদশাহের অট্টহাসি]

আমেদ ॥ [নেপথ্যের দিকে] ঐ দেখুন জাঁহাপপনা, মহম্মদশাহ আর সম্রাজ্ঞী উধমবাই এই দিকেই আসছেন। আমি এখন আসি জাঁহাপনা।

[প্রস্থান]

ম-৩৮৫

মহম্মদশাহ ও উধমবাইয়ের প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ [উন্মত্তের ন্যায় অট্টহাসি] হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাদির ॥ আমি দস্যু—আমি দস্যু—আমি দস্যু।

উধম ॥ হ্যাঁ দস্যু। আমিও বলছি তুমি নৃশংস—নরঘাতক দস্যু! একদিন তুমি পথের ভিখারী ছিলে, আর আজ তুমি শক্তির দম্ভে বেগমদের অলঙ্কার পর্যন্ত লুণ্ঠন করতে চাইছ। কত অলঙ্কার চাও তুমি? সমস্ত অলঙ্কার আমি আর আমার সহচরীরা খুলে স্তূপীকৃত করে রেখে এসেছি। যাও নিয়ে যাও, সব নিয়ে তুমি পারস্যে ফিরে যাও সম্রাট। শুধু ভিক্ষা দাও আমাদের আপনজনের জীবন।

নাদির। ভিক্ষা! মৃত নাদিরের কাছে ভিক্ষা!

উধম ॥ না, জীবিত নাদিরশাহের কাছে কাতর মিনতি। আর সেইটাই হবে তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়। এরজন্য সমগ্র দিল্লীবাসী তোমাকে করবে আশীর্বাদ। এ হত্যা—এ নৃশংসতা, তুমি বন্ধ কর সম্রাট।

নাদির ॥ যদি বন্ধ না করি বেগমসাহেবা?

উধম ॥ তাহলে সমস্ত দিল্লীবাসী তোমাকে দেবে তাদের মর্মমথিত অভিশাপ।

নাদির ॥ অভিশাপ,—

উধম ॥ হ্যাঁ অভিশাপ। শোনো দিগ্বিজয়ী নাদির! যদি আমি এক মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে ডেকে থাকি, তাহলে সমস্ত দিল্লীবাসীর হয়ে তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার ঐ ঘাতকের জীবন, যেন ঘাতকের হাতেই শেষ হয়ে যায়—শেষ হয়ে যায়। [প্রস্থান]

নাদির ॥ [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] আমি জানি—আমি জানি বেগমসাহেবা, এ অভিশাপ ব্যর্থ হবে না! সহস্র সহস্র নিহত অশরীরী আত্মা আমাকে অহরহ অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু অভিশাপে নাদির ভীত নয়। দরিদ্রের শোষিত রক্তে ভারত গড়ে উঠেছে যে অলঙ্কার-ঐশ্বর্য, পারস্যের দরিদ্র ভাইদের মধ্যে আমি তা বিলিয়ে দিতে চাই।

মহম্মদ ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নাদির। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও সম্রাট। স্মরণ রেখো তোমার প্রতিশ্রুতি বিশকোটি টাকার মধ্যে—দুই কোটি টাকা এখনও আমি পাইনি। আজ আমি তোমার কাছে দাবী করছি অনাদায়ী সেই দুই কোটি টাকা।

মহম্মদ ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমারই আগ্রাসি ক্ষুধায় আমার সব গেছে। দিল্লীর সম্রাট আমি—ভারতের বাদশাহ আমি. আমিও আজ নিরাভরণ। যদি আমি তোমারই মত হৃদয়হীন নির্মমতায় জিজিয়া কর স্থাপন করতাম; তবে হয়তো এই দুই কোটি টাকা তুমি পেতে। কিন্তু, আমি তা করিনি।

নাদির ॥ একমাত্র সেইজন্যই আজ তোমার পরিত্রাণ মহম্মদশাহ ! কিন্তু অনাদায়ী এই দুই কোটি টাকা আদায় করতে আমি জানি। কে আছো ? বন্দী বারহান মুলেক শাদাত খাঁ।

মহম্মদ ॥ শাদাত খাঁ ! সেই বিশ্বাসঘাতক ! না-না, আমি তার মুখদর্শন করতে পারব না। সে হবে আমার মৃত্যু—সে হবে আমার মৃত্যু। [প্রস্থান]

নাদির ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ ! শাদাত খাঁ—শাদাত খাঁ—

নজরবন্দী শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত ॥ বন্দেগী পারস্য সম্রাট।

নাদির ॥ কুশলে আছেন জনাব ? দিল্লী নগরীতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে আগুন জ্বলছে, আকাশে বাতাসে যে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে জনাবের বিশ্রামের কোন তকলিফ হচ্ছে না তো ?

শাদাত ॥ সম্রাট, ব্যঙ্গ করছেন ?

নাদির ॥ ব্যঙ্গ—! তাই নাকি ? তবে থাক ব্যঙ্গ, কাজের কথা হোক। আমার প্রাপ্য বিশ কোটি টাকার মধ্যে, দুই কোটি টাকা এখনও পাইনি। এই বিশ কোটি টাকা আপনারই নির্দেশে আমার প্রাপ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। আর এই টাকার জামিন হয়েছিলেন আপনি—স্মরণ আছে ?

শাদাত ॥ আছে সম্রাট। আর এ কথাও আপনিও বিস্মৃত হন নি, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ সম্রাট।

নাদির ॥ কৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞ—

শাদাত ॥ হ্যাঁ সম্রাট—কৃতজ্ঞ। দিল্লীর মসনদে যে মুহূর্তে আপনি আমাকে ভারতের বাদশাহ রূপে অভিষিক্ত করবেন, সেই মুহূর্তেই আমি আপনাকে অনাদায়ী—এ দুই কোটি টাকা সেলামী দেব সম্রাট।

নাদির ॥ বটে !

শাদাত। হ্যাঁ সম্রাট। বিনাযুদ্ধে আপনি যে দিল্লী-জয় করেছেন, তার মূলে আমার সেই অপরিসীম সাহায্য আপনি এইভাবে পুরস্কৃত করবেন, এ আশা কি দুরাশা সম্রাট ?

নাদির ॥ শোভানাল্লা ! একটা বিশ্বাসঘাতককে আমি-এ দেশের ভাগ্যবিধাতা করে যাব ?

শাদাত ॥ সম্রাট !

নাদির ॥ তুমি আমারই স্বদেশবাসী পারসীক। যে ভারতের নুন খেয়েছ, সেই ভারতেরই সর্বনাশ সাধন করেছ। পারস্যের এত বড় একটা কলঙ্ক আমি ভারত-সিংহাসনে অক্ষয় করে রেখে যাব ? বিশ্বাসঘাতকের এত বড় স্পর্ধা ! এ আশা করতে লজ্জা করে না তোমার ?

শাদাত ॥ বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিতে আপনারও লজ্জা হয়নি ?

নাদির ॥ বটে।

শাদাত ॥ আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও কার্পণ্য করেননি আপনি। আজ সেটা ভুলে যাবেন না সম্রাট !

নাদির ॥ না-না, ভুলিনি-ভুলিনি। সে পুরস্কার আমি আপনাকে দিয়েছি।

শাদাত ॥ দিয়েছেন ?

নাদির ॥ হ্যাঁ দিয়েছি। শত্রুপক্ষীয় হয়েও আপনি আমার সম্মুখে আজও জীবিত আছেন।

শাদাত ॥ এ্যাঁ !

নাদির ॥ হ্যাঁ, এর বেশি পুরস্কার কোনো বিশ্বাসঘাতক আমার কাছে আশা করতে পারে না।

শাদাত ॥ [চিৎকার করিয়া] সম্রাট—

নাদির ॥ আমি এখন আপনার কাছে চাই, আমার প্রাপ্য দুই কোটি টাকা। দিন—

শাদাত ॥ বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার আমি পেয়েছি।

নাদির ॥ কিন্তু, আমার টাকা !

শাদাত ॥ আমার ঘর বাড়ি অগ্নিদাহে ভস্মীভূত। টাকা আমি কোথায় পাব ?

নাদির ॥ আমি তা জানি না। আপনি এই টাকার জামিন ছিলেন। [কঠিন কণ্ঠে] টাকা চাই—টাকা।

শাদাত ॥ টাকা আমার নেই, আমি আজ পথের ভিক্ষুক।

নাদির ॥ ও কথায় আমি ভুলছি না। কে আছে ?

রক্ষীর প্রবেশ।

নাদির ॥ আসামীকে কষাঘাত কর। যতক্ষণ দুই কোটি টাকা আদায় না হয় কষাঘাত বন্ধ হবে না—কষাঘাত চলবে।

[নাদিরের আদেশে রক্ষী শাদাতকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।]

শাদাত ॥ [আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং উহার মধ্যে কথা বলিতে লাগিল।] আঃ ! আমি শাদাত খাঁ, কষাঘাত খেতে জন্মাইনি। সে বিষ খায়, কিন্তু কষাঘাত নয়। [সহসা হাতের হীরক অঙ্গুরীয় চুষিতে লাগিল। এবং তীব্র বিষক্রিয়ায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।]

নাদির ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ। বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি! ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও রক্ষী!

[রক্ষী শাদাতকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ও বেত্রাঘাত
করিতে করিতে লইয়া গেল।]

নাদির ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মহম্মদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ ॥ যে শাস্তি আমি ওকে দিতে পারতাম না, সে শাস্তি তুমি ওকে দিলে। ধন্যবাদ-ধন্যবাদ! কিন্তু আর কত শাস্তি তুমি আমাকে দেবে? তোমার ক্ষুধা কি এখনও নিবৃত্ত হয়নি নাদির? নরমুণ্ডের এই বীভৎস পাহাড় আমি আর দেখতে পারছি না—সইতে পারছি না।

নাদির ॥ সইতে হবে মহম্মদশাহ। আর আমার এই দিল্লী ধ্বংসের জয়োৎসবের জন্য সমস্ত আয়োজন করতে হবে তোমাকে। দিল্লীর সৈন্যসামন্তদের আমি দেখিয়ে দিতে চাই—নাদিরশাহ জীবিত না মৃত।

মহম্মদ ॥ না-না, আমি বলছি তুমি মৃত নও—তুমি জীবিত। বলো তুমি কি চাও? কি পেলে তুমি তৃপ্ত হবে নাদির?

নাদির ॥ আমি জানি না, আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

মহম্মদ ॥ তুমি কি আকাশের চাঁদ চাও?

নাদির ॥ হ্যাঁ চাই, আকাশের চাঁদই চাই।

নেপথ্যে গুলবাহার ॥ নাদির—এই ধ্বংস বন্ধ কর—এই হত্যা বন্ধ কর নাদির—

নাদির ॥ [গুলবাহারের আওয়াজ শুনিয়া চমকিত হইয়া] কে—কে—কে!

ছুটিয়া গুলবাহার আসিয়া নাদিরের পদতলে পড়িল।

গুল ॥ আমি! এই নির্বিচার ধ্বংস বন্ধ কর নাদির!

নাদির ॥ তুমি—! ঘৃণায় তুমি আমার মুখ দেখতে আসো নি! এখন এলে যে তবে?

গুল ॥ ভালবাসি বলেই আসতে হল।

নাদির ॥ ভা—লো—বা—সি। কিন্তু আমার এই দস্যুতা?

গুল ॥ দিল্লীর শোষক শাসক শ্রেণীকে দণ্ড দিতে তোমার যে অভিযান তা আমি ঘৃণা করতে পারি না নাদির। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু তোমার এত মহৎ হৃদয়—তবু কেন তুমি দীন দরিদ্র নির্বিশেষে নিরপরাধ দিল্লীবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করছ নাদির? তোমার এই ধ্বংসলীলায় শোষিত গরীব জনসাধারণও যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

নাদির ॥ গুল—এ তুমি কি বলছ ?

গুল ॥ আমি তোমাকে বুঝেছি বলেই বলছি। আর তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি ঐ শোষিত লাঞ্ছিত মানুষদের রক্ষার জন্যে। ওরা তো তোমার শত্রু নয়। তুমিই ওদের পরিত্রাতা।

নাদির। [গুলবাহারকে পদতল হইতে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইয়া] মহম্মদশাহ, আকাশের চাঁদ আমি পেয়েছি। কে কোথায় আছ ঘোষণা কর, বন্ধ হোক ধ্বংস।

[নেপথ্যে চিৎকার : "বন্ধ হোক ধ্বংস, বন্ধ হোক ধ্বংস—"]

নাদির ॥ এই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠুক এক নতুন সমাজ। শোষণ হীন, শ্রেণী বিহীন এক নতুন সমাজ—যার জন্য আজ আমার এই দিগ্বিজয়।

য ব নি কা

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

মহম্মদ শাহ—ভোলা পাল ॥ জাওয়েদ খাঁ—শিবদাস মুখার্জী ॥

শাদাত খাঁ—রবীন মজুমদার ॥ নিজাম—নিতাই গাঙ্গুলী ॥

মীর মহম্মদ আমীন—অনুপ ঘোষ ॥ শাহ তমাস—গোরাশশী মণ্ডল ॥

ইব্রাহিম খাঁ—মাখন সমাদ্দার ॥ জাহান্দার খাঁ—দেবাশিস গাঙ্গুলী ॥

নাদির কুলী খাঁ—তপনকুমার ব্যানার্জী ॥ আদমশাহ আবদালী—রাখাল সিংহ ॥

বাজীরাও—মোহন চ্যাটার্জী ॥ ফকির—ভক্ত মল্লিক ॥

দরবেশ—কিশোরী চক্রবর্তী ॥ প্রতিনিধি—দেবদাস মুখার্জী ॥

পাহাড়ী বালক—মাঃ উত্তম ॥ রক্ষী—দিবাকর সিংহ ॥

বিক্রেতা—উত্থান মণ্ডল ॥ দিল্লী সৈন্য—বাসুদেব শীট ॥

পারসীক সৈন্য—পশুপতি সিংহ ॥ উধমবাই—অসীমা কুণ্ডু ॥

গুলবাহার—জয়শ্রী মুখার্জী ॥ কোহিনূর—মিতা চাটার্জী ॥

মস্তানী—মীণাক্ষী দে ॥

॥ মতামত ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ আনন্দলোক ॥ ১৮-৯-৬৯

প্রেমের জন্যে। হ্যাঁ, শুধু ভালবাসার জন্যেই সে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। পারস্যের এক সাধারণ পরিবারের যুবক নাদির কুলি খাঁ কেবল ভালবাসার জন্যে হয়ে উঠেছিল দিগ্বিজয়ী নাদির। তার তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আফগান থেকে ভারত পর্যন্ত বইয়ে দিয়েছিল রক্তস্রোত। ধ্বংস, লুঠতরাজ আর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর নাদির কি পেয়েছিল দয়িতার সন্ধান?

পেয়েছিল। সত্যাম্বর অপেরার নতুন পালা উপহার 'দিগ্বিজয়'-এর সেটা শেষ দৃশ্য। সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত এবং তীব্র আবেগে ভরপুর—যেন এমনটি আর হয় না। পালা খেলার দিন কেবল দর্শক নয়, আমন্ত্রিত তাবৎ সুধীজন উচ্চ প্রশংসার ধ্বনি তুলে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন নাট্যকার মন্মথ রায়কে সার্থক পালাকাররূপে। কেন? বোধহয় সংশয় থেকে থাকবে, পালা রচনায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন কি হবেন না! আমরা নিঃসংশয় ছিলাম। কারণ, জানি, তাঁর বহু নাটকেই এ সাফল্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে!

যুগান্তর

॥ আসর সংবাদ ॥ ২৭-১০-৬৯

রাশিয়ায় নেহেরু পুরস্কার ও দিল্লীর সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রথম রচিত ঐতিহাসিক পালা 'দিগ্বিজয়, যাত্রা জগতে সাড়া তুলেছে। নৃত্যগীতে এবং বিভিন্নরস পরিবেশনে নাটকখানি উদ্দীপনাময়। নাটকের মূলকাহিনীতে রয়েছে দরিদ্র-দরদী বীরপ্রেমিক খেয়ালী পারস্য সম্রাট নাদিরশাহের আফগানিস্থান ও লাহোর বিজয় এবং হিন্দু মুসলমানে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, উদার, বিলাসী সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজধানী দিল্লীর ঐতিহাসিক লুণ্ঠন হত্যা। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, প্রভুভক্ত যোদ্ধা জাওয়েদ খাঁ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শক্তিমান মারাঠারাজ বাজিরাও, নর্তকী কোহিনূর, পারস্য যুবতী গুলবাহার (নাদিব প্রেমিক) ও বেগম উধমবাই প্রসঙ্গ স্বাভাবিরভাবেই নাট্যকাহিনীকে পুষ্টিদান করেছে। নাটকের বক্তব্য, সুকৌশল রচনাশৈলীর বলিষ্ঠত। এবং দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্যে আসরে আসরে, নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

আলো চাই-আরো আলো

আলো চাই-আরো আলো

[আজবদেশ নাটকটির সংক্ষেপিত রূপে]

যষ্টি-হস্ত

মধু-মুখ

রসসাগর

কুমারেশ ঘোষ

পরম প্রিয়েষু।

গুণমুগ্ধ

সখ্য গর্বিত

মন্মথ রায়

দোলপূর্ণিমা

১৩৯২

["আজবদেশ" নামে আকাশবাণী : কলিকাতা কর্তৃক বেতার নাটক রূপে প্রথম অভিনয় ১৯৮৫ সালে ৯ই অক্টোবর।]

কিংবদন্তী নাটক

আলো চাই-আরো আলো

প্রথম অধ্যায়

কিংবদন্তী সেই আজব দেশ। হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী। রাজধানীর উপকণ্ঠে বুড়ো শিবের মন্দির। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব। অপরাহ্ন।

মেলার পরিবেশ। মন্দিরের শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি।

সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি : জয় বাবা বুড়োশিব জয়।
হর হর ব্যোম ব্যোম—জয় মহাদেব।
জয় হবু রাজা—জয়।
জয় গবু মন্ত্রী—জয়।
রাজকুমারী জয়ন্তী—জয়।
বাঞ্ছাপূরণ বুড়ো শিব—জয়।
গাজনের সঙ এল ঐ—জয়।

[গাহিতে গাহিতে গাজনের সঙ-এর প্রবেশ।]

॥ গান ॥

আমরা আজব দেশের অধিবাসী
মন্দ কিসে আছি।
খাই দাই আর ঠেসে ঘুমোই
হুজুগ পেলেই নাচি।
আমরা মন্দ কিসে আছি!
হবু রাজার গবু মন্ত্রী দেশের কর্ণধার।
কত ধানে কত যে চাল,
ধার ধারিনা তার ॥
বুদ্ধি পাছে যায় পালিয়ে,
(থাকি) নাক-কানেতে ছিপি দিয়ে

সাবধানেতেই ঘুরে বেড়াই,
কেবল হাঁচি পেলেই হাঁচি।
আমরা মন্দ কিসে আছি!
লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ
নাই আমাদের দেশে
বিদ্যে হলেই নানা মতের
দল বাড়বে শেষে!
দল বাড়লেই হানাহানি—
আমরা সেটা ভালই জানি
(তাই) আলোর বালাই নাই,
আঁধারেই খেলি কানা-মাছি।
সিদ্ধি-গাঁজায় দুঃখ ভুলে
(আছি) কৈলাসের কাছাকাছি।
বলো, মন্দ কিসে আছি।

[গানটি স্তিমিত হইয়া আসিল।]

কিষণচাঁদ ॥ এই ফট্‌কে! ভাল তো?

ফটিক ॥ (বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল) একি কিষনচাঁদ, তুমি!

কিষণ ॥ চুপ। হ্যাঁ আমি। আবার ফিরে এলাম! ধরিয়ে দিলেই তো একশো মোহর ইনাম পাবি!

ফটিক ॥ ছি গুরু। শুনলেও পাপ হয়। তুমি আমাদের সকলের ভালর জন্যে একা লড়ে যাচ্ছ। তুমি আমাদের গুরু। তোমার মুখ চেয়েই আমরা রয়েছি। তোমাকে দেব আমরা ধরিয়ে! ছিঃ ছিঃ! এ কথা তুমি বলতে পারলে?

কিষণ বেশ—বেশ। পিঠ আড়াল করে আমাকে একটু ঢেকে রাখত। মন্দিরের দেওয়ালে আমি এই লেখাটা শেষ করি।

ফটিক ॥ হ্যাঁ, তা রাখছি। অত বড় বড় করে কি সব লিখলে গুরু?

কিষণ ॥ ঐ তো! লেখাপড়া না শিখে সব আঁধারের পোকা হয়ে রইলি। তাই আওয়াজ তুলতে লিখছি—আলো চাই—আরো আলো। সর, এবার পালাই।

ফটিক ॥ না পালালেও চলে। দাঁড়ি গোঁফ যা লাগিয়েছ আমিই চিনতে পারিনি। কিন্তু দেওয়ালে যা লিখলে কটা লোক পড়তে পারবে? আমি ওটা ছড়া বেঁধে নেচে নেচে গাইছি। একটু থাকই না। এবার নেত্য গীত ধরছি আমি। (ফিস্‌ফিস্‌ করে ॥ মজাটা দেখেই যাও—

ফটিকের নাচগান

ফটিক ॥ আলো চাই আরো আলো

চারিদিকে বড়ই কালো।

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ (নৃত্য)

আলো চাই—আরো আলো,

চোখে তাই দেখছিনা ভালো

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্। (নৃত্য)

গেল গেল ভাই সবই গেল

আলো চাই আরো আলো,

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ (নৃত্য)

আলো চাই আরো আলো,

দিন দুপুরে প্রদীপ জ্বালো।

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্। (নৃত্য)

রাজ ঘোষক ॥ চুপ চুপ সব থামো। পুজো শেষ। রাজামশাই সদলবলে রাজবাড়ি যাবেন। সব পথ করে দাও—পথ ছাড়ো—সব জয়ধ্বনি করো।

প্রজারা ॥ জয় বাবা বাঞ্ছাপুরণ বড়ো শিবের জয়

জয় হবুরাজা জয়

জয় গবুমন্ত্রী জয়

জয় রাজকুমারী জয়ন্তী জয়।

[জয়ধ্বনি স্তিমিত হইল। অন্য এক পার্শ্বে রাজকুমারীর শিবিকাবাহক চতুষ্টয়ের তিনজন—নিধু, চৈতন এবং ফটিক কথপোকথনরত।]

নিধু ॥ ওরে চৈতন, ওরে ফটিক। রাজকুমারী তো এসে পড়েছেন। পণ্ডাটাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তিনজন কি করে রাজকুমারীর পাল্কী বইব ?

চৈতন ॥ তন্ন তন্ন করে তো সব জায়গায় খুঁজে দেখলাম। কোন চুলোতে যে গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে কে জানে—

ফটিক ॥ ভেবোনা। আমি লোক দিচ্ছি। ইয়া গোঁফ ইয়া দাড়ি—

নিধু ॥ আরো আমাদের মতন যোয়ান তো ?

ফটিক ॥ সে আর বলতে হবে না—দেখবে এখন। আমি ধরে আনছি। কিন্তু পণ্ডার পাওনা মোহর দুটো কিন্তু ওকেই দিতে হবে।

নিধু ॥ তা দেব,—তা দেব—তুই বাবা ধরে আন।

[মন্দির সংলগ্ন পথে, মন্দির হইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন প্রজাপুঞ্জের জয়ধ্বনির মাঝে হবু রাজা, রাজকুমারী জয়ন্তী, গবু মন্ত্রী।]

হবু ॥ আমার প্রিয় বাপধন প্রজারা, আজ এই চৈত্র সংক্রান্তির মোক্ষম দিনটিতে তোমাদের একটা বড়ই আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করছি। তোমরা সব মন দিয়ে শোন—তোমাদের ভাত কাপড়ের দুঃখ তো—

প্রজাগণ সমস্বরে ॥ হ্যাঁ মহারাজ—হ্যাঁ।

হবু ॥ গবু মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিল, রাজ্যে গাঁজার চাষ বাড়িয়ে দিতে। গাঁজা খেলে ও দুঃখটা নাকি আর থাকে না। কথাটা আমার মনে ধরেছিল। চৈত্রসংক্রান্তির এই বাঞ্ছাপূরণের দিন বুড়ো শিবের মন্দিরে এসে বাবা ভোলানাথকে শুধু সিদ্ধি গাঁজা ভেট দিয়েই পুজো সেরে বাবাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেলাম—কাল নতুন বছর থেকে আমার যেখানে যত খাস জমি আছে তাতে কেবল গাঁজার চাষই হবে। গবু বলেছে এতে গাঁজার দাম খুবই হবে কমে যাবে। সকলেই খুব সুলভ মূল্যে গাঁজা কিনে, মনের সুখে ঘর কন্না করতে পারবে। কি বল হে গবু—তাই তো ?

গবু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। এটা নেই সেটা নেই—এসব অভাব কারও মনে আর আসবেই না। জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

সমবেত কণ্ঠে প্রজাবৃন্দ ॥ জয় দিন দুনিয়ার মালিক মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

[ইতিমধ্যে জয়ন্তী দেওয়াল গায়ে লেখাটি পড়িয়াছে, সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।]

জয়ন্তী ॥ (পাঠ করিয়া) 'আলো চাই—আরো আলো'। মহারাজ, দেওয়ালের ঐ লেখাটি পড়েছেন ? আপনি পড়েছেন মহামন্ত্রী ?

হবু ॥ লেখা পড়ার মধ্যে আমি নেই মা। গবু, ব্যাপার কি দেখ।

গবু ॥ (পাঠ করিয়া) 'আলো চাই—আরো আলো' তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—সেই শালা কিষণচাঁদ সেই রাজবিদ্রোহীটা আবার দেশে ফিরেছে।

জয়ন্তী ॥ কিষণচাঁদ! নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে।

গবু ॥ নাম শুনেছি। লোকটাকে আমরা কেউ চোখে দেখিনি।

হবু ॥ লোকটা ভগবান না কি হে ? নাম শুনি অথচ চোখে দেখিনি।

গবু ॥ না-তা লোকটার বাহাদুরি আছে বলতে হবে। অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। রোজ সরকার থেকে তাকে ধরার জন্য একশ' মোহর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তাতেই সে পালিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি—সে আবার এসেছে। আবার সেই আওয়াজ তুলেছে—'আলো চাই—আরো আলো।'

হবু ॥ লোকটা পাগল না ছাগল ? এত আলো থাকতে আলো চাওয়ার কোন মানে হয়! সূর্য আলো দিচ্ছে, চন্দ্র আলো দিচ্ছে, ঝাড় লণ্ঠন রয়েছে, প্রদীপের আলো রয়েছে, জোনাকি যে জোনাকি—সেও আলো দিচ্ছে—আবার আলো কি রে ব্যাটাচ্ছেলে।

গবু ॥ পাগলা নয় মহারাজ—শয়তান। যা তা একটা ধুয়ো তুলে লোক ক্ষ্যাপাবার মতলব!

জয়ন্তী ॥ সত্যিকার দুঃখকষ্ট দূর করার ব্যাপার হলে লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু 'আলো চাই—আরো আলো' একথা বলে লোক ক্ষ্যাপানো—একটা নিছক শয়তানি। মহারাজ, এখনি আপনি ঘোষণা করুন ঐ বিদ্রোহীকে যে বন্দী করে আনতে পারবে—একশ' নয়—এক হাজার মোহর তার পুরস্কার।

হবু ॥ যখনই ঘোষণা কর গবু।

গবু ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। আসুন—সন্ধ্যা নেমে আসছে।

হবু ॥ হ্যাঁ, চলো, চলো। এখনই প্রজারা চেঁচামেচি শুরু করবে—'আলো চাই—আরো আলো।' ওরে কে আছিস? রাজকন্যার শিবিকা।

[সপারিষদ রাজার প্রস্থান।]

শব্দ তরঙ্গ: ঢ্যাঢরা সহযোগে ঘোষণা—'রাজবিদ্রোহী কিষণচাঁদকে ধরতে পারলে এক হাজার মোহর পুরস্কার।'

[রাজকন্যার শিবিকা বাহিদের শব্দ হেঁইও হেঁইও। দূরে মিলাইয়া গেল।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

[রাজসভা। হবু রাজা, গবু মন্ত্রী স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সভাপণ্ডিত য়্যাং, ব্যাং, চ্যাং নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। যথাস্থানে রক্ষীবর্গ দণ্ডায়মান।]

হবু ॥ দেখ গবু, দেশ বিদেশে একটা প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজা তো রাজা—হবু রাজা। মন্ত্রী তো মন্ত্রী—গবুমন্ত্রী। আর দেশ তো দেশ—ঐ আজব দেশ। এতবড় সম্মান আমি মাটি হতে দিতে পারিনা গবু।

সকলে ॥ (সমস্বরে) নিশ্চয়ই না—নিশ্চয়ই না—

হবু ॥ বিচার করতে গিয়ে আমার কোন দয়া মায়া নেই। আমার অমন সাধের পোষা বেড়ালটা মারা গেল। এ শোক আমি কি করে সইব? আমার রথের চাকার ধাক্কা খেয়ে বেড়ালটা একটু খোঁড়া হয়েছিল—আমি তখনই ওকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম—ওর দুঃখ দেখে কেঁদেই ফেলেছিলাম। ওর খোঁড়া পা জোড়া লাগাতে রাজবৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করালাম। তার কথা মত বেড়ালের পুষ্টির জন্য দৈনিক এক মণ দুধ বরাদ্দ করলাম। তাতেও আমার সেই আদরের বেড়াল মরে কি করে?

গবু ॥ আমারও সেই প্রশ্ন মহারাজ। য়্যাং ব্যাং আর চ্যাং দেশ বিখ্যাত এই তিন রাজপণ্ডিতকে নিয়ে এই ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এক তদন্ত

পরিষদ গঠন করেছিলাম। তিনশ' পৃষ্ঠার এক রায় দিয়েছেন। আপনি পড়ুন হ্যাং পণ্ডিত।

হ্যাং ॥ (রায়পাঠ) মার্জার দেখিতে যদিও নিরীহ গৃহপালিত প্রাণী—কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞান মতে মার্জার মাংসাশী, স্তন্যপায়ী প্রাণী গোষ্ঠীর অন্যতম— যে প্রাণী গোষ্ঠীর প্রধান হইলেন সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি মহা হিংস্র, মহাবলবান প্রাণী। ইতিহাসে বর্ণিত আছে দুই হাজার বৎসর পূর্বে মিশর দেশে মার্জারকে দেবতার আসন দেওয়া হইত—পূজা করাও হইত। গৌড়বঙ্গ প্রভৃতি দেশে ষষ্ঠী দেবীর বাহনরূপে মার্জার আজিও দুগ্ধ কদলী অর্ঘ পাইয়া থাকেন।

হবু ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও ওরে বাবা! আমার মাথা ঘুরছে, থামো—থামো। ওসব তুমিই শুনো। পণ্ডিতমশাইরা আমাকে সোজা কথায় বলুন—শেষ পর্যন্ত বেড়ালটা মরল কিসে?

ব্যাং ॥ অপুষ্টিতে।

হবু ॥ দৈনিক একমণ দুধ খেয়েও?

চ্যাং ॥ হজম হ'ত না।

হ্যাং ॥ হজম হ'ত না দেখে ঐ দুধে বেড়ালকে চান করান হ'ত।

হবু ॥ কে চান করাত?

ব্যাং ॥ পোষ্য প্রাণীপাল—লাখু। ঐ যে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

হবু ॥ এটাকে তো আমি কোন দিন দেখিনি। কে তোকে এই হবু রাজপ্রাসাদে চাকরি দিয়েছিল?

লাখু ॥ মা-মা-মা-মা-মামা।

হবু ॥ কে মামা?

গবু ॥ আজ্ঞে মহারাজ আমারই ভাগনে। মহারাজ! এ চাকরির একটা হাতিহাস আছে।

হবু ॥ ইতিহাস? সে আবার কি? বলছিলাম বেড়াল, চলে এল হাঁস! ব্যাপারটা কি বল।

গবু ॥ আমার ঐ ভাগনেটা ছিল বেকার কান্নাকাটি করে করে ব'লত—মামা, যেমন তেমন একটা সরকারী চাকরি দাও। দেখ, আমি ঘি ভাত খাব। আমি পরিহাস ক'রে নদীর ঢেউ গোণার কাজ দিয়ে—ওকে ঢেউ পাল-এর চাকরি দিয়েছি।

হবু ॥ ঢেউ গোনার চাকরী। বাঃ! তারপর? (লাখুকে) বল না শালা—তারপর ঘি ভাত খেলি? অবাক কাণ্ড। কি করে?

লাখু ॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার! ঘি ভাত খেলাম। বন্দরে নদীর ধারে বসে ঢেউ গুনছি। একটা জাহাজ এসে নোঙর করল। আমি ছুটে গিয়ে রাজত-কমা দেখিয়ে জাহাজের মালিককে বন্দী করলাম। জাহাজের মালিক বলে—

'আমার অপরাধটা কি ?' আমি বললাম—গভীর জলে সরকার বাহাদুর মাছের চাষ করবেন। দিনে রাতে নদীর কোথায় কত ঢেউ খেলে, তাই গুণে মাছের চাষের জায়গা ঠিক হবে। তোমার জাহাজ সেই সব ঢেউ তোলপাড় করে দিয়েছে। তোমার জাহাজই বাজেয়াপ্ত হবে।

হবু॥ না, কথাটা কিন্তু খুব ঠিক। এমনি একটা পরিকল্পনা তুমি করেই ফ্যালো গবু। মাছগুলো বড়ই চালাক—খুব ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর ? তোমার ঘি-ভাত হ'ল কি করে ?

লাখু॥ অভয় দেন তো বলতে পারি ধর্মাবতার।

হবু॥ মজার ব্যাপার ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, নির্ভয়ে বলো।—

লাখু॥ ঐ দিন রাতেই জাহাজের মালিক আমার বাড়িতে এসে হাজার মোহর গুণে দিয়ে গিয়ে জাহাজ খালাস করে বাণিজ্য করে চলে গেল।

হবু॥ সত্যিই তুই বুদ্ধিতে বাহাদুর।

গবু॥ মহারাজ। আমিও ওর এই বাহাদুরি দেখে রাজপ্রাসাদের অহরহ চুরি বন্ধ করতে, ওকে নিযুক্ত করে দিয়েছি প্রাসাদে—পালের চাকরি। যাকে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আর কি।

হবু॥ কাজটা করেছিলে ঠিকই। কিন্তু দৈনিক একমন দুধ বরাদ্দ থাকা সত্বেও আমার বেড়ালটা অপুষ্টিতে মারা গেল কি করে ?

লাখু॥ দয়াময় হুজুর ! আবার যদি অভয় দেন তো বলি—

হবু॥ হ্যাঁ নির্ভয়ে বলো—

লাখু॥ বেড়াল আর কতোটা দুধ খেতে পারতো ! যেটা বাঁচতো, সেটা আমিই নিতাম। গবু মামার হ'ল সন্দেহ। তাতে তিনি আমার মাথার ওপর নিযুক্ত করলেন—এক প্রতিবেদক। দুধের ভাগীদার বেড়ে গেল। বেড়ালের দুধের ভাগ কমে গেল, বেড়ালের চেহারা আরও খারাপ হ'ল। মামা তারপর নিযুক্ত করলেন—এক পরিদর্শক। তাতে বেড়ালের দুধের ভাগ আরও কমল বেড়াল আরও কাহিল হ'ল। মামা তখন রেগে মেগে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে নিযুক্ত করলেন—এক উপদেষ্টা। দুধের ভাগ না পেয়ে বেড়াল এবার পেল অক্কা। হুজুর মা-বাপ। অভয় পেয়ে সব বলেছি—রক্ষা করুণ।

হবু॥ আয়রে আমার সাধের বেড়াল ! নাঃ এবার পুষব একটা বাঘ ! বাঘের খাবার যে চুরি করতে যাবে, বাঘ তাকেই ধরে খাবে। নিশ্চিন্ত। কিন্তু গবু ! আর একটা বিপদে পড়েছি যে। আমার খাস জমিতে গাঁজা খেয়ে বদ্দি হয়ে পড়ে থাকলে এত বড় রাজ্যটা চালাবে কে ? সৈন্য সামন্তরাই বা খাবে কি ? দেশরক্ষা করবে কে ? কাজেই বুঝলে গবু। এই রাজপণ্ডিতদের নিয়ে আমাদের খাদ্য সমস্যার একটা সমাধান করো।

ম-৪০১

গবু ॥ মহারাজ যথার্থ বলেছেন। কিন্তু আর একটা মহা সমস্যাও হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—বস্ত্র সমস্যা। বস্ত্রাভাবে দেশের লোকগুলো দেখছি সব ন্যাংটা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের এখন চোখ বুঁজে পথে বেরুতে হচ্ছে।

হবু ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমি বলে রাখছি গবু। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে খাদ্যবস্ত্র সমস্যার সমাধান বের করতেই হবে তোমাদের। নইলে জেনে রেখো, তোমরা আর নেই খ্যাচাং—ঘেচ্।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

[রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী জয়ন্তীর উপবেশন কক্ষ। জয়ন্তী ও পাল্কী বাহাকের ছদ্মবেশে কিষণচাঁদ।]

কিষণ ॥ দয়া ক'রে রাজকুমারী, এইবার আমাকে ছুটি দিন। বুড়ো শিবের আশীর্বাদ ছিল বলেই শিবিকা বাহকদের মধ্যে তোমার মতো সাহসী বীরটি ছিল। তাই না কাল রাত্রে বুনো হাতীর হাত থেকে অমনভাবে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু তারপর থেকেই তুমি পালাই পালাই করছ কেন? বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব, তবে না তুমি যাবে। ঐ যে বাবা এসে গেছেন। ভালই হয়েছে।

[হবুচন্দ্রের প্রবেশ।]

হবু ॥ এই যে মা জয়ন্তী। কি আশ্চর্য খেয়াল তোর। শুনলাম, তুই হাতীর পিঠে চড়ে কাল রাতে বাড়ি ফিরেছিস।

জয়ন্তী ॥ কি শুনতে যে কি তুমি শোন বাবা! পথে একটা বুনো হাতী আমাদের পাল্কী দেখে তেড়ে আসে। শিবিকা বাহক এই লোকটি পাথর ছুঁড়ে দস্যুর মতো লড়াই করে হাতীটিকে তাড়ায়। আর সব পাল্কী বাহকরা ভয়ে পালায়। এই লোকটি আমাকে পিঠে নিয়ে অতটা পথ হেঁটে এত রাতে বাড়ি পেঁাছে দিয়েছে।

হবু ॥ বলিস কি? এই লোকটার পিঠে চেপে অতটা পথ! (কিষণচাঁদকে) তুমি শুধু ওকে বাঁচাওনি। সেই সঙ্গে আমাকেও। কি পুরস্কার দেবো ভেবে পাচ্ছিনা।

জয়ন্তী ॥ আজ থেকে এই হবে আমার দেহরক্ষী তুমি অনুমতি দাও বাবা।

হবু ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়। ও হে হাতীমার। আজ থেকে তুমি আমার জয়ন্তী মার দেহরক্ষী হলে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। দেখ বাবা, সেই দুষমণ কিষণ-

চাঁদকে বড় ভয়। চাইছে আলো ; আর ব্যাটা লুকিয়ে আছে অন্ধকারে। ঝোপ বুঝে কখন কোপ মারবে—বলা যায় না! রাস্তা ঘাটে রাজকন্যা যখন বেরুবেন—চারদিকে চোখ রেখ বুঝলে বাবা—হ্যাঁ—তোমার নাম ?

কিষণ ॥ আজ্ঞে সূর্যলাল।

হবু ॥ সূর্যলাল! একে সূর্য—তায় আবার লাল। বেশ-বেশ। ওরে ব্যাটা কিষণচাঁদ—কত আলো চাস্ আয়—পিঠে বস্তা বেঁধে আয়। হা-হা-হা। আমি এবার যাই মা চান করে পুজোয় বসতে হবে।

[হবুচন্দ্রের প্রস্থান।]

জয়ন্তী ॥ তুমি তো আমার দেহরক্ষী—আর আমার ভাবনাটা কি ? এবারে এস। একটা বড় কাজে আমরা হাত দি। হ্যাঁ, সব সময়ে আমি চাই একটা উত্তেজনা।

কিষণচাঁদ ॥ কাজটা কি বলুন না।

জয়ন্তী ॥ ঐ কিষণচাঁদ। অন্ধকারের আড়াল থেকে লোকটা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে—'আলো চাই—আরো আলো।' দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াব। একটি বার শুধু জিজ্ঞেস করব, 'আলো চাই ? আরো আলো ?'

কিষণ ॥ সে হয়ত বলবে—'রূপের আলোই একমাত্র আলো নয় সুন্দরী। জ্ঞানের আলোও আলো। সেই আলোই আমরা চাই।' তখন ?

জয়ন্তী ॥ জ্ঞানের আলো!

কিষণ ॥ হ্যাঁ, জ্ঞানের আলো। কিষণচাঁদ সেই কথাই বলেছে—সেই আলোই চেয়েছে।

জয়ন্তী ॥ সেই আলোই চেয়েছে ? তুমি কি করে জানলে ?

কিষণ ॥ লোকের মুখে শুনেছি।

জয়ন্তী ॥ তুমি তাকে দেখনি ?

কিষণ ॥ হয়ত দেখেছি। হ্যাঁ—আপনিও তাকে দেখে থাকবেন রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ আমি ?

কিষণ ॥ তা বলা যায় না! শুনেছি লোকটা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় কখনও কৃষক হয়ে, কখনও সৈনিক সেজে—কখনও পণ্ডিতরূপে, কখনও মূর্খের বেশে—তাই দেখলেও আপনি তাকে চিনতে পারেননি রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ তা হবে। (কি ভাবিলেন হঠাৎ) ? পাল্কী বাহকের বেশেও কি সে আছে ?

কিষণ ॥ (চমকিয়ে উঠিল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। তখনই আত্মস্থ হইয়া) না—তবে আমি ধরে ফেলতাম।

জয়ন্তী ॥ লোকটা দেখছি একটা ধাঁ ধাঁ। তুমি ধাঁ ধাঁ ভালবাস ?

কিষণ ॥ ভালবাসি। জীবনটাই তো একটা ধাঁধাঁ—

জয়ন্তী ॥ বেশ। উত্তর দাও দেখি আমার এই ধাঁধাঁটার—

রাতের অন্ধকারে
যে মায়া জাগালো মদির স্বপন
আকুল করিল আমার ভুবন।
দিবসের জাগরণে
নিঠুর আঘাতে সে
মরীচিকা আমার
ভেঙ্গে যায়—হায়
মুছে যায় বারে বারে।

উত্তর কি? বল—

কিষণ ॥ আশা-আশা, মনের আশা—

জয়ন্তী ॥ সূর্যলাল—সূর্যলাল, আমার হেঁয়ালী রচনা সার্থক। তুমি শুধু বীর নও, দেখছি তুমি পণ্ডিতও।

কিষণ ॥ না রাজকুমারী, পাণ্ডিত্যের অভিমান আমার নেই। তার ধাঁধাঁ মেলানো আমার একটা নেশা।

জয়ন্তী ॥ দুজনের একই নেশা! আশ্চর্য!

[হঠাৎ চিৎকার করিতে করিতে রাজরক্ষীর প্রবেশ।]

রাজরক্ষী ॥ সাবধান—সাবধান। দুষমন-দুষমন কিষণচাঁদ রাজপ্রাসাদ ঢুকে পড়েছে। সাবধান—সাবধান—

জয়ন্তী ॥ য়্যা! কোথায়?

কিষণ ॥ আজ তবে তার রক্ষা নেই। আমি দেখছি—

[কিষণচাঁদের দ্রুত প্রস্থান। মানে—পলায়ন।]

জয়ন্তী ॥ কে যে কিষণচাঁদ—আর কে যে কিষণচাঁদ নয়—ভাববার কথা।

[জয়ন্তী—জয়ন্তী!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে হবু রাজার প্রবেশ। গবুচন্দ্র ও বিক্রমজিৎ।]

হবু ॥ এই যে মা জয়ন্তী! তোর এদিকে আসেনি তো?

জয়ন্তী ॥ কে, ঐ কিষণচাঁদ? ঢ্যাঢরা শুনলাম, রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। তোমার জন্যেই ভাবছিলাম বাবা। কি দুঃসাহস!

গবু ॥ মহারাজকে খুন করে পালিয়ে যাবার মতলব।

বিক্রম ॥ কিন্তু কাজটা অত সোজা নয়। রাজপ্রাসাদ আমি সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখেছি।

হবু ॥ তোর সেই দেহরক্ষী কোথায় ?

জয়ন্তী ॥ ঢ্যাঢরা শুনেই কিষণচাঁবকে ধরতে ছুটে গেছে।

হবু ॥ ধরতে পারলেই ঐ কিষণচাঁদের প্রাণদণ্ড। রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও গবু।

গবু ॥ যথাজ্ঞা মহারাজ।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

[রাজসভা। য়্যাং, ব্যাং, চ্যাং রাজপণ্ডিতগণ যথাস্থানে সমাসীন। তাঁদের হাতে বড় বড় খাতা। গবু মন্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে মিশরীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী আদমজী]

গবু ॥ আদমজী' আপনি দয়া করে আসন পরিগ্রহ করুন। মহামান্য রাজপণ্ডিতগণ এবং প্রিয় সভাসদগণ মিশর দেশের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী এই আদমজী আজব দেশে এর পূর্বেও ব্যবসা উপলক্ষে বহুবার এসেছেন। এবার এসেছেন আমার জরুরী আমন্ত্রণে। আজ আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে রাজ্যের অন্ন বস্ত্র সমস্যার সমাধানের ওপর। প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত বিদ্রোহী কিষণচাঁদ এখনও ধরা পড়েনি। প্রজাদের সে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আজ রাত্রে তারা নাকি প্রাসাদ অক্রমণ করবে। মারাত্মক খবর হচ্ছে (প্রায় চুপি চুপি) সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

য়্যাং ॥ মারাত্মক সংবাদ, রাজকন্যা জয়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারটা কি হ'ল ?

ব্যাং ॥ হ্যাঁ, রাজকন্যার বিয়ের মত একটা ধুমধাড়াক্কা হ'লে প্রজারা রাজ-ভোজ খেয়ে কিছুদিন মেতে থাকতো।

চ্যাং ॥ হ্যাঁ, রাজকন্যাও তো এখন প্রায় অরক্ষণীয়া। মহারাজ কি দেখেও দেখেন না ?

গবু ॥ সেখানেও এক বিপদ। বিয়ের ব্যাপারে তিনি একটা পণ করেছেন —রাজসভায় তিনি কি একটা ধাঁধাঁ বলবেন। সঠিক উত্তর যিনি দিতে পারবেন তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। যে উত্তর দিতে গিয়ে যে পারবেন না, তার তখনি শিরচ্ছেদ। রাজকন্যার আর রাজত্ব পাওয়ার লোভে অনেকে এসেছে, অনেকের প্রাণ গেছে। অনেকদিন কেউ আর আসছে না। এই রে, মহারাজা এসে গেছেন। পণ্ডিত মশাইরা আপনারা সব তৈরি তো ?

য়্যাং ॥ (ভয়ে) তো-তো-তো-তৈরি।

ব্যাং ॥ (ভয়ে) কিন্তু ধো-ধো-ধো-ধোপে টিকলে হয়।

চ্যাং ॥ (ভয়ে) গুরু কৃপাহি কে-কে-কে-কেবলম্।

[হবু রাজার প্রবেশ।]

সকলে ॥ জয় মহারাজের জয়।

হবু ॥ মুখে বলছ 'জয়'। আমি চারিদিকেই দেখছি ক্ষয়। অন্ন আর বস্ত্র সমস্যার আজ তোমরা সমাধান না করলে—জেনো আমিও গেছি তোমরাও গেছ।

গবু ॥ সুসমাধান ওঁরা করেছেন মহারাজ। আপনি শুনুন-সবাই শুনুন!

য়্যাং ॥ দুনিয়ার সর্বত্র আজ খাদ্যাভাব কেন—সে আলোচনা আমাদের তদন্তের বিষয় ছিল না! এক্ষণে কি করণীয় সেই বিষয়েই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছি। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত—ঘাস ভক্ষণ এ সমস্যার সমাধান।

সকলে ॥ (চমকিত হইয়া) ঘাস!

য়্যাং ॥ না, না—ঘাসকে আপনারা যত তুচ্ছ ভাবছেন—ঘাস তত তুচ্ছ নয়—

ব্যাং ॥ না, না—ঘাসকে তুচ্ছ করবেন না। গরুরা এই ঘাস খায়। আর তাদের দেওয়া দুধ থেকে আমরা পাই মাখন ঘি ছানা দই।

চ্যাং ॥ সুতরাং দেখা যাচ্ছে—দুধ-মাখন-ঘি খেয়ে আমরা যে শক্তি অর্জন করছি—তা সেই ঘাস থেকেই আসছে। খাদ্যপ্রাণই হচ্ছে ঘাস।

য়্যাং ॥ তাই আমরা সুপারিশ করছি—খাদ্যসঙ্কট মোচনের জন্য ঘাস খাওয়া উচিৎ। ইহা সহজ, সুলভ অথচ পুষ্টিকর।

গবু ॥ আজ তাই আসুন—আমরা দেশে আওয়াজ তুলি—'ঘাস ফলাও—আরো ঘাস ফলাও ঘাস খাও—আরো ঘাস খাও।'

পণ্ডিতত্রয় ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

য়্যাং ॥ ঘাসের বড়া, ঘাসের রুটি, ঘাসের চাপাটি, ঘাসের ঝোল, ঘাসের সুক্তো, ঘাসের সেজ, ঘাসের অম্বল—ঘাস নানারূপে আমাদের দেহের পুষ্টিবর্ধন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

হবু ॥ মার হববা, খাদ্য সমস্যার সত্যিই একটা সমাধান হ'ল—বাঁচা গেল। এই বার বস্ত্র সমস্যা—

গবু ॥ বস্ত্র সমস্যার সমাধানও মহারাজ, হয়ে গেছে। আজই মহারাজের সামনে তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই আদমজী, মিশরের একজন বিখ্যাত বস্ত্র ব্যাবসায়ী! মহারাজের যশোগৌরব সুদূর মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আদমজী সুদূর মিশর থেকে এই আজব দেশে এসেছেন—মিশরের শ্রেষ্ঠ আবিস্কার 'অদৃশ্য-বস্ত্র' উপঢৌকন নিয়ে।

হবু ॥ 'অদৃশ বস্ত্র' সেটা আবার কি?

গবু ॥ মহারাজ বোধ হয় ঢাকাই মসলিনের কথা শুনে থাকবেন।

হবু ॥ তা-হাঁ—শুনেছি।

গবু ॥ মিশরের এই 'অদৃশ্য বস্ত্র' ঐ ঢাকাই মসলিনের ও বাবা। হ্যাঁ,

আমি দেখেছি বলেই আসছি। আদমজী, আপনার 'অদৃশ্য বস্ত্র' এইবার মহারাজকে দেখান। আমাদের মহারাজের মত গুণগ্রাহী সমজদার দুনিয়ার আর পাবেন কি না সন্দেহ।—আপনার অদৃশ্য বস্ত্রের পেটিকার আবরণ উন্মোচন করুণ আদমজী।

আদমজী ॥ এই যে মহারাজ, দেখছেন তো ?

হবু ॥ ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—তা নয়—তবে—তবে কাপড়টা—ঠিক কোথায়····

গবু ॥ মহারাজ ঠিক দেখছেন—জহুরীই জহর চেনে।

আদমজী ॥ এই দেখুন মহারাজ. এই অভিনব শাড়ীর পাড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র। পৃথিবীর কোন তন্তুবায় কাপড়ের ওপর এমন বর্ণ সুষমা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। মহারাজ কি দেখতে পাচ্ছেন না ? আর একটু এগিয়ে এসে—মাথা নীচু করে দেখুন মহারাজ, আপনারাও দেখছেন তো ?

গবু ॥ অপূর্ব, অপূর্ব। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আর মানুষের চরম সৃষ্টি এই অদৃশ্য বস্ত্র—একথা আমাদের মানতেই হবে মহারাজ।

হবু ॥ একশোবার। কিন্তু এই অদৃশ্য বস্ত্রের দাম পড়ছে কত ?

আদমজী ॥ অদৃশ্য এই বস্ত্রের কাটা ছেড়ার ভয় নেই। একটিবার কিনলে—সারাটি জীবন।

হবু ॥ বুঝেছি—বুঝেছি। বংশের পর বংশ পরতে পারবে। কিন্তু দাম ?

আদমজী ॥ সে তুলনায় খুবই কম। এক একটি কাপড় এক একটি মোহর।

গবু ॥ নামমাত্র দামে প্রজাদের দিয়ে দেব মহারাজ। আপনি আমাকে এই অদৃশ্য বস্ত্রের কারখানা খোলার অনুমতি দিন মহারাজ।

হবু ॥ একশবার—একশবার। জয় বাবা বুড়ো শিব, তোমার কৃপায় আমার রাজ্যে ভাত কাপড়ের কষ্ট ঘুচে গেল। ওরে বাজা রে বাজা—বাদ্য বাজা।

ঘোষক ॥ রাজকুমারী জয়ন্তী মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

হবু ॥ কিন্তু কেউ তার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে বাইরের এ ঘণ্টাটা বাজিয়ে এই সভায় এসে দাঁড়ালে তবে না রাজকুমারী এখানে আসবে। এত তাড়া কেন ?

গবু ॥ রাজকুমারী তাঁর স্বয়ম্বরের জন্যে বড়ই উতলা হ'য়ে পড়েছেন মহারাজ।

হবু ॥ উতলাই যদি হবে অমন সব কঠিন ধাঁ-ধাঁ দিচ্ছে কেন ? রাজকন্যা আর রাজ্য পাওয়ার লোভে ভাল ভাল পাত্রই বেশ কিছু আসছিল। কিন্তু ওর ঐ সব শক্ত শক্ত ধাঁধাঁর উত্তর দিতে না পেরে স্বয়ম্বরের শর্তমত শূলে চড়ে প্রাণ দিয়ে গেছে। এখন আর উতলা হ'লে চলবে কেন ?

[জয়ন্তীর প্রবেশ]

হবু ॥ এই যে এসে গেছিস মা ? কিন্তু ঘণ্টা বাজায়নি তো কেউ।

জয়ন্তী ॥ (রাগত ভাবে) ঐ ঘণ্টাকর্ণ হয়ে তোমরাই থাক বাবা। আমি আর এখানে টিকতে পারছিনা, বনবাসে যাচ্ছি বিদায় নিতে এসেছি।

হবু ॥ বনবাসে ! সে কি মা !—কেন ?

জয়ন্তী ॥ না গিয়ে আর উপায় নেই। এরাজ্যে এখন কোন মানুষ বাস করতে পারে ? লোকেরা গাঁজা খেয়ে বুঁদ হ'য়ে বসে আছে। তারপর এখনই শুনলাম—ঘাস খেয়ে হাম্বা হাম্বা করতে হবে—অদৃশ্য বস্ত্র পরে ঘরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হবে। অন্ধকারে ডুবে যাক এ দেশ। এর চেয়ে আমার বনবাসই ভালো।

হবু ॥ এ তুই কি বলছিস মা ? দেশটা অন্ধকারে ডুবে গেলে ঐ কিষণ-চাঁদই দলবল নিয়ে আরও চেঁচাবে—'আলো চাই—আরো আলো।'

[এমন সময় ঘণ্টা বাজল]

হবু ॥ ঐ, শূলে চড়তে আবার কে এল ?

[ভিন্নতর ছদ্মবেশে কিষণচাঁদের প্রবেশ]

কিষণ ॥ মহারাজের জয়—

হবু ॥ মহারাজের তো চিরকালের জয়। কিন্তু ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে তুমি ক্ষয় হতে এলে কেন বাবা ?

গবু ॥ এসেছে রাজকন্যা আর রাজত্বের লোভে। কিন্তু রাজকন্যার ধাঁধাঁর উত্তরটি না দিতে পারলে—

জয়ন্তী ॥ (সহাস্যে) আর আপনি আসবেন, এও আমি জানতাম। কিন্তু এ সে ধাঁধাঁ নয়—যা আপনি জানেন। নতুন ধাঁধাঁ—

কিষণ ॥ বলুন—

জয়ন্তী ॥ বলতে পারেন আপনি, 'পৃথিবীতে এমন কোনো হিমশীতল প্রস্তর-খণ্ডের সন্ধান কেউ জানে কি—যার স্পর্শে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে আগুন ?

[সভায় গভীর নিস্তব্ধতা।]

হবু ॥ ঠাণ্ডা পাথর থেকে জ্বলবে আগুন। এ আবার কি রকম ধাঁধাঁরে বাবা। দোহাই বাবা বুড়ো শিব—দোহাই বাবা বুড়ো শিব।

জয়ন্তী ॥ উত্তর দিন মাননীয় পরীক্ষার্থী। সময় উত্তীর্ণ প্রায়।

কিষণ ॥ (আবেগজড়িত কণ্ঠে) রাজকুমারী জয়ন্তী। (হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে রাজকুমারীর সন্নিহিত হইয়া) আপনি রাজকুমারী, আপনি সেই হিম-শীতল পাথর—আমার পৃষ্ঠে যার দেহের স্পর্শে আমার মত কঠোর মানুষের মনেও জ্বলে উঠেছে প্রেমের আগুন।

[জয়ন্তী লজ্জায় নীরব রহিল]

হবু ॥ এ আবার কি উত্তর হ'ল রে বাবা ! কি মা—তুমি চুপ করে আছ যে ?

জয়ন্তী ॥ (কিষণচাঁদকে) আপনি জয় লাভ করেছেন—এই নিন আমার কণ্ঠের রত্নহার—আপনার জয়মাল্য—আমার বরমাল্য—

হবু ॥ মার হাব-বা। হর হর ব্যোমা ব্যোম—বামে শোবে গৌরী।

গবু ॥ কিন্তু রাজপরিবারের বিবাহের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমাদের জিজ্ঞাসা—কি আপনার পিতৃকুল পরিচয়—কি আপনার বংশ পরিচয় ?

কিষণ ॥ (হাসিয়া) আমি এই অভিশপ্ত রাজ্যেরই এক অতি সাধারণ প্রজা। আমি সেই বংশেই জন্মেছি—যারা সবার পিছনে থেকে সবার নীচে দাঁড়িয়ে—কুশিক্ষা, দারিদ্র আর অর্ধাশনে তিল তিল করে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে—যাদের শোষণ করে রাজ্যের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা ক্রমশঃ ফেঁপে উঠছে, আমি এই দেশেরই সেই নিপীড়িত প্রজাদের একজন মহারাজ।

হবু ॥ কথাগুলো বেশ। কিন্তু বোঝা তো গেল না গবু।

[উত্তেজিতভাবে সেনানায়ক বিক্রমজিৎ এর প্রবেশ।]

বিক্রম ॥ মহারাজ- মহামন্ত্রী এই সেই বিদ্রোহী কিষণচাঁদ—ছদ্মবেশে এতক্ষণ প্রতারিত করেছে।

গবু ॥ কিষণচাঁদ ! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজবিদ্রোহী কিষণচাঁদ !

কিষণ ॥ আমি সগৌরবে সে পরিচয় স্বীকার করছি মহারাজ।

গবু ॥ মহারাজ আপনারই আদেশে এই বিদ্রোহীর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে — প্রাণদণ্ড।

হবু ॥ তাতো হয়েছেই। তুই যে মড়ার গলায় মালা দিয়েছিস্ মা—মড়ার গলায় মালা দিয়েছিস—

গবু ॥ রাজকন্যা আশাকরি রাজার কর্তব্যে বাধা দেবেন না—রাজ্যের আইন লঙ্ঘন করবেন না।

জয়ন্তী ॥ অন্ধকারেই যদি এরাজ্য চিরকাল ডুবিয়ে রাখেতে চাও পিতা, তবেই ওকে বধ করে ঐ আলো নিভিয়ে দাও।

গবু ॥ বিক্রমজিৎ, মহারাজার আদেশ এখুনি প্রতিপালন কর।

কিষণ ॥ রাজকন্যা, রাজকন্যা ! যে পরিচয় এখনি তোমার পেলাম এরপর আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমি মৃত্যুর জন্য সানন্দে প্রস্তুত। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে রাজশক্তির কাছে আমার একটি অভিযোগ আছে মহারাজ।

গবু ॥ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি আইনের চোখে মৃত। তার কোন বক্তব্য শুনতে আমরা বাধ্য নই মহারাজ।

হবু ॥ না, না—তুমি বল কিষণচাঁদ। ফাঁসির আগে ফাঁসির আসামী কী খেতে চায়, কি বলতে চায় আজবদেশে এসব শোনার রীতি আছে। তুমি কি বলবে বল কিষণচাঁদ।

কিষণ ॥ মহারাজের জয় হোক। 'আলো চাই—আরো আলো'—এই ছিল আমাদের দাবী। একে বলা হয়েছে বিদ্রোহ—কিন্তু ভেবে দেখুন মহারাজ—দেশে আজ কি নিদারুণ অন্ধকার। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার—এ তিন অন্ধকারে দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কে? তারা—যারা জনসাধারণকে শোষণ করতে চাই—অবাধে, নির্বিবাদে। দেশে মূঢ়, ম্লান, মূক লোকের সংখ্যা যত বেশী থাকে—ততই তাদের শোষণের সুবিধা হয়! এই গবু চন্দ্রদের দেশে আজ শিক্ষার আলো নেই বলেই—যেমন তেমন চাকরিতে ঘি ভাত হয়—

গবু ॥ আঃ অসহ্য এসব কি হচ্ছে?

হবু ॥ না না, বল—বল—নতুন কথা শুনছি।

কিষণ ॥ আর ॥ তাই এক মণ দুধ দৈনিক বরাদ্দ থাকলেও রোগা বেড়াল খাবার অভাবে মরে। মানুষ ঘাস খায়—অদৃশ্য বস্ত্র পরে—

গবু ॥ না না, এসব প্রলাপ অসহ্য! বিক্রমজিৎ, রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এক্ষুনি বধ, কর।

হবু ॥ (প্রাণপণে চিৎকার করিয়া একটি মাত্র শব্দে আদেশ দিলেন) না —(সভায় নিস্তব্ধতা। ক্ষণপরে হবু শান্ত সংযতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন) রাজা আমি। আমারই আজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ঐ কিষণচাঁদ। আজব দেশের আইনে যদি আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করি—আমার আজ্ঞা আর রাজাজ্ঞা নয়। ওর দণ্ড প্রাণদণ্ড নয়। আজ থেকে ইনি রাজা (কিষণচাঁদের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) আর (জয়ন্তীকে দেখাইয়া) ইনি রাণী, আমি ওদের প্রজা।

সকলে ॥ জয়—মহারাজ কিষণচাঁদের জয়।

জয়ন্তী ॥ (কিষণচাঁদকে) আজব দেশে এলে তুমি আলোর রাজা। আলো দাও, আলো দাও—আরো আলো। অন্ধকার থেকে আমাদের আলোতে নিয়ে যাও।

সকলে ॥ জয় মহারাজ কিষণচাঁদের জয়।

জয়ন্তী ॥ মহামন্ত্রীকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কি নতুন রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন না?

হবু ॥ অদৃশ্য বস্ত্রের মত মহামন্ত্রীও কি অদৃশ্য হলেন?

জয়ন্তী ॥ (হাসিয়া) তাকে যেতেই হবে বাবা—অদৃশ্য হতেই হবে। আলো এলে অন্ধকার আর থাকে না। শুধু আজব দেশে নয়—কোন দেশেই না। তাই আলো চাই—আরো আলো।

সকলে ॥ আলো চাই—আরো আলো।

য ব নি কা

উর্বশী নিরুদ্দেশ

প্রাণাধিক

শ্রীমতী জয়ন্তী রায়

শ্রীমান সচ্চিদানন্দ রায়কে

স্নেহাশিস।

নিয়ত আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

আত্মকথা

নাটকটি রচনা করেছি মনের তাগিদে। এক টুকরো স্বপ্ন থেকে এর ইঙ্গিত পেয়ে।

বন্ধুবর শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৬০এর শারদীয়া সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পূর্ণ নাটকটি প্রকাশ ক'রে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

২২১সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

মন্মথ রায়

রচনাকাল : ১৩ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ ১৯৫৩

প্রথম প্রকাশ : শনিবারের চিঠি : শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০

গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

উর্বশী নিরুদ্দেশ

প্রথম দৃশ্য

শরতের দার্জিলিং। কার্ট রোডে একটি 'ভিলা'। ভিলার মালিক গৌতম গুহ দার্জিলিঙের স্থায়ী বাসিন্দা। রেশম ও পশমের পোশাক-পরিচ্ছদের কারবার। নীচে দোকান-ঘর। উপরে বাস-ভবনের একটি অংশে নিজে বাস করেন। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট এই অংশটিতেই বর্তমান দৃশ্যের অবতরণিকা। কক্ষটি স্টাডি। ঘরটির পশ্চাতের দেওয়ালে মার্কিনী পদ্ধতিতে একটি সুদীর্ঘ কাচের জানালা। এই জানালা দিয়া তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্যে কক্ষটি উদ্ভাসিত। কক্ষের দক্ষিণে দুইটি এবং বামে দুইটি দরজা। দক্ষিণের একটি দরজা বাহিরে যাতায়াতের পথ এবং দ্বিতীয় দরজাটি স্টাডি-সংলগ্ন শয়নকক্ষে যাতায়াতের পথ। বামের প্রথম দরজাটি গৃহস্বামীর বাসভবনের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে এবং দ্বিতীয় দরজাটি একতলার দোকানঘরে যাইবার অভ্যন্তরস্থ পথ। গৃহসজ্জায় শিল্পীজনোচিত রুচি এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচয় ছড়ানো আছে। ঘরের দুই কোণে দুই সেট সোফা, দুইটি ছোট টেবিল এবং নানাবিধ টিপয়। হিমালয়ের নানাবিধ মনোরম দৃশ্য সম্বলিত খানকতক ছবি কক্ষটির শুধু শোভা-করিতেছে না, একটি পাহাড়ী পরিবেশও সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে উর্বশীর একটি মৃন্ময় মূর্তি। মূর্তিনির্মাণ প্রায় সমাপ্ত—শুধু চক্ষুদানই বাকি আছে। মৃৎশিল্পী মৃন্ময় ভাস্কর মূর্তি রচনার শেষ কাজগুলি সারিয়া লইতে-ছিলেন। মূর্তির চক্ষুদান অবশ্য তখনও বাকি রহিয়াছে। শিল্পীর বয়স ত্রিশের মধ্যে। দেখিলে শিল্পী বলিয়াই মনে হইবে। সৌন্দর্য ছাড়া কল্পনা এবং ব্যক্তিত্বও তাঁহার চেহারাতে সুপরিস্ফুট। শরতের পূর্ণিমা। অদূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। ক্ষণপরেই দক্ষিণের দরজা দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিল গৌতম গুহের বাল-বিধবা ভগ্নী কৃপা। ভরা যৌবন, কিন্তু বৈধব্যের বিষাদে মহিমময়ী। কৃপা ঘরে ঢুকিয়াই মৃন্ময়কে মূর্তিরচনায় তদ্‌গতচিত্ত দেখিতে পাইল।

[কৃপা ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল]

কৃপা ॥ মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন ?

[মৃন্ময়ের ধ্যানভঙ্গ হইল। খানিকটা অপ্রস্তুত হইয়া সে কৃপার দিকে অপরাধীর মত তাকাইল।]

মৃন্ময় ॥ কি বলছ কৃপা ?

কৃপা ॥ জিজ্ঞেস করছিলাম—আপনি কি বাড়ি আছেন ?

মৃন্ময় ॥ বাড়ি আছেন মানে? বাড়িতেই তো রয়েছি।

কৃপা ॥ দেখে তা তো মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, আপনি আর ইহজগতে নেই! গেছেন স্বর্গে, যেখানে সুরসভাতলে আপনার এই উর্বশী নাচছে।

মৃন্ময় ॥ ভাবছিলাম—ভাবছিলাম—ভাবছিলাম—কবিগুরুর সেই চিরন্তন প্রশ্ন (মূর্তির দিকে তাকাইয়া)—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরসজ্জাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥"

কৃপা ॥ বুঝেছি আপনার ব্লাডপ্রেসারটা আজ বেড়েছে। সারারাত আজ নিজেও ঘুমোবেন না, আমাদেরও ঘুমোতে দেবেন না। রাত নটা বেজে গেল সে খেয়াল আছে কি? ডাঃ বোস বাড়ি যাবার পথে আপনার খবর নিয়ে যাবেন বলেছেন। তিনি যদি এসে দেখেন—রাত নটাতেও আপনি ঘুমোতে যান নি ওষুধ খান নি—এই 'নহ মাতা নহ কন্যা' করেছেন—রোগী ব'লে আপনি হয়তো ক্ষমা পাবেন মৃন্ময়বাবু, কিন্তু আমাদের তো ক্ষমা মিলবে না।

মৃন্ময় ॥ না না, কৃপা উর্বশী আমি গ'ড়ে ফেলেছি। আমার মানসী মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে। বাকি শুধু চক্ষুদান! আমাকে তোমরা বাধা দিও না; কৃপা, ডাক্তার বলেছে—তোমরাও জানো, যে কোন মুহূর্তে একটা স্ট্রোকে আমি ম'রে যেতে পারি। আমার জীবনের শেষ সাধনা সম্পূর্ণ করতে দাও—সম্পূর্ণ করতে দাও কৃপা।

[ডাক্তার নির্ভয় বসু ও গৃহস্বামী গৌতম গুহের প্রবেশ]

গৌতম ॥ হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই।

নির্ভয় ॥ মৃন্ময়বাবু, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? রাত নটায় ওষুধ খেয়ে আপনার ঘুমিয়ে পড়বার কথা। নাঃ, দেখছি ঐ উর্বশীই আপনাকে খেলো। (গৌতমকে) গৌতমবাবু, আপনার বন্ধুর জন্যে কাল থেকে অন্য ডাক্তার দেখুন। আমাকে মাপ করবেন। দুশোর ওপরে যার ব্লাডপ্রেসার, সে যদি—

গৌতম ॥ (মৃন্ময়কে) কলকাতা থেকে তোমাকে দার্জিলিঙে যে ধ'রে

এনেছি, সে কি তোমাকে এ ভাবে মরতে দেওয়ার জন্যে ? এতবড় একটা শিল্পী যদি এমনিভাবে আমার বাড়িতে অপঘাতে মারা যায়, দেশের লোক কি আমাকে ক্ষমা করবে ?

কৃপা ॥ উনি ম'রে বাঁচবেন দাদা। স্বর্গে গিয়ে জলজ্যান্ত উর্বশী লাভ হবে।

গৌতম ॥ তা তো হবে, কিন্তু দেশের লোক যে এদিকে আমাদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে।

মৃন্ময় ॥ (করযোড়ে) আচ্ছা, আচ্ছা, আর এক ঘণ্টা।

নির্ভয় ॥ আমি চললাম গৌতমবাবু। [প্রস্থানোদ্যত]

মৃন্ময় ॥ আচ্ছা, আচ্ছা....(কৃপাকে) কই, কোথায় ওষুধ, দাও। আমি শুয়ে পড়ছি।

[কৃপা ঔষধ আনিয়া মৃন্ময়কে খাইতে দিল]

গৌতম ॥ হ্যাঁ, এইটাই হ'ল সুবোধ বালকের কথা। পাগলামি করলে তো চলবে না ভাই মৃন্ময়। মনে রেখো, দেশ এখনও তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছে। অবশ্য একদিন ছিল যখন তোমার মধ্যে এই প্রতিভার আগুন আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি। সেই যখন দুজনে স্কুলে পড়তাম। বুঝলেন ডাঃ বোস, মৃন্ময় মামার বাড়িতে মানুষ। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আমি ওর তুলি রঙ কিনে দিয়েছি। আজ আমি রেশম-পশমের কাপড়ের ব্যবসা ক'রে টাকা করেছি। কিন্তু টাকার গর্ব আমার গর্বা নয়! আমার গর্বা—ও আমার বন্ধু। মৃন্ময় দেশের লোকের কাছে যত বড় হচ্ছে, আমার গর্ব তত বেড়ে উঠছে ওর চিকিৎসা আপনাকেই করতে হবে। ওকে আমি হারাতে পারি না—পারি না ডাঃ বোস।

নির্ভয় ॥ (মৃন্ময়কে) হ্যাঁ, ওষুধপত্র খেয়ে, নিয়মমত থেকে আগে আপনি সেরে উঠুন, তারপর উর্বশীকে আপনি গড়ুন।

কৃপা ॥ ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু। গড়াই বা কেন, উনি যদি উর্বশীকে স্বর্গ থেকে বেঁধে নিয়ে আসেন তাতে আমরা আরও খুশি হব।

নির্ভয় ॥ যা বলেছেন।

গৌতম ॥ এবার শুয়ে পড়, আমরা চলি।

[গৌতম ও নির্ভয় চলিয়া গেলেন। মৃন্ময় তাহার শোবার ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। কৃপা তাহার সামনে আসিল।]

কৃপা ॥ তা হ'লে সত্যি শুতে যাচ্ছেন ?

মৃন্ময় ॥ অগত্যা।

কৃপা ॥ ভেবে দেখুন, কালও আপনি ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু দুপুর রাত্রে কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এসে দেখি, আপনার শোবার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আপনি নেই, এখানেও নেই।

মৃন্ময় ॥ তুমি জানো দেখছি। কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না। ভাবছিলাম উর্বশীকে একটি শাড়ি পরালে কেমন দেখায়! কি রঙের কোন্ শাড়ি পরাব তাও ভাবছিলাম। তখন মনে হ'ল ঐ দরজা দিয়েই তো তোমার দাদার শাড়ি-কাপড়ের দোকানঘরে যাওয়া যায়। নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারলাম না। ঐ পথে ঢুকে পড়লাম তোমার দাদার দোকানের ভেতর। আলো জেবলে শাড়ি বাছছিলাম। হয়তো তুমি তখন এসে থাকবে।

কৃপা ॥ হ্যাঁ, আপনি উঠে আসছেন শব্দ পেয়েই আমি চ'লে গেলাম। কিন্তু আপনি যখন ফিরে এলেন, আপনার হাতে তো কোন শাড়ি দেখলাম না!

মৃন্ময় ॥ আনলাম না, আনলাম না। শাড়িগুলো দেখতে দেখতে আমার মনে হ'ল, কার জন্যে আমি শাড়ি বাছছি। সৌন্দর্যের নগ্ন আভরণই না তার বসন! কিন্তু আর বেশি বকলে—তুমিই আমাকে বকবে কৃপা। আচ্ছা।

[মৃন্ময় ভিতরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কৃপা মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ক্ষণকাল পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। মৃন্ময় তাহার শয়নকক্ষ হইতে সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিল। ঘরের অন্যান্য দরজাগুলি বন্ধ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিল এবং কৃপা যে-দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল তাহা বন্ধ করিয়া দিল। তৎপর কক্ষের শেডের ল্যাম্প জ্বালাইয়া মূর্তিটির কাছে বাতিদানের উপর রাখিল। ইহাতে সে এবং মূর্তিটি আলোকিত হইল। কক্ষের অন্যান্য অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিল। তারপর মৃন্ময় নির্নিমেষ নেত্রে মূর্তিটির পানে তাকাইয়া রহিল এবং ক্ষণপরে তুলি লইয়া মূর্তির চক্ষুদান করিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করিল।]

"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা ॥"

[মূর্তির পশ্চাতে খিলখিল হাসি শোনা গেল। মৃন্ময় চমকিয়া উঠিল।]

মৃন্ময় ॥ কে?

[মূর্তিটির পশ্চাৎ হইতে আবির্ভূতা হইলেন স্বয়ং উর্বশী]

উর্বশী ॥ আমি। উর্বশী।

মৃন্ময় ॥ উর্বশী! সে কি!

উর্বশী ॥ চক্ষুদানের অপেক্ষায় ছিলাম। চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মৃন্ময় ॥ তুমি! তুমি! উর্বশী!

উর্বশী ॥ উর্বশী।

মৃন্ময় ॥ আমার বাল্যের কল্পনা, যৌবনের স্বপ্ন উর্বশী!—তুমি!

উর্বশী ॥ আমি।

মৃন্ময় ॥ আমার কামনা—আমার সাধনা—আমার তপস্যা—

উর্বশী ॥ আমাকে টেনে এনেছে তোমার কাছে—ছিনিয়ে এনেছে স্বর্গ থেকে, দেবসভার মধ্য থেকে।

মৃন্ময় ॥ উর্বশী! উর্বশী! তুমি! আমি তোমাকে দেবসভা থেকে ছিনিয়ে এনেছি!

উর্বশী ॥ তুমি আমায় চেয়েছিলে। আমি তোমায় চেয়েছিলাম। তাই তুমি পেয়েছ। তাই আমি এসেছি।

মৃন্ময় ॥ না না, এ স্বপ্ন, স্বর্গের উর্বশী ধরা দেবে মর্ত্যের মানুষের কাছে?

উর্বশী ॥ তুমি ভুলে গেছ পুরূরবার কথা, ভুলে গেছ অর্জুনের কথা। তাঁরা স্বর্গের দেবতা ছিলেন না—ছিলেন এই মর্ত্যেরই মানুষ।

মৃন্ময় ॥ পুরূরবা ছিলেন বিশ্ববিজয়ী সম্রাট, অর্জুন ভুবনবিজয়ী বীর আর আমি সামান্য মৃৎশিল্পী। না না, এ স্বপ্ন, এ স্বপ্ন।

উর্বশী ॥ কে বলে, তুমি সামান্য মৃৎশিল্পী? কে বলে এ স্বপ্ন? আমাকে তুমি ছুঁয়ে দেখ—

মৃন্ময় ॥ না, না—

উর্বশী ॥ বেশ, তবে আমিই তোমাকে—

[উর্বশী বামহস্তে মৃন্ময়ের হাত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহাতে চিমটি কাটিল।]

মৃন্ময় ॥ উঃ, উঃ!

[উর্বশী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

উর্বশী ॥ এখনও বলবে—স্বপ্ন?

মৃন্ময় ॥ না না, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়। কিন্তু আমার এ কি সৌভাগ্য! তোমার এ কি দয়া! কে তুমি আর কে আমি!

উর্বশী ॥ কেন, তুমি মৃন্ময় ভাস্কর। কলকাতা আর্ট স্কুলের সেরা ছাত্র।

ম-৪১৭

দিল্লীতে গেল ডিসেম্বর মাসে যে ইণ্টার-ন্যাশনাল আর্ট এক্‌জিবিশন হয়েছিল, তাতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছ তুমি।

মৃন্ময় ॥ আমার সে মূর্তিটি ছিল—নৃত্যরতা উর্বশীর।

উর্বশী ॥ আমি তা দেখেছি।

মৃন্ময় ॥ দেখেছ? কি ক'রে দেখলে?

উর্বশী ॥ কেন, স্বর্গ থেকেই দেখেছি। একমনে যখন তুমি আমায় ধ্যান কর, আমার দেহটাই শুধু প'ড়ে থাকে স্বর্গে। আমার চোখ, আমার মন, তখন খুঁজে বেড়ায় শুধু তোমাকে।

মৃন্ময় ॥ কি বলছ তুমি? এসব আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ উর্বশী?

উর্বশী ॥ হ্যাঁ, নয়তো কি ক'রে আমি জানি, তোমার ব্লাডপ্রেসার আজ দুশো দশ।

মৃন্ময় ॥ ব্লাডপ্রেসার—সেও তুমি জানো। কিন্তু এসব ইংরেজী শব্দই বা কি ক'রে জানলে তুমি?

উর্বশী ॥ এখন যাঁরা স্বর্গে যাচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগই তো মরছেন ব্লাড-প্রেসারে। তাঁদের কাছেই শুনেছি, শিখেছি। আজ দুশো বছর ধ'রে স্বর্গের আত্মাদের কাছে এত ইংরেজী শুনেছি যে, আমাকে অনায়াসে তুমি আমেরিকা নিয়ে যেতে পার আজ।

মৃন্ময় ॥ নৃত্যরতা উর্বশী-মূর্তিটা এক আমেরিকানই কিনে নিয়েছে দশ হাজার টাকায়। জানো?

উর্বশী ॥ কেন জানব না! সাহেবটির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন তোমার কাছে। ঐ নাচ দেখতে যাবেন।

মৃন্ময় ॥ সে যে কি বিপদ, দেখেছ তবে! অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বললাম, উর্বশীর নাচ দেখতে হ'লে রতে হবে, যেতে হবে স্বর্গে।

উর্বশী ॥ সাহেবটি ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, তবে তুমি কি ক'রে এ নাচ দেখলে? তুমি তো আর মর নি। দশ হাজার টাকার খদ্দের। জবাব না দিলেও নয়। তোমার দুরবস্থা দেখে আমার এমন হাসি পাচ্ছিল।

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, শেষে মেমসাহেবটি বলে কি না—আমাকে ঐ নাচ শিখিয়ে দাও।

উর্বশী ॥ শেখাতে হ'ল, তাও আমি দেখেছি। সেদিন সন্ধ্যায় তোমার ফ্ল্যাটে।

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, ভাগ্যিস গ্রামোফোনের 'উর্বশী-নৃত্য' রেকর্ডটা ছিল। সেটা বাজিয়ে তারই তালে তালে—উঃ, সে কি তাণ্ডব!

উর্বশী ॥ না না, মন্দ হচ্ছিল না। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল নাচি।

মৃন্ময় ॥ নাচবে, তুমি নাচবে? রেকর্ডটা আমার আছে।

[মৃন্ময় ছুটিয়া গিয়া গ্রামোফোনে রেকর্ডটি চালাইয়া দিল। রেকর্ডে 'উর্বশীনৃত্য' বাজিতে লাগিল। তালে তালে উর্বশী নাচিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইলে উর্বশীর উদ্দেশ্যে মুগ্ধচিত্তে মৃন্ময় আবৃত্তি করিল।]

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

[এমন সময় বামে অবস্থিত বহির্দ্বারে করাঘাত শোনা গেল। মৃন্ময় ও উর্বশী সচকিত হইয়া উঠিল।]

মৃন্ময় ॥ (উর্বশীর প্রতি সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কৃপা।

উর্বশী ॥ জানি। গৌতমবাবুর বোন।

মৃন্ময় ॥ সঙ্গে বোধ হয় গৌতমও আছে।

উর্বশী ॥ হবে। কিন্তু আমি তো আর স্বর্গে ফিরে যেতে পারব না মৃন্ময়। আমি যে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

মৃন্ময় ॥ ফিরে যেতে তোমাকে আমি দেবও না উর্বশী।

উর্বশী ॥ কিন্তু এ বেশে আমি তো ওদের সামনে বেরুতে পারব না মৃন্ময়। একটা যদি শাড়ি-টাড়ি পেতাম—

মৃন্ময় ॥ শাড়ি? আছে। এসো।

[দরজায় করাঘাত প্রবলতর হইল। উর্বশীকে নীচে দোকানঘরে যাইবার দরজাপথে আনিয়া মৃন্ময় বলিল।]

মৃন্ময় ॥ এখনি দরজা না খুললে, ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে। এই সিঁড়িটা সোজা চ'লে গেছে নীচের দোকানঘরে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেই ডান দিকে আলোর সুইচ পাবে। আলো জ্বাললেই দেখতে পাবে থরে থরে রেশমী শাড়ি সব সাজানো রয়েছে। 'লাসা শাড়ি'টা প'রে চ'লে এসো।

উর্বশী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটে—যেটা কাল তুমি আমার জন্য বেছেছিলে।

[পুনরায় করাঘাত]

তুমি যাও, দরজা খোল। আমি সব ম্যানেজ ক'রে নেব।

[উর্বশী নামিয়া গেল। মৃন্ময় দরজা খুলিয়া দিতেই গৌতম ও কৃপা ঘরে প্রবেশ করিল।]

মৃন্ময় ॥ ব্যাপার কি বল তো?

[গৌতম ও কৃপা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।]

গৌতম ॥ আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম। ব্যাপার কি ? এত রাত্রে ঘরে নাচছিল কে ?

মৃন্ময় ॥ ও ! নাচের রেকর্ড বাজাচ্ছিলাম।

কৃপা ॥ কিন্তু কথাও শুনলাম যেন কার ?

মৃন্ময় ॥ কথা ? আমারই কথা শুনে থাকবে। হ্যাঁ, আবৃত্তি করছিলাম যে।

কৃপা ॥ না না, কোন মেয়ের গলা পেলাম যে !

[কৃপা আবার চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।]

মৃন্ময় ॥ এসো, বসো। আমি বলছি।

[তাহারা তিনজনেই বসিল। মৃন্ময়ের মুখে কোন কথা জোগাইল না।]

গৌতম ॥ কি, চুপ ক'রে রইলে যে ?

কৃপা ॥ একটা গল্প তৈরি করতে সময় লাগে দাদা।

মৃন্ময় ॥ না না, গল্প নয় কৃপা। যা বলব সত্যিই বলব। কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। সত্য কথা বলতে কি,—সত্য হ'লেও আমারই কেমন অবিশ্বাস হয়। তুমি আর ডাক্তার চ'লে গেলে। কিন্তু আমার মাথায় জ্বলছিল আগুন—সৃষ্টির আগুন। চোরের মত উঠে এলাম বিছানা ছেড়ে উর্বশীর এই মূর্তির কাছে। চক্ষুদানই ছিল শুধু বাকি। আমার দেহমনের সমস্ত অনুভূতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল আমি চক্ষুদান করলাম। বিশ্বাস কর গৌতম, বিশ্বাস কর কৃপা সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূতা হ'ল আমারই সামনে স্বর্গের উর্বশী—আমার জীবনের ধ্যান, আমার কল্পনার মানসী।

গৌতম ॥ তিনি তবে নাচছিলেন ?

কৃপা ॥ তা মন্দ হয় নি। গল্পটা আপনার ভালই ! ওঠ দাদা। ঘর-গুলো পরীক্ষা ক'রে দেখ—তোমায় আমি বলব না দাদা। তোমার বন্ধু খুব বড় শিল্পী—এই জানতাম। শ্রদ্ধাও করতাম প্রচুর। কিন্তু আজ জেনে গেলাম, শিল্পসৃষ্টির চেয়ে মিথ্যার জাল বুনতেই উনি আরও বেশি দক্ষ।

[কৃপা চলিয়া যাইতেছিল]

মৃন্ময় ॥ কৃপা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। জানি, আমার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তবু জেনে যাও—এ সত্য, এ সত্য।

[এমন সময় বধূবেশে শাড়িপরিহিতা উর্বশীর প্রবেশ।]

উর্বশী ॥ না না, সত্য নয়। আমি বলছি এ সত্য নয়, মিথ্যা। সত্য যদি শুনতে চান—দাঁড়ান, আমি বলছি।

[কৃপা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইল।]

উর্বশী ॥ আমি ওঁর স্ত্রী। উর্বশী নই, মানসী। আমার নাম মানসী।

গৌতম ॥ আপনি যখন বলছেন, বিশ্বাস না ক'রে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে ঠকা ভাল। আপনি বলুন মানসী দেবী।

উর্বশী ॥ কিন্তু বিশ্বাস আপনি করতে পাচ্ছেন না আমি জানি। আপনি ওর আবাল্য বন্ধু, প্রিয়তম বন্ধু। ভাবছেন, মৃন্ময় বিয়ে করল আর আমি জানলাম না! কিন্তু আপনাদের না জানবার কারণও ছিল অনেক গৌতমবাবু। ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আপনি বিলেতে ছিলেন। তখন আমি ওর মডেল উর্বশীর. যে সব মূর্তির জন্যে আজ দেশে-বিদেশে ওর এত খ্যাতি সে উর্বশীর মডেল আমি। ঘৃণায় ভাই-বোনে এতক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকান নি। কিন্তু দয়া ক'রে একটিবার তাকিয়ে দেখুন, আমার কথা মিথ্যা নয়।

গৌতম ॥ তা অবশ্য মিথ্যা নয়।

কৃপা ॥ কিন্তু তাতে বিয়েটা প্রমাণ হয় না মানসী দেবী।

উর্বশী ॥ তা হয় না জানি আপনারা জানেন না ব'লেই আমাদের বিয়েটা মিথ্যা প্রমাণ হবে—এই বা কি কথা কৃপা দেবী? এই ধরুন আপনার কথা। আপনার অনেক কথাই হয়তো আপনার দাদা জানেন না। তাই ব'লে সেটা তো আর মিথ্যা নয়। বিয়েটা গোপন রাখার কারণ ছিল এই, আমার পিতৃপরিচয় ছিল না। কোথা থেকে কেমন ক'রে কোন্‌দিন যে এ জগতে এসেছিলাম, আমি বলতে পারি না। আর তা ছাড়া. আমি শুধু একজনের প্রেয়সী ছিলাম না। এবার কথাটা হয়তো বুঝছেন গৌতমবাবু? স্বর্গের উর্বশী, সেও ছিল বিশ্বের প্রেয়সী—তবু দেবসমাজে তার আদরই ছিল। কিন্তু আপনাদের সমাজে আমার স্থান হয় নি—হতে পারে নি গৌতমবাবু।

গৌতম ॥ কিন্তু মৃন্ময়, আমি কি তোমার এতই পর যে, আমাকেও এ কথা বলতে তোমার বেধেছিল?

উর্বশী। ওর হয়তো বাধত না। কিন্তু বাধা দিয়েছি আমিই। সংসারটা শুধু পুরুষদের নয়—মেয়েদেরও। সামাজিক অনাচার পুরুষরা হয়তো সইতে পারে, কিন্তু মেয়েরা পারে না। কৃপা দেবীর কথাই ধরুন। আমি গোত্রহীন, আমি বারাঙ্গনা, কিন্তু আমি ওর বিবাহিতা বধূ—এ কথাও সত্য। গ্রহণ করবেন আপনারা আমাকে? এই গৃহে?

গৌতম ॥ বিয়েই যখন হয়েছে, অতীত আমরা দেখব না মানসী দেবী। দেখব বর্তমান, দেখব ভবিষ্যৎ, কি বলিস কৃপা?

কৃপা ॥ (চেষ্টা করিয়া হাসিয়া) অত সব বুঝি না, ওঁর যখন বউ, আমার তখন বউদি। কিন্তু বউদি, তুমি ম্যাজিকও জান, না? কি ক'রে সবার চোখে ধুলো দিয়ে রাত দুপুরে এ ঘরে এলে বল তো?

উর্বশী ॥ ম্যাজিক ভাই আমি জানি না। সে জানেন তোমার দাদা।

ব্লাডপ্রেসার দুশো হয়েছে দেখে হয়তো বাঁচবেন না ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলেন। কখন কি হয় ভেবে গোপনে আমায় খবর দিয়েছিলেন—ওগো, এসে শেষ দেখা দেখে যাও। যাবার আগে সবাইকে ব'লে দাও, তুমি আমার কে? এরোপ্লেনে এসে আজই এখানে বিকেলে পেঁৗছেছি। তোমার দাদা পথ চেয়েই বসেছিলেন। ট্যাক্সি থেকে নামতেই নিয়ে যান আমাকে পার্কে। সেখান থেকে এক হোটেলে গিয়ে দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে ঢুকি এই ঘরে। মূর্তি গড়বার ছলে দোর বন্ধ ক'রে কেবলই আলোচনা করেছেন—পরিচয় দেবেন কি দেবেন না! বাইরে তোমার গলা শুনে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ভেতরে। এলে তুমি, এলেন উনি, এল ডাক্তার।

কৃপা ॥ তার পর সব অবশ্য সব জলবৎ তরলং। ওঠ দাদা, আর ভাবনা নেই, সত্যিকার ওষুধ এসে গেছে।

গৌতম ॥ তা আর বলতে! আচ্ছা, গুড নাইট—লাকি ডগ। নমস্কার বউদি। আয় কৃপা। রাতও অনেক হয়েছে।

কৃপা ॥ হ্যাঁ, খান দুই রেকর্ড বাজালেই রাত ভোর হয়ে যাবে। আচ্ছা বউদি, শুভরাত্রি। ফুলশয্যাটা কিন্তু বাকি থাকল, সেটা হবে কাল।

[গৌতম ও কৃপা চলিয়া গেল। উর্বশী তাহাদের বিদায় দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া মৃন্ময়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

উর্বশী ॥ কি গো, কি ভাবছ?

মৃন্ময় ॥ বলবার ভাষা নেই। অবাকবিস্ময়ে তোমায় দেখছিলাম, তোমার কথা শুনছিলাম।

"যুগ-যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।"

[উর্বশী রহস্যময় হাতছানিতে মৃন্ময়কে আমন্ত্রণ জানাইয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিল। মৃন্ময় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছিল। পুনরায় করাঘাত।]

মৃন্ময় ॥ এ কি? এত রাত্রে আবার কে? তুমি ভেতরে থাকো, আমি দেখছি।

[দরজা খুলিতেই পিলপিল করিয়া উর্বশীর অষ্টসখী—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ; এবং উর্বশীর বাদক চতুষ্টয়—চিত্রসেন, সুষেণ, ঈশান ও বিষাণ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।]*

মৃন্ময় ॥ কে—কে আপনারা ?

[উর্বশী শয়নকক্ষের দরজাপথে উঁকি দিয়া ইহাদের দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।]

উর্বশী ॥ তোমরা !

চিত্রসেন ॥ যাক, তবে তোমাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি দেবী।

প্রথমা ॥ সখী, কি কাণ্ড করেছ বল তো ! স্বর্গ থেকে এমন ক'রে উধাও হ'লে কেন সখী ?

দ্বিতীয়া ॥ আর কাউকে না বল, আমাদের তো ব'লে আসতে হয় !

তৃতীয়া ॥ আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসতেই বা দোষ কি-ছিল সখী ! তোমাকে ছেড়ে আমরা কি ক'রে বাঁচি।

চতুর্থী ॥ কাউকে কিছু না ব'লে এমন ক'রে পালালে—আমরা ভেবে মরি।

পঞ্চমী ॥ স্বর্গে তো হুলস্থুল বেধে গেছে। জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। দৈত্যদের দিন বুঝি আবার এল—সবাই ভাবছে।

ষষ্ঠী ॥ দেবরাজ চ'টে আগুন।

সপ্তমী ॥ প্রথমে আগুন, শেষটায় ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী হয়েও এখন খোঁজ হ'ল না, তখন দেবরাজ যে দেবরাজ তিনিও বুক চাপড়াচ্ছেন।

অষ্টমী ॥ দেবতারাও। স্বর্গে 'হায় হায়' রব উঠেছে। স্বর্গের গেজেটে কালো বর্ডার দিয়ে নিরুদ্দেশের সংবাদ বেরিয়েছে।

উর্বশী ॥ থাম্ তোরা। (মৃন্ময়কে) এরা আমার অষ্টসখী। আর এ গন্ধর্ব চারজন—চিত্রসেন, সুষেণ, ঈশান, বিষাণ। কিন্তু তোমরা যে এলে, কি ক'রে জানলে আমি এখানে ?

প্রথমা ॥ চন্দ্রদেব তোমায় এ দিকে আসতে দেখেছেন।

দ্বিতীয়া ॥ আর পবনদের কানে কানে ব'লে দিয়েছেন, পথের খবর—বাড়ির সন্ধান।

তৃতীয়া। সখী, এখনো ফিরে চলো। নইলে আর রক্ষা নেই।

উর্বশী। ফিরে যেতে হয়—তোরা যা। আমি যাব না।

সুষেণ ॥ না, এ রাত্রে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। বাইরে যা শীত ! হাড়গুলো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল।

ঈশান ॥ এ রাত্রে বাইরে গেলে আর প্রাণে বাঁচব না। বরফ পড়ছে।

উর্বশী ॥ বেশ, তবে থাকো। কিন্তু ছোট্ট এই ঘরে—। (মৃন্ময়কে) কাছে কোন হোটেল-টোটেল নেই ?

---

* উর্বশী অষ্টসখী এবং বাদক চতুষ্টয় সম্পর্কিত নাট্যাংশ অপরিহার্য নয়।

মৃন্ময় ॥ কেন থাকবে না ? এই তো সামনেই প্যারাডাইস হোটেল।

সকলে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা হোটেলে থাকব। খানা খাব।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু এমন চেঁচামেচি করলে তো হোটেলে থাকতে দেবে না। আর এত রাত্রে হোটেল খোলাও নেই।

উর্বশী ॥ রাতটুকু এই ঘরে যে যেখানে পার গড়িয়ে নাও। কাল হোটেলে যাবে। চেঁচামিচি ক'রো না। এর ব্লাডপ্রেসার আছে। দুশো, না ?

মৃন্ময় ॥ দুশো ছিল। এখন বোধ হয় দু হাজার।

উর্বশী ॥ ভাববার কথা হ'ল। এরা এল, কাল হয়তো দেবতারাই এখানে এসে পড়বেন। এত সব সামলাবে কি ক'রে ?

মৃন্ময় ॥ কালকের ভাবনা কাল। আজ যে রাতটুকু আছে, সেটুকু আমায় দাও। এসে আমায় বল—

"কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ-দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে,
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।"

উর্বশী ॥ এস।

[মৃন্ময়কে লইয়া উর্বশী শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। বাদকগণ বাদ্যযন্ত্রের মূর্ছনায় তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। আধুনিকতম বেশভূষাপরিহিতা, প্রসাধনরম্যা উর্বশী ও মৃন্ময় সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া সবেমাত্র ঘরে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী ভৃত্য বাহাদুর ট্রেতে একখানি কার্ড আনিয়া মৃন্ময়ের সামনে ধরিল।]

মৃন্ময়। (ট্রে হইতে কার্ড তুলিয়া পড়িল) চতুর্ভুজ ত্রিবেদী।

উর্বশী ॥ কে ইনি।

মৃন্ময় ॥ প্যারাডাইসের ম্যানেজার, যে হোটেলে তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি।

উর্বশী ॥ প্যারাডাইস মানে স্বর্গ না?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ। তা ঠিকই হয়েছে। Paradise lost—Paradise regained মানে, স্বর্গভ্রষ্ট হয়েও আবার স্বর্গলাভ। (বাহাদুরকে) যাও, সেলাম দাও।

[বাহাদুর চলিয়া গেল।]

কিছু একটা ঘটেছে। নইলে ম্যানেজার এমন সময় দেখা করতে আসছে কেন?

[চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর প্রবেশ।]

চতুর্ভুজ ॥ এই যে স্যার, নমস্কার। আচ্ছা সব প্যাসেঞ্জার আমার কাছে পাঠিয়েছেন!

মৃন্ময় ॥ কেন? কি হয়েছে?

চতুর্ভুজ ॥ আপনি তো বলেছিলেন স্যার, 'ভরত-নাট্য-সংসদে'র এঁরা সব শিল্পী, দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছেন। শুনে আমি ওঁদের এক নম্বর ঘরে রেখেছি, এক নম্বর খানা দিয়েছি। লাঞ্চ খেয়ে সেই যে তাঁরা বেরিয়েছেন, সন্ধ্যা হয়ে এল—এখনও তাঁদের দেখা নেই।

উর্বশী ॥ তাই তো! গেল কোথায়?

মৃন্ময় ॥ নতুন এসেছে, হয়তো শহর ঘুরে দেখছে।

উর্বশী ॥ না না, ভাবনার কথা হ'ল। বিদেশ বিভুঁই—হয়তো কোন বিপদেই পড়েছে।

মৃন্ময় ॥ (চতুর্ভুজকে) লোকজন পাঠিয়ে খোঁজ করুন মশাই।

চতুর্ভুজ ॥ সে কি আর বাকি রেখেছি স্যার? যাকে বলে—গরু খোঁজা খুঁজেছি। না পেয়ে তবেই না খবর দিতে এসেছি।

উর্বশী ॥ বাদ্যযন্ত্র-টন্ত্র, সেগুলো কোথায়?

চতুর্ভুজ ॥ সে তো সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। (মৃন্ময়কে) আমার মাথাব্যথা তো ঐখানে স্যার। পাওনা আদায়ের আর কোন চান্স নেই।

উর্বশী ॥ (মৃন্ময়কে) ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস কর তো, কত পাওনা হয়েছে?

চতুর্ভুজ ॥ আজ্ঞে, সাত টাকা ক'রে দিন বারোজনে চুরাশি টাকা। আর এক্সট্রাও খেয়েছেন প্রায় শ'খানেক টাকা।

মৃন্ময় ॥ এক্সট্রা খেয়েছেন শ'খানেক টাকা?

চতুর্ভুজ ॥ মানে—স্যার, চপ কাটলেট, চিকেন, পোলাও, কোর্মা, কালিয়া

কাবাব—হোটেলে যা ছিল সব কাবার করেছেন। শেষটায় পাশের হোটেল থেকে সাপ্লাই দিতে হয়েছে। এর ওপর ড্রিঙ্কসের বিল—চেখে দেখতে গিয়ে বোতলে বোতলে চলেছে।

মৃন্ময় ॥ এই সেরেছে! যাক, আজ ওরা না ফিরলে কাল আমাকে বিল দেবেন। কিন্তু শুনুন, এ নিয়ে আর থানা-পুলিস করবেন না।

চতুর্ভুজ ॥ না, আপনি যখন বলছেন—আচ্ছা, আসি। নমস্কার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ভাস্কর। (প্রস্থান)

উর্বশী ॥ টাকা দিয়ে না হয় ম্যানেজারকে ঠাণ্ডা করলে। কিন্তু এরা গেল কোথায়? ড্রিঙ্কস মানে তো মদ? ডোবালে দেখছি। কিন্তু এরা হারিয়ে গেলে তো আমি বাঁচব না মৃন্ময়। চল, আমরাও একবার খোঁজ ক'রে আসি।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু এখন যাই কি ক'রে? কৃপা আর গৌতম তাদের বন্ধু-বান্ধবদের কয়েকজনকে এই সন্ধ্যায় চায়ের নেমন্তন্ন করেছে—তোমার সম্মানে। (ঘড়ি দেখিয়া) হ্যাঁ, সাড়ে ছটা বাজে। সময় হয়ে এল।

[এমন সময় কৃপার প্রবেশ।]

কৃপা ॥ এই যে বউদি। হ্যাঁ, চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। মৃন্ময়বাবু কাল রাত্রে প্রথমটায় তোমাকে উর্বশী ব'লে চালাতে চাচ্ছিলেন। খুব দোষ হ'ত না তাতে। সত্যিই তুমি উর্বশী।

মৃন্ময় ॥ কে উর্বশী, কে রম্ভা—সেটা ঠিক হোক। আমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

কৃপা ॥ তুমি আশ্চর্য বউদি! মরা মানুষকে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছ। সকাল থেকেই দেখছি। ব্লাডপ্রেসারের রোগী ব'লে ওঁকে আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কিন্তু বউদি, তবু বলব, ডাঃ বোসের দেওয়া ওষুধ দিনে তিনবার ক'রে খাওয়াতে ভুলো না। আর পথ্যও তিনি যা বলেছেন—তাই খাওয়ানো উচিত।

উর্বশী ॥ তা কি খান নি?

কৃপা ॥ না, খান নি। আমি চেষ্টা করেছিলাম। "ওসব ঢের হয়েছে আর নয়" এই ব'লে আমাকে উনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

উর্বশী ॥ তোমার কথাই যখন রাখেন নি ভাই, আমি নতুন এসেছি—আমি বললে কি আর শুনবেন?

কৃপা ॥ আমি দেখতে চাই—শোনেন কি না আমি দেখতে চাই।

[গৌতমের প্রবেশ]

গৌতম ॥ এই যে বউদি, আমার বরাত ফিরিয়ে দেবে দেখছি!

উর্বশী ॥ আমি! আপনার বরাত ফিরিয়ে দেব! কেন বলুন তো?

গৌতম ॥ আমার দোকানের সেরা শাড়িখানা প'রে তুমি পথে বেরিয়েছ। লোকের চোখে এমন লেগে গেছে যে, একদিনেই এগারোখানা শাড়ি বিক্রি ক'রে আসছি। বউদি, সেই যখন এলে—দশ বছর আগে এলে না কেন?

[বলিতে বলিতে গৌতম এক প্যাকেট উর্বশীর স্বর্গীয় পোশাক বাহির করিয়া উর্বশীকেই দিয়া বলিল।]

বউদি, খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এই শাড়িখানা পেলাম। এ যে কবে কোত্থেকে আনিয়েছি—কেউ মনে করতে পারছে না। কিন্তু জিনিসটা চোখ-ঝলসানো। এই শাড়ির ফ্যাশানটা একবার চালু ক'রে দাও দেখি। আমি একটা ফ্যাক্টরি খুলে দিই। এই এক ডিজাইনেই আমার বরাত ফিরে যাবে। নাম দিচ্ছি—অপ্সরা শাড়ি।

উর্বশী ॥ বাঃ, এ তো বেশ শাড়ি। (কৃপাকে) কি বল ভাই?

কৃপা ॥ আমি হচ্ছি ভাই আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর রাখি না।

উর্বশী ॥ ও।

গৌতম ॥ বিয়ের বছরই বিধবা হয়েছে। আমার এই বোনটি আমার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ।

কৃপা ॥ থাক্ দাদা। কিন্তু ডাঃ বোস তো এখনও এলেন না?

গৌতম ॥ ডাক্তার লোক, কত কল! চায়ের আসর ভাঙবার মুখে ও ঠিক আসবে।

কৃপা ॥ আমি নেমন্তন্নের কথা বলছি না দাদা, রোগীর কথা ভাবছি।

গৌতম ॥ রোগী আবার কে? (উর্বশীকে) বউদি, কি অমৃত পরিবেশন করেছ জানি না, মৃন্ময়কে দেখে কেবলই মনে হচ্ছে—ও যেন পুনর্জন্ম পেয়েছে।

কৃপা ॥ পুনর্জন্ম কি না জানি না। তবে এমন ভাবে দীপটা জ্ব'লে উঠেছে যে, নিবে না যায়—সেই ভয়। আমি ডাঃ বোসকে ফোন করছি।

গৌতম ॥ কিন্তু আমার মনে হয় কৃপা, মৃন্ময় আজ চিকিৎসার বাইরে। না বউদি, তুমি অদ্ভুত, তুমি আশ্চর্য, তোমাকে নমস্কার।

[নির্ভয়ের প্রবেশ]

নির্ভয় ॥ নমস্কার মিসেস ভাস্কর। সকালে আপনাকে বলেছিলাম, চায়ের আসরে আসব। কথা রাখতেই এসেছি। কিন্তু এখুনি ছুটি চাই। একটা ডেলিভারী কেস ফেলে এসেছি।

উর্বশী ॥ না না, সে কি! আপনি তবে আসুন।

কৃপা ॥ কিন্তু মৃন্ময়বাবুর প্রেসারটা আপনি একবার চট্ ক'রে দেখে যাবেন না ডাক্তার বোস?

উর্বশী ॥ না না, তিনি বেশ আছেন। খুব ভাল আছেন। প্রেসারটা দেখতে গেলেই বরং তাঁর প্রেসারটা বাড়বে।

গৌতম ॥ না না, মৃন্ময়ের জন্যে আর ভাবি না। আপনি বরং যদি পারেন কলটা অ্যাটেন্ড ক'রে আসবেন।

কৃপা ॥ (ডাক্তারের প্রতি মিনতি-ভরা চোখে) আপনাকে আসতে হবে, আসতেই হবে ডাক্তারবাবু।

নির্ভয় ॥ আসব বইকি কৃপা, সময় পেলে নিশ্চয় আসব। (প্রস্থান)

গৌতম ॥ আমিও চলি। দেখি কেউ এলেন কি না! বউদি, চট্ ক'রে শাড়িটা পালটে এটা প'রে এসো। (প্রস্থান)

উর্বশী ॥ (কৃপাকে) তা হ'লে ভাই, আমিও চলি। তোমার দাদার যা তাড়া!

[উর্বশী যাইতেছিল, এমন সময় মৃন্ময়ের প্রবেশ]

মৃন্ময় ॥ (উর্বশীকে) এ কি? তুমি এখনও এখানে? শাড়িটা পালটে নেবে না?

উর্বশী ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি। (প্রস্থান)

মৃন্ময় ॥ (কৃপাকে) না কৃপা, এই উৎসবের দিনে তুমি অন্তত একটা গরদের শাড়ি প'রে এসো।

কৃপা ॥ তার কোন দরকার আছে মৃন্ময়বাবু? চন্দ্র একাই সমস্ত অন্ধকার হরণ ক'রে থাকেন। আপনার যা সাজসজ্জা দেখছি, চন্দ্রকেও আপনি হার মানিয়েছেন আজ

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, ডাক্তার বোসও আজ দুপুরে বলছিলেন—মরা গাঙে যেন জোয়ার এসেছে। সত্যি কৃপা, আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করছে।

কৃপা ॥ সবাই চায়, আপনি বাঁচুন। আপনি দেশের শিল্পজগতের আশা-ভরসা। আপনার জীবনের ওপর দেশের লোকের দাবি আছে মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় ॥ ও, বুঝেছি—ভূমিকা শুনেই বুঝেছি। ওষুধ খেতে বলবে তো?

কৃপা ॥ নিশ্চয় বলব।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু তোমার বউদি বলছেন, ওষুধ খেতে হবে না। সব চেয়ে বড় ওষুধ—আনন্দ। সে ওষুধ তোমার বউদি এনেছেন।

কৃপা ॥ হ্যাঁ, আনন্দ—পতঙ্গ যে আনন্দে আগুনে ঝাঁপ দেয়। বেশ, খাবেন না।

[কৃপা দ্রুত হলঘরের দিকে চলিয়া গেল। অপর দরজা দিয়া হন্তদন্ত হইয়া গৌতমের প্রবেশ।]

গৌতম ॥ মৃন্ময়, তুমি কি 'ভরত-নাট্য-সংসদে'র সদস্যদের এখানে আসতে বলেছ ?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ। তারা এসেছে ? কোথায় তারা ? মানসীর সঙ্গেই কলকাতা থেকে ওরা এসেছে— প্যারাডাইসে উঠেছিল।

গৌতম ॥ ওরে বাবা! তাই নাকি! না ভাই, তুমি ওদের সামলাওগে।

[বহির্দ্বারে চিত্রসেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

চিত্রসেন ॥ (নেপথ্যে) দেবী, দেবী! কোথায় তুমি ?

গৌতম ॥ (পশ্চাতে তাকাইয়া) ঐ যে এঁরা এখানেই এসে পড়েছেন। (সদস্যদের প্রতি) আসুন আসুন। বসুন।

[গন্ধর্ব চতুষ্টয় এবং অষ্টসখীর প্রবেশ।]

মৃন্ময় ॥ (গৌতমকে) তা হ'লে আর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের এখানেই নিয়ে এসো গৌতম। 'ভরত-নাট্য-সংসদে'র সদস্য এঁরা। একটু স্বর্গীয় নৃত্যগীত আমরা আশা করব বইকি!

গৌতম ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি সব ডাকছি।

[গৌতমের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময় রুদ্রমূর্তি ধারণ করিল।]

মৃন্ময় ॥ (গর্জন করিয়া) সারাদিন কোথায় ছিলেন আপনারা ?

চিত্রসেন ॥ সে যা বিপদ গেছে, তা একমাত্র বিষ্ণুই জানেন।

মৃন্ময় ॥ ছিলেন হোটেলে—খাস দার্জিলিঙে। বিপদ আবার কিসের ?

সুষেণ ॥ স্যার, পদে পদে বিপদ। বিশেষ এই মেয়ের দঙ্গল নিয়ে।

ঈশান ॥ এই জন্যেই শাস্ত্রে আছে "পথি নারী বিবর্জিতা।"

বিষাণ ॥ এদের নিয়ে যে ঘরে ফিরতে পেরেছি—এই ঢের স্যার।

মৃন্ময় ॥ কেন, কি হয়েছিল ?

চিত্রসেন ॥ খাওয়া-দাওয়া সেরে শহর দেখতে পথে বেরুতেই—সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জ'মে গেল।

সুষেণ ॥ সবার মুখেই এক কথা—আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি ?

মৃন্ময় ॥ নিশ্চয় বলেছেন—স্বর্গ থেকে নেমেছেন, উর্বশী দেবীর দলবল ?

ঈশান ॥ এত ক'রে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তা বলব কেন ? অত বোকা আমরা নই স্যার।

বিষাণ ॥ (অষ্টসখীদের দেখাইয়া) ওদের মধ্যে ঐ প্রথমা আর দ্বিতীয়া সব কথা প্রায় ফাঁস করে আর কি! ভাগ্যিস আমি বুঝতে পেরেছিলাম! এমন কট্‌মট্‌ ক'রে তাকালাম—বাপ-মার নাম ভুলে গেছে।

চিত্রসেন ॥ আর তৃতীয়া আর চতুর্থী—ওদের সামলানোও দায়। মাথা ঘুরছিল, পা টলছিল।

ঈশান ॥ পঞ্চমী আর ষষ্ঠী তো ব'লেই বসল—স্বর্গে ওরা আর ফিরবে না। কলকাতার এক লক্ষপতি ওদের নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরুবেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। পাসপোর্ট বেরুতে যা দেরি।

পঞ্চমী ॥ কেন যাব না বলুন? স্বর্গ এত একঘেয়ে হয়ে গেছে, ভাল লাগে না—ভাল লাগে না।

স্বর্গের পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা উর্বশীর প্রবেশ।]

উর্বশী ॥ যাক, তবে তোমরা এসেছ!

মৃন্ময় ॥ এসেছেন বটে, কিন্তু কেউ আর স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন না। কলকাতার কোন লক্ষপতি তোমার এই পঞ্চমী আর ষষ্ঠীকে এরোপ্লেনে বিশ্বভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছেন।

উর্বশী ॥ সে কি?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, পাসপোর্ট বেরুতে যা দেরি।

ষষ্ঠী ॥ শুধু কি আমরাই? এই সপ্তমী আর অষ্টমী—এরাও তো কলকাতা চলল।

উর্বশী ॥ কলকাতা? কেন?

চিত্রসেন ॥ কলকাতার এক ফিল্ম-ডিরেক্টর প্যারাডাইস হোটেলেই ছিলেন। 'মদনভস্ম' বই করছেন। সপ্তমীকে সাজাবে রতি, অষ্টমীকে সাজাবে মদন। আগাম টাকা দিয়ে কনট্রাক্ট ক'রে ফেলেছে।

অষ্টমী ॥ কনট্রাক্ট শুধু আমরা করেছি! তোমরা কর নি? হ্যাঁ সখী, ঠিক হয়ে গেছে এরা সব বাজাবে। সঙ্গীত-পরিচালনা—চিত্রসেন। নৃত্য-পরিচালনা—সুষেণ, আর এই ঈশান আর বিষাণ—

ঈষাণ ও বিষাণ ॥ আমরা সব সহকারী।

উর্বশী ॥ বেশ, বেশ। স্বর্গে আর আমরা কেউ ফিরছি না।

সকলে ॥ কেউ না, কেউ না।

মৃন্ময় ॥ নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে স্বাক্ষরিত হোক এই পুণ্য প্রতিজ্ঞা।

সকলে ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

[উর্বশীর নৃত্য শুরু হইল। একে একে গৌতম, ডাঃ বোস, কৃপা, ফিল্মডিরেক্টর ত্রিভঙ্গ পাকড়াশী এবং আরও কয়েকজন অভ্যাগত কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিলেন। নৃত্যশেষে সকলে হাততালি দিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।]

ত্রিভঙ্গ ॥ (উর্বশীর প্রতি সোচ্ছ্বাসে) অপূর্ব—অভূতপূর্ব! নৃত্যের ঝলকে ঝলকে আত্মা যেন আর্তনাদ করছে। আপনাকে আমি প্রণাম করছি মানসী দেবী।

গৌতম ॥ ও, হ্যাঁ। মিঃ ত্রিভঙ্গ পাকড়াশী। এভারেস্ট ফিল্ম কোম্পানির ডিরেক্টর। বর্তমানে 'মদনভস্ম' করবেন স্থির করেছেন। (সখীদের

দেখাইয়া) এঁদের সঙ্গে নাকি কি কনট্রাক্ট হয়ে গেছে। এঁদের পিছু পিছু এসে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

ত্রিভঙ্গ ॥ এগিয়ে আসুন ধনপতিবাবু। ইনি আমাদের প্রোডিউসার ধনপতি আগরওয়ালা। আর ইনিই সেই মানসী দেবী—'ভরত-নাট্য-সংসদে'র পরিচালিকা।

[উর্বশী ও ধনপতি পরস্পর নমস্কার-বিনিময় করিল।]

ধনপতি ॥ আপনার দলবলের সঙ্গে আমাদের বাতচিত হয়ে গেছে। বাকি ছিলেন আপনি। একটু বিজনেস্ টক্ ছিল। মেহেরবানি ক'রে যদি আমার হোটেলে একবার পায়ের ধুলো দেন মানসী দেবী—

উর্বশী ॥ আপনিই কি বিশ্বভ্রমণে বেরুচ্ছেন ধনপতিবাবু ?

ধনপতি ॥ (সখীদের দেখাইয়া ওঁরা বলছিলেন বটে। তখন তো আপনাকে দেখি নি। এখন আপনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে হুকুম করুন মানসী দেবী।

ত্রিভঙ্গ ॥ ভেবে দেখুন মানসী দেবী, এ কত বড় যোগাযোগ ! ভাগ্যিস 'মদনভস্মে'র লোকেশান ঠিক করতে এসেছিলাম দার্জিলিঙে ! তবেই না দেখা অবধি মনে হচ্ছে, জন্মজন্মান্তর আমি এই শুভলগ্নটির প্রতীক্ষাতেই ছিলাম মানসী দেবী। আমার শুধু একটা নিবেদন—নামটা বদলাতে হবে। মানসী নয়, উর্বশী—স্বর্গের উর্বশী আপনি। আমি ত্রিভঙ্গ পাকড়াশী এখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছি—তুচ্ছ এই বাংলা দেশ, তুচ্ছ বোম্বে. একদিন হলিউড থেকে আপনার ডাক আসবে। আমি আপনাকে আবিষ্কার করেছি। দয়া ক'রে সেদিন আমাকে ভুলবেন না দেবী।

উর্বশী ॥ আমি ভেবে দেখব। মানে—আমার স্বামী আছেন কিনা। তাঁর মতটাও তো জানতে হবে। আপনারা বরং কাল একবার আসবেন।

ধনপতি ॥ (সখীদের দেখাইয়া) আর এঁরা ?

উর্বশী ॥ ওরা আমার দলের হলেও স্বাধীন।

ধনপতি ॥ ওসব ঠিক আছে। (সখীদের প্রতি) আসুন আপনারা, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি। (উর্বশীকে) বেশ, তা হ'লে কাল সকালে আসছি। টাকার কথা ভাববেন না। 'মদনভস্মে' তিন লাখ এরই মধ্যে ঢেলেছি। গৌরীর রোলটা আপনি যদি করেন, আমি দশ লাখ ঢালব। আচ্ছা, নমস্কার।

[উর্বশীর দলবলকে লইয়া ধনপতি ও ত্রিভঙ্গের প্রস্থান।]

মৃন্ময় ॥ ডাঃ বোস, ডাঃ বোস, আপনার যন্ত্রটা কই ? আসুন। দেখুন, আমার ব্লাডপ্রেসারটা দেখুন। আমার মাথাটা ঘুরছে।

কৃপা ॥ এই ভয়ই আমি করেছিলাম।

[কৃপা ছুটিয়া ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটি আনিতে গেল ।]

নির্ভয় ॥ (নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) আজ ওষুধ খেয়েছিলেন ?

মৃন্ময় ॥ না ।

[কৃপা ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটি লইয়া আসিল ।]

কৃপা ॥ নিন ডাঃ বোস ।

উর্বশী ॥ (মৃন্ময়কে) তোমার কি একলা থাকতে ইচ্ছা করছে ?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ । এ আলো আমি সইতে পারছি না । লোকজন আমার ভাল লাগছে না ।

নির্ভয় । হ্যাঁ, তাই বল, অ্যাব্‌সলিউট রেস্ট । কোন কথা নয়, শব্দ নয় । শুধু একজন থাকুন, যিনি নার্স করবেন ।

মৃন্ময় ॥ (উর্বশীর হাত দুইখানি টানিয়া আনিয়া) সবাই যাক, কিন্তু তুমি যেও না । তুমি গেলে আমি বাঁচব না—বাঁচব না ।

[ডাঃ বোসের ইঙ্গিতে সবাই কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন । মৃন্ময়ের কাছে শুধু উর্বশী রহিল । গৌতম যাইবার সময় সবুজ বাল্‌বটি জ্বালাইয়া দিয়া গেল । কক্ষটি স্নিগ্ধ সবুজ আলোতে রহস্যময় হইয়া উঠিল ।]

মৃন্ময় ॥ সবাই চ'লে গেছে ?

উর্বশী ॥ গেছে ।

মৃন্ময় ॥ দোর জানলা সব বন্ধ ক'রে দাও । আমাকে একা থাকতে দাও—একা—তোমাকে নিয়ে ।

[উর্বশী দরজা ও জানলা বন্ধ করিতে গেল । বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্মিত হইল । দেখিল, মৃন্ময় শয্যায় নাই, শয়নকক্ষের দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে ।]

উর্বশী ॥ এ কি ?

মৃন্ময় ॥ ব্লাডপ্রেসার, না, হাতী ! তোমাকে একলা পেতে হ'লে ব্লাড-প্রেসারের ভয় দেখানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল, বল ?

উর্বশী ॥ কি দুষ্টু তুমি, ছলনায় দেখছি দেব তাদেরও হার মানিয়েছ ।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু ছলনায় তোমার কাছে সবাই এখনও শিশু ।

উর্বশী । আমার ছলনা তুমি কোথায় দেখলে ?

মৃন্ময় ॥ তোমার যতটুকু দেখেছি সবই তো ছলনা ।

উর্বশী ॥ মানে ?

মৃন্ময় ॥ এই যে তুমি এখানে এসেছ—এ কি আমি বিশ্বাস করব যে, তুমি আমার জন্যে এসেছ ?

উর্বশী ॥ হয়তো বলেছি, মনে প্রাণে তুমি আমাকে চেয়েছিলে তাই আমি এসেছি। কিন্তু সেইটেই একমাত্র সত্য নয়। আমার নিজের কথাটা গোপন রেখেছি। সেটা যদি ছলনা হয়, তবে ছলনা ক'রেছি।

মৃন্ময় ॥ নিজের কথাটা গোপন রেখেছি?

উর্বশী ॥ তা রেখেছি। আর বললেও তুমি বিশ্বাস করতে না।

মৃন্ময় ॥ বল, যাচাই ক'রে দেখি।

উর্বশী ॥ ভাল লাগে না—স্বর্গ আর আমার ভালো লাগে না।

মৃন্ময় ॥ স্বর্গ ভাল লাগে না—বিশ্বাস করতে বলছ? তোমার অনন্ত যৌবন, অক্ষয় ঐশ্বর্য, দেবতার প্রেম, দেবতার পূজা—তুমি বলছ তোমার ভাল লাগে না?

উর্বশী। আমি বলছি, ভাল লাগে না। আমার জীবন, আমার যৌবন, আমার ঐশ্বর্য, এ যেন মানসসরোবরের অবরুদ্ধ জল। ক্ষয় নেই সত্যি, কিন্তু ক্ষয় নেই ব'লেই তাতে প্রাণ নেই। জীবন হয়েছে স্তব্ধ, অনুভূতিতে আজ আমি বৃদ্ধ, মহাকালের মত বৃদ্ধ। লোকে বলে—উর্বশী। কিন্তু জানে না, আমি আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ী। মৃন্ময়, মৃন্ময়, আজ আমার বুকে শুধু এক হাহাকার—আমার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই।

মৃন্ময় ॥ কি আশ্চর্য! তুমি চাও মৃত্যু, আমি চাই জীবন।

উর্বশী ॥ আশ্চর্য! যে যা চাই, সে তা পায় না। পাই না ব'লেই যুগে যুগে ছুটে গিয়েছি মানুষের কাছে। গিয়েছি পুরূরবার কাছে। গিয়েছি অর্জুনের কাছে। এসেছি তোমার কাছে, মৃত্যুর রূপটি দেখতে। মরণশীল মানুষের কাছে মৃত্যুর রহস্য বুঝতে।

মৃন্ময় ॥ আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ী—এসব তুমি কি বলছ? দেবতার চেয়ে মানুষকে তুমি বেশি ভালবাস?

উর্বশী ॥ (স্বপ্নাবিষ্টবৎ) বাসি। মানুষকে বেশি ভালবাসি। সত্য বটে আছে তার জরা, আছে তার দুর্গতি; কিন্তু সব কিছু শোধন হয় ঐ মৃত্যুতে—বৃদ্ধ যায়, শিশু আসে নবজন্ম নিয়ে, নবরূপে নবছন্দে। মাটির বুকে চলেছে মানুষের জীবন-যৌবনের এই চির জয়যাত্রা। মাটিকে তাই ভালবাসি, মানুষকে, তাই বরণ করি। বিধাতার কাছে আর্তকণ্ঠে কাঁদি—ফিরিয়ে নাও আমার এই অমর জীবন। আমাকে মানবী কর, মানুষের ঘরে কল্যাণী বধূ হয়ে সন্ধ্যার মঙ্গলদীপটি জ্বালাতে দাও। দুঃখ দাও, ব্যথা দাও, বেদনা দাও, অশ্রু দাও—

[এমন সময় ঊর্ধ্বলোক হইতে দৈববাণী হইল "উর্বশী।" উর্বশী এবং মৃন্ময় উভয়ে চমকিয়া উঠিল।]

উর্বশী ॥ কে?

ম-৪৩৩

দৈববাণী ॥ আমি পবনদেব। ভেবেছ, দেবতার চোখে ধূলি দিয়ে স্বর্গ থেকে পলায়ন ক'রে মর্ত্যে তুমি বাস করবে মানুষের ঘরণী হয়ে? কিন্তু ওরে পাপিয়সী, আমাকে বিভ্রান্ত করবে কে? আমি তোমাকে আদেশ করছি উর্বশী, এই মুহূর্তে তুমি স্বর্গে প্রত্যাবর্তন কর।

উর্বশী ॥ আমাকে ক্ষমা করুন পবনদেব। আমি তা পারব না, আমি যাব না।

পবনদেব ॥ রে পাপিয়সী, এত স্পর্ধা তোমার? জান এই মুহূর্তে আমি বায়ুপ্রবাহ বন্ধ ক'রে শ্বাসরোধ ক'রে তোমাদের যমালয়ে প্রেরণ করতে পারি?

উর্বশী ॥ তাই কর দেব, তাই কর। মৃত্যু দাও—আমায় মৃত্যু দাও।

পবনদেব ॥ ও! তোমার মৃত্যু নেই, তাই তোমার এত দম্ভ!

মৃন্ময় ॥ আর তা ছাড়া, দেব, উর্বশীরই যদি মৃত্যু হ'ল, স্বর্গের আর তবে কি রইল?

পবনদেব ॥ স্তব্ধ হও প্রগল্‌ভ যুবক। উর্বশী, আমি তোমাকে এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এই মুহূর্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবে কি না?

উর্বশী ॥ না দেব, আমি তো বলেছি, আমি তা পারব না।

পবনদেব ॥ উত্তম, তোমার এই দুর্বিনীত আচরণ আমি সুরসভায় এখনই উত্থাপন করছি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগে তোমার পাপাচার আমরা অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু এই কলিযুগে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দেবতামণ্ডল তোমার অনুসন্ধানরত। শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাক উর্বশী—বিদায়।

মৃন্ময় ॥ এ কি সত্য, না, মায়া? মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় এই আমার জন্যে সত্যিই কি তুমি দেবতার ক্রোধ বরণ ক'রে নেবে উর্বশী?

উর্বশী ॥ নেব, কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না সখা। আসে যদি চন্দ্র, আসে যদি সূর্য, আসে যদি যম আসে যদি ইন্দ্র—তুমি আমাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে রেখো। তুমি যেন ভয় পেয়ো না।

মৃন্ময় ॥ ভয়! আমার শুধু একটি ভয় উর্বশী শুধু একটি ভয়।

উর্বশী ॥ কি ভয়?

মৃন্ময় ॥ তুমি যদি আমার বুকে থাক, ত্রিভুবনে কোন শক্তি নেই তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু উর্বশী তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, আমার কোন শক্তি নেই—তোমাকে রোধ করি।

উর্বশী ॥ তুমি ভুলে যাচ্ছ মৃন্ময়, সুদীর্ঘ সাধনায় যে দিন ঐ মূর্তি তুমি গঠন করেছ, চক্ষুদান ক'রে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ, সেই মুহূর্তে আমি ধরা দিয়েছি তোমার হাতে, তোমাকে। যতদিন যতক্ষণ ঐ মূর্তি তোমার কাছে আছে, ততদিন ততক্ষণ এ উর্বশী দেবতার নয়—তোমার।

মৃন্ময় ॥ "স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।"

[এই আবৃত্তির মধ্যে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখা গেল, এই রুদ্ধ কক্ষেও তৃতীয় ব্যক্তি আছে। সে ছিল মূর্তির আড়ালে লুক্কায়িত। আবৃত্তির মধ্যে ভাবাবেগে সে আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রতিহিংসার ক্রূর হাসি তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে আর কেহ নহে—কৃপা। আবৃত্তি শেষ হইতে মৃন্ময় ও উর্বশী যখন হাত-ধরাধরি করিয়া পশ্চাৎ ফিরিবে বলিয়া মনে হইল, কৃপা মূর্তির অন্তরালে তখনই আত্মগোপন করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। কাল সন্ধ্যা। কৃপা, ডাঃ নির্ভয় বোস ও গৌতম পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিতেছিলেন।]

কৃপা ॥ সেই দৈববাণীর কথা মনে হ'লে এখনও আমার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে।

নির্ভয় ॥ (হাসিয়া) দৈববাণী! আপনি কি বলছেন কৃপা দেবী!

গৌতম ॥ বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছিলি কৃপা।

কৃপা ॥ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়। কতবার তোমাদের বলব. মেয়েটিকে প্রথম থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছে। ওর ধরন-ধারণ ভাল লাগছিল না। মৃন্ময়বাবু কাল যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তোমরা সবাই চ'লে গেলে বটে ; কিন্তু আমার মন মানল না। মূর্তিটির আড়ালে আমি গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। তার পর যা দেখেছি, তাতে স্পষ্ট বুঝেছি, ঐ মেয়ে মানুষ নয়। বলছে স্বর্গের উর্বশী, কিন্তু আসলে ও একটা ডাইনি. মৃন্ময়বাবুর রক্ত চুষে খাচ্ছে ঐ ডাইনী।

নির্ভয় ॥ তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু দৈববাণী ব্যাপারটা কি?

কৃপা ॥ হ্যাঁ, দৈববাণী ঊর্ধ্ব থেকে অশরীরী কোন আত্মার সুস্পষ্ট বাণী। স্পষ্ট বললে—পবনদেব। স্বকর্ণে আমি শুনেছি। কি ক'রে বলি মিথ্যা? পবনদেব ডাইনিকে স্বর্গে ফিরে যেতে বলছিল। কিন্তু ডাইনীও স্পষ্ট ব'লে দিলে— মৃন্ময়বাবুকে ছেড়ে সে যাবে না। ডাক্তারবাবু, দাদা, ডাইনীকে তাড়ান; এখনই তাড়ান যদি মৃন্ময়বাবুকে বাঁচাতে চান।

নির্ভয় ॥ বেশ তো, বেশ তো। কিন্তু আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপারটা দেখাই যাক না, কদ্দূর গড়ায়। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি, যার দুশোর ওপরে ব্লাডপ্রেসার সে লোক কি ক'রে এই দু দিন এত হৈ-হল্লা ক'রেও বেঁচে আছে! আমি কেসটা অবসার্ভ করছি। চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষে এ কেসটা যে একটা ব্যতিক্রম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কৃপা ॥ ডাইনী ব'লেই এটা সম্ভব হয়েছে। ডাইনী—ডাইনী— ও ডাইনী। ওকে না তাড়ালে মৃন্ময়বাবু বাঁচবেন না।

গৌতম ॥ ডাইনীই যদি হয়, তাকে তাড়ালেও মৃন্ময় হয়তো বাঁচবে না।

নির্ভয় ॥ কিন্তু কই, ওঁরা তো এখনও ফিরলেন না! আমি আর কতক্ষণ ব'সে থাকব? আমি বরং কয়েকটা জরুরী কেস সেরে আবার আসছি। (যাইবার জন্য উঠিলেন)

কৃপা ॥ আজ রাত্রে নাকি সব দেবতারা আসবেন। ডাক্তারবাবু, আজ রাত্রে আপনাকে এখানে থাকতে হবে—থাকতেই হবে।

নির্ভয় ॥ আপনি ভাববেন না। দেব-দর্শনের পুণ্য আমি হেলায় হারাব না। আমি আসব।

কৃপা ॥ আপনি আমায় বাঁচালেন, আমায় বাঁচালেন। (প্রস্থান)

নির্ভয় ॥ (গৌতমকে) শুধু বন্ধুর নয়, ভগ্নীর চিকিৎসার দিকেও মন দিন গৌতমবাবু।

গৌতম ॥ আপনি কি করেন, কৃপা যা দেখেছে বা শুনেছে, সেটা কি ওর মানসিক বিকার অথবা মস্তিষ্কবিকৃতি?

নির্ভয় ॥ আপনাকে না ব'লে পারছি না—It is a clear case of approaching insanity due to frustrated loev—প্রেমের ব্যর্থতার জন্য আসন্ন মস্তিষ্কবিকৃতি, কথাটা বুঝেছেন গৌতমবাবু?

গৌতম ॥ খানিকটা বুঝেছি, বাকিটা বুঝতে চেষ্টা করছি। আপনি আবার আসবেন কিন্তু।

নির্ভয় ॥ আসব।

[এমন সময় নেপথ্যে উর্বশী ও মৃন্ময়ের সম্মিলিত উচ্চহাসি শোনা গেল।]

গৌতম ॥ ঐ ওরা আসছে। একটু দেখে যান ডাক্তারবাবু।

[উর্বশী ও মৃন্ময়ের প্রবেশ।]

মৃন্ময় ॥ কি ডাক্তারবাবু, ভাল আছেন তো ?

নির্ভয় ॥ ভাল। হ্যাঁ—না—তা আপনি তো দেখছি বেশ ভাল আছেন।

মৃন্ময় ॥ পার্‌ফেক্‌ট্‌। মানসীকে এক্ষুণি বলছিলাম—চল না এবারকার এভারেস্ট অভিযানে আমরাও যাই। (মানসীকে টানিয়া লইয়া) না না মানসী, তুমি আমাকে পার্‌মিশন দাও। আমি এভারেস্ট এক্‌স্‌পিডিশনে যাব। হ্যাঁ, আমি ঠিক পারব।

উর্বশী ॥ কি পাগলামিই করছ, তার চেয়ে বরং শোন—

[মৃন্ময়ের কানে কানে কি বলিতে গেল।]

গৌতম ॥ এভারেস্ট।

নির্ভয় ॥ মাই গড! (উর্বশী ও মৃন্ময়ের দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা, তবে আসি, নমস্কার। (প্রস্থান)

[কিন্তু উর্বশী ও মৃন্ময়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।]

গৌতম ॥ ওরে বাবা! (প্রস্থান)

মৃন্ময় ॥ (বর্ণিত গল্পের জের টানিয়া) বল কি!

উর্বশী ॥ হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ পাতালে, জলের তলে ?

উর্বশী ॥ হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ আমাকে নিয়ে যাবে ?

উর্বশী ॥ তুমি গেলেই নিয়ে যাব।

মৃন্ময় ॥ বেশ, বেশ। তুমি-আমি পাতালেই বাসা বাঁধব। কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। বিরক্ত করতে কেউ যেতে পারবে না। প্রবাল-দ্বীপে বাস করব তুমি আর আমি।

উর্বশী ॥ হ্যাঁ, তুমি আর আমি। আমি দেখব তোমাকে, তুমি দেখবে আমাকে। আমি ভাবব তোমাকে, তুমি ভাববে আমাকে। যুগের পর যুগ, এমনি ক'রে কেটে যাবে। আজ থেকে শতবর্ষ পরে দুঃসাহসী মানুষের দল বিজ্ঞানের বলে যখন যেখানে যাবে তাদের চোখও আমরা এড়িয়ে যাব।

মৃন্ময় ॥ কেমন ক'রে ? তারা আমাদের দেখবে না ?

উর্বশী ॥ দেখবে। কিন্তু চিনতে পারবে না। কারণ, আমরা তখন দুজনেই রূপান্তরিত হয়ে গেছি ফসিলে।

[দুইজনেই খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। মূর্তির আড়ালে কৃপা আত্মগোপন করিয়া ছিল। মৃন্ময় ও উর্বশী চলিয়া যাওয়ামাত্র সে বাহির হইল। অপর দরজা দিয়া বাহাদুর এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উর্বশী ও মৃন্ময়কে না পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। কৃপা ডাকিল।]

কৃপা ॥ বাহাদুর !

বাহাদুর ॥ মাঈজী !

কৃপা ॥ ঐ ডাইনীর কাছে খবরদার আসবি নে। ওর চোখের দিকে কখনও চাইবি নে। কেন বল্‌ তো ?

বাহাদুর ॥ হাম্‌ ভেড়া বন্‌ যায়গা।

কৃপা ॥ জরুর। ঐ মৃন্ময়বাবু ভেড়া হ'ল ব'লে ! আজ রাত্রেও হতে পারে, খুব দেরি হ'লে কাল সকালে।

বাহাদুর ॥ (ভয় পাইয়া) বাবুসাব ভ্যা-ভ্যা করেগা ?

কৃপা ॥ জরুর।

বাহাদুর ॥ হাম্‌ ছুট মাংতা—ঘর চলা যায়গা।

কৃপা ॥ না না, তুই ঘরে যাবি কেন ?

বাহাদুর ॥ হাম ভেড়া বন যায়েগা—হামারা বহু হামকো নেহি পহচানেগা।

কৃপা ॥ না না, ওকেই আমরা ঘরছাড়া করছি। আয়, আমার সঙ্গে।

[বাহাদুরকে লইয়া কৃপা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গৌতমের প্রবেশ।]

গৌতম। এই যে কৃপা, তুমি এখানে ? কালকের সেই ভূত-প্রেতগুলো আবার এসেছে। এ তো বড় বিপদ হ'ল দেখছি কৃপা ! এত হৈ-চৈ—এ তো সইতে পারি না বোন। ওঁরা কোথায় ?

কৃপা ॥ পাতালে—প্রবাল-দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে দাদা। আর দেখছ কি, ডাইনী মৃন্ময়বাবুকে একেবারে ভেড়া বানিয়েছে।

গৌতম ॥ তা বানাক। কিন্তু আমি তো আর সইতে পারি না। এখন কে এদের বসায় ! কে এদের অভ্যর্থনা করে ! বাহাদুর, তুই মৃন্ময়বাবু আর ঐ বিবিকে খবর দে। তুই আয় বোন, আমরা স'রে পড়ি।

বাহাদুর ॥ নেহি সাব্‌। হাম্‌ভি ভেড়া বন্‌ যায়গা।

কৃপা ॥ তুই খবর দিয়ে চ'লে আয়। তবে চোখের দিকে চাইবি না। বুঝলি ?

বাহাদুর ॥ জী হুজুর।

[গৌতম ও কৃপা চলিয়া গেল। বাহাদুর ভয়ে ভয়ে উর্বশীর শয়নকক্ষের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রুমাল দিয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর শয়নকক্ষের দরজায় টোকা মারিতে লাগিল। দরজা খুলিয়া মৃন্ময় এবং উর্বশী বাহিরে আসিল। উর্বশীর অঙ্গে অপ্সরার পরিচ্ছদ।]

মৃন্ময় ॥ এ কি ! বাহাদুর !

বাহাদুর ॥ সাব্‌, বহুৎ আদমি আয়া, ভেট মাংতা।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু চোখ বেঁধেছিস কেন ?

বাহাদুর ॥ আঁখমে বহুৎ দরদ হুয়া সাব্ ।

[বাহাদুরের ছুটিয়া প্রস্থান । ইতিমধ্যে কোলাহল করিতে করিতে অষ্টসখী ও গন্ধর্ব-চতুষ্টয়কে লইয়া ফিল্ম-ডিরেক্টর ত্রিভঙ্গ পাকড়াশী এবং প্রোডিউসার ধনপতি আগরওয়ালার প্রবেশ ।]

ত্রিভঙ্গ ॥ এই যে দেবী, নমস্কার । আমরা সব এসে গেছি ।

ধনপতি ॥ আপনাকে দেখলেই দেবী, আমার কেমন স্বর্গের কথা মনে হয় । আপনি স্বর্গের দেবী আছেন ।

উর্বশী ॥ (হাসিয়া) যাবেন আমার সঙ্গে স্বর্গে ?

ধনপতি ॥ আপনি সঙ্গে নিলে জরুর যাব । স্বর্গে বলুন—স্বর্গে, নরকে যাবেন তো তাও যাব । হাঃ হাঃ হাঃ— (হাসিতে লাগিল)

মৃন্ময় ॥ কষ্ট ক'রে আর অত দূর যাবেন কেন ? আপনার যখন টাকা আছে—স্বর্গই বলুন আর নরকই বলুন, সৃষ্টি করতে কতক্ষণ ?

ত্রিভঙ্গ ॥ তা যা বলেছেন ! আমরা ফিল্ম ডিরেক্টররা মশাই—স্বর্গ মর্ত্য নরক সবই তো মুহুমুহু গড়ছি । এই তো মদনভস্মে'র রিহার্স্যাল দিতে এসেছি, এই ঘরেই মানসচক্ষে গ'ড়ে তুলুন—তুষারাবৃত হিমালয় । ধরুন, এই হিমালয়েরই এই শিখরদেশে ব'সে আছেন ধ্যানগম্ভীর মহাদেব । (মৃন্ময়কে) বসুন না, আপনি এখানে বসুন । ত্রিলোকের কোন শক্তিই মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে নি । ওদিকে দুর্দান্ত তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা বিব্রত, বিপন্ন । কিন্তু কে বধ করবে এই দুর্দান্ত তারকাসুরকে ? প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, বধ করতে পারবে একমাত্র শিবাত্মজ । শিবের কবে পুত্র হবে, সেই পুত্র কবে বধ করবে তারকাসুর ? দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন । সন্ন্যাসী শিবকে গৃহী করবার জন্যে উমার হ'ল আবির্ভাব । (উর্বশীকে) আপনি সেই উমা । আসুন, আসুন সখীদের নিয়ে আপনি সদলবলে এগিয়ে আসুন । আপনারা নৃত্যচ্ছন্দে প্রথমে করবেন শিবপুজো । কিন্তু তথাপি শিবের ধ্যানভঙ্গ হবে না । (মৃন্ময়কে) আপনি চোখ বুজেই ব'সে থাকবেন । তখন মদনদেব তাঁর পঞ্চশরের বাণে শিবকে করবেন বিদ্ধ । (বিষাণকে) এই, তুমি সময় বুঝে বাণ ছুঁড়বে—যেমন ব'লে দিয়েছি । সঙ্গে সঙ্গে শিবের ধ্যান-ভঙ্গ । শিবের তৃতীয় নয়নে জ্বলে ওঠবে আগুন—সেই আগুনে মদন পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে । সে সব আমরা ম্যানেজ ক'রে নেব । তারপরই শুরু হবে উমার সেই নাচ, যে নাচে সন্ন্যাসী শিব গৃহী হ'ল, উমার জন্য পাগল হ'ল । Music hands ready ready everybody, quiet on the floor, start.

[সঙ্গে সঙ্গে ডিরেকশন অনুযায়ী দৃশ্যটি অভিনীত হইতে লাগিল । মাঝখানে ডাঃ বোস, কৃপা ও গৌতমের প্রবেশ । ইহার মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যের প্রবেশ ও দর্শকরূপে আসন গ্রহণ ও অবস্থান । নৃত্য শেষ হইলে ত্রিভঙ্গ মৃন্ময়কে বলিল ।]

ত্রিভঙ্গ ॥ আপনি মুখ গোমড়া ক'রে থাকবেন না মৃন্ময়বাবু। গৌরীর নৃত্যে আপনি প্রসন্ন হয়েছেন—উন্মাদ হয়েছেন। চোখে মুখে সেই ফীলিং আনুন। মুখে আনন্দের হাসি আনুন।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু আমি পারছি না মিঃ পাকড়াশী। আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। আমার ব্লাডপ্রেসারটা ভীষণ বেড়ে গেছে। ডাঃ বোস, আমার পাল্‌স্‌টা একবার পরীক্ষা করুন।

[মৃন্ময় মূর্ছিত হইবার ভান করিল। ভীষণ চাঞ্চল্য শুরু হইল।]

কৃপা ॥ এক গেলাস জল—এক গেলাস জল—

গৌতম ॥ বাহাদুর, বাহাদুর, এক গেলাস জল।

[ডাঃ নির্ভয় বসু ছুটিয়া আসিয়া মৃন্ময়ের নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃপা কিন্তু আজ নির্বিকার। সে এক কোণে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করিতেছিল। বাহাদুর ছুটিয়া আসিয়া মৃন্ময়ের কম্পমান হস্তে জলের গেলাস দিল।]

উর্বশী ॥ বাহাদুর।

[বাহাদুরের বাম হস্তে জলের গেলাস। উর্বশীর ডাক শুনিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া বলিল।]

বাহাদুর ॥ জী হুজুর।

উর্বশী ॥ পাখা খুলে দাও।

[বাহাদুর আদেশ পালন করিতে সেখান হইতে ছুটিয়া গেল।]

মৃন্ময় ॥ আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মানসী। উঃ—

উর্বশী ॥ (করজোড়ে) আপনারা দয়া ক'রে এবার আসুন। ওঁকে একটু একলা থাকতে দিন, ওঁকে একটু একলা থাকতে দিন।

[ডাঃ নির্ভয় বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

নির্ভয় ॥ না, তেমন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু এখন ওর অ্যাব্‌সলিউট রেস্ট দরকার। চলুন—এখন আমরা এখান থেকে যাই। (কৃপাকে) কৃপা দেবী আপনি সেই ওষুধটা মানসী দেবীকে এনে দিন। পনের মিনিট অন্তর অন্তর খাওয়ানো ভাল।

কৃপা ॥ কোন ওষুধেরই আর আবশ্যক হবে না ডাঃ বোস, উনি এখনই ভাল হয়ে যাবেন।

[এই বলিয়া বক্র কটাক্ষ হানিয়া কৃপার প্রস্থান। সকলেই চলিয়া গেল। শুধু দুইজন লোক এক কোণে বসিয়া ছিল।]

মৃন্ময় ॥ বাইরের গোলমাল আমি সইতে পারছি না। দরজা-জানলা-

গুলো সব বন্ধ ক'রে দাও মানসী। আর নীল বাতিটা জেবলে দাও। আঃ—ওঃ—(কাতরোক্তির অভিনয়)।

[দরজা জানলা বন্ধ করিতে গিয়া উর্বশী হঠাৎ লক্ষ্য করিল, দুইজন লোক বসিয়া আছে। বিরক্তভাবে উর্বশী তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল।]

উর্বশী ॥ ও'র অসুখ দেখে সবাই চ'লে গেছেন। আপনারা এখনও এখানে ব'সে ?

চন্দ্র ॥ আমরা যাওয়ার জন্য আসি নি উর্বশী।

সূর্য ॥ আমরা এখানে থাকতেই এসেছি সুন্দরী।

উর্বশী ॥ এ কি ? আপনারা।

মৃন্ময় ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে ?

উর্বশী ॥ চিনতে পারছ না ? না না, তুমি কি ক'রে চিনবে ! ইনি হচ্ছেন সূর্যদেব। (করজোড়ে)

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

আর ইনি হচ্ছেন চন্দ্রদেব।

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবং
নমামি শশিনং ভক্ত্যা বন্দে শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥

আসুন, আপনারা দয়া ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন।

[উর্বশী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া দুইটি সোফায় বসাইল।]

চন্দ্র ॥ কিন্তু বেশিক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব না উর্বশী। জান তো আজ প্রতিপদ। উদয় হতে আজ আমার একটু বিলম্ব আছে। সেই ফাঁকে আমি চ'লে এসেছি শুধু তোমাকে বলতে—উর্বশী, এখনও সময় আছে। স্বর্গে ফিরে চল। জান কি উর্বশী ! তোমার বিহনে স্বর্গে আজ দেবতার মনে সে কি বিরহব্যথা ! শুধু দেবতারা নয়, দেবরাজ নয়, মুনি-ঋষিরা নয়, স্বর্গের আজ প্রতি অণু পরমাণু তোমারই পথ চেয়ে ব'সে আছে। আকাশে বাতাসে কেবলই ধ্বনিত হচ্ছে, 'উর্বশী, কবে তুমি আসবে ! কবে তুমি আসবে !'

মৃন্ময় ॥ আপনি স্যার এ কথা আজ বলছেন ! ঠিক এই কথাগুলোই লিখে গেছেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, অর্ধশতাব্দী পূর্বে, ১৩০২ সালে—

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী।
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।
আদিযুগ পুরাতন এ-জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,

সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
রবে তরঙ্গিতে।।"

[আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে সূর্যদেব আরামে সোফায় দেহ এলাইয়া দিলেন।]

চন্দ্র ।। অপূর্ব! অপূর্ব! উর্বশী বল, কবে তুমি আসবে—কবে তুমি আসবে?

উর্বশী ।। আমি! না না, স্বর্গে আর আমি ফিরব না। আমার জন্য দেবতার এ হাহাকার—এ শুধু দুদিনের। কে আমি? অপ্সরা উর্বশী। দেবতার হৃদয়ের ধন? না। তবে? দেবতার কামনার ইন্ধন। আমার জন্য হাহাকার? আমার বিচ্ছেদে বিরহ? সে ক্ষণিকের। বিলাপ? সে দেবতার প্রলাপ। অশ্রু নেই—অশ্রু নেই—আমার জন্য কার চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু নেই।

মৃন্ময় ।। কি আশ্চর্য! কবিগুরু ব'লে গেছেন—

"শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে। অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।"

সূর্যদেব ।। ওহে চন্দ্র, তোমার উদয়ের সময় এসে গেল যে!

চন্দ্র ।। চলুন, একসঙ্গে যাই।

সূর্যদেব ।। না না, আমি এখন কি যাব হে? আমি বিশ্রামের জন্যেই এসেছি।

চন্দ্র ।। বিশ্রাম! পূর্বাচলে গিয়ে কাল প্রভাতে উদয় হতে হবে তো সূর্যদেব।

সূর্যদেব ।। পূর্বাচলে উদয় হয়ে অস্তাচলে অস্ত গেছি—এক দিন নয়, দু দিন নয়—লক্ষ লক্ষ দিন, কোটী কোটী বৎসর। বিশ্রাম নিই নি একদিনও। আজ আমার বিশ্রাম। উর্বশী কোথায়? তোমার ব্যথা আমি বুঝতে কোনদিনই চেষ্টা করি নি! তোমার কথাতে আজ আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছে। এই যে কোটী কোটী বৎসর কঠোর কর্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছি—কারও ব্যথা তো

বুঝি নি, কারও সুখ-দুঃখের তো ভাগ নিই নি, কারো জন্যে তো কাঁদি নি। না না, চন্দ্রদেব, তুমি যাও, আমি যাব না।

চন্দ্র ॥ কিন্তু আপনার কথাগুলো মন্দ লাগছিল না। আমিও তবে থেকেই যাই সূর্যদেব। বিশ্রাম আমারও চাই।

উর্বশী তবে ঐ জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিই ?

চন্দ্রদেব ॥ কেন ? কেন ?

উর্বশী ॥ আপনার একটি নয়, দুটি নয়, সাতাশটি নক্ষত্রবধূ আপনাকে আমার এখানে দেখছে কি না। (জানালায় ছুটিয়া গিয়া) হ্যাঁ, ঐ তো অশ্বিনী, ঐ তো রোহিণী, ঐ তো ভরণী, ঐ যে কৃত্তিকা। ওরে বাবা ! ঐ যে অশ্লেষা, ঐ যে মঘা, তারা মিটিমিটি চেয়ে নেই – কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে।

চন্দ্রদেব ॥ ওরে বাবা ! (বাতায়নে ছুটিয়া গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি এখুনি যাচ্ছি। (প্রস্থানকালে সূর্যের প্রতি) কিন্তু সূর্যদেব, কাজটা আপনিও ভাল করছেন না। চ'লে আসুন—

সূর্য ॥ না না, তুমি যাও, আমি যাব না। বিশ্রাম—এতকাল পর সূর্যের আজ বিশ্রাম।

চন্দ্র ॥ সূর্যের বিশ্রাম ! সৃষ্টি তবে স্তব্ধ হয়ে যাবে ? পৃথিবীতে আসবে অচল অবস্থা ?

মৃন্ময় ॥ যাকে বলে – ডেড্‌লক ! ডেড্‌লক !

চন্দ্র ॥ ক্ষমা করবেন সূর্যদেব। দেবরাজ ইন্দ্রসকাশে গিয়ে এখনি আমাকে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি বা কথা নিবেদন করতে হবে। (প্রস্থান)

সূর্য ॥ না না, তোমরা ভেবো না। ব'স ব'স, তোমরা ব'স। বেশ সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছিল – যা এতকাল হয়নি।

উর্বশী ॥ (আবদারের সুরে) হ্যাঁ দাদু, আপনি আর উদয় হবেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবেন। রাতের পর রাত—আমরা এখানে হাসব, নাচব, গাইব। কত খেলা খেলব ! সুখ-দুঃখের ছোটখাট কত কথা কইব ! আপনি যা শোনেন নি— আপনি যা জানেন না।

সূর্য ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি আর ও উদয়-টুদয় হচ্ছি না।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু আমি ভাবছি দাদু, কি কাণ্ডটাই না হবে—আপনি যদি উদয় না হন ?

সূর্য ॥ কি কি কাণ্ড হবে বল দেখি—ব'সে আরাম ক'রে শোনা যাক।

মৃন্ময় ॥ শুনুন তবে। আজ কত তারিখ ? (ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া) ১৪ই এপ্রিল— ৩০ শে চৈত্র। দাদু, আজ বছরের শেষ দিন। তা হ'লে ঠিক দিনটিতেই কাণ্ডটি ঘটছে। মানে— নববর্ষের প্রভাত আর হচ্ছে না। হালখাতা-মহৎ সব বন্ধ হয়ে গেল।

সূর্য ॥ বটে ! বটে ! দেনা আদায় হবে না। পাওনাদারেরা মাথায় হাত

দিয়ে বসবে—কি বল ? তা ওরা এতকাল অনেক পাওনা আদায় করেছে। দিন কতক ক্ষান্ত থাক্। কি বল হে ?

মৃন্ময় ॥ যা বলছেন দাদু। দেনাদারদের হাড়ে একটু বাতাস লাগুক।

উর্বশী ॥ কিন্তু চোরা-কারবারটা রাতেই ভাল চলে দাদু। ওরা দু হাত তুলে আপনাকে আশীর্বাদ করবে।

সূর্য। তাই তো হে! ভাবিয়ে তুললে!

উর্বশী ॥ কেন দাদু ?

সূর্য ॥ নেতারা আর কাগজওয়ালারা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করবে না ?

মৃন্ময় ॥ ভোর না হ'লে প্রসেশনই বা কি ক'রে বেরুবে, কাগজই বা কি করে বেরুবে ?

সূর্য ॥ না হে না। সবাই কত আর ঘুমুবে ? নাইট এডিশন, নাইট সেশন শুরু হয়ে যাবে।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু আর একটা ভারি মজা হবে। আপনাদের চিত্রগুপ্তের খাতায় যাদের জন্ম-মৃত্যু লেখা আছে—পয়লা বৈশাখ, তারা কেউ জন্মাবে না, তারা কেউ মরবে না।

সূর্য ॥ শিশুগুলো জঠরযন্ত্রণা বেশি ভোগ করবে। আর বুড়োগুলো না ম'রে ছেলেগুলোকে জ্বালিয়ে মারবে। হ্যাঁ, এটাও ভাববার কথা বটে।

মৃন্ময় ॥ ট্রাম-বাস গাড়ি-ঘোড়া কিছুই চলবে না।

সূর্য ॥ রাতেই চলবে।

উর্বশী ॥ তা হয়তো চলবে। কিন্তু পয়লা তারিখ না এলে মাসের মাইনে পাবে না যে কেউ। মালিকদেরই সুবিধা হবে বেশি।

মৃন্ময় ॥ মহাজনদের সুদ বাড়বে না, ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়বে না, বিয়ের দিন, এন্‌গেজমেণ্টের তারিখ সব গোলমাল হয়ে যাবে।

সূর্য ॥ আসল কথাটা তোমরা কেউই বলতে পারছ না। সূর্যের তেজ না পেয়ে পৃথিবীতে নামবে ধীরে ধীরে হিমের প্রবাহ। ধীরে ধীরে জমবে বরফ। বরফের তালে চাপা পড়বে সৃষ্টি। হেন্ করেঙ্গা তেন্ করেঙ্গা, 'অ্যাটম বম' মারেঙ্গা—সব চেঁচামেচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

[এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। মেঘগর্জন হইতে লাগিল। প্রবল ঝঞ্ঝার আভাস পাওয়া গেল।]

মৃন্ময় ॥ এ কি! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! কি ভীষণ মেঘ ডাকছে! (বজ্র-পতনের শব্দ) ঐ বাজ পড়ল!

সূর্য ॥ (অট্টহাস্যে) ইন্দ্র আসছেন—ইন্দ্র।

উর্বশী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ তো।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রের আবির্ভাব।]

উর্বশী ॥ দেবরাজ, আপনার শুভাগমনে আমরা ধন্য।

ইন্দ্র ॥ উর্বশী, আমি নিজে এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। এস।

[উর্বশী কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।]

ইন্দ্র ॥ বুঝলাম। তুমি যাবে না। (সূর্যকে) (সূর্যদেব, পূর্বাচলে আপনার উদয়-মুহূর্ত সমাগত।

সূর্য ॥ জানি দেবরাজ। আমার প্রাত্যহিক কর্তব্য আমি বিস্মৃত হই নি দেবরাজ। কিন্তু স্বর্গের জীবনে আজ ঘুণ ধরেছে, বিধিনির্দিষ্ট সকল নিয়মই আজ হয়ে গেছে বানচাল। শুধু একটি কারণে। উর্বশী স্বর্গ থেকে চ'লে এসেছে।

ইন্দ্র ॥ চ'লে এসেছে ব'লেই আজ এই প্রথম বুঝতে পারছি, উর্বশী কে, উর্বশী কি ?

সূর্য ॥ এতদিন জানতাম, উর্বশী ছিল অপ্সরা তাকে হারিয়ে আজ বুঝেছি, অপ্সরা তার সত্যিকারের পরিচয় নয়। উর্বশী হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। কর্মের উৎসব—উৎস। সে কারও মাতা নয়, সে কারও কন্যা নয়, কারও বধূ নয়, সে আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতার জীবন-দেবতা, যাকে আমরা কামনা করি অথচ পাই না। আর পাই না ব'লেই তাকে আরও বেশি ক'রে চাই। কর্ম করি তারই আনন্দের জন্যে। কর্তব্য ক'রে যাই তারই প্রশংসা পেতে। সার্থক হই তার প্রেমে, ধন্য হই তার প্রীতিতে।

ইন্দ্র ॥ আমি জানি, আমি তা বুঝেছি। বুঝেছি ব'লেই আমি তাকে ফিরিয়ে নিতে নিজে এসেছি।

সূর্য ॥ কিন্তু এও আমি বুঝেছি, ফিরিয়ে নিতে তুমি তাকে পারবে না। উর্বশীর প্রেম কোন দেবতা পায় নি, পেয়েছে ওই মরণশীল মানব। ওরই জন্যে উর্বশী স্বর্গ ছেড়েছে, মর্ত্যে এসেছে।

ইন্দ্র ॥ স্বর্গে ওকে ফিরে যেতেই হবে—আজই, এই রাত্রে।

উর্বশী ॥ (মরিয়া হইয়া) হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি যাব না, স্বর্গে আমি আর যাব না—যাব না।

ইন্দ্র ॥ ওই মানুষটাকে তুমি ভালবেসেছ, তাই না ?

উর্বশী ॥ হ্যাঁ।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু ওর তো জীবন শেষ হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, ঐ ওর মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া ফুটে উঠেছে। উর্বশী, উর্বশী, যদি তোমার দিব্যদৃষ্টি এখনও থেকে থাকে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না ? আজ রাতই ওর জীবনের শেষ রাত। এ আমার বাসনা নয়, বিধাতার বিধান। রাত্রিশেষে হবে ওর মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ও যাবে স্বর্গে। আর তুমি যদি ওকে ভালবেসেই থাক সখী, তোমাকেও ফিরে যেতে হবে স্বর্গে—ওরই সঙ্গে।

সূর্য ॥ দেবরাজ, আপনি আমায় বাঁচালেন।

ইন্দ্র ॥ আসুন। (সূর্যসহ অন্তর্ধান)

মৃন্ময় ॥ আমি বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ তুমি আমাদের পাশে আছ উর্বশী, আমার মৃত্যু নেই। আমার দেহের প্রতি রক্তকণা তোমার স্পর্শে প্রতি মুহূর্তে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। আমার প্রত্যেকটি অনুভূতি তোমার প্রেমে প্রতি মুহূর্তে নব চেতনায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। তোমার প্রেমে, তোমার প্রীতিতে আমি প্রতি মুহূর্তে সেই শক্তি লাভ করছি, যে শক্তি মৃত্যুকে করে তুচ্ছ, ধ্বংসকে করে ব্যর্থ। শুধু তুমি বল প্রিয়া, আমি তোমাকে পেয়েছি, চিরকালের জন্যে পেয়েছি।

উর্বশী ॥ পেয়েছ। যেদিন তুমি আমার ঐ মূর্তি তোমার দেহের, তোমার মনের প্রতি অনুভূতি দিয়ে আমার নিখুঁত প্রতিমূর্তিরূপে গড়তে পেরেছ, সেই দিন সেই মুহূর্তেই তুমি আমাকে পেয়েছ। যতদিন ওই মূর্তি আছে, ততদিন আমি আছি—আমি আছি।

মৃন্ময় ॥ এস প্রিয়া, তবে এস, আমার শয্যায়, এই রাত্রের প্রতিটি মুহূর্ত রূপে, রসে, গানে, গন্ধে অভিষিক্ত কর, এস—ব্যর্থ করি দেবতার অভিশাপ। এস অভিশাপ এস সখী, এস।

[মৃন্ময় উর্বশীকে লইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। মৃদু বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মূর্তির আড়াল হইতে কৃপা বাহির হইয়া আসিল। ধীরপদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে সে একটি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই বাহাদুরকে লইয়া পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিল, মূর্তিটি বাহাদুরকে দেখাইয়া উহা বাতায়নপথে পাহাড়ের নিম্নে ফেলিয়া দিবার ইঙ্গিত করিল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত বাহাদুর মূর্তিটিকে তুলিয়া লইয়া বাতায়নপথে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। মূর্তিটি সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শয়নকক্ষ হইতে উর্বশীর আর্তনাদ শোনা গেল। বাহাদুর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কৃপা প্রতিহিংসা-চরিতার্থ পাষাণীর ন্যায় বাতায়নে দেহভার ন্যস্ত করিয়া অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। উর্বশী শয়নকক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিল। পশ্চাতে মৃন্ময়। উর্বশী ছুটিয়া গেল মূর্তিটির কাছে। তাহা দেখিতে না পাইয়া সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মৃন্ময়ও মূর্তিটি নাই দেখিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, মৃন্ময় ধীরে ধীরে কৃপার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ঝাঁকিয়া দিয়া বলিল।]

মৃন্ময় ॥ আমি বুঝেছি, এ কাজ তোমার। কিন্তু জেনো, আমি যেমন ওকে হারালাম তুমিও তেমনই আমাকে হারালে। যে যাকে চায় সে তাকে পায় না। আশ্চর্য মানুষের জীবন, আশ্চর্য মানুষের ভাগ্য!

[কৃপা নির্বাক রহিল। শুধু তাহার চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। ধীরে ধীরে উর্বশী কাছে আসিল।]

মৃন্ময় ॥ আমি তোমাকে ধ'রে রাখতে পারলাম না, পারলাম না উর্বশী। ধ'রে রাখার ধনও তুমি নও আমি জানি।

উর্বশী ॥ বিদায় সখা - বিদায়। (অদৃশ্য হইয়া গেল)

মৃন্ময় ॥ চ'লে গেল। তিনটি রাত্রির স্বপ্ন অস্ত গেল।

"ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে ॥"

[আবৃত্তি করিতে করিতে মৃন্ময় একটি সোফায় হেলিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ কক্ষটি ঊষার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল কৃপা।]

কৃপা ॥ মৃন্ময়—মৃন্ময়—মৃন্ময়—

[কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সে পাষাণমূর্তির মত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঊর্ধ্বে তাকাইয়া বলিল।]

কৃপা ॥ আশ্চর্য আমার জীবন –আশ্চর্য আমার ভাগ্য !

[কৃপা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

য ব নি কা

সবিনয় নিবেদন

১৯৮৬ সালের রচিত আমার একাঙ্ক নাটক '**মহাভারত**' সমকালীন তীব্র জাতীয় সমস্যা বিশ্বযুদ্ধ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কিত ছিল। পূর্ণাঙ্গ এই নাট্য সংকলনে নাটকটির স্থান হতে না পারায় সমসাময়িক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে ঐ নাটকটিকে আমি দুইটি পর্বে বিভক্ত করে পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাতে তুলে এই এই সংকলনেই সন্নিবিষ্ট করলাম। ত্রুটি মার্জনীয়।

নাটকটিতে একটি মহাসভা পরিকল্পিত রয়েছে। মহাসভাটির অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্য নাট্য পরিচালক মঞ্চে অভিনীত ঘটনাবলীর সম্পর্কে ঐ মহাসভায় উপবিষ্ট জনতার মন্তব্যাদি ধ্বনিত করে সামগ্রিক অভিনয়টিকে অধিকতর প্রাণমন্ত করা চলে কিনা ভেবে দেখলে সুখী হব।

বিনীত—

মন্মথ রায়

মহাভারত

॥ দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা বিরোধী নাটক ॥

মহাভারতের মহামন্দিরে নিবেদিত
আমার এই সন্ধ্যা-দীপ।

মন্মথ রায়

২৫শে বৈশাখ

১৩৯৩

রচনাকাল ঃ ৭ই শ্রাবণ ১৫ই জুন ১৯৮৫ হইতে এক সপ্তাহ।

প্রথম প্রকাশ ঃ

গ্রুপ থিয়েটার

শারদীয়া সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১৩৯২

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রথম পঠন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ গণ-তান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত শনিবারের আসরে ১৩ই জুলাই ১৯৮৫। পরে নাটকটি রবিবাসরে এবং নাট্য শোধের বিশেষ অধিবেশনেও গ্রন্থকার কর্তৃক পঠিত হয়।

কলিকাতা আকাশবাণী কর্তৃক
বেতার নাটিকারূপে প্রথম অভিনীত
১০ই জানুয়ারী ১৯৮৫

নিবেদন

আজ ভারতে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি সমাজ-সচেতন নাগরিকই যুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতার দ্বিধাহীন বিরোধী। আমিও তাই এই নাটকটি প্রযোজকের অভিরুচি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ অথবা একাঙ্ক যে কোন রূপেই অভিনয় যোগ্য।

মহাভারত নাটকটির লিখন কার্যে ৮৬ বছর বয়স্ক ক্ষীণদৃষ্টি আমাকে অনুলিখনে সাহায্য করেছেন সাগ্রহে ও সানন্দে যে দুইজন পরম স্নেহাস্পদ সাহিত্যিক বন্ধু—সেই শেখর মুখোপাধ্যায় এবং কার্তিক রায়কে আমার অশেষ আশীর্বাদ জানাই।

নিবেদন ইতি

মন্মথ রায়

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩

মহাভারত

[চরিত্রলিপি]

খল্লাতক। রাধাগুপ্ত। রাজপুরুষ। ঘোষক। মহেন্দ্র
মিত্রা। অশোক। বিভাবসু। অধ্যক্ষ। যুবক।
এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গণের প্রতীক।

॥ প্রথম পর্ব ॥

[মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী—পাটলিপুত্র। রাজপ্রাসাদ সন্নিকটে সভাগৃহ। সভাগৃহে প্রেক্ষাগার সম্মুখস্থ মঞ্চ উৎসব সাজে সজ্জিত। প্রভাত কালে উৎসবমুখর নহবৎ বাদ্যমান। প্রেক্ষাগারে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গ আসনস্থ। (ইহা কল্পিত) মঞ্চে দণ্ডায়মান মহামান্য রাধাগুপ্ত, মহাসন্ধি বিগ্রাহিক খল্লাতক এবং কয়েকজন রাজপুরুষ। নহবৎ বাদ্যের অবসান হইল।]

খল্লাতক ॥ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী এই পাটলিপুত্রে কলিঙ্গ রাজ্যজয়ের সার্বভৌম এই মহোৎসব স্বয়ং মহামান্য সম্রাট অশোকের আগ্রহেই আহুত। সুতরাং তাঁরই অনুপস্থিতিতে এ উৎসব অকল্পনীয়।

রাধাগুপ্ত ॥ মহামান্য রাজ-অতিথিবর্গ, আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আরও একটু ধৈর্য ধারণ করুন। মিথ্যা বলব না, আমিও অধীর হয়ে উঠেছি। কিন্তু এক্ষণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে আরও কিছুকাল ধৈর্য ধারণ ভিন্ন অন্য কোনো পথও দেখছি না। কি বলেন মহাসন্ধি বিগ্রাহিক খল্লাতক ?

খল্লাতক ॥ ধৈর্য ধারণ ভিন্ন অন্য কোনো পথ আমিও দেখছি না মহামাত্য রাধাগুপ্ত। ব্যাপারটা সত্যই রহস্যজালে আবৃত হয়ে আমাদের শঙ্কিত ও বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

রাধাগুপ্ত ॥ আমি বিস্মিত। আমি স্তম্ভিত। প্রচণ্ডতম যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজ্যজয় করে মহারাজাধিরাজ সম্রাট অশোক সার্বভৌম উৎসবের এই বিরাট অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে ঐ অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ছিল আজ এই শুভদিনে সূর্যোদয় কালে। কিন্তু আজ সূর্যোদয়ের পর এক প্রহর উত্তীর্ণ হতে চলেছে, তবু সম্রাট উৎসবে অনুপস্থিত। রাজপ্রাসাদ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ—সম্রাট এখনও তাঁর শয়নাগারে অবস্থান করছেন। এবং

এত বেলাতেও তাঁর শয়নকক্ষে শুধু দ্বার নয়, সমুদয় বাতায়নও ভিতর থেকে অবরুদ্ধ। নানা প্রচেষ্টাতেও মহারাণীরা সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

[হঠাৎ বাহিরে দামামা বাজিয়া উঠিল।]

খল্লাতক ॥ ঐ রাজপ্রাসাদ থেকে কেউ আসছেন। [পার্শ্বস্থ রাজপুরুষকে] সম্রাট নন নিশ্চয়। দেখ তো কে!

[রাজপুরুষটি নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিলেন।]

রাজপুরুষ ॥ রাজকুমার মহেন্দ্র এবং রাজকুমারী মিত্রা।

ঘোষক ॥ মহামান্য সুকল্যাণ কুমার মহেন্দ্র, মহামান্যা রাজকুমারী সুকল্যাণী কুমারী মিত্রা দেবী।

[রাজকুমার মহেন্দ্র ও রাজকুমারী মিত্রা দেবীর প্রবেশ।]

রাধাগুপ্ত ॥ কি সংবাদ কুমার মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র ॥ একই সংবাদ।

মিত্রা ॥ পিতার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে মাথা খুঁড়ে কোনো সাড়া পেলাম না মহামাত্য। শিশুকালে মাতৃহীন হয়েছি। [সক্রন্দনে] আজ বোধ হয় পিতৃহীন হলাম।

রাধাগুপ্ত ॥ না—না মা, এ রূপ ধারণার কোনো কারণ নেই।

[মিত্রা দেবীকে কাছে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

মহেন্দ্র ॥ এই সার্বভৌম উৎসবে যোগ দিতে পিতার জরুরি আদেশ পেয়ে রাজগুরু ভগবান উপগুপ্তের আশীর্বাদ নিয়ে নালন্দা মহাবিহার বিদ্যালয় থেকে রথরোহণে আমি আর ভগিনী মিত্রা গতকাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি পাটলিপুত্রে। সৈন্যদলের ক্ষুদ্র এক গুপ্ত বিদ্রোহ দমন করে তারা দলপতিকে বন্দী করে আনা হয়েছে, কিন্তু তখন সেখানে পিতৃদেব অনুপস্থিত। তবে কি ঐ গুপ্ত বিদ্রোহের আর এক অংশের চক্রান্তে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি?

খল্লাতক ॥ [ম্লানহাস্যে] না বৎস, বিদ্রোহ ছিল নামমাত্র এবং মহাবলাধিকৃত বীতশোক অতি সহজেই তা চূর্ণ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদ এবং এই সভাগৃহ রাজরক্ষী সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত রেখেছে।

মহেন্দ্র ॥ গুপ্তহত্যার তবে কোনো অবকাশ নেই মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ না নেই।

মিত্রা ॥ গুপ্তহত্যা যদি নয়, তবে কি আত্মহত্যা?

[মিত্রা ক্রন্দনে আচ্ছন্ন হইল।]

রাধাগুপ্ত ॥ না মা, তুমি অযথা উতলা হয়ো না। সম্রাট করবেন আত্ম-হত্যা! যিনি যুদ্ধে এক লক্ষ লোক—

[তখনই মহাসমারোহে জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল।]

সম্রাট আসছেন।

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ, সম্রাট আসছেন।

রাধাগুপ্ত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সার্বভৌম সম্রাট এসে পড়েছেন।

['জয় সম্রাটের জয়' ধ্বনিতে সভাগৃহ স্পন্দিত হইল। সম্রাট অশোকের প্রবেশ।]

ঘোষক ॥ চতুরুদধি-সলিল-রাশি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবীত-বসুন্ধরাধিশ্বর পরমেশ্বর পরমভট্টারক-সার্বভৌম মহারাজাধিরাজ সম্রাট অশোক।

[জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল।]

অশোক ॥ না। জয়বাদ্য এখন নয়।

[জয়বাদ্য বন্ধ হইল।]

সর্বাগ্রে আমার কর্তব্য এই মহোৎসবে এত বিলম্বে যোগদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। [সম্রাট প্রেক্ষাগারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন] সমবেত মিত্র রাজন্য ও প্রজাবর্গ সুস্বাগতম। উৎসবের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে আমি লজ্জিত —আমি দুঃখিত—আমি মার্জনাপ্রার্থী। কেন এই অভাবনীয় বিলম্ব—সেই চমকপ্রদ কাহিনী আমি সর্বসমক্ষে বর্ণনা করব। কিন্তু তারও পূর্বে আমার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে—সেটি ক্ষুদ্র এক গুপ্ত বিদ্রোহের নায়কের বিচার। কোথায় সেই শৃঙ্খলিত সৈন্যাধ্যক্ষ? আমি তার বিচার করব।

[অশোক সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। পুনরায় জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল।]

অশোক ॥ [চিৎকার করিয়া] বন্ধ রাখো জয়বাদ্য।

[আদেশ প্রতিপালিত হইল।]

রাধাগুপ্ত ॥ মহামান্য সম্রাট! চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রাজ নর্তকীরা আপনাকে বরণ করবেন এখন।

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, এটা একটা মাঙ্গলিক কুলপ্রথা।

অশোক ॥ আমি জানি॥ আপনারা বহুবার দেখেছেন এই বরণোৎসবের শ্রেষ্ঠা নর্তকীকে আমি উপহার দিয়ে থাকি আমার অঙ্গুরীয়কটি [দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন] কোথায় সেই অঙ্গুরীয়ক? নেই। আজ তিন তিনটি দিন নেই। কোথায় গেল সেই অঙ্গুরীয়ক! আমি জানি। কিন্তু আমি তা বলব না। আমি দেখতে চাই কী করে সেই উধাও অঙ্গুরীয়ক কে উদ্ধার করে। প্রশাসনিক দক্ষতা আজ আছে কি নেই, তা আমি জানতে চাই। ঐ অঙ্গুরীয়ক উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমার সম্মুখে নৃত্য গীত-বাদ্য বন্ধ। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া]

এইবার তবে আমি নিবেদন করছি, আমারই দ্বারা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠেয় আজকের এই সার্বভৌম উৎসবে আমারই যোগদানে এই অভাবনীয় বিলম্ব কেন। [সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া] ও না, আমারই বিরুদ্ধে সেই গুপ্ত বিদ্রোহের নায়ক বিশ্বাসঘাতক সেই সৈন্যাধক্ষের বিচার। কি যেন তার নাম ?

খল্লাতক ॥ সৈন্যাধ্যক্ষ বিভাবসু।

[খল্লাতকের ইঙ্গিতে শৃঙ্খলিত বিভাবসুকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিল এক রক্ষী।]

দুর্বৃত্ত বিভাবসু ! সম্মুখে তোমার সার্বভৌম সম্রাট। নতজানু হয়ে অভিবাদন করো পাপিষ্ঠ।

বিভাবসু ॥ না। আমার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি নরখাদক দুর্বৃত্ত এক রাক্ষস। কলিঙ্গ রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করতে গিয়ে যে নির্বিচারে হত্যা করেছে—এক লক্ষ লোক, গৃহহারা করেছে দেড় লক্ষ নরনারী, আর ওর সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসাজনিত ঐ যুদ্ধের ফলে গোটা দেশে শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী—যাতে লক্ষ লক্ষ লোক মুমূর্ষু—এতেও ঐ নরখাদক রাক্ষস সন্তুষ্ট নয়। এখন তার সংকল্প—সিংহল অভিযান। তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই বিদ্রোহ। যুদ্ধ অভিযানে আর চলবে না।

অশোক ॥ চলবে। আমার সিংহল অভিযান আসন্ন। প্রাণদণ্ড না দিয়ে কারাদণ্ডেই দণ্ডিত করব তোমাকে যাতে আমার জয় গৌরব তোমার মৃত্যু যন্ত্রণা হয়।

বিভাবসু ॥ জয় গৌরব ! না যুদ্ধ বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাতর ক্রন্দন আর ক্রুদ্ধ অভিশাপ ?

অশোক ॥ থামো। আমি জানি। সেই আর্তনাদ আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করার পর থেকে লাভ হয়েছে আমার এই অলৌকিক শক্তি। কলিঙ্গ যুদ্ধের সেই জ্বলন্ত স্মৃতি আমার মনে হলে—কি কেউ মনে করিয়ে দিলে, আমি স্পষ্ট শুনতে পায় লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপে রূপান্তরিত সেই আর্তনাদ। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি—হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা ! হাঃ হাঃ হাঃ—ওঃ—এ কি ! এ কি ! এত কাছে কেন ঐ আর্তনাদ আর অভিশাপ। এ যেন কানের কাছে চোখের সামনে !

[প্রথমে হাস্য—পরে যন্ত্রণা]

বিভাবসু ॥ হাঃ হাঃ হাঃ নরখাদক রাক্ষস ! যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ আর মহামারী আজ কি শুধু কলিঙ্গে ? দুর্ভিক্ষ আর মহামারী তোমাদেরও গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তোমার রাজধানী পাটলিপুত্রের অদূরে কয়েকটি গ্রামও আজ দুর্ভিক্ষ কবলিত। না হয়ে পারে ? প্রজাদের প্রদত্ত রাজস্বের সিংহভাগ তুমি ব্যয় করেছ প্রজা হিতে নয়—যুদ্ধ জয়ে—সৈন্যদের বেতনে—অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে—

সমরোপকরণ ক্রয়ে এবং অপর এক দেশের মানুষ মারতে। শুধু মানুষ মারতে নয়, মানুষের সৃষ্ট যা কিছু সুন্দর সব কিছু ধ্বংস করতে।

[বিভাবসুর এই অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন অশোক।]

অশোক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ যুদ্ধজয়ে আমার সাম্রাজ্যের ধন দৌলত প্রভাব প্রতিপত্তি যে কি পরিমাণ বাড়ছে তা ঐ মূঢ়ের চোখে পড়ে না। ঐ দুষ্ট শুধু দেখছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী! মহামাত্য! আপনি কি বলেন মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ এই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যে দুভিক্ষ বা মহামারী অশ্রুতপূর্ব! আপনি কি বলেন মহাসন্ধি বিগ্রাহিক?

খল্লাতক ॥ কিছু দরিদ্রলোক পৃথিবীর সর্বদেশেই বিরাজ করে। আর মৃত্যু পৃথিবীর কোন্ দেশে নেই? সম্রাটের সাম্রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বলে দুভিক্ষ বা মহামারী চলছে এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

বিভাবসু ॥ মিথ্যাবাদী—চাটুকার সব। যারা প্রজাদের দিকে ফিরে তাকায় না কোনোদিন—দেখে শুধু নিজেদের স্বার্থ—

রাধাগুপ্ত ॥ এই দুবৃত্তের স্পর্ধা দেখছেন?

খল্লাতক ॥ আশ্চর্য! কী দুঃসাহস লোকটার!

অশোক ॥ শুনেছি—আমি সব শুনেছি—[কাতর যন্ত্রণায়] আমি এই দুই কানে অনেক কিছুই শুনেছি।

[হঠাৎ সেখানে আরক্ষা অধ্যক্ষের প্রবেশ। সঙ্গে বন্দী এক কৃষক যুবক। তার দেহে প্রহারের চিহ্ন।]

অধ্যক্ষ ॥ মহামান্য সার্বভৌম সম্রাট। আপনার অপহৃত অঙ্গুরীয়ক এই দুর্বৃত্তের হাতে। এই দেখুন। রাজধানীতে বিক্রী করতে এসে ধরা পড়েছে। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পেলে এই অঙ্গুরীয় দেবে, নতুবা হাত ছাড়া করবে না।

অশোক ॥ কিন্তু এ কি! এর দেহ রক্তাক্ত কেন।

অধ্যক্ষ ॥ অঙ্গুরীয়ক না পাওয়াতে একে বলপূর্বক ধরে আনতে হয়েছে। তাতে সামান্য কিছু প্রহারের ফলেই ঐ রক্তচিহ্ন।

অশোক ॥ এই অঙ্গুরীয়ক কি ভাবে পেল ওকে বলতে বলো।

[কৃষক যুবক হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

যুবক ॥ আমি চুরি করি নি হুজুর—আমি চুরি করি নি। তবুও আমাকে চোর বলেছে—ধরে মেরেছে।

খল্লাতক ॥ কোথায় তোমার বাড়ি?

যুবক ॥ এক ক্রোশ দূরে—রামপুরে।

খল্লাতক ॥ কি করে চলে?

যুবক ॥ চলে না হুজুর। জিনিসের দাম আকাশে উঠেছে—গ্রামে চলছে দুর্ভিক্ষ—খেতে পায় না কেউ।

বিভাবসু ॥ রাজ দরবারে জানিয়েছিলে ?

যুবক ॥ কে শুনবে আমাদের কথা ? কানই দেয় না কেউ।

[অশোক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

অশোক ॥ গুপ্তচরের মুখে সম্রাট কিন্তু শুনেছিলেন। তিন দিন পূর্বে গভীর নিস্তব্ধ নীশীথে রাজপ্রাসাদ থেকে গোপনে একাকী ছদ্মবেশে বেরিয়ে এক ক্রোশ দূরে ঐ রামপুরে চলে যান তিনি—আগেকার দিনে অনেক রাজারা যেমন যেতেন—বহু বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখেন, সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ। হ্যাঁ-হ্যাঁ—দুর্ভিক্ষ! খাদ্যাভাবে অনাহারে গত তিন মাসের মধ্যে বহুলোক মৃত—বহু-লোক অর্ধমৃত। আর বহু—বহুলোক মুমূর্ষু—শুধু অনাহারে নয়—মহামারীতে।

বিভাবসু ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—প্রদীপের নিচেই জমাট অন্ধকার!

অশোক ॥ সাবধান, সংযত হও যুবক। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে—সম্রাট শেষ যে বাড়িতে যান, দেখেন—এক বৃদ্ধা মাতা তাঁর যুবা পুত্রকে বলছেন 'তোর ছোট ভাই দুটোকে বাঁচাস—সারাদিন ধুঁকতে ধুঁকতে যে কটা শাকপাতা তুলেছি, তোর হাতে দিয়ে গেলাম'। সম্রাট চোখের ওপর ঐ বৃদ্ধার মৃত্যু দৃশ্যটি দেখলেন। যুবক পুত্রটি কেঁদে উঠতেই দেখে লোকটি তাঁর হাতের মাঙ্গলিক অঙ্গুরীয়কটি তার হাত দিয়ে বলছে 'এই অঙ্গুরীয়কটি বিক্রী করে যে অর্থ পাবে তাতে তোমার গোটা গাঁয়ের লোক কদিন খেয়ে বাঁচতে পারবে।

যুবক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকটা মনে হচ্ছিল দেবদূত। রাজধানীতে আংটিটা বিক্রী করতে এসে কিন্তু মারধোর খেলাম। কপাল!

অশোক ॥ মহামাত্য! ঐ অঙ্গুরীয়কটি যদি ফেরত নিতে চান তবে হাজার স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিতে হবে। কিন্তু সবার আগে ওর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করুন। এখুনি।

যুবক ॥ দেবদূতের গলা আর এই রাজার গলা—এ যে দেখছি, একই গাল।

অশোক ॥ একই গলা, কিন্তু রূপ আলাদা। যখন যেমন, তখন তেমন।

মহামাত্য ॥ [আরক্ষা অধ্যক্ষকে] যথাবিহিত ব্যবস্থা হোক।

[মহামাত্যের ইঙ্গিতে কৃষক যুবককে নিয়ে আরক্ষা অধ্যক্ষ ও এক রাজপুরুষের প্রস্থান।]

বিভাবসু ॥ লোক দেখানো এই ছিটে-ফোঁটা মহানুভবতায় তোমার হিমালয় প্রমাণ পাপের কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হবে না নরখাদক রাক্ষস রাজ!

খল্লাতক ॥ আদেশ দিন সম্রাট, চিরতরে স্তব্ধ করে দি ঐ অসংযত কণ্ঠ।

অশোক ॥ [ম্লান হাসে] কোনো লাভ নেই, মহাসন্ধি বিগ্রাহিক, ওই কণ্ঠের চেয়ে লক্ষগুণ শক্তিশালী আর্তনাদ আর অভিশাপ আমার কর্ণে অহরহ ভেসে আসে কলিঙ্গ যুদ্ধে সর্বস্বান্ত নরনারীদের কণ্ঠ থেকে। তা আমি কি

করে রোধ করব ? আমার আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ সব কিছুই বিষাক্ত হয়ে যায় সেই আর্তনাদ আর অভিশাপে। আমার দুরন্ত দুরারোগ্য এই ব্যাধি কেউ দমন করতে পারে নি আজও। হ্যাঁ হ্যাঁ. ঐ সেই আর্তনাদ—ঐ সেই অভিশাপ আক্রমণ করেছে আমাকে। আমি স্পষ্ট শুনেছি। সহ্য করতে পারছি না আমি। তোমরা আমাকে বধির করে দাও। ভগবান উপগুপ্ত! রক্ষা করো আমাকে।

[মহেন্দ্র ও মিত্রা উভয়েই পিতার এই অস্থিরতা দেখিয়া সম্রাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।]

মহেন্দ্র ॥ পিতা ! ভগবান উপগুপ্তকে আপনার এই ব্যাধির কথা সবিস্তারে বলেছি। তিনি হেসে উঠে বললেন—'এই ব্যাধি দূর করা অতি সহজ।' বলেন নি মিত্রা ?

মিত্রা ॥ হ্যাঁ পিতা, আমিও ছিলাম। তিনি বললেন—'তোমাদের পিতৃদেবকে বলো যুদ্ধ বিগ্রহে তিনি যত লোকের অপকার করেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তত লোকের উপকার করুন তাতেই তাঁর সকল ব্যাধি দূর হবে।

মহেন্দ্র ॥ আপনার পদস্পর্শ করে বলছি, তিনি এই কথা বলেছেন।

মিত্রা ॥ [নতজানু হইয়া অশোকের পদস্পর্শ করিয়া] আমিও বলছি পিতা, তিনি ঐ কথাই বলেছেন। যত লোকের অপকার করেছেন তত লোকের উপকার করতে হবে।

অশোক ॥ যত লোকের অপকার করেছি তত লোকের উপকার !

মিত্রা ও মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ পিতা, যত লোকের অপকার করেছেন তত লোকের উপকার করতে হবে।

অশোক ॥ গুরুবাক্য অভ্রান্ত। আমার জীবনে আজ এ এক নতুন আলোকপাত। দুরন্ত ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ তবে আমার আসন্ন। এইবার তবে শুরু হোক আমার সার্বভৌম উৎসব।

সমবেত কণ্ঠে ॥ জয় সম্রাটের জয় !

অশোক ॥ নাম আমার অশোক। জানি না কে কেন এই নাম রেখেছিলেন আমার। কিন্তু এ নাম যখন গ্রহণ করেছি আমি আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী আমার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের কোনো শোক রাখব না। রাজকোষে সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ আমি আজ থেকে প্রজাদের হিত সাধনে অর্ঘ দান করব এই মহাসভায় ঘোষণা করছি। আজ থেকে—আজ থেকে—আজ থেকে আমার সাম্রাজ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ।

খল্লাতক ॥ যুদ্ধ নিষিদ্ধ ! বলো কি বৎস ?

অশোক ॥ হ্যাঁ মহাসন্ধি বিগ্রাহিক, যুদ্ধ নিষিদ্ধ। কলিঙ্গ যুদ্ধ জয়ের পর- ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নয়, ক্ষতবিক্ষত মনে আমি গ্রহণ করি বৌদ্ধ ধর্ম।

তখনি সংকল্প করি যুদ্ধ বর্জন—চিরতরে যুদ্ধ বর্জন। আর তা ঘোষণা করতেই আজকের এই মহা সম্মেলন। পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাক—যুদ্ধ বর্জন ঘোষণা করছি আমি। কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নয়, সর্ব যুদ্ধে সর্বজয়ী হয়ে। আমি বুঝেছি যুদ্ধের জয়, জয় নয়—মানবতার পরাজয়। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্য বাহিনী নিতান্তই প্রয়োজন তা রেখে আমার বিরাট সৈন্যবাহিনীর বাকি অংশ দেশ ও সমাজ সেবার কাছে নিযুক্ত করব আমি। নিযুক্ত হবে তারা এই বিশাল দেশের প্রয়োজনীয় পথ-ঘাট নির্মাণে—জলাশয় খননে—কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে। আশা করি আমার এই সার্বভৌম উৎসবে আমার এই ঘোষণা গৃহীত হবে সাদরে।

রাধাগুপ্ত ॥ বৎস অশোক! তোমার পিতা সম্রাট বিন্দুসারের মৃত্যুর পরেই তোমাকে সিংহাসনে স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলাম আমি এবং খল্লাতক। সেই সাহসেই বলছি, আজ থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ তুমি ত্যাগ করছ, অথচ পৃথিবীর বিশালতম সাম্রাজ্য স্থাপনে তুমিই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে সম্রাট—

খল্লাতক ॥ এ কথা সত্য।

অশোক ॥ সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি এখনও আছি মহাসান্ধি বিগ্রাহিক। কিন্তু সেই সাম্রাজ্য স্থাপন করব আমি অহিংস পথে, প্রেম ও সেবার অভিনব অস্ত্রে। আমার পরবর্তী অভিযান নির্দিষ্ট ছিল সিংহল। সে অভিমানের সংকল্প অপরিবর্তিত। আমার পরমপ্রিয় পুত্র মহেন্দ্র, পরম কল্যাণীয়া কন্যা মিত্রা আজ সার্বভৌম উৎসবের এই শুভলগ্নে তোমরা আমার মহাগুরু শ্রীউপগুপ্তের আশীর্বাদ নিয়ে অবিলম্বে যাত্রা করো সুদূর সেই সিংহলে। প্রেম ও সেবার অভিযানে জয় করো ঐ রাজ্য। সৈন্যাধ্যক্ষ বিভাবসু, তোমার বিদ্রোহের জন্য আমি তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি। সিংহল অভিযানে তুমি আমার পুত্রকন্যার সহযোগী হও।

বিভাবসু ॥ সম্রাট! সম্রাট! আমার জীবনে এত বড় সৌভাগ্য আর কখনো আসে নি সম্রাট।

[নতজানু হইয়া সম্রাটকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

অশোক ॥ জয়োস্তু। তোমরা তিনজন এইবার ভগবান উপগুপ্তের উপদেশ গ্রহণ করতে নালন্দা যাত্রা করো। তোমাদের সিংহল যাত্রা কালে আশীর্বাদ করতে আমিও উপস্থিত থাকব। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মহেন্দ্র, মিত্রা ও বিভাবসু ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

অশোক ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

মহেন্দ্র, মিত্রা ও বিভাবসুর ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

অশোক ॥ সংঘং শরণং গচ্ছামি।

মহেন্দ্র, মিত্রা ও বিভাবসু ॥ সংঘং শরণং গচ্ছামি।

[মহেন্দ্র, মিত্র ও বিভাবসুর প্রস্থান ।]

অশোক ॥ প্রিয় বন্ধুগণ, আর একটু ধৈর্য ধারণ করুন। আপনাদের সামনে এবার উদ্ঘাটন করছি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ একটি ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা। যার জন্য আজ এই সার্বভৌম উৎসবে যোগ দিতে আমার হয়েছে অভাবনীয় অমার্জনীয় এই বিলম্ব। দয়া করে একটু ধৈর্য ধারণ করুন। সকলে স্থির হয়ে বসুন, শুনুন।

[সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'জয় সম্রাটের জয়'।]

আজকের এই মহা উৎসবে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ আমার পরমপ্রিয় রাজন্য বর্গের সামনে কী বক্তব্য রাখব সেই কথা একমনে নির্জনে চিন্তা করার জন্য গতরাত্রে আমার শয়নাগার অর্গলবদ্ধ করে একাকী শয্যাগ্রহণ করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি। আর তখনই ঘটল সেই অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা।

খল্লাতক ॥ কী সেই ঘটনা সম্রাট ?

অশোক ॥ দেখতে থাকি অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য এক স্বপ্ন।

রাধাগুপ্ত ॥ স্বপ্ন !

অশোক ॥ হ্যাঁ স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন যে কত মারাত্মক হতে পারে সবিস্তারে তা বর্ণনা করছি। আপনারা কল্পনা নেত্রে প্রত্যক্ষ করুন, আমার সেই জীবন-স্বপ্ন অথবা স্বপ্ন-জীবন।

[সময়োচিত সুর তরঙ্গ। মঞ্চে আলোক স্তিমিত হইয়া আসে।]

অশোক ॥ মনে হতে লাগল যেন আমার চার পাশে কারা অস্ফুট স্বরে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পরে মনে হল সেই কথাবার্তা যেন বাদানুবাদ। ক্রমশ সেই বাদানুবাদ উচ্চগ্রামে উঠল এবং পরিণত হল আত্মকলহে। সবিস্ময়ে অনুভব করলাম ঐ সব কণ্ঠস্বর আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গদের। এবং তারা তাদের প্রতীকী মূর্তি ধারণ করে আমার দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমারই শয্যার চারপাশে বিবাদরত।

[মঞ্চ ক্রমশঃ অন্ধকরাচ্ছন্ন হইল।]

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

[যথোচিত সুরতরঙ্গ মধ্যে মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল শয়ান অশোকের চতুষ্পাশে একে একে অংগ-প্রত্যংগের আবির্ভাব। দেখা গেল হস্ত পদ প্রভৃতি অংগ-প্রত্যংগ মানুষের দেহধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহে অংকিত আছে তাহাদের স্ব স্ব পরিচয় প্রতীক।]

হস্ত ॥ আমি আবার বলছি, সম্রাটের ঐ স্বর্ণমুকুট প্রতি উৎসবে প্রতিবার তাঁর মস্তকই ধারণ করবে মস্তকের এই চিরাচরিত অধিকার আর আমি মানব না। ঐ রাজমস্তকের চেয়ে এই রাজহস্ত কিসে কম? প্রতিটি যুদ্ধ জয়ে অসিধারণ করেছে কে? আমি। এই হস্ত। এখন থেকে ঐ স্বর্ণমুকুট ধারণ করে থাকব আমি।

পদ ॥ [বিকৃতকণ্ঠে] অ্যাঁ, যুদ্ধ জয়ে অসিধারণ করেছে কে? আমি। বলি, হস্তি মূর্খ হস্ত মহাশয়, নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছ দেখছি। আমি সম্রাটের এই শ্রীচরণ। এক পা আগাতে হলে—সেই আমি। আমাকে বাদ দিয়ে সম্রাট কি বসে বসে হাত পাখায় হাওয়া খাবেন? [অন্যদের প্রতি] তোমরা সব চুপ করে রয়েছ যে? তোমরা কিছু বলো।

চক্ষু ॥ নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাসালে দেখছি। আমি চক্ষুরত্ন, আমি আছি তাই আলো, নইলে সব অন্ধকার। এর বেশি আর কিছু বলবার আছে? অন্ধকারে হাঁটবে—হাঁটো। অসি চালাবে—চালাও। হোঁচট খাবে—খাও। পড়ে মরো তো মরো। পরের গলা কাটতে গিয়ে নিজের গলাই কাটো।

কর্ণ ॥ আরে বাপু, আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম। আমি এই কর্ণ বাবাজী, বহাল তবিয়তে রয়েছি, তাই সম্রাট সব শুনছেন। তবে সব জানছেন—তবে সব বুঝেছেন। তা সে গুপ্তচরই হোক আর উপগুপ্তই হোক।

নাসিকা ॥ এ দেখছি এরা সব বাপের নামটাই ভুলে যাচ্ছে! আরে আমি রাজার নাসিকা। আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই না সম্রাটের জন্ম—জীবন। আমি চলছি, তাই সম্রাট চলছেন। আমি থামলেই সম্রাট আর নেই। কাজেই স্বর্ণমুকুটের অগ্রাধিকার আমার।

জিহ্বা ॥ বাঃ—বাঃ—বাঃ, বলো—বলো—বলে যাও। প্রাণ যা চায় বলে যাও। আমি জিহ্বা কোনো বাধা দিচ্ছি না। বেঁচে যাচ্ছ শুধু এইজন্য যে

সম্রাট এখনও জিহ্বার ওপর কোনো কর ধার্য করে নি, তাই যার যা খুশি বলে যেতে পারছ। সবার মুখে সব শুনছি আর মনে মনে হাসছি। একটা কথার উত্তর দেবে তোমরা ? সম্রাট বেঁচে আছেন কি করে ? খাদ্য খেয়ে তো ? আমি জিহ্বা রয়েছি, তাই না খাচ্ছেন—রস পাচ্ছেন—রসস্থ হচ্ছেন। সম্রাট কথাই বা বলছেন কি করে ? তুমি হাত তোমার সাহায্যে ? তুমি চোখ—তোমার সাহায্যে ? তুমি কান—তোমার সাহায্যে ? না কি তুমি পা—তোমার সাহায্যে ? সুতরাং ঐ স্বর্ণ মুকুট আমারই প্রাপ্য।

হস্ত ॥ নাও—নাও—নাও। চেটেপুটে চুষে খাও—মুকুটের সাথে রাজার মাথাটাও !

[সকলের হাস্য।]

পদ ॥ না—না, এ হাসির কথা নয়—মান-অভিমানের কথা নয়। আমাদের দাবি আমাদের অধিকারের কথা।

কর্ণ ॥ হ্যাঁ সকলে শান্ত হও। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে যা করতে হয় এখুনি করো। রাত্রি প্রভাতেই হবে সার্বভৌম উৎসব। তার পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চক্ষু ॥ আমরা কি করব ? একটা জিনিস স্পষ্ট দেখছি আমাদের সকলেরই যথেষ্ট যোগ্যতা আছে ঐ রাজমুকুটের সম্মান বহন করার।

হস্ত ॥ তাহলে স্বর্ণ মুকুট কে পাবে ?

সকলে ॥ [চিৎকার করিয়া] আমি—আমি - আমি—

নাসিকা ॥ কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কে পাবে সে বিষয়ে কেউই একমত হতে পারছি না। তাহলে যার যা খুশি করো।

সকলে ॥ করবই তো।

জিহ্বা ॥ কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত। রাজমস্তকে ঐ স্বর্ণমুকুটের চিরকালের অধিকার আর দেওয়া হবে না।

সকলে ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

হস্ত ॥ স্বর্ণমুকুট যখন আমার জুটছে না, তখন আমিও আজ থেকে আর অসি ধারণ করব না।

পদ ॥ আমারও সে কথা। আমি আর চলব না।

কর্ণ ॥ আমি আজ থেকে বধির।

চক্ষু ॥ আমিও আজ থেকে অন্ধ।

জিহ্বা ॥ আমিও আজ থেকে স্তব্ধ হচ্ছি।

সকলে ॥ [সমস্বরে] আজ থেকে আমরা স্ব স্ব প্রধান—স্বতন্ত্র হলাম। দেখা যাক—কে কী করতে পারি !

[সকলে বসিয়া পড়িল। এবং পরে অবসন্ন হইয়া হেলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ মঞ্চে বাদ্য।]

সম্রাট ॥ [কাতর স্বরে] এখন আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। বেঁচে আছি কি না সেইটা সন্দেহ হচ্ছে। চক্ষু থাকতেও আমি দৃষ্টিহীন—হাত পা থাকতেও আমি অচল কর্ণ থাকতেও বধির। জিহ্বা থাকতেও আমি ক্ষুধা নিবারণে অসমর্থ। আমি যেন ক্রমশ নিস্তেজ ও নির্জীব হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে আমার মুমূর্ষুকাল উপস্থিত। আমার এ কী হল। আমার স্বর্ণ-মুকুট মস্তক হয়ে খসে পড়তে চলেছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। পরস্পর বিবাদে নিজেরাও নির্জীব নিস্তেজ এবং আমারও বোধ হয় অন্তিম মুহূর্ত সমাগত।

হস্ত ॥ [কাতরতা] আমার সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছে।

পদ ॥ [কাতরতা] আমারও।

চক্ষু ॥ [কাতরতা] সে তো আমারও।

জিহ্বা ॥ [কাতরতা] আমরা মারা যেতে বসেছি।

নাসিক ॥ [কাতরতা] না খেয়ে আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে প্রায় অচল হয়ে পড়লাম বলে।

কর্ণ ॥ [কাতরতা] না—না, এ অবস্থা চলতে পারে না।

হস্ত ॥ [কাতরতা] এ দেখছি আমরা নিজেরাই মারা যাচ্ছি।

পদ ॥ আর সেই সঙ্গে সম্রাটও। ঐ দেখ—

চক্ষু ॥ কিন্তু এ তো আমরা চাই নি।

জিহ্বা ॥ তবে কি আমরা আলাদা হয়েই মারা যেতে বসেছি!

কর্ণ ॥ নিশ্চয়।

নাসিকা ॥ এখন তো তাই মনে হচ্ছে। সকলে আমরা মিলে মিশে ছিলাম বলেই আমরা ছিলাম জলজ্যান্ত—সম্রাটও।

কর্ণ ॥ ছাড়াছাড়ি হয়ে তো দেখা গেল—

চক্ষু ॥ কারও কোনো দাম নেই। ঐ রাজমস্তকেরও না।

জিহ্বা ॥ আরে মস্তক! সে তো আমাদের সকলেই মস্তক! ওর মাথায় মুকুট উঠলে সে তো আমাদের মাথাতেই উঠল।

হস্ত ॥ বটেই তো বটেই তো। ভুল যখন বুঝেছি—আর দেরি নয়।

পদ ॥ তবে আর কেন? আমরা সব এক যে যার কাজে লেগে যাই।

অন্যান্য অঙ্গগণ ॥ বটেই তো—বটেই তো। উঃ, কী দুর্বলই না হয়ে পড়েছি! সেই গানটা রে—সেই গানটা—'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

[সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তর্ধান। আলোক উজ্জ্বল মঞ্চ। শয়ান অশোক দণ্ডায়মান হইলেন।]

অশোক ॥ মনে হল যে আমার জীবন আবার ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম আমার অস্তিত্ব। ফিরে পেলাম সর্বাঙ্গ সহযোগিতার ঐক্যে সংগঠিত একজাতীয় মহাজীবনের সেই মহাস্বপ্ন। আজ আমার এই সার্বভৌম উৎসবে সমাগত বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের রাজন্যবর্গ, আমার প্রিয় প্রজাপুঞ্জ, আপনারা যথার্থই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাতেই গড়ে উঠবে আমার স্বপ্নের সেই মহাভারত। যার মর্মবাণী মানবজীবনের সেই পরম সত্য —ঐক্যেই বিকাশ, অনৈক্যেই বিনাশ। সংযুক্তিই জীবন—বিযুক্তিই মৃত্যু। এই মহাসত্যের জয় হোক।

[জয়ধ্বনির মধ্যে যবনিকাপাত।]

নাট্যকার মন্মথ রায় একটি সাক্ষাৎকার

[গণনাট্য পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নগুলি রাখেন হীরেন ভট্টাচার্য। ১২, ৯, ৮৫, তারিখে মন্মথ রায় সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন। সে প্রশ্ন ও উত্তর ছাপাতে পেরে আমরা আনন্দিত।]

১। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা আপনি বলেছেন। কেন ও কি ভাবে এ আদর্শের নাট্যায়ন সম্ভব ?

উত্তর : উত্তরটি গত ১৯৪৬সালে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনে আমি সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তাতেই আলোচনা করেছিলাম। উদ্ধৃত করছি : "সমাজ জীবন রাজনীতি এবং সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাজনীতি এবং সমাজনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের সমাজ জীবন এবং এই সমাজ জীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক ও নাট্যশালা। জাতির এবং সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আশাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষ্যভ্রষ্ট। নাটক ও ন্যাট্যশালা জ্ঞানাঞ্জন শলাকারূপে জাতির চেতন ও অবচেতন মনে অধঃপতনের দুষ্টক্ষতগুলি সম্পর্কে চৈতন্য সঞ্চার করে জাতিকে যদি সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত না করে, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা পথ ভ্রষ্ট।" দেশের ও সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজকের নাট্য আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্যক, সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত।

১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনে দেশের যে পরিস্থিতিতে ঐ কথা বলেছিলাম তারপর আরও একুশ বৎসর আমরা পার হয়ে এলাম, কিন্তু আমাদের সামাজিক এবং আর্থিক দুরবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের আট-চল্লিশ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন যন্ত্রণায় জর্জর। কোটি কোটি

যুবক যুবতী বেকার। দেশের সত্তর শতাংশ লোক নিরক্ষর। বৈদেশিক ঋণে দেশ আকণ্ঠ নিমজ্জ। দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। ধনতান্ত্রিক প্রভাব পুষ্ট সংবিধান-এর চোরাগলি দিয়ে অর্থনীতি প্রবাহিত। তাতে এপারে গরীবের কুল ভেঙে ওপারের ধনীর কুলটি ফুলে ফেঁপে উঠছে, মানে—গরীব হচ্ছে আরও গরীব, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। দেশে আজ কালো টাকার পরিমাণ অপরিমেয়। এই দুঃসহ শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের মাত্র একটিই পথ—তা হচ্ছে নির্ভেজাল গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ। দেশের প্রায় সব বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি সমাজতন্ত্রকেই জাতীয় লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ এদের অনেকেরই ক্রিয়াকলাপ সমাজতন্ত্রের বিরোধী। গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই যে জাতিকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করে সাম্য ও মৈত্রী ভিত্তিক আদর্শ জীবনে উত্তরণের একমাত্র প্রমাণিত পথ—এই মহাসত্যকে জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইজন্য যে প্রচার আবশ্যক তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে —গণনাট্য। গণনাট্য সঙ্ঘের সাম্প্রতিক অভিযান এইজনাই জোরদার করা হয়েছে, এটা লক্ষ্য করেছি। তবে এই প্রসঙ্গে লোকনাট্য যাত্রাপালার কার্যকারিতা অধিকতর বলে আমার মনে হচ্ছে। কাজটা সুন্দর শুরু করেছিলেন নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ সালে তাঁর 'রাহুমুক্ত' যাত্রাপালায়। একটা ক্ষীণ চেষ্টা আমিও করেছিলাম, বছর ষোল আগে, ১৯৬৯ সালে সত্যম্বর অপেরা প্রযোজিত আমার 'দিগ্বিজয়' নামক পালা নাটকে। শুনেছি গণনাট্য সংঘও এ বিষয়ে হাত দিয়েছেন।

২। প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে নারীর স্থান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? নারীর সামাজিক সমস্যা আজকের নাটকে কি ভাবে প্রতিফলিত হবে?

উত্তর ঃ আধুনিক নারী এই কথা প্রমাণ করেছে যে, সুযোগ পেলে অথবা তেমন পরিস্থিতি দাঁড়ালে নারী অসামান্য শক্তি বা অপরিসীম প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম। এবং বর্তমান সমাজে এ পরিচয়ের অন্ত নেই। কিন্তু আজকের দিনে খবরের কাগজখুললেই বধূ নির্যাতনের বহু ঘটনা প্রকাশিত হয়। এমন ঘটনা আগেও ঘটত কিন্তু তার প্রকাশ বা প্রচার ছিল না। পণপ্রথা নারীর সামাজিক জীবনে আর একটি কলঙ্ক আইন করেও এ প্রথা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাত্রপক্ষের আর্থিক দুর্লোভ এর প্রধান কারণ। এই পণপ্রথার দরুণ বহু বধূ আত্মহত্যা বা হত্যার বলি হয়েছে। নারীর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আজকের নাটক

কিরূপ হওয়া উচিত—তা বলতে গেলে আমার প্রথমেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাট্যচিত্রটি—যার মর্মবাণী হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর পায়ে পড়েও থাকতে চায় না—মাথায়ও চড়তে চায় না। সুখে দুঃখে থাকতে চায় স্বামীর হাত ধরে—তার পাশে। গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' এ প্রসঙ্গে এক হৃদয়ভেদী নাট্য চিত্র। শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর কিছু কিছু নাট্যরূপে নারী জীবনের পুনর্মূল্যায়ন আছে, যা খুবই সার্থক। বলাই বাহুল্য' সমগ্র সমাজে, নারী এখন ও স্বমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ নয়। এ সম্পর্কে আরও অনেক নাটকের প্রচারমূলক সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক—বিশেষ আজকালের এই পণ-প্রথার বিরুদ্ধে।

৩। প্রশ্ন : আমাদের নাটকের বক্তব্য, সংলাপ ইত্যাদি উন্নতমানের। অথচ এর পাশাপাশি অপ-সংস্কৃতিমূলক নাটক বেশ কিছু চলেছে। এর কারণ কি? কিভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব?

উত্তর : বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমি একটি সংস্কৃত সুভাষিত তুলে ধরব :—

'কাবং হি দর্শনং হন্তি। কাব্যাং গীতেন হন্যতে।
গীতং নাট্যবিলাসেন। সর্বং হন্তি বুভুক্ষতা।'

এই সুভাষিতটি আমাকে দিয়েছেন ডাক্তার কবি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীকালিকিংকর সেনগুপ্ত। শ্লোকটির মোটামুটি অর্থ হ'ল এই—দর্শন আলোচনার আসরের পাশে যদি কাব্যের আসর বসে, তবে দর্শানের আসর ভেঙে যায়। আবার কাব্যের আসরের পাশে যদি সংগীতের আসর বসে, তবে কাব্যের আসর ভেঙে যায়। সংগীতের আসরের পাশে যদি নাটকের আসর বসে, তবে সংগীতের আসর ভেঙে যায়। তবে সব আসরই ভেঙে যায়, দর্শকের পেট যদি ক্ষুধায় জ্বলে। 'সর্বং হন্তি বুভুক্ষুতা'। কিন্তু দেশ থেকে এই বুভুক্ষুতা দূর করার উপায় কি তা বলতে তদুপযোগী নাটকও অভিনয় করতে হবে জাতীয় প্রয়োজনে। সব প্রথমেই আমি সরকারী পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছি ভারতের আটচল্লিশ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমারও নীচে মুমূর্ষু। এর ওপর-তলায় যারা আছে তাদের সিংহভাগই দরিদ্র এবং বুভুক্ষু। এদের জন্যই আজ আমাদের নাটকের সবিশেষ প্রয়োজন। কপালের দোহাই দিয়ে এরা দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নেয়। যেখানে আবশ্যক এরা রুখে উঠবে এবং বাঁচবার দাবিতে লড়াই করবে। এই চেতনাই জাগিয়ে তুলতে হবে বুভুক্ষু এইসব হতভাগ্য-দের মধ্যে। এটা গণনাট্যই করে আসছে এবং আরও বেশি করে করবে। এবং

এইসব নাটক বিদেশী নাটকের অনুবাদে বা ছায়ায় রচিত না হয়ে আমাদের দেশীয় পরিস্থিতিরই একটি বাস্তব রূপায়ন হলে অধিকতর বিশ্বাস্য এবং ফলপ্রদ হবে। অপসংস্কৃতির নাটক বেশিরভাগই সেইসব থিয়েটারেই বেশী চলে যাদের মালিকরা দেশের বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামান না, তারা চান যেন তেন প্রকারেণ সাধারণ মানুষকে অপসংস্কৃতিমূলক নাটকে প্রলুব্ধ করে অর্থ উপার্জন। গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালকদের উদ্দেশ্য—জনজাগরণ। আনন্দদানের মাধ্যমে জনকল্যাণ। তাঁরা নাটকের রূপ ও রূপায়ন নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। নানাভাবেই এরা একটা নতুন নাট্যযুগের প্রবর্তন করেছেন। এবং বেশ কিছু ভাল নাটকও তাঁরা দিয়েছেন। শুনছি এখন নাকি গ্রুপ থিয়েটারের মন্দা চলছে। আমার মনে হয় এটা সাময়িক। হয়ত এটা আর একটা অধিকতর সংগ্রামী নাট্যযুগের আগমনী সংকেত। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। অপসংস্কৃতিমূলক নাটকের মোকাবিলা করতে চাই নাট্যগুণসমৃদ্ধ সুলিখিত সত্যিকার নাটক। বর্তমান সময়েই দেখা যাচ্ছে পেশাদার মঞ্চে 'বিলকিস বেগম' এবং তারও কয়েকটি নাটক অপসংস্কৃতিমূলক নাটক না হয়েও খুবই ভাল চলছে। এইরকম আরও কিছু নাটক যদি বেশ কিছুকাল চলে তাহলেই অপসংস্কৃতি-মূলক নাটকের নাভিশ্বাস উঠবে।

৪। প্রশ্ন : নাটক অতীতকে পেছনে ফেলে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে। কিভাবে ঐতিহ্যের দিককে এর সাথে সমন্বয় করা যায় ?

উত্তর : ঐতিহ্য কথাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল—"কিংবদন্তী, বিশ্রুতি, পরম্পরাগত কথা, tradition।" এই অর্থানুযায়ী ঐতিহ্যও ভাল-মন্দ দুই-ই হতে পারে। সতীদাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথার অত্যাচার উৎপীড়ন নির্বিবাদে সহনশীলতা, কোন যুগে হয়ত প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু এ যুগে সে সব কোনমতেই গৌরব জনক ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। অতীতের যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা কালের বিচারে এখনও গৌরবোজ্জ্বল বিবেচিত হবে সেটাই হবে আমাদের সত্যিকার ঐতিহ্য। যেমন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম, রামমোহন রায়-এর স্বাদেশিকতা, শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ নীতি, বিবেকানন্দের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেবাব্রত, ভারতের অহিংস এবং বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা সংগ্রাম, সতীদাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন—নিঃসন্দেহে এমনি সব ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের অতীতের ঐতিহ্য। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নয়, জয়ী হয়েও সম্রাট অশোকের যুদ্ধ বর্জন—এটা ভারতের

একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অন্ত নেই। ঐতিহ্য মানুষকে চলার পথে উদ্বুদ্ধ করবেই। অবশ্য আমাদের সবনাটকই যে এই ঐতিহ্য ভিত্তিক হবে তারও কোন মানে হয় না। নাটককে এগিয়ে যেতেই হবে। সবনাটকই যে ঐতিহ্য ভিত্তিক হবে তার কোন মানে নেই। ঐতিহ্য তৈরীও হয়।

৫। প্রশ্ন : ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধে আমাদের দেশের মহান শিল্পীরা মুখর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে। আপনার কি মনে হয় আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উম্মাদনার মুখে আমাদের দেশের বর্তমান মহান শিল্পীরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন ?

উত্তর : গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে নাট্যশিল্পীরা বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে একযোগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে যে বিরাট শোভাযাত্রা যুদ্ধবাজ আমেরিকান দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তাকে বর্তমানের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপরূপে গণ্য করা যায়। গত জুন মাসে রচিত যুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতা বিরোধী 'মহাভারত' নামক আমার একটি একাঙ্ক নাটক গণতন্ত্রী সঙ্ঘের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরে ১৩ই জুলাই পাঠ করে আমি আমার নিজস্ব নাটকীয় অভিযান শুরু করেছি।...এইরূপ প্রতিবাদে অন্যান্য নাট্যকার পরিচালকরাও মুখর হয়ে উঠবেন আশা রাখছি।

৬। প্রশ্ন : এটা পরিষ্কার যে, দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। এক্ষেত্রে নাট্যকারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত ?

উত্তর : আমি বিশ্বাস কার অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশী। দেশের বর্তমান এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে নাট্যকারেরা মস্যাধার নিয়ে বসবেন। এবং আমাদের স্বাধীনতার সংবিধানটিকে নির্ভেজাল গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংবিধানে পরিবর্তিত করতে নাট্যাভিযানে ব্রতী থাকবেন। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে।' নমস্তে।

মন্মথ রায়

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

নাট্যকার মন্মথ রায়

● সমীক্ষা ●

এক-বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে. তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভাল করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নজরুল ইসলাম ॥ ৪-৭-১৯২৭

আপনি শুনে খুসি হবেন যে 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি Drama। বাংলা সাহিত্যে নাটক এক রকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী
১৩-৭-১৯২৪

[বঙ্গসাহিত্যের 'বীরবল'। 'সবুজপত্র' সম্পাদক]

পৌরারিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে সর্বপ্রকার নাটক আলোচনার কালে ইহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাষাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্দা ইনি অতি সুনিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটকের উদ্বেলিত ভাব তরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরুপায় ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে! ইহার নাটক দর্শন কালে চরম উত্তেজনায় মন নাচিতে থাকে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।'

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ
প্রণীত
বাংলা নাটকের ইতিহাস

"রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক, তিনশ্রেণীর নাটকই লেখা হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের ধারা যদিও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তবুও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বাস্তব জগতের রস, বহু নাটকেই পরিবেশন করা হইয়াছে। এই ধরণের পৌরাণিক নাটকের বিখ্যাত রচয়িতা হইলেন মন্মথ রায়। তাঁহার 'কারাগার' 'দেবাসুর' 'সাবিত্রী', 'চাঁদসদাগর,' প্রভৃতি নাটকের কাহিনী পৌরাণিক হইলেও উহাতে মানবীয়দ্বন্দ্ব ও সুখদুঃখের সংঘাতই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বাংলায় একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক।"

ভারত কোষ [৪র্থ খণ্ড] ১৮৮ পৃষ্ঠা।

তাঁহার নাটকের ঘটনা সমূহ সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর—দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি আধুনিক যুগে বাহ্যনাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতে, বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চকর ঘটনা—প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়া আধুনিক যুগের সঙ্গে অতি আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নাট্যকার মন্মথ রায়ের অবদান বহু-বিচিত্র,—জাতীয় জীবনে নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক দুর্লভ সম্পদ। ১৯৩০ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ 'কারাগার' নাটকটি পৌরাণিক হয়েও আধুনিক। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনী 'মীরকাশিম' নাটকে সার্থক। 'মহাভারতী', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' থেকে সুরু করে 'ধর্মঘট' নাটকটিতে আধুনিক জীবনচিত্র সুস্পষ্ট।...তাঁর পৌরাণিক থেকে সুরু করে আধুনিক নাট্যরচনায় পরিচয় অসামান্য।

বিজন ভট্টাচার্য ॥ ভাদ্র—১৩৮০
['নবান্ন'-খ্যাত নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক]

এ ভাবে নবনাট্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে আর কেউ পেরেছেন বলে জানা নেই। বিশেষ করে আপনার 'আজব দেশ' তথাকথিত নব্য লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে। 'আলো চাই—আরো আলো'র কোনো তুলনা নেই—অন্ততঃ এদেশের নাট্য-সাহিত্যে নেই।...ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আপনার 'অশোক'। আপনার নাটকেই দেখলাম—প্রকৃত নাটক ইতিহাসের একটা যুগকে ধরার চেষ্টা করে, তৎকালীন আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতিকে প্রতিফলিত করে।... আপনার 'চোটো পাড়া'—কি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর!

উৎপল দত্ত ॥ ২২-১-১৯৫৭

তাঁর রচনার যা সম্পদ, বৈচিত্র্য, গভীর জীবন-বোধ, কল্পনা ও সত্যনিষ্ঠা, এ তাঁর আজও অব্যাহত। একাঙ্কিকা নাটকের ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট। তাঁর নাট্যরচনার ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি কখনো থেমে থাকেন নি, সব সময়েই এগিয়ে চলেছেন—চিন্তাধারার মধ্যে গতি আছে, বিবর্তন আছে, নানান সুরের অর্কেস্ট্রা বাজাতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

দেশ ॥ ২৩-৫-১৯৫৯

"বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের সাধনায় সবচেয়ে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন যশস্বী প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়। প্রায় উপেক্ষিত থেকে দিনের পর দিন এই বিশেষ পর্যায়ের নাট্য রূপ নিয়ে চর্চা ও পরীক্ষা করেছেন তিনি—তিনিই এর নামকরণ করেছেন 'একাঙ্কিকা।' 'বিদ্যুৎপর্ণা'র নাট্যয়ণ একদা বাংলা দেশকে বিদ্যুচ্চকিত করেছিল। ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রোম্যান্টিক, কৌতুকধর্মী—এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে তিনি 'একাঙ্কিকা' গড়বার চেষ্টা করেন নি। চরিত্র রচনা এবং নাট্যমুহূর্ত—সৃষ্টির কৌশল তাঁর অধিগত—সংলাপে তিনি সিদ্ধ সাধক; এবং শ্রীযুক্ত রায়ের যে কোন একটি নাটিকার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ছোটগল্প আর একাঙ্ক নাটকের সন্নিহিতি কত বেশী এবং আন্তর ক্ষেত্রে এই দুইয়ের পার্থক্যও কোন খানে।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

'ছোটগল্পের সীমারেখা' [তৃতীয় অধ্যায়]

[ছোটগল্প এবং একাঙ্ক নাটক—১২৩ পৃষ্ঠা]

মন্মথ রায় বাংলা একাঙ্ক নাট্যসম্রাট—তাঁর মুক্তির ডাক বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক—নব সম্ভাবনার সোনালী দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে; তাঁর নাটকের পরিমানও শ্রেষ্ঠ—শতাধিক অসামান্য নাটকের তিনি সফল স্রষ্টা, আর সমালোচকের ভাষায় একক মন্মথ রায়কে ঐকটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র

'একাঙ্ক নাটকের কথা'

"বর্তমাণ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ই—বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। শুধু প্রবর্তয়িতা নন, তিনিই একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।"

ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য এবং

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত

'একাঙ্ক সঞ্চয়ন'

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

অনিবার্য পরিস্থিতি জনিত মুদ্রণ প্রমাদের বাহুল্য মার্জনীয় সবিশেষ সংশোধনীয়—৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে '৭ই শ্রাবণ' কেটে দিন। ঐ পৃষ্ঠাতেই পঞ্চদশ লাইনে ১৯৮৫ কেটে ১৯৮৬ করুন। ঐ পৃষ্ঠারই ঊনবিংশ লাইনে 'তাই কথাটির পর একটি দাড়ি দিন।

বিনীত—প্রকাশক।

'মুক্তির ডাক'—বাংলা একাংক নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী

আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, ১৯২৩ সালের বড়দিনে কলিকাতার স্টার থিয়েটার নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাংক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় দ্বারা বাংলার নাট্যসাহিত্যে এবং নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক গবেষকগণ 'মুক্তির ডাক' রচয়িতা নাট্যকার মন্মথ রায়কে বাংলা একাংক নাটক প্রবর্তকের সম্মান দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল', সমালোচক শ্রেষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী 'মুক্তির ডাক' নাটকটিকে 'যথার্থই একখানি ড্রামা' রূপে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে বাংলা একাংক নাটক পরম জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হইয়াছে। এখন শুধু মহানগরীতে নয়, গ্রামে গ্রামেও একাংক নাটক অভিনীত হইতেছে। দৃশ্যপটের আড়ম্বর আবশ্যক হয় না এবং প্রযোজনার ব্যয়ও কম বলিয়া একাংক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ক্রমবর্ধমান। উন্নত মানের একাংক নাটক আজ আর দুর্লভ নয়। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার অভিযানে একাংক নাটক আজ অনন্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'মুক্তির ডাক' আমাদের নাট্যজগতে যে রাজপথের সন্ধান দিয়াছিল, এই বৎসর তাহার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান সঙ্গত মনে করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পেশাদার ও অপেশাদার থিয়েটার এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আগামী বড়দিন ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ হইতে অন্তঃত ছয়মাসকাল এই উৎসবের জন্য চিহ্নিত রাখিয়া নাট্য-উৎসবের মাধ্যমে একাংক নাটকের জয়যাত্রাকে অভিনন্দিত করিবেন, আমাদের এই আশা এবং আকাংক্ষা।

স্বাক্ষর ঃ

রমেশচন্দ্র মজুমদার	সত্যজিৎ রায়	উৎপল দত্ত
সত্যেন বোস	মৃণাল সেন	বিজন ভট্টাচার্য
সুকুমার সেন	ঋত্বিক ঘটক	তরুণ রায়
নীহার রঞ্জন রায়	উত্তমকুমার	দেবনারায়ণ গুপ্ত
প্রেমেন্দ্র মিত্র	আশুতোষ ভট্টাচার্য	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
মনোজ বসু	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	অজিতকুমার ঘোষ
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	দক্ষিণারঞ্জন বসু	শুদ্ধসত্ত্ব বসু
রমা চৌধুরী	সুশীল রায়	জীবেন্দ্র সিংহ রায়
কালীশ মুখোপাধ্যায়	বিনয় সরকার	

বিনয় সরকার ঃ

সম্পাদক

বাংলা সাহিত্য একাডেমি দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মুক্তির ডাক' একাঙ্ক নাটকের হীরক জয়ন্তী উৎসব কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যকার মন্মথ রায় কলকাতায় শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।